বিজ্ঞান-কল্প-লতিকা

অর্থাৎ

ন্যায় ও যুক্তি সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয়

প্রস্তাব।

প্রথম ভাগ।

শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদ রায়

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

রাজবাটী ২৫ নং দরমাহাট্টা ষ্ট্রীট।

শকাব্দাঃ ১৮০৪

পূর্ব্বভাষ।

বিজ্ঞান-কল্প-লতিকার প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রস্তাব পুরাণ, ইতিহাস এবং কাব্যাদি হইতে সমাহৃত উদাহরণ সমেত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবগুলি কোন পুস্তক বিশেষ হইতে অনুবাদিত বা তদবলম্বনে রচিত নহে; তবে উদাহরণ স্থলে সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনেক গ্রন্থের আভাষ ও আনুকুল্য গ্রহণ করা গিয়াছে। এই পুস্তক খানি এক প্রকার নূতন প্রণালীতে লিখিত হইল। মনোবিজ্ঞান বিষয়ক ঈদৃশ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় নাই বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত প্রস্তাবগুলিতেই সদ্‌যুক্তি ও সুনীতি সংশ্রব রাখিতে এবং ঐ সমুদায় স্বভাব সঙ্গত ও পরিস্ফুট করিতে সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছি। ভাষা প্রাঞ্জল, শব্দাড়ম্বর শূন্য, এবং বিষয়োপযোগী বিশদ করিবারও চেষ্টার ক্রটি করি নাই; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আপনি আপনি বুঝিতে পারিলাম না। তবে এই মাত্র ভরসা করি, যাঁহারা ধৈর্য্য রাখিয়া এই গ্রন্থ সমগ্র পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের বোধ হয়, নিতান্ত সময় নষ্ট করা হইবে না। এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যে দুই চারি খানি মনোবিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সকল গুলিই কোন না কোন সংস্কৃত বা ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে

বিরচিত হওয়ায়, তৎসমুদায় মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত স্থূল স্থূল তত্ত্বগুলির জ্ঞানলাভ করিতে সাধারণের বিশেষতঃ প্রথম শিক্ষার্থী জনগণের সমুহ ক্লেশ হয়। ঐ সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ যে যে মূল গ্রন্থ হইতে প্রস্তুত, তৎসমুদায়ের সহিত ঐক্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া এরূপ কঠিন ও নীরস হইয়া পড়িয়াছে যে, অধ্যয়ন কালে ধৈর্য্য রক্ষা করা অনেকের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। একে ত বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয় অনেক লোক মাতৃ-ভাষায় মনোবিজ্ঞানের নাম শুনিলেই বিরক্ত হন, তাহার উপর আবার উপযুক্ত পুস্তকের অভাব তাঁহাদিগের উক্ত বিজ্ঞান পাঠের স্পৃহা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া তুলিতেছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, মনোবিজ্ঞান অনুশীলনে মনুষ্যের মন যতদূর উন্নত, স্ফূর্ত্তিমান্ ও সারবান্ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আধুনিক বঙ্গীয় লেখকগণ কেবল নাটক ও উপন্যাসাদি প্রণয়ন করিতেই ব্যস্ত থাকায়, এদেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আশানুরূপ চর্চ্চা হইতেছে না। এই সময়ে যদি অস্মদ্দেশীয় কৃতবিদ্য মহাশয়েরা মনো-বিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান আশ্রয় করিয়া দেশ কালানুযায়ী উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, তাহা হইলে, দেশের সর্ব্ব-সাধারণ লোক অবশ্যই এই সুমহৎ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভের অধি-কারী হইতে পারেন।

পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা না করেন, আমি নূতন প্রণালীতে মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান রচনার পথ প্রদর্শক হইতে যাইতেছি। তবে এ কথা বলিতে পারি যে, এই পৃথিবীতে যে সকল নূতন, আশ্চর্য্য ও মহাহিতকর কার্য্যের আবিষ্কার

D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

হইয়াছে, অনেক স্থলে অজ্ঞজনেরাই তাঁহার প্রথম প্রবর্ত্তক। আমার ন্যায় অল্পশক্তি ব্যক্তি কর্ত্তৃক এতাদৃশ মঙ্গলকর কার্য্যে প্রবর্ত্তনা পক্ষেও সাহায্য হইলে, পরিশ্রম সফল বোধ করি। গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আমি লেখনী ধারণ করি নাই। যদি ইহার কোন অংশে কোন গুণ দৃষ্ট হয়, পণ্ডিত মহাশয়গণ তাহার সহিত তুলনা করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থ আরও উৎকৃষ্ট করিতে পারিবেন এবং ইহার যে সকল স্থলে দোষ লক্ষিত হইবে, নিজ নিজ গ্রন্থে সেই সকল দোষ ত্রুটি অনায়াসেই পরিহার করিয়া যশোভাজন হইতে ও মাতৃ ভাষার গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারিবেন। এক্ষণে বিনীত ভাবে বিদ্বজ্জন সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা অন্ততঃ মাতৃভাষার উন্নতির অনুরোধেও গ্রন্থ খানি একবার আদ্যন্ত পাঠ করুন এবং ইহার দোষ গুণ সমালোচন করুন। তাঁহাদিগের নিরপেক্ষ সমালোচন আমার ও আমার পরবর্ত্তী পণ্ডিত লেখক মহোদয় গণের প্রভূত উপকার করিবে, এই আশাতেই গুণ দোষ বিচারক্ষম পণ্ডিত মহাশয়গণের হস্তে সাদরে ও সসম্মানে এখানি ন্যস্ত করিলাম; যে হেতু মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন,—

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আমার চিন্তাশীল ও বহুদর্শী শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে আমাকে বিস্তর সাহায্য করি-

ছেন। তিনি ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে মুদ্রিত করিতে উৎসাহিত না করিলে, বোধ হয়, আমি ইহার প্রচারে সাহসী হইতাম না। ইতি ১লা ফাল্গুন ১৮০৪ শকঃ।

রাজবাটী,
২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়
গ্রন্থকারস্য।

২২৮৫
G. D. HAZRA & BROTHERS
PHARMACY
BASANTA KUMAR
PROFESSOR OF METRONOMY

বিজ্ঞান-কল্প-লতিকা।

মন ও মনোবৃত্তি।

এই ভূতাবাস ভূমণ্ডল যাঁহার শক্তিতে সৃষ্ট হইয়া যথানিয়মে চলিতেছে, যাঁহার শক্তিতে ঋতুসমূহ পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, যাঁহার শক্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া বিপুলতর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতেছে, যাঁহার শক্তিতে নীরদেরা ক্ষীরতুল্য নীরবর্ষণে ক্ষিতিতল শীতল করিতেছে, যাঁহার শক্তিতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যথাসময়ে নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম সৃষ্টি-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে, সেই চৈতন্যস্বরূপ স্বভাবনিয়ন্তা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল পর্য্যালোচনা করিলে কাহার মনে ভক্তি-রসের আবির্ভাব না হয়? তিনি যে সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গতিশক্তি ও প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থের নাম প্রাণী; শোণিতশুক্রসম্ভূত মনুজকুলই তাহার সর্ব্বপ্রধান। মনুষ্যশরীরে চৈতন্য আছে, শাস্ত্রকারেরা সেই চৈতন্যাংশকে আত্মা বা মন কহেন। এই মনসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, কিন্তু মনের স্থান কোথায় তাহা অদ্যাপিও বিশিষ্টরূপে নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, যে, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে মন অবস্থান করে, অনেকে আবার মস্তিষ্ককেই মন কহিয়া থাকেন। ক্রম্বিনামক বিজ্ঞানবিৎ পাণ্ডিত কহেন যে, যে শক্তিদ্বারা চিন্তা করি, অভিলাষ করি, স্মরণ করি এবং সদসৎ বিবেচনা করি,

সেই শক্তিকেই মন কহে; এই কথাই অনেকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মনের সহযোগী কতকগুলি শক্তি আছে, সেই শক্তির অভাব হইলে মনের কোন ক্ষমতাই থাকে না। প্রথমতঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, (যাহাদিগের দ্বারা মন বাহ্যিক জগতের সমস্ত সংবাদ প্রাপ্ত হন) যথা—দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয়। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারা মন, বাহ্য জগতের সহিত যে সম্বন্ধ রাখেন, চারিটি কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা সেই সকল সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। এই চারিটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে, যথা—হস্ত, পদ, গুহ্য ও মেঢ্র। কেহ কেহ মনকে ইহাদিগের সমভিব্যাহারে লইয়া পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় কহিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকানেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, মনকে যখন দেহ-ক্ষেত্রের একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া অবধারিত করা যাইতেছে, তখন তাঁহাকে কর্ম্মেন্দ্রিয়মধ্যে কিরূপে গণনা করা যাইতে পারে? মন দেহ-রাজ্যে সম্রাট্স্বরূপ। রাজচক্রবর্ত্তীরা যেমন কর্ম্মচারীদ্বারা সংবাদ লইয়া স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় কার্য্য করেন, মনও তদ্রূপ করিয়া থাকেন। মনের যেমন পাঁচজন জ্ঞানদাতা ও চারিজন কার্য্যকারী ভৃত্য আছে, তেমনই ছয়জন মন্ত্রী ইহাঁকে সর্ব্বদা মন্ত্রণা দিয়া থাকে এবং কার্য্যকালে মনের উত্তেজক হয়। ইহাদিগের নাম কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই সমস্ত কর্ম্মচারী লইয়া মন মনুষ্যদেহের মধ্যে যেরূপ ক্রীড়াকৌতুক করিয়া থাকেন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাই তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া জগজ্জনের বোধ উদয় করিতেছেন।

এক্ষণে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা মন কি প্রকারে কার্য্য করান, তাহারই প্রথম উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে;—আমি বাল্যকালাবধি আম্রফলের বিষয় কিছুই অবগত

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY
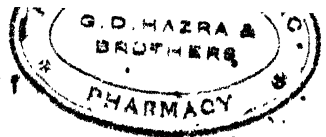
নহি, অন্য কি কথা কখন তাহার নামও শ্রবণ করি নাই। এক দিবস একাকী রাজপথে গমন করিতেছি, এমন সময়ে একজন লোক কহিতেছে "আম চাই?" সেই শব্দ আমার শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, মন আম্রফলের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই সংবাদপ্রাপ্তি মাত্রেই মন আপনা আপনি বিবেচনা করিলেন আম্রফলটি কি? দেখিতে ইচ্ছা হইল, দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা তাহা দেখিলেন, আম্রের বাহ্য অবয়বে মন মুগ্ধ হইল। আঘ্রাণ লইলেন, আঘ্রাণদ্বারা তাঁহার রসাস্বাদনে অভিলাষ জন্মিল। রসনেন্দ্রিয়দ্বারা আস্বাদন করিলেন, সুস্বাদু ফলের রসাস্বাদনে মন মুগ্ধ হইল; পুনর্ব্বার আস্বাদনের ইচ্ছা জন্মিল। ফলবিক্রেতার নিকট একটিমাত্র আম্রফল ছিল, সে কহিল, "আপনার যদি অধিক প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আম্রকাননে গমন করুন্, সেখানে অনেক ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।" পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা মন আম্রফলের রূপ, রস, গন্ধ সমস্তই অবগত হইলেন, তাহার পর আম্রভক্ষণে যার পর নাই অভিলাষ জন্মিল। জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা যাহার সংবাদ ও গুণাগুণ জানিতে পারিলেন, এক্ষণে সেই বস্তু প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যের আবশ্যক হইল। চরণ, মনসম্বলিত দেহকে চালনা করিয়া আম্রকাননে লইয়া গেলেন। কিন্তু সে সময়ে আম্রকাননের রক্ষক তথায় উপস্থিত ছিল না। মনের আম্রভক্ষণে ঘোর অভিলাষ উপস্থিত হওয়ায় কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত বাড়াইয়া আম্র পাড়িতে গেলেন, কাননের রক্ষক দূর হইতে দেখিতে পাইয়া দুই হস্ত তুলিয়া নিবারণ করিয়া কহিল, "ও আম্র পাড়িবেন না, আমি অমুক ধনীর জন্য ঐ কয়েকটা পক্ক আম্র রাখিয়াছি, এখনও ভালরূপ সুপক্ক হয় নাই, কল্য হইবে।" মন, তৎকালে লোভের বশতাপন্ন হইয়া আম্রপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই মোহ

আসিয়া উদয় হইল, মূর্খভাবশতঃ কহিলেন, ইহার যত মূল্য হয় আমি দিব, আমাকে আম্র দাও। রক্ষক কোনক্রমেই তাঁহার কথা শুনিল না। তখন কামনা (প্রাপ্তীচ্ছা) ও ক্রোধ একৈক্য হইয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিল, "আম্র লইতেই হইবে, যদি সহজে না দেয়, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক লইব!—ওর শরীরে কত বল আছে? আমি এক চপেটাঘাতে উহাকে ধরাশায়ী করিয়া আম্র লইয়া যাইব! অমুক বাবুকে দেবে—আমি বাবু নই? আমার টাকা নাই? আমার অপেক্ষাও তিনি বড় হইলেন?" মদ ও মাৎসর্য্য এইরূপে মনকে উত্তেজিত করিতে লাগিল।

প্রথমতঃ মন আম্রফলের কথা শুনিলেন, শ্রবণমাত্রেই দেখিতে ইচ্ছা হইল, দর্শনমাত্রেই সুন্দর আম্রফলটি হস্তে তুলিয়া আঘ্রাণ লই-লেন, সুগন্ধে মনোরাজ মোহিত হইলেন, বদনে দিয়া আস্বাদ গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় একত্র হইয়া কহিল,"আম্রফল কি, তাহা আমরা বিশিষ্টবিধানে বুঝাইয়া দিলাম, এক্ষণে মনোরাজের যাহা ইচ্ছা করুন্"—এই কথা বলিয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হইল। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইল না। কিন্তু মন্ত্রিগণ সর্ব্ব-দাই রাজাকে উপদেশ দিতে পারেন তাহার কালাকাল নাই, এই জন্য লোভ বলিলেন, "এমন উত্তম ফল উদরপূর্ণ করিয়া আহার করা উচিত।" তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মোহ জোড়হস্তে কহিলেন, "যত ব্যয় হয় হউক, তথাচ উদর পূরিয়া আম্র খাওয়া উচিত।" এই দুই জনের মন্ত্রণায় কাম (প্রাপ্তীচ্ছা) প্রবল হইয়া উঠিল, অভিলাষমত কার্য্য সম্পন্ন না হইলেই ক্রোধের আবির্ভাব হয়। আম্রফলসম্বন্ধে সময় বুঝিয়া ক্রোধও মনকে উত্তেজনা করিলেন, মদ ও মাৎসর্য্য ক্রোধের সহচর বলিলেও বলা যায়। তাঁহারা আম্রফলের রক্ষককে
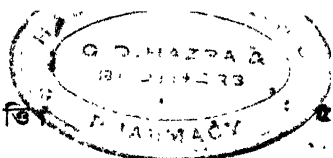
আম্রদানে বিরত দেখিয়া মনকে রাগাইয়া দিলেন, মদ মাতাইয়া দিলেন, মাৎসর্য্য আত্মশ্লাঘা ও বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা দিলেন। মন ষড়রিপু (ছয়মন্ত্রী) দ্বারা বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্তকে কহিলেন, ইহাকে প্রহারের দ্বারা ধরাতলশায়ী করিয়া আম্র পাড়, চরণকে কহিলেন, তুমি দ্রুতপদে পলাইয়া যাও। এখানে মনের আম্রফলপ্রাপ্তিসম্বন্ধে সমস্ত সহচরেরাই কার্য্য করিল, কেবল দুইটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তার প্রয়োজন হইল না, কারণ অধিকারভেদে, মনের সহায়তা সম্বন্ধে সকল কর্ম্মচারীর কার্য্যকরণের আবশ্যক করে না।

মন পূর্ব্বে জানিতেন না যে, দুর্গন্ধযুক্ত গলিত শব কাহাকে বলে। কোন সময়ে এক ব্যক্তি গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে কর্ণকুহরে এই শব্দ গেল "একটা পচা মড়া ভেসে যাচ্চে!" মনের উত্তেজনায় নয়ন (দর্শনেন্দ্রিয়) দৃষ্টি করিয়া কদাকার গলিত শবদর্শনে যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দুর্গন্ধে বিরক্ত হইলেন, রসনেন্দ্রিয় ইহাঁদিগের দুইজনের ভাব দেখিয়া আস্বাদনের কথা উত্থাপনও করিলেন না। শবসম্বন্ধে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় একত্র হইয়া মনকে কহিলেন যে, "ইহাকে দুর্গন্ধযুক্ত গলিত শব কহে। এই পদার্থ দর্শন, স্পর্শন, কি আস্বাদন কিছুরই যোগ্য নহে।" মন জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া প্রধান মন্ত্রী লোভকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন গো, যে নূতন পদার্থের অদ্য জ্ঞানলাভ হইল তাহার প্রতি কি আমি লোভ করিব? শ্রুতমাত্রেই লোভ কহিলেন "অমন কথা মুখে আনিবেন না!" যেখানে লোভ বিরত হইলেন, সেখানে অন্য পঞ্চ রিপু তৎক্ষণাৎ সেই মতে মত দিয়া গেলেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে সকল বিষয়ে

মনকে লোভ উত্তেজিত করে, সে বিষয়ে অন্য পঞ্চ রিপু তাহার সহায়তা করিবেই করিবে।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মনকে ভাল মন্দ* (উচিত ও অনুচিত) সকল বিষয়েরই সংবাদ দিয়া থাকেন। জ্ঞানেন্দ্রিয় না থাকিলে মন বাহ্য-বস্তুসম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকিতেন। কখন কখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ হইয়া মনকে জ্ঞান শিক্ষা দেন। যেমন একটি পঞ্চমবর্ষীয় বালক জননীর ক্রোড়ে বসিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল পূর্ণচন্দ্র গগনে উদিত হইয়াছে। দর্শনদ্বারা মন এই সংবাদটি প্রাপ্ত হইলেন, যে, আকাশে একখানি সুন্দর পদার্থ সমুদিত হইয়াছে তাহার নাম চন্দ্র ; দর্শনেন্দ্রিয় মনকে এই পর্য্যন্ত সংবাদ দিলেন। ইহাতে রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রভৃতি কেহই কোন কার্য্য-কারিতা দর্শাইতে পারিলেন না, কেবল একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ই মনকে চন্দ্রের বিষয় জানাইয়া দিলেন। চন্দ্রের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মন মন্ত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন গো, তোমাদিগের এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে ? ষড়রিপু একৈক্য হইয়া কহিলেন, "এ বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নাই।" কিন্তু কাম কহিলেন, "যদ্বিও আমি তোমাদিগের মতে মত দিয়াছি, তথাচ আমার চন্দ্রগ্রহণে অভিলাষ জন্মিতেছে।" এদিকে সেই বালক কামনার বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র ডাকিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চন্দ্রকে ডাকিল, তথাচ চন্দ্র নিকটস্থ হইল না দেখিয়া ক্রোধের আবির্ভাব হইল, জননীকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল; "আমাকে চাঁদ ধরিয়া দাও।" জননী তাহার সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। জননী চন্দ্র দিলেন না দেখিয়া বালকের ক্রোধস্থলে মোহ আসিয়া উপস্থিত হইল, চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল।
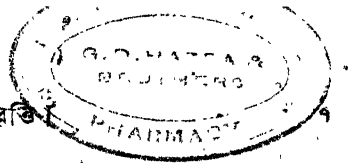
তৎকালে বালকের বাহ্য জগতের সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল না, এই জন্য ক্রন্দন করিতে করিতে মোহবশতঃ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। যে বয়সে বালক চন্দ্রদর্শন করিয়া তাহার প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, সে সময়ে মনের একটি প্রধান বৃত্তি স্মৃতি সেটি বালকের মন আয়ত্ত করিতে পারে নাই, এইজন্য নিদ্রিতাবস্থাতেই বালক একেবারে সব ভুলিয়া গেল। বাহ্য জগতের সহিত যে মনের বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন হইয়াছে, সে মনের প্রাপ্তি ইচ্ছা সহজে লোপ পায় না। হয়ত একটি কামনা বিংশতি বৎসর মন মনে মনে রাখিয়া দেন, তাহার পর সুযোগকাল উপস্থিত হইলেই সেই ইচ্ছা ষড়রিপুর দ্বারা উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন মন সেই বস্তুর প্রাপ্তির জন্য সমস্ত সহচরগণের আশ্রয় চাহিতে থাকেন।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যে একটি বিষয় লইয়া ঘোর আপত্তি করিয়া থাকেন, অদ্যাপিও সর্ব্বতোভাবে তাহার মীমাংসা হয় নাই; তাঁহারা বলেন যে, পশুজাতিরও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, তবে তাহারা অজ্ঞান অবস্থায় কালহরণ করে কেন? কেহ কেহ বলেন পশুজাতির মন নাই, এই জন্য তাহারা সদসৎ ও হিতাহিত বোধ করিতে পারে না। অন্য একদল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, পশুজাতির মন আছে, কিন্তু কয়েকটি মনোবৃত্তির অভাবে তাহারা অজ্ঞানাবস্থায় থাকে, তাহাদের অনুভবশক্তি নাই। দূরে একটি কামানের শব্দ শুনিয়া মনুজকুল বুঝিতে পারেন যে, অমুকস্থানে সংগ্রামের আয়োজন হইতেছে, পশুজাতিরা তাহা অনুভব করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা কার্য্যের কারণ বোধ করিতে পারে না। পশুজাতির স্মরণশক্তি নাই, কিন্তু অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হস্তী ও সিংহ দশ বৎসরের পরে অপকারীর প্রতিহিংসা করিয়া থাকে, ইহা

অপেক্ষা স্মারকতাশক্তির আর কি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? সমস্ত দিন নানাস্থান বিচরণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পক্ষিগণ আপনাপন নীড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং শাবকগণের জন্য কিঞ্চিৎ আহারসামগ্রী মুখে করিয়া আনিতেও বিস্মৃত হয় না; তবে তাহারা কার্য্যের হেতুবাদ করিতে পারে না এই বিভ্রমেই মনুষ্যের কুহকে নিপতিত হয়।* যে হস্তী দশ বৎসরের পর আততায়ীর দণ্ডবিধান করিয়াছে, সেই হস্তীই মনুষ্যের ফাঁদে পড়িবার সময় অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র বিবেচনা করিতে পারে না।

আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া দুইটি কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। অনেক বিবেচনা করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করেন যে, পশুদিগের জীবাত্মা আছে, পরমাত্মা নাই। অনেকস্থলে তাঁহারা পরমাত্মাকে বুদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পশুজাতিরা সেই বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হয় নাই। মনুষ্যেরা কেবল সেই বুদ্ধিবলে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রাণীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন।

* পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চারিটি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বাহ্য জগতের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত হইলেই বুদ্ধিবৃত্তির উৎপত্তি হয়। বুদ্ধি হইতে প্রবৃত্তি জন্মে, প্রবৃত্তি দুই প্রকার,—উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ছয় প্রকার—প্রসন্নতা, ক্ষমা, দয়া, দান, পরদুঃখকাতরতা ও দাক্ষিণ্য। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পঞ্চ প্রকার—আত্মপ্রেম, লোকানুরাগপ্রিয়তা, অসাবধানতা, কাম ও অনুকরণপ্রিয়তা। বুদ্ধি, আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার মূল কারণ। বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবার প্রধান উপায়—উপমিতি, বিবেক, অনুভব ও কল্পনা। যাহাদিগের অনুভব ও কল্পনাশক্তি নাই, কোনও কালে
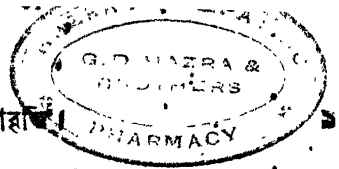
তাহাদিগের উন্নতিলাভ হয় না। সদসৎ বিবেচনাদ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করাকে বিবেক কহে, আর দুই পদার্থের সাদৃশ্য নিরূপণকে উপমিতি কহে। যাঁহাদিগের বিবেক ও উপমিতি ছিল, মনুষ্য-সমাজে তাঁহারাই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতিজ্ঞদিগের বিবেকশক্তির প্রয়োজন ও কবিগণের উপমিতির প্রয়োজন।

এক্ষণে মনোবিজ্ঞানের সমস্ত আয়োজন করিয়া লওয়া গেল। পুনরায় মনুষ্যদেহের মধ্যে চক্রবর্ত্তীর স্বরূপ মন, বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া কি রূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে। মনুষ্য মন লইয়া জন্মগ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু সে সময়ে মন নাম মাত্র দেহপিঞ্জরে অবস্থান করেন; যেমন বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বাগ্রে রোদন করিতে শিখে, তাহার পর স্তন্যপান করে, কিছুদিন স্তনদুগ্ধ পান করিয়া একটু সবল হইলে, ক্রমে ক্রমে হস্ত পদ সঞ্চালন করে। যখন হামা দিতে ও বসিতে শিখে তখন মনের কিয়ৎ পরিমাণে চৈতন্য হয়, সেই সময় বালক একটি মনোমত পদার্থ দেখিতে পাইলেই ছুটিয়া গ্রহণ করিতে যায়। যদিও শিশুর তৎকালে পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় থাকে, কিন্তু বাহ্যজগতের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় না থাকায়, যাহা পায় তাহাই তুলিয়া বদনে দেয়। যদি সম্মুখে একটা কালসর্প পড়িয়া থাকে অকুতোভয়ে তাহাকে হস্তদ্বারা ধরিবে! কারণ সর্পদংশনে যে মৃত্যু ঘটনা হয় তৎকালে সে তাহা অবগত নহে। কেবল ক্ষুধা ও নিদ্রা উপস্থিত হইলে, রোদনেরদ্বারা জননীকে তাহা বিজ্ঞাপিত করে। যদিও সেই বালকের দেহক্ষেত্রে মন আবির্ভূত আছেন, কিন্তু বাহ্যজগতে কি হইতেছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ধারণাশক্তি হয় নাই বলিয়া তিনি কিছুই অবগত

হইতে পারেন না। ক্রমে যখন বালক সুন্দরবস্তু দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিতে শিখে, তখন তাহার জননী কখন বা রক্তবস্ত্র দেখাইয়া, কখন বা নানারঙ্গে রঞ্জিত ঝারা ঝুলাইয়া দিয়া, কখন বা চন্দ্র দেখাইয়া তাহার মনের হর্ষ উৎপাদন করিতে থাকেন। ঐ সকল দৃষ্টিমনোহর পদার্থ দর্শনে বালক যে কেন "আ, ও" শব্দে আনন্দ প্রকাশ করে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহার কিছুই কারণ অনুভব করিতে পারেন না। তবে এই মাত্র বলেন, যে দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তু দৃষ্টি করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে যাইয়া প্রতিফলিত হয়। মন তখন অন্য বিষয়ে নিযুক্ত থাকিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া, দৃষ্টিমনোহর বস্তুর প্রতিকৃতি দর্শনে যে মহা আনন্দ অনুভব হয় কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা তাহাই বাহ্যিকে প্রকাশ হইয়া পড়ে। বালকের যখন বাক্‌শক্তি হইল, তখন দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দেখে, জননীর কাছে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান লয়। জননী তদ্বিষয়ে যাহা বুঝাইয়া দেন, শ্রবণেন্দ্রিয় তৎক্ষণাৎ মনকে তাহা বিজ্ঞাপিত করে। তিন চারি বর্ষ বয়স্ক বালকের দেহক্ষেত্রে থাকিয়া মন. কেবল দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যজগতের কিছু কিছু সংবাদ প্রাপ্ত হন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকর হয় না। কারণ বালক এক দিবস চন্দ্র দেখিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা ওটা কি?" জননী কহিলেন "ওটা চাঁদা মামা।" বালক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "ও কি খায়?" জননী কহিলেন "লোকে মাছ কুট্‌লে মুড়া দেয়, ধান্য ভান্‌লে কুঁড়ো দেয়, গাই বিয়লে দুধ দেয়, তাই ও খায়।" বালকের জননীর কথা তৎকালে মহামন্ত্র বলিয়া বোধ হইল। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা এই এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, চন্দ্রকে জীব বলিয়া তৎকালে মনের ধারণা হইল, সেই ধারণা অনেক দিবসেও

আমাদিগের সংশোধন হয় নাই। বালকের যৎকালে বাক্‌শক্তি ছিল না তৎকালে অকুতোভয়ে অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিত। তাহার পর বালক যখন অন্ধকারে "জুজু কানকাটা থাকে," জননীর প্রমুখাৎ এই কথা অবগত হইল, সেই কথায় বালকের মনে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হইল, আর অন্ধকার গৃহে কোনক্রমেই একাকী যাইতে চাহে না। এক দিবস একটি পক্ক আম্র পাইয়া জননী বালকের হস্তে দিয়া কহিলেন "খাও," বালক স্তনের ন্যায় চুষিতে আরম্ভ করিল, তদ্দারায় কিছু আস্বাদন না পাইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে ফেলিয়া দিল। জননী হাস্য করিয়া আম্রফলটি কুড়াইয়া লইলেন, এবং তাহার কিয়দংশ কর্ত্তন করিয়া বালকের মুখে ধরিলেন, বালক সুমধুর আস্বাদ পাইয়া আম্রফলের উপর পরম পরিতুষ্ট হইল। তদ্দারা মনেও এই ধারণা হইল, আম্র বড় উত্তম ফল। আম্রফলের সহিত মনের পরিচয় লাভ হওয়া অবধি, আম্র দেখিলেই ঐ বালকের মন সেই দিকে ছুটিয়া যাইত। বাল্যকালে জননী দ্বারা বালকগণ বাহ্যজগতের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এতদ্দেশীয় জননীরা সন্তান সন্ততিকে বাহ্যজগতের যে সকল পরিচয় দেন, তাহার অধিকাংশ অলীক কল্পনা মাত্র। "অন্ধকারে ভূত থাকে, চাঁদে বুড়ী আছে" এই সকল কথা জননীর প্রমুখাৎ বালক-বালিকারা শ্রবণ করিয়া বহুকালাবধি অন্ধকার গৃহে যাইতে মনে মনে অত্যন্ত আশঙ্কা পাইয়া থাকে। কিন্তু ইয়ুরোপখণ্ডের জননীরা বালককে সেই শৈশবাবস্থা হইতেই, ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা অলীক ভয় দেখাইয়া বালককে ভীরু করিয়া ফেলেন না। সে যাহা হউক, অতিশৈশবে, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চারিটি, শিশুর কোমল মনে বাহ্যজগতের স্থূল স্থূল

বিষয় অবগত করাইয়া দেয়, কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধসম্বন্ধে ভাল মন্দ জ্ঞাত করাইতে পারে না। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যেস্থানে একজন বর্ষীয়ান্ লোকের বসিতে মহাকষ্ট উপস্থিত হয়, সেই দুর্গন্ধময় স্থানে অনায়াসে বালকবালিকারা বসিয়া ক্রীড়া কৌতুক করে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট আতরের একটি তুলি পঞ্চমবর্ষীয় একটি বালকের নাসারন্ধ্রে ধরিলে, সেই সৎগন্ধের মাধুর্য্য সে কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু একটা ভয়ানক শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে বিপদের আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ জননীর ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে শৈশবে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা মন, এই বাহ্যজগতের কেবল স্থুল স্থুল বিষয় অবগত হন। সে সময়ে বালকবালিকারা কাহাকে উত্তম এবং কাহাকে অধম বস্তু বলে ইহার প্রভেদ করিতে কখনই পারে না, কিন্তু এই আমটি টক্ ও এইটি মিষ্ট তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। বয়সাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বালকের যে পরিমাণে শিক্ষা হয়, সেই পরিমাণে মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বহির্ভাগের (বাহ্যবস্তুর) সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বোধের কার্য্য প্রকাশ করিতে থাকে। যদি শৈশবে শিক্ষা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই বালক অশীতিবর্ষ বয়স্ক হইলেও অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য করিবে। কারণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যে একজন ভদ্রসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া আপন জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু 'বাসুকী ফণা নাড়িলে ভূমিকম্প হয়' বাল্যকালে জননীর নিকট যে গল্প শুনিয়াছিল; শিক্ষার অভাবে একাল পর্য্যন্ত তাহার সে বোধ তিরোহিত হয় নাই। শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যের ক্রমে ক্রমে যে বোধোদয় হইতে থাকে তাহাকেই
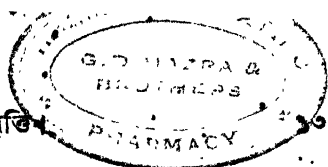
বুদ্ধি কহে। বোধ কর যদ্যপি একটি পঞ্চমবর্ষীয় বালককে একটি গৃহের মধ্যে তালা বন্ধ করিয়া রাখা যায়, এবং তাহাকে বলা যায়, "যে তুমি অদ্য অপরাধ করিয়াছ এই জন্য সমস্ত দিন কারারুদ্ধ হইয়া থাকিবে।" বালক আত্মোদ্ধারের জন্য চীৎকার শব্দে রোদন করিবে এইমাত্র ; কিন্তু একটি বিংশতিবর্ষীয় যুবাকে, ঐ কথা বলিয়া ঐ অবস্থায় রাখিয়া দিলে সে কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মোদ্ধারের জন্য গৃহের চারিদিক্ অনুসন্ধান করিবে, তাহার পর নিজ বুদ্ধিবলে সুবিধা পাইবামাত্র পলায়ন করিবে। কিঞ্চিৎ শিক্ষা দ্বারা মনোমধ্যে বুদ্ধির আবির্ভাব হয়; যে, যে বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহার সেই বিষয়েই কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখা যাইবেই যাইবে। এদেশের কৃষীবল লোকদিগের বিশিষ্টরূপে বিদ্যাশিক্ষা হয় না, তাহারা বাল্যকাল হইতেই পিতা, মাতা, ও আত্মীয় বন্ধুর নিকট কৃষিকার্য্যের শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। একটু বয়সাধিক্য হইলেই তাহারা হলযোজনা করিতে, হলচালনা করিতে, মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে ও সময়ে বীজবপন করিতে শিক্ষা করে। কোন্ বীজ বপন করিবার জন্য কি প্রকার ভূমি মনোনীত করিতে হয়, ও সে ভূমিতে কত-বার হলাকর্ষণ করিতে হয়, এই সকল জ্ঞান তাহারা পিতৃপিতামহের নিকট শিক্ষা করে, তাহার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রয়োজন তৎসমুদয়ই জানিয়া লয়। কালক্রমে, সেই সকল কৃষক আকাশের ভাব দেখিয়া কবে বৃষ্টি হইবে তাহাও অনুমান করিয়া লইতে পারে। কৃষিজীবীদিগের শিক্ষার সহিত উচ্চশিক্ষার কোন সংস্রব নাই, এই জন্যই তাহাদিগের মন উন্নত হয় না। অন্ন বস্ত্র পাইলেই, অপনাপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া একভাবে চিরকাল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মনুষ্যচরিত্র

অবগত হইতে পায় না বলিয়া তাহাদিগের মন অনেকাংশে সরল ও সাধুভাব ধারণ করে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার অভাবে, কল্পিত ধর্ম্মভয়ে যারপর নাই ভীত হয়। মন উন্নত নহে বলিয়া কল্পনাশক্তির অভাব থাকে, সেই কল্পনার অভাবেই আপনার অলীক অভাব বাড়াইয়া লইয়া মনকে কষ্ট দেয় না।

এখানে অবশ্য একথা বলিতে হইবে যে, কল্পনা দ্বারা সংসারের উন্নতি ও অবনতি দুই হইয়া থাকে। কল্পনা না থাকিলে, ব্যাস, বাল্মীকি, শেক্‌স্‌পিয়ার, মিল্‌টন্‌ প্রভৃতি কবিগণ এই সংসারে এতদূর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তির প্রাখর্য্য দৃষ্টে আধুনিক কবিকুল আবার নূতন নূতন কল্পনার মাধুরি প্রকাশ করিতেছেন। কল্পনা দ্বারা নাবিকশ্রেষ্ঠ কলম্বস্‌ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। সংক্ষেপে বলা যাইতেছে, যে কল্পনা দ্বারা সংসারের সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, আবার সেই কল্পনা দ্বারাই সংসারের অসংখ্য অনিষ্ট উৎপাদিত হইতেছে। বোধ কর, কোন ধনিব্যক্তির দুইটি পুত্র আছে, পিতার মৃত্যুর পর দুই ভ্রাতায় পিতৃসম্পত্তি সমানাংশে বিভক্ত করিয়া লইলেন। দুই সহোদরেরই কল্পনাশক্তির প্রাখর্য্য ছিল। জ্যেষ্ঠ কল্পনা করিলেন, যে কাশী হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যে সকল যাত্রীরা সর্ব্বদা গমনাগমন করে, তাহাদিগের জলকষ্টের পরিসীমা থাকে না; যদি কোন ব্যক্তি ঐ রাস্তার স্থানে স্থানে এক একটা কূপ খনন করাইয়া দেন, তাহা হইলে সর্ব্ব সাধারণের বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে। আমি তাদৃশ ধনবান্‌ নহি যে একাকী এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিব। তবে কল্পনা দ্বারা বোধ হয়, যদি কেহ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে অনেক সদাশয়

O. P. MATRA & BROTHERS PHARMACY
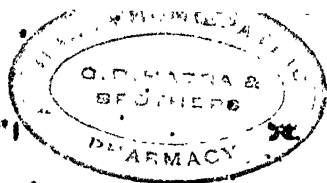
সাধুব্যক্তি সেই মহৎকার্য্যের অনুসরণ করিলেও করিতে পারেন। যাহা হউক যেখানে জলকষ্ট অধিক সেই স্থানে আমি একটি মাত্র কূপ খনন করাইব, এবং সেই কূপের সম্মুখে একখানি প্রস্তরফলকে লিখিয়া দিব যে, "ঈশ্বর যাঁহাকে অর্থ দিয়াছেন তিনি ক্রমে ক্রমে এই জলশূন্য পথের স্থানে স্থানে কূপ খনন করাইয়া তীর্থদর্শনার্থী যাত্রিগণের জলকষ্ট নিবারণ করুন।" তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন ফলে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। যাত্রিগণ ঐ একটি মাত্র কূপোদকের জল পান করিয়া দাতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। সেই প্রসংশাবাদ শুনিয়া অনেক ধনবন্ত লোকের জলাশয় খননে অভিলাষ জন্মিল। শক্তি অনুসারে কেহ দুইটি, কেহ পাঁচটি, কেহ একটি কূপ খনন করাইতে আরম্ভ করায় অতি অল্পকালের মধ্যেই জলশূন্য সমস্ত স্থানের জলকষ্ট নিবারণ হইল। এদিকে কনিষ্ঠ সহোদর কল্পনা করিলেন, যে ত্রিবেণীর ঘাটে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিতে যায়। তাহাদিগের সুবিধার নিমিত্ত আমি ত্রিবেণীর ঘাটের দুইপার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র চাঁদিনী প্রস্তুত করাইব। সেই চাঁদিনীর মধ্যস্থলে অতি প্রত্যূষ হইতেই অনল জ্বলিতে থাকিবে, এবং আমার দুইজন কিঙ্কর দুই চাঁদিনীতে বসিয়া স্ত্রীলোকদিগের দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। স্ত্রীলোকেরা সেই দুরন্ত মাঘের শীতে স্নান করিয়া উঠিয়া অবশ্যই অনলের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইবে, এবং আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিবে। আমি সমস্ত মাঘ মাস ত্রিবেণীর ঘাটের উন্নত অট্টালিকার উপর বাস করিব, সেস্থান হইতে উভয় চাঁদিনী দৃষ্টিগোচর হইবে। স্ত্রীলোকেরা শীতে আড়ষ্ট হইয়া যখন বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিবে, সেই সময় আমি বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগের অর্দ্ধবিবসন অবস্থা অবলোকন করিতে

পাইব। আমি স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য যে সকল উপায় করিয়া দিব তদ্দ্বারা সকলেই সন্তুষ্ট হইবে, এবং যে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাকে দেখিবার জন্য অনেকের অভিলাষ জন্মিতেও পারে। আমিও দুই এক দিবস, উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গঙ্গাতীরে ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিয়া বেড়াইব। স্ত্রীলোকেরা অবশ্যই এ উহাকে দেখাইয়া দিবে " যে ঐ বাবু আমাদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য এত টাকা ব্যয় করিয়াছেন। " আমিও সেই সময়ে সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে মনোনীত করিয়া রাখিব, এবং যে দুই জন চতুর কিঙ্করকে স্ত্রীলোকদিগের দ্রব্যাদি রক্ষণে নিযুক্ত করিব তাহাদিগের দ্বারাই অনেককে আপনার বৈঠকখানায় আনিতে পারিব তাহাতে আর সংশয় নাই।

যখন উভয় ভ্রাতার মধ্যে এক জনকে সৎ ও অন্য একজনকে অসৎ দেখিতে পাওয়া গেল, তখন বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের মধ্যে কি জন্য ব্যভিচারিণীর অপ্রতুল ঘটিবে? ঐ অসদভিপ্রায়ী যুবক যাহা কল্পনা করিয়াছিল, ক্রমে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। সে প্রত্যহ নূতন নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে বেড়াইতে আরম্ভ করায় অনেক স্ত্রীলোক তাহার নিয়োজিত কিঙ্করদ্বয়ের নিকটে বাবুর নাম, ধাম ও গুণাদির পরিচয় লইতে লাগিল। বাবু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেয়, কিঙ্করেরা দুই চারি দিবসের মধ্যে তাহাকেই বৈঠকখানায় আনিয়া উপস্থিত করে। এইরূপে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার কুযশ চারিদিকে বিস্তার হইয়া পড়িল। গ্রামস্থ লোকেরা স্ত্রীলোকদিগকে সে ঘাটে স্নান করিতে যাইতে নিষেধ করিয়া দিল, এবং অনেক গোঁয়ার একত্রিত হইয়া প্রহার দ্বারা সেই কামুকের অস্থি চূর্ণ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

সুযোগমত সময়ে বাবুর অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। এখন দেখিতে হইবে, উভয় ভ্রাতার কল্পনা স্বভাবসম্ভূত কি শিক্ষাপ্রসূত?

যখন উভয় ভ্রাতাই পর্য্যায়ক্রমে পিতার নিকটে বসিয়া নানা প্রকার গল্প শুনিতেন, সেই সময়ে একজন পণ্ডিত মথুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, ও তীর্থপর্য্যটনে যে সকল কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, বাবুর নিকটে সংক্ষেপে তাহারই গল্প করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মহাশয়! তীর্থপথের সকল কষ্টেরই হ্রাস বৃদ্ধি আছে, কিন্তু জলকষ্টের সহিত কোনও কষ্টেরই তুলনা হয় না! ভারতবর্ষে এত ধনবান্ লোক আছেন, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত যাত্রিগণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য কেহই চেষ্টা করিলেন না। যদি দশ ক্রোশ অন্তরেও এক একটি কূপ থাকিত, তাহা হইলেও যাত্রিগণের অনেক উপকার হইতে পারিত। ভ্রাতৃদ্বয় পিতার নিকট বসিয়া এই গল্প শুনায়, সেই দিন অবধি জ্যেষ্ঠের মনে এইরূপ সঙ্কল্প হইল, যে যদি কখন স্বহস্তে ধন পাই, তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণেও যাত্রিগণের কষ্টদূর করিবার চেষ্টা দেখিব। কনিষ্ঠ ভ্রাতাও সেইখানে বসিয়াছিলেন, কিন্তু যাত্রিগণের ঐ কষ্টকর গল্পে তিনি কিছুমাত্র মনোনিবেশ করিলেন না। কিয়দ্দিবস পরে আর একজন লোক কাশীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া উক্ত বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ঐ লোকটি অত্যন্ত বাচাল ছিলেন, কাহারও সহিত কথা কহিবার সময় অশ্লীল শব্দ প্রয়োগে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন গো, কাশীধামের কি অবস্থা দেখিলে?" উক্ত ব্যক্তি একটু উন্নতস্বরে কহিলেন, "অবস্থা আবার কি দেখিব? কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ করিতে বাটী আসিয়াছি। এবার কাশী

রাইয়া গঙ্গারধারে যদি একখানি কুঁড়ে বাঁধিতে পারি, এবং গাছ-কতক রুদ্রাক্ষের মালা কিনিতে পারি, তাহা হইলে নিত্য ক্ষীর সর ভোজন করিতে পাইব, এবং নূতন নূতন রমণীকে কাশীখণ্ড শুনাইয়া তৃপ্ত করিয়া দিব।” বাবু কহিলেন, ‘সে কি’? লোকটি কহিলেন, “আরে মহাশয়! কাশীর ব্যভিচারের কথা কহতব্য নাই। যে সকল স্ত্রীলোক প্রত্যুষে প্রাতঃস্নান করিতে আসে, তাহার চৌদ্দ আনা ব্যভিচারিণী। যাহারা গঙ্গাতীরে ছাপ্পর বাঁধিয়া বসিয়া আছে, তাহারাই তাহাদিগের গুণাগুণ অবগত হইতে পারে। মহাশয়! বলিতে কি, যে সকল স্ত্রীলোকেরা প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতে যায়, তাঁহাদিগের চরিত্র যারপর নাই শোচনীয়!” বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র বসিয়া এই কথাগুলি শুনিলেন, এবং ভাবিলেন, মনে মনে যে সকল কল্পনা করিয়া রাখিয়াছি, হস্তে টাকা পাইলেই তাহা সুসিদ্ধ করিব। জ্যেষ্ঠপুত্র, উক্ত লোকটির মুখে ঐ সকল কদর্য্য কথা শুনিয়া তাহাতে মনোযোগ দিলেন না।

এই দুইটি যুবার বাল্যাবস্থা হইতেই রুচির বিভিন্নতা ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৎকথার আন্দোলনে বিশেষ মনোযোগী হইতেন। কিন্তু কনিষ্ঠ ছাদে উঠিয়া বাটীর নিকটস্থ বেশ্যাগণের ক্রীড়া কৌতুক দেখিতেন। এক পিতার পুত্রদ্বয়ের এরূপ রুচির প্রভেদ কেন হইল? মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যে প্রত্যেক ব্যক্তির মনের রুচি স্বতন্ত্র। যেমন একটি গ্রামের মধ্যে দশটা পুষ্করিণী আছে; তাহার মধ্যে একটি পুষ্করিণীর জল নির্ম্মল ও সুস্বাদু। অন্য একটি পুষ্করিণীর যৎকিঞ্চিৎ সুস্বাদু কিন্তু জল কেহ মুখে করিতে পারে না। অপর আর একটি পুষ্করিণীর জলে স্নান করিলেই লোকের পীড়া উপস্থিত হয়, এবং সেই পুষ্করিণীতে

সংস্থ ছাড়িয়া দিলে তাহা বর্দ্ধিত হয় না, বরং ক্রমে ক্রমে মরিয়া যায়। এরূপ তারতম্য ঘটিবার কারণ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। আধুনিক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, যে একশত ধনু অন্তরের ভূমির প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কেন না দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর কিয়দংশে পদ্মফুল জন্মে, অপর অংশে চেষ্টা করিলেও জন্মে না; মনুষ্য প্রকৃতিও সেইরূপ। এক প্রকৃতির লোক প্রায় দুইজন দেখিতে পাওয়া যায় না, স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রভেদ থাকিবেক।

কেবল এক মন সম্বন্ধে পৃথিবীর চারিখণ্ড নিবাসী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা অনেক আন্দোলন করিয়াছেন। কেহ বলেন মন মনুষ্য শরীরের একটি শক্তি মাত্র, কেহ বলেন মন (Matter) পদার্থবিশেষ, এই দুইটি কথা লইয়া পণ্ডিতেরা এত আন্দোলন ও এত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যে তৎসমুদয় পড়িতে গেলে অনর্থক কালহরণ করা হয় মাত্র, কিছুই ফল লাভ হয় না। যদিও সে সকল নিষ্ফল তর্কের এখানে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, তথাচ উপরোক্ত ঐ দুইটি কথার উপর কে কি বলিয়াছেন, তাহার আভাস মাত্র এস্থলে বিবৃত করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে সকল পণ্ডিতেরা মনকে পদার্থ বলিয়া ধরেন, তাঁহারা আপনাদিগের মত বলবৎ করিবার জন্য এইরূপ তর্ক করিয়াছেন—মন যদি পাঞ্চভৌতিক মনুষ্যদেহের একটি শক্তি মাত্র হইত, তাহা হইলে মনের সহিত শরীরের এতদূর নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিত না। যথা—কোন ব্যক্তি একটি সুরূপা কামিনী দর্শন করিয়া মনে মনে তাহার রূপমাধুরী ধ্যান করিতে লাগিল। সেই ধ্যানের বর্দ্ধিত প্রাপ্তি অভিলাষ প্রবল

হইল। যে পরিমাণে প্রাপ্তি অভিলাষ প্রবল হইল, সেই পরিমাণে বিবেচনাশক্তির হ্রাস হইয়া গেল। মনকে একটি বিষয়ে গাঢ় চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ আপন আপন কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই ব্যক্তি মনকে প্রবল চিন্তায় নিমগ্ন করিয়া সময়ে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল। ক্রমে সর্ব্বশরীর ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, আহারে অরুচি জন্মিল, নিয়মিত কার্য্যে শৈথিল্য ঘটিল, বুদ্ধির হ্রাস হইয়া গেল, স্মরণ ও কল্পনা এই দুইটি শক্তি কেবল সেই কামিনীকে স্মরণ ও তাহার রূপ কল্পনায় নিযুক্ত করিয়া রাখিল। একমাত্র মনের বিকৃতি উপস্থিত হওয়ায় সর্ব্বশরীর বিকৃত হইতে লাগিল। আর সে প্রফুল্ল মুখশ্রী থাকিল না, বর্ণের উজ্জ্বলতা রহিল না, আহারে রুচি না থাকায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলই দুর্ব্বল হইয়া গেল। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, সেই একটি মাত্র রমণীর চিন্তায় চিন্তিত হইয়া মন, আপনার নিবাসভূমি মনুষ্যদেহকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিলেন; যদি মন মানব দেহের একটি শক্তি মাত্র হইত, তাহা হইলে মনের জন্য সমস্ত শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে কেন? শ্রবণ মনুষ্যদেহের একটি শক্তি। কোন ব্যক্তি ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বধির হইয়া গেল, কিন্তু সেই শ্রবণশক্তির অভাবে মনুষ্যশরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না, অগ্নিমান্দ্য হয় না, শরীরের লাবণ্য যায় না এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় না। যদি কোন ব্যক্তি এককালে বধির ও অন্ধ হইয়া যায়, তথাচ তাহার দ্বারা সংসারের অনেক কর্ম্ম পাওয়া যাইতে পারে। মিল্‌টন্‌ অন্ধ হইয়াও ভুবনবিখ্যাত "প্যারেডাইজ্‌ লষ্ট্‌" রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসাদি পাঠে জানিতে পারা যায়, যে সর্ব্বগুণসম্পন্ন

G. D. HAZRA & BROTHERS

এক একটি রাজপুত্র এক একটি সুরূপা যুবতী কামিনীর প্রতি মন সমর্পণ করিয়া জন্মের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই যে, হঠাৎ আমার দক্ষিণ হস্তে একটা বেদনা উপস্থিত হইল, সেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আহার. নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলাম, সুতরাং শরীর দুর্ব্বল ও কান্তিভ্রষ্ট হইয়া গেল। সেই বেদনা আরোগ্য হইবামাত্রেই, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতি সমস্তই পূর্ব্বভাব ধারণ করিল। মনুষ্যশরীরে কোন কোন রোগ অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, যথা—শিরোবেদনা। শিরো-বেদনা উপস্থিত হইলে আর কিছুই ভাল লাগে না, যাহা অত্যন্ত প্রিয় তাহাও অপ্রিয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বেদনার সমতা হইবামাত্রই মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সর্ব্বশরীর প্রকৃতিস্থ হয়। সেইরূপ মনের কামিনীর রূপ কল্পনা——যাহার জন্য মনুষ্যশরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুরুষ অবোধ শিশুর ন্যায় আব্দার করিতেছে, এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকের নিকটে যদি তাহার সেই মনোনীত রমণীকে উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত ব্যাধির উপশম হইয়া যাইবে, এবং মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সেই ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হইয়া মনুষ্যের উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু কামিনীকে দর্শনমাত্রেই হয়ত সবলে লম্ফ প্রদান করিয়া তাহার কর গ্রহণ করিবে। মন যদি পদার্থ না হইত তাহা হইলে হস্তের বেদনা ও শিরঃপীড়ার সহিত মনের প্রকৃতির সাদৃশ্য হইল কেন?

অন্য সম্প্রদায়ীরা কহেন যে, হস্তপদাদি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ রক্ত মাংসে নির্ম্মিত, ইহাদের ক্ষমতা অসীম নহে। মন যদি রক্ত

মাংসে নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে মনের অসীম ক্ষমতা হইত না। শাস্ত্রকারেরা মনকে ঈশ্বরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঈশ্বর যে রক্ত মাংসে নির্ম্মিত নহেন ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ, মনও তদনুরূপ। ঈশ্বরের সহিত মনের অনেক সাদৃশ্য আছে, ঈশ্বর যেমন মুহূর্ত্ত-কালের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে পারেন, মনেরও সেইরূপ ক্ষমতা আছে। ঈশ্বর যেমন কল্পনা দ্বারা এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, মন ইহা অপেক্ষাও সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করিতে পারেন। তবে ঈশ্বরে ও মনে এই মাত্র প্রভেদ যে, ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান্, কিন্তু মন তাহা নহেন। মন কল্পনা করিতে পারেন, ঈশ্বর অপেক্ষাও উন্নত কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু যে আধারে বাস করেন, সেই আধারের ক্ষমতার অতীত কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। সে ক্ষমতা ঈশ্বর মনকে না দিয়া ভালই করিয়াছেন, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির মনের কল্পনা যদি কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড এক দিনের জন্যেও এক অবস্থায় থাকিতে পারিত না। এ সকল কথার হেতুবাদ স্থানান্তরে হইবে। এখন কথা হইতেছে এই যে, মন, রক্ত মাংসে নির্ম্মিত নহে, মন পঞ্চ ভৌতিক দেহের একটি চৈতন্য মাত্র। কিন্তু মনের সহিত মনুষ্য শরীরের এত দূর সম্বন্ধ আছে, যে মন উন্নত হইলেই মনুষ্যের উন্নতি হইবে, মন অবনত হইলেই মনুষ্যের অবনতি হইবে। অনেকানেক পণ্ডিতেরা মনকে মত্তকরীর সহিত তুলনা করিয়াছেন, যেমন মত্ত মাতঙ্গকে কেবল অঙ্কুশাঘাতেই শাসন করা যায়, তেমনি মনোমাতঙ্গকে জ্ঞানাঙ্কুশের দ্বারা সর্ব্বদা শাসন করিয়া রাখিতে হয়।

G. D. HAZRA &
BROTHERS
PHARMACY
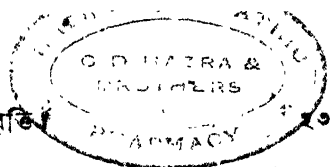
যাঁহারা মনকে একটি শক্তিমাত্র বলিয়া ধরেন, তাঁহারা অন্য প্রকারে পূর্ব্বকথিত পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করিয়া থাকেন, যথা—যে সকল পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, মন অবশ্য রক্তমাংসে নির্ম্মিত, তাহা না হইলে মন দুর্ব্বল হইলে শরীর দুর্ব্বল হয় কেন? মন প্রফুল্ল থাকিলে মনুষ্য বলবান্ হইয়া উঠে কেন? এ কথায় তাঁহারা এই মাত্র উত্তর দিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির প্রিয়তমা পত্নী তাহার বাটী হইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরে পিত্রালয়ে বাস করিতে ছিল। হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইল, এই সংবাদ তাহার স্বামী প্রাপ্ত হইয়া দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিল, আহারে অরুচি জন্মিল, নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিল, এক প্রকার উন্মাদের ন্যায় শয্যাশায়ী হইয়া রহিল। মন যদি রক্ত মাংসে নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে কেবল শরীর সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনার উপর মনের সুখ দুঃখ অনুভব হইত। যেমন চরণে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইলে মন অধৈর্য্য হইয়া উঠে, কেন না মন রক্ত মাংসে নির্ম্মিত ;-সুতরাং এক অবয়বে আঘাত লাগিলে, অন্য অবয়ব অবশ্য কষ্ট অনুভব করিবে। কিন্তু বিংশতি ক্রোশ অন্তরে একটি স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটিল—সেই সংবাদ শ্রবণে আমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল কেন? আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হই কেন? আমার শরীরের সহিত তাহার কোনও সংস্রব ছিল না, তথাচ তাহার মৃত্যুতে আমি মৃতবৎ হইয়া পড়িলাম কেন? আমার মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে কেন? একটি পুষ্করিণীতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সেই পুষ্করিণীর জলই কম্পিত হয়, কিন্তু তাহার নিকটে যদি আর একটি পুষ্করিণী থাকে তাহার জল কখনই কম্পিত হয় না। দূরে অগ্নি জ্বলিলে হস্তপদাদি দগ্ধ হয় না, কিন্তু দূরে একটি সুন্দর বস্তু দর্শন করিলে মন

সেই বস্তুর নিকটস্থ হইতে যার পর নাই ব্যগ্র হন কেন? এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মন রক্ত মাংসবিশিষ্ট শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নহে। যেমন একটি বাষ্পীয়যন্ত্র নানা উপকরণে নির্ম্মিত হইলে পর, জল ও অগ্নি সম্ভূত বাষ্পের তেজে চলৎশক্তি বিশিষ্ট হইয়া অনবরত শব্দ ও ধূম উদ্গীরণ করিতে থাকে; সেইরূপ মনুষ্য শরীরে পঞ্চভূত একত্র সমবেত হওয়ায় যে একটি অদ্ভূত শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাকেই মন কহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে মনুষ্যের জন্মগ্রহণের পর ক্রমে ক্রমে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যজগতের সহিত মনের যত পরিচয় হয়, ততই মন বিস্তারিত হইতে থাকে।

মন রক্ত মাংস নির্ম্মিত হউক, বা রক্ত মাংস নির্ম্মিত শরীরের কোনও শক্তিই হউক, সে বিষয় লইয়া আর অধিক তর্কের প্রয়োজন নাই। তবে, মন যে মনুষ্য দেহের একটি সর্ব্ব প্রধান শক্তি তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। ঐ শক্তি হইতেই স্মরণ, বিবেচনা, ইচ্ছা ও চিন্তা এই শক্তি কয়েকটি সমদ্ভূত হইয়াছে। তাহাদের কার্য্য কি প্রকার তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

স্মরণ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে কোন জ্ঞান প্রাপ্ত হই, ও যে অবস্থায় হউক না কেন যে কিছু কার্য্য করি, সেই সকল বিষয়ের ভাব যে শক্তিদ্বারা ধারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় সেই শক্তিকে স্মরণ কহে। স্মরণকে কেহ কেহ মনের ভাণ্ডারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মনুষ্যের যত প্রকার মানসিক শক্তি আছে তন্মধ্যে স্মরণের ন্যায় মহৎ উপকারী শক্তি আর কিছুই বোধ হয় না। কেবল এক স্মরণের সহায়তায় আমরা বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত শব্দে বাচ্য হই। স্মরণশক্তি সকলের সমান নহে।

HOMOEOPATHIC
G. D. HAZRA &
BROTHERS
PHARMACY

স্বভাবতঃ যাঁহাদের ঐ শক্তি প্রখর তাঁহারাই বহু বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারেন, এবং কার্য্যকালে, সেই বিদ্যা কোথায় কি অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয় অসাধারণ স্মরণশক্তির প্রভাবে তাহা সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতেও পারেন। এই বঙ্গভূমির মধ্যে নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষার একটি প্রধান স্থল। তথাকার চতুষ্পাঠী সমূহে বহু সংখ্যক ছাত্র সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত শাস্ত্র সমুদ্র তুল্য। ব্যাকরণ সাহিত্য নাটকপ্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া অগ্রে সংস্কৃত ভাষায় বোধাধিকার জন্মিলে ছাত্রগণ পুরাণ উপ-পুরাণ ও দর্শনশাস্ত্রে অধিকারী হন। এক একটি ছাত্র অসাধারণ স্মরণশক্তির প্রভাবে ষড়দর্শনে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। যাঁহাদের স্বভাবতঃ স্মরণশক্তি কম, তাঁহারা এক দুরূহ ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়িতেই মস্তকের কেশ শুভ্র করিয়া ফেলেন, তথাচ এক ব্যাকরণেই বিশিষ্ট-রূপ বোধাধিকার জন্মে না। ষড়দর্শনবেত্তা পণ্ডিতেরা সভাস্থলে বিচারের সময় আপনাদের অসাধারণ স্মরণশক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রশ্নোত্তরকালে নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, সেই সময়ে তাঁহারা কোন্ পুরাণের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ স্থানে প্রমাণোপযুক্ত বচনটি আছে, তৎক্ষণাৎ তাহা আবৃত্তি করিতে পারেন। ষড়দর্শন সামান্য শাস্ত্র নহে, বিচারকালে তাঁহারা সেই সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া প্রমাণস্থলে আনিয়া যখন উপস্থিত করেন, তখন প্রশ্নকারী ও শ্রোতাগণ একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া যান। হাইকোর্ট নামক প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে যাঁহারা প্রধান প্রধান কৌনসলী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অসাধারণ স্মরণশক্তি আছে, নতুবা কেবল নজির দেখাইয়া আপনার মও-ক্কেলকে কখনও নির্দ্দোষী প্রমাণ করাইতে পারিতেন না। যে সকল

কৌন্‌সলীর ব্যবস্থাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য আছে, অথচ স্মরণশক্তি তাদৃশ প্রখর নহে, বিচারকালীন নজির দেখাইবার জন্য, তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ পুস্তকের সাহায্য লইতে হয়। তাঁহারা একখানি পুস্তক আনিয়া যে সময়ের মধ্যে বহুকষ্টে একটি নজির দেখাইবেন, প্রতিপক্ষের কৌন্‌সলী সেই সময়ের মধ্যে আপনার স্মরণরূপ অক্ষয়ভাণ্ডার হইতে শত শত নজির দর্শাইয়া আপন পক্ষ বলবৎ করিয়া তুলেন। যাঁহারা পার্লিয়ামেন্ট নামক মহাসভার বক্তা, তাঁহাদিগেরও অসাধারণ স্মরণ-শক্তি। মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার রাজ্যপ্রণালীর সমালোচন করিতে গিয়া সেই সম্বন্ধে, উইলিয়ম্ রুফসের রাজ্যে কি কি ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় অনর্গল বলিয়া যান। বক্তা দুই প্রকার আছেন, পণ্ডিতও দুই প্রকার আছেন, এবং কৌন্‌সলীও দুই প্রকার আছেন। এক দল কেবল স্মরণের সাহায্যে কর্ম্ম করেন, অপর দল কেবল ন্যায় ও যুক্তি ধরিয়া আপন মত বলবৎ করিতে যান। যাঁহাদিগের স্মরণ অধিক তাঁহারা নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগকে সহজেই পরাস্ত করিয়া ফেলেন। কারণ তাঁহারা যে সময়ে যে বচনের প্রয়োজন, স্মরণ-শক্তির প্রভাবে তাহা অনায়াসে আবৃত্তি করিতে পারেন। আবহমানকাল দেখিয়া আসা যাইতেছে, যে স্বভাবদত্ত স্মরণশক্তি যাঁহাদিগের অধিক, তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত হন, তাঁহারাই রাজমন্ত্রী হন এবং তাঁহারাই রাজসভার প্রধান বক্তা হন। যাহার স্মরণশক্তি নিতান্ত অল্প, সেই অগ্রগণ্য মুর্খ হইয়া দাঁড়ায়, লোকের সহিত গুছাইয়া পাঁচটি কথা কহিতে পারে না। এমন কি দুই প্রহরের সময় কি কি ব্যঞ্জন দিয়া আহার করিয়াছে, অপরাহ্ণে তাহাও বলিয়া উঠিতে পারে না। বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নয়টি রত্ন ছিলেন, তাহার মধ্যে ঘটকর্পরের অন্য বিদ্যা যৎসামান্য ছিল,

কেবল এক শ্রুতিধর বলিয়াই তিনি নবরত্নের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ঘটকর্পর একবার যাহা শুনিতেন তাহাই কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন।

যাহার স্মরণশক্তি নাই, সংসারে সে কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। স্মরণের অপ্রতুল জন্য তাহার বাল্যকালে বিশিষ্টরূপ বিদ্যালাভ হয় না; যৌবনে কোনও ব্যবসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, কল্য কি কার্য্য করিয়াছে, তাহা অদ্য স্মরণ করিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য অনায়াসে লোকে তাহাকে প্রতারণা করিতে পারে।

স্মরণ দুই প্রকার, ধারণা ও অনুস্মরণ। এক এক জনের ধারণা বিলক্ষণ আছে, অর্থাৎ সমস্ত বিষয় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু অনুস্মরণ নাই বলিয়া কার্য্যকালে অক্ষয়ভাণ্ডার সত্ত্বেও তাহার সেই ধারণা কোন উপকারে আইসে না। একখানি প্রকাণ্ড পুস্তকের এক পংক্তিমাত্র কার্য্যকালে প্রয়োজন হইয়াছে, যাঁহার অনুস্মরণ আছে তিনি তাহা অনায়াসে আবৃত্তি করিতে পারেন। অনুস্মরণ ও ধারণায় প্রভেদ কি, নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। গুরু মহাশয়ের পাঠশালার দুইটি ছাত্রকে কেহ প্রশ্ন করিলেন, 'ছাপ্পান্ন কড়ায় কত'? যাহার অনুস্মরণ ও ধারণা দুই শক্তি আছে সে তৎক্ষণাৎ বলিল 'চৌদ্দগণ্ডা'। যাহার কেবল ধারণা আছে, অনুস্মরণ নাই, সে চল্লিশ কড়া হইতে গণিতে আরম্ভ করিয়া ছাপ্পান্ন কড়ায় চৌদ্দগণ্ডা বলিল। তবেই ধারণা ও অনুস্মরণ এই দুই শক্তি একত্রিত না হইলে, স্মরণশক্তির প্রকৃত কার্য্য হয় না। যাহার নিতান্ত স্মরণশক্তির অপ্রতুল, এক জন পণ্ডিত তৎসম্বন্ধে কহিয়াছেন যে, সেই প্রকার ব্যক্তিকে প্রত্যহ দুই প্রহরের কার্য্য বৈকালে, এবং বৈকালের কার্য্য সন্ধ্যার সময় ও সন্ধ্যা-

কালের কার্য্য শয়নের পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিতে হয়; এইরূপ করিতে করিতে কেবল এক আলোচনার জন্য,কিয়ৎপরিমাণেও তাহার স্মরণ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। আর এক পণ্ডিত কহিয়াছেন, স্বভাবতঃ যাহারা অমনোযোগী, অর্থাৎ কোনও কার্য্যে গাঢ় মনোযোগ করিতে পারে না, তাঁহাদিগের স্মরণশক্তি ঐ দোষের জন্য নিতান্ত কম হইয়া পড়ে। যাহারা সকল বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক দেখে এবং শুনে, তাহারাই অনেকাংশে অনেক বিষয় স্মরণে রাখিতে পারে; এই জন্যই অধ্যাপকেরা সর্ব্বদাই ছাত্রবৃন্দকে বলিয়া থাকেন "মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ কর"। যে সকল ছাত্র, কলেজে বিদ্যা শিক্ষার সময় জ্যামিতি, কনিক্‌সেক্‌সন্‌ এবং ক্যাল্‌কুলাস্‌প্রভৃতি সমগ্র পাঠ করিয়া সেই সকল বিষয়ের পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার কালে ধর্ম্মাধিকরণের উকালতি পদে নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল ঐ ব্যবসা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করার পর, ত্রিকোণমিতির একটা সামান্য প্রশ্নেরও উত্তর করিতে পারেন না। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কেবল এক আলোচনার অভাবে তাহা একেবারে বিস্মরণ হইয়া গিয়াছেন। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উপরোক্ত ছাত্রগণের ধারণা ও অনুস্মরণ এই উভয় শক্তিই ছিল, সেই জন্যই ঐ দুরূহ বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, কেবল আলোচনা রাখিলেন না বলিয়াই কালে বিস্মরণ হইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অনেক সহাধ্যায়ী দুই শক্তির অপ্রতুলে, ঐ দুরূহ বিদ্যা শিক্ষাও করিতে পারিলেন না। যাঁহারা একবার শিখিয়া ভুলিয়াছেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্ব সংস্কারের জন্য অতি অল্পায়াসেই বিস্মৃত বিষয় মার্জ্জিত করিয়া তুলিতে পারেন। আমরা এককালে

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY
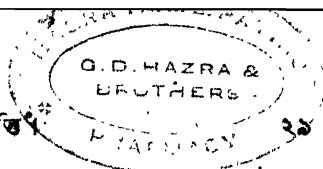
ত্রিকোণমিতি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে ভুলিয়াছি। তবে সাইন্, কোসাইন্, ট্যান্‌জেন্ট্, কোট্যান্‌জেন্ট্ এ সকল কথা কখনই ভুলিব না। কিন্তু যাহাদিগের ধারণা ও অনুস্মরণ ছিল না, তাহারা কেবল শিক্ষকের তাড়নায় ত্রিকোণমিতি পাঠ করিত বলিয়া তাহাদিগের ঐ বিদ্যা সম্বন্ধে আর একটি কথাও স্মরণ নাই। যে, যে বিষয়ের অধিক আলোচনা করে, তাহার সে বিষয় অধিক পরিমাণে স্মরণ থাকে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। অনেকে অনেক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, কেবল এক আলোচনার অভাবে তাহা বিস্মরণ হইয়াছেন, ইহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের একটি প্রবাদ বাক্য আছে, যে "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধনম্"। যে বালক অতি অল্পায়াসে অধিক বিদ্যা অর্জ্জন করে অর্থাৎ প্রখর মেধাবী হয়, তাহাকে সাধারণ লোকে কহিয়া থাকে "ইহার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার আছে, তাহাতেই এত অল্পকালের মধ্যে এত বিদ্যা শিখিয়া ফেলিল," একথা আমাদিগের মনস্তুষ্টি করিবার একটি প্রধান উপায়। কোন কোন বালকের দ্বাদশবর্ষের পরিশ্রমে একটি ভাষায় কিঞ্চিৎমাত্র অধিকার জন্মে, কিন্তু সেই কালের মধ্যে অন্য কোন মেধাবী বালক তিন চারিটি ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করে এমন অনেক দেখা গিয়াছে; এই জন্যই আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়েরা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বলিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। আবার ফ্রেণোলজিকেল্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, যাহার মস্তিষ্কের যেরূপ ধারণা, ও অনুস্মরণশক্তি স্বভাব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারে। এক সময়ে এক গুরুর কাছে অনেক গুলি ছাত্র পড়িতেছে, তাহার মধ্যে, যে দুই এক জন অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করে, সে কেবল,

স্বভাব কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে ধারণা ও স্মরণশক্তি প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এত দূর করিয়া উঠে।

একটি সাধারণ কথায় বলিয়া থাকে "আমার মনে নাই," শিক্ষিত লোকেরা বলেন "আমার স্মরণ নাই"। তবে মন ও স্মরণ এ দুইটি কি স্বতন্ত্র শক্তি? তাহা কি প্রকারে হইবে? যেমন সৌর-জগতের মধ্যে গ্রহ উপগ্রহ সকলেরই আকর্ষণশক্তি আছে, কিন্তু সৌরজগতের মধ্যে সূর্য্যই সর্ব্বপ্রধান। সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তিতেই গ্রহ উপগ্রহ আদি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া সূর্য্য-মণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণ যদি একে বারে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে গ্রহ উপগ্রহাদি পরস্পর পর-স্পরকে অনিয়ম আকর্ষণ করিয়া সৌর জগৎকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে; তেমনি মনুষ্য শরীরের মধ্যে মনই সর্ব্ব প্রধান। হাসিতে-ছেন কে? মনই হাসিতেছেন। দুঃখভোগ করিতেছেন কে? মনই দুঃখভোগ করিতেছেন। হিংসানলে দগ্ধ হইতেছেন কে? মনই দগ্ধ হইতেছেন। উঁহার চিরকাল অর্থোপার্জ্জন করিবার মানস ছিল, সেই জন্যই টাকা হইয়াছে। এখানে মনের যে একটি অর্থ অর্জ্জন করা স্বতন্ত্র বৃত্তি আছে, এবং সেই বৃত্তির যে একটি স্বতন্ত্র নাম আছে, তাহার কোন কথারই উল্লেখ হইল না, তথাচ মোটা কথায় সাধারণ লোকে বুঝিয়া গেল। "আপনি কোথায় গিয়াছিলেন"?— দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে তাঁহার দৌহিত্রের নিকট গমন করিয়াছিলাম। যে ব্যক্তি আমাকে পূর্ব্বে প্রশ্ন করিয়াছিল, সে দ্বারকানাথ ঠাকু-রের নামমাত্র শুনিয়াই চলিয়া গেল, আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। সেই রূপ মোটা কথায় সাধারণ লোকে এক মনেরই

[library stamp]

দোহাই দিয়া থাকে। মনের যে কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃত্তি আছে, এবং তাহাদিগের যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম আছে, ইহা কেবল পণ্ডিতেরাই জানেন। অজ্ঞ লোকেরা জানে না। তাহার জন্য অজ্ঞ লোকের মোটামুটী সকল বিষয় বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না। পণ্ডিতেরা মনের সমস্ত শক্তিকে তন্ন তন্ন করিয়া বাহ্যজগতের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন, যে শক্তি যে বিষয়ে অসাধারণ রূপে প্রয়োগ হইয়াছে, সেই শক্তির সেই অধিকারভুক্ত একটি নাম দিয়াছেন, যেমন—মনের উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছার নাম অর্জ্জনস্পৃহা। সেই রূপ মনের প্রত্যক্ষ কি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের সমস্ত বিবরণ ধারণা করিয়া রাখিবার যে শক্তি তাহারই স্মরণশক্তি বলিয়া নামকরণ হইয়াছে। স্মরণ, মনই করিয়া রাখেন। কেবল স্মরণ কেন, আমরা যাহা করিতেছি, যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, যাহা ভাবিতেছি, এ সমস্তই মনেরই কার্য্য সুতরাং মনই সর্ব্বময় কর্ত্তা।

স্বভাবদত্ত স্মরণ, আমাদিগের কি চমৎকার শক্তি! যদি আমরা নির্জ্জনে বসিয়া থাকি, জনপ্রাণীও আমাদিগের নিকটে না থাকে, সময় হরণের জন্য একখানি পুস্তকও যদি সে সময়ে সংগ্রহ করিতে না পারি, এরূপ সময়ে কেবল এক স্মরণই হাসাইতে থাকে, কাঁদাইতে থাকে, কখনও বা ভয়ে আড়ষ্ট করিয়া তুলিতে থাকে। বহুকাল গত হইল একটি উৎকট পাপ করিয়াছিলাম, সংসার আবর্ত্তনে পড়িয়া তাহা একেবারে বিস্মরণ হইয়া গিয়াছি। এক দিবস নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সেই পাপজনক কার্য্যটি স্মরণ হইল, যখন সেই কার্য্যটি করিয়াছিলাম তখন আমার প্রকৃতি স্বতন্ত্র ছিল। হয়ত তখন, এক্ষণকার মত জ্ঞান বুদ্ধি ছিল না, তৎকালে যে কার্য্যটি অনায়াসে করিয়াছিলাম, এখন তাহা চিন্তা করিতেও ভয়

হইতে লাগিল! মনে ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হইল, এবং ভাবিতে লাগিলাম, এরূপ জঘন্য কার্য্য আমাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে! তখন কি আমার ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না? যদি সেই বিষয়টি জনসমাজে প্রচার হইত, তাহা হইলে, আমি কোন কালেই সে কলঙ্ক ঢাকিতে পারিতাম না। এই রূপ মর্ম্মান্তিক অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় একেবারে সমস্ত বিস্মরণ হইয়া গেলাম। আমি কোথায় আছি, কি করিতেছি, কিছুই মনে রহিল না। কিছুকাল পরে ঘড়িপানে চাহিয়া দেখিলাম, যে প্রায় এক ঘন্টাকাল আমি এই অবস্থায় অবস্থিত আছি। যাহার স্মরণশক্তি কম, তাহার মনে সহসা অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হয় না। কারণ তাহারা এক বৎসর পূর্ব্বে যে সকল গর্হিত কার্য্য করিয়াছে স্মরণশক্তির অপ্রতুলবশতঃ সে সকল বিষয় আর তাহাদের স্মরণে আসে না। বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে মনুষ্যের দিব্যজ্ঞান না হইলে, অনুতাপ উপস্থিত হয় না; অনুতাপই পরমার্থ লাভের প্রধান সোপান। যখন আমরা মনোমধ্যে আপনার ভালমন্দ কার্য্যের সমালোচনা করিতে আরম্ভ করি, তখন মনোমধ্যে পর্য্যায়ক্রমে প্রফুল্লতা ও অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। যে অনুতাপ করিতে শিখিল তাহার আর কিছুতেই ভয় নাই। সে তখন একেবারে পরমপুরুষার্থ লাভ করিয়াছে এ কথা অবশ্যে বলিতে হইবে। সামান্য জ্ঞানে অনুতাপ উপস্থিত হয় না, সেই অনুতাপের প্রধান কারণ হইতেছে স্মরণ। যাহার স্মরণ নাই তাহার অনুতাপও নাই, অনুতাপে তাহার হৃদয় কম্পিত হয় না। স্মরণের দ্বারা অনুতাপ ঈশ্বর কেবল মনুষ্যকেই দিয়াছেন, অন্য কোনও জীবকে দেন নাই। যখন মনোমধ্যে অনুতাপ উপস্থিত হইল তখনই মন মন্দ কার্য্যে বিরত হইলেন। কারণ ন্যায়

G. D. HAZRA & BROTHERS

অন্যায় বিবেচনা ব্যতিরেকে কখনও অনুতাপ উপস্থিত হয় না। কেবল এক স্মরণের জন্যই আমরা কুকার্য্যে বিরত থাকি, কেন না একবার কুকার্য্য করিয়া দণ্ডভোগ করিয়াছি, আবার যখন সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন স্মরণ আমাদিগের সম্মুখে পূর্ব্বঘটনা সকল নজিরস্বরূপ ধরিয়া দেয়।

স্মরণ আমাদিগের মহৎ উপকারী। ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল মনের বৃত্তি দিয়াছেন, তন্মধ্যে এক স্মরণের দ্বারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই। স্মরণই আমাদিগের জ্ঞানলাভের প্রধান সহায়; বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বস্থলে স্মরণের বিশেষ প্রয়োজন। স্মরণই আমাদিগকে পরকাল স্মরণ করাইয়া পাপকার্য্যে বিরত করায়। স্মরণশক্তি আছে বলিয়াই আমরা পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি উচিত ব্যবহার করি, এবং স্মরণশক্তির প্রভাবেই আমরা পূর্ব্বঘটনা স্মরণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ে সাবধান হই। যখন আমরা অপব্যয় করি, তখন স্মরণই আমাদিগকে বলিয়া দেয়, "এরূপ অপব্যয় করিয়া অমুক অমুক কষ্ট পাইয়াছে, তুমিও সেইরূপ করিতেছ, একবার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখ।" অধিক আর কি বলিব, স্মরণশক্তির সর্ব্বস্থানে উপকারিতা দেখা যায়, তবে কোন কোন বিষয়ে কষ্টদায়ী বটে,—কোন ব্যক্তির অনেকগুলি পুত্র পর্য্যায়ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, সে ব্যক্তি তাহাদিগের নাম ও কার্য্য স্মরণ করিয়া অবিরত শোক করিতেছে, অনেকে সেই সময়ে তাহাকে প্রবোধচ্ছলে কহিয়া থাকেন—"তাহারা তোমার পুত্র ছিল না, শত্রু ছিল, সেই অল্পায়ুগণের নাম একেবারে ভুলিয়া যাও, আর কেন অকারণ তাহাদিগের রূপগুণের কথা মনে করিয়া কষ্ট পাইতেছ ? ইষ্টমন্ত্র স্মরণ কর, তাহা হইলেই তাহাদিগকে

ভুলিতে পারিবে।” তবে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল যে, স্মরণ আমাদিগকে বহুকালগত শোকদুঃখ স্মরণ করাইয়া দিয়া চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটায় সত্য, কিন্তু যখন শোকদুঃখ স্মরণ করিয়া আমরা কষ্ট অনুভব করি, তখন সেই স্মরণই আবার অনেক প্রবোধকথা স্মরণ করাইয়া আমাদিগের সেই শোকের উপশম করাইয়া দেয়। যে স্মরণ আমাদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে প্রধান সহায়, ইচ্ছা করিয়া অনেকে সেই স্মরণকে নষ্ট করিয়া থাকেন। কতকগুলি কার্য্য আছে তদ্দ্বারা স্মরণশক্তির হ্রাস হয়, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে মাদকসেবন, অনিয়ম স্ত্রীসংসর্গ, দ্যূতক্রীড়ার আধিক্য, অনিয়ম রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি।

বিবেচনা মনের আর একটি শক্তি। ন্যায়, যুক্তি, ধর্ম্ম ও ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে কার্য্য করিতে পারে, সেই বিবেচক। যাহার অনুমানশক্তি বিলক্ষণ প্রখর, অর্থাৎ অনুমানদ্বারা কোন কার্য্য বিবেচনা করিয়া সময়ে তাহা সমাধা করে, ও যদি কোন অংশে তাহাতে বৈলক্ষণ্য না ঘটে, সাধারণ লোকে তাহাকেই বিবেচক বলিয়া গ্রাহ্য করে। বয়সাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনা পরিবর্দ্ধিত হয়, সংসারের সহিত অধিক না মিশিলে বিবেচনা পরিপক্ক হয় না। একজন বিদ্বান্ যুবক অপেক্ষা একজন নিরক্ষর বৃদ্ধ সুবিবেচনা করিতে পারেন; কারণ তিনি দেখিয়া শুনিয়া অনেক শিখিয়াছেন। বিবেচনা একটি মনের শক্তি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে বিবেচনা এককালে আমাদের কিছুই ছিল না, এখন সেই বিবেচনা অনেক দেখিয়া শুনিয়া এবং শিক্ষা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে জন্মিয়াছে। উচ্চবোধ ব্যতিরেকে বিবেচক হয় না। যে অত্যন্ত গোঁয়ার অর্থাৎ সকল বিষয়েই অধৈর্য্য হইয়া কার্য্য করে, সে

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY
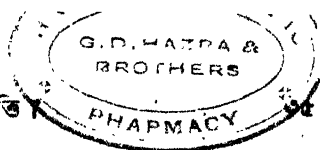
কোন কালেই বিবেচক হইতে পারে না। যাহার প্রকৃতি স্থির, সহিষ্ণুতাগুণ অধিক, এবং সকল বিষয় মনোযোগপূর্ব্বক দেখে ও শুনে, সেই বিবেচক হইতে পারে। এক সময়ে আমরা অনায়াসে সময় নষ্ট করিতাম, ক্রীড়াকৌতুকে কালহরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না, গ্রীষ্মপ্রধান সময়ে দিবা দুইপ্রহরে কেবল এক ক্রীড়ার অনুরোধে গৃহত্যাগ করিয়া বন্ধুবান্ধবের বাটীতে গমন করিতাম, রৌদ্রের উত্তাপ গ্রাহ্য করিতাম না, যে সকল দ্রব্য আহার করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহা অকুতোভয়ে আহার করিতাম, তজ্জন্য একবারও ভবিষ্যৎ ভাবিতাম না, তৎকালে এই সকল কার্য্য অনায়াসে করিতাম কেন? সে সময় আমাদিগের বিবেচনাশক্তি ছিল না। এখন স্বাধীন হইয়াছি, যদি সমস্ত দিন তাস পাশা খেলিয়া কালহরণ করি তথাচ কেহ প্রতিবাদ করিবে না, কিন্তু অকারণ সময় নষ্ট করিতে এখন আর সাহস হয় না। যাঁহারা কার্য্যের লোক তাঁহারা ভাবেন, "যে দুই ঘণ্টা ক্রীড়ায় কালহরণ করিব, সেই দুই ঘণ্টা কাল বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে অনেক উপকার দর্শিবে। যদি কোন বিশেষ কার্য্যও না থাকে, তাহা হইলে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব সেও স্বীকার, তথাচ ভয়ানক রৌদ্রে বাটীর বাহির হইয়া শরীরের স্বাস্থ্যভঙ্গ করিব না।" পূর্ব্বে যে সকল সামগ্রী অনায়াসে খাইতাম, এখন সেই সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেও আশঙ্কা উপস্থিত হয়, কারণ আমি ত তাহা ব্যবহার করিবই না, যদি অন্যান্য অবিবেচক পরিবারেরা এই সকল দ্রব্য আহার করিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে।

মনুষ্যের যে পরিমাণে বিবেচনা বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে তাহাদিগের মনে সন্দেহও জন্মে। যুবকেরা যে কার্য্য করিতে অকুতো-

ভয়ে অগ্রসর হয়, বৃদ্ধেরা সেই সকল কার্য্যই অনেক বিবেচনা করিয়া হয়ত অবশেষে তাহাতে হস্তার্পণ করিতে একেবারে বিরত হইয়া বসেন। সিবিল্ কার্য্যের ও সামরিক কার্য্যের বিবেচনা স্বতন্ত্র। সিবিল্ কার্য্যের বিবেচনা যত স্থিরচিত্তে করিবে ততই মঙ্গল হইবে, কিন্তু সামরিক কার্য্যে বিশিষ্টবিধানে বিবেচনা করিবার সময় থাকে না বলিয়া অনেক সময়ে রণনিপুণ সেনাপতিরাও অবিবেচনার কার্য্য করিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রাচীনেরা দ্বৈধ কার্য্যে যাইতে নিষেধ করেন, কারণ তাঁহারা অনেক বিবেচনাদ্বারা এই স্থির করিয়াছেন, যাহারা উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত সুখের জন্য সঞ্চিত অর্থব্যয় করে, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। নিম্নলিখিত কার্য্যকে বৃদ্ধেরা অবিবেচনার কার্য্য বলেন যথা—এক জন পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রমে আপনার প্রাচীন প্রণালীর পৈতৃক বাটী ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণের বাটী নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। সে বাটীখানি যথানিয়মে প্রস্তুত করিতে গেলে দশ বৎসরে সমাপ্ত হইবে, তবে এই অবিবেচনার কার্য্যে তিনি কি জন্য প্রবৃত্ত হইলেন? এখনকার লোকের ষষ্টি বৎসর জীবিত থাকাই অসম্ভব, তিনি এতদূর অজ্ঞ যে, নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়া দীর্ঘকাল ভোগ করিবার মানসে উপস্থিত সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিলেন। পুরাতন বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলায় একটি বসিবার স্থানও খুঁজিয়া প্রাপ্ত হন না। কি প্রকার নূতন বাটীর কার্য্য হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, হয়ত দিবা দুইপ্রহরের সময় খোলা ছাদে দাঁড়াইয়া নূতন বাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রৌদ্রে পুড়িতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এই সকল অনিয়ম কার্য্যদ্বারা স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, বাটী প্রস্তুত হইতে না হইতেই মরিয়া গেলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ বিষয় লইয়া তুমুল

G D HAZRA & BROTHERS

কলহ বাধাইল, বাটীর প্রতি কাহারও দৃষ্টি রহিল না। সকলেরই এই অভিপ্রায় হইল যে, আপনাপন অংশ লইয়া স্বতন্ত্র বাটী করিব। এইজন্য সাধারণের বাটী যে ভাবে কর্ত্তা রাখিয়া গেলেন, সেই ভাবেই রহিল। এইরূপ অবিবেচনার কার্য্য নগরে ও পল্লীগ্রামে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

বোধ কর, আমি গঙ্গায় একটি ঘাট বাঁধাইবার অভিপ্রায়ে কয়েকজন বিবেচক লোক লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলাম যে, কোন্ স্থানে ঘাট প্রস্তুত করিলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। এক জন কহিলেন, "নিমতলার ঘাটের পার্শ্বে প্রস্তুত কর," অন্য জন কহিলেন, "শবদাহের গন্ধে সুখে স্নান করা হইবে না।" আর একজন প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "হাটখোলাও ঘাট প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত স্থান নহে, কারণ ঐ স্থান সর্ব্বদা বোঝাই কিস্তিতে পরিপূর্ণ থাকে, সুতরাং কিস্তির গতায়াতে অল্পদিনের মধ্যেই ঘাট চূর্ণ হইয়া যাইবে, অতএব হাটখোলার নিম্নে ঘাট প্রস্তুত করাইলে কেহই সুখে স্নান করিতে পাইবে না।" যুবকগণের এইরূপ অনেক তর্কবিতর্ক শেষ হইলে পর, একজন বৃদ্ধ কহিলেন, "কৃতী কি অভিপ্রায়ে গঙ্গায় ঘাট প্রস্তুত করাইতেছেন? সাধারণের উপকারের জন্য, না নামের জন্য?" কৃতী মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "আমি সাধারণের উপকারের জন্যই এত টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।" বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে যে অঞ্চলে ঘাট নাই, অথচ বহুসংখ্যক লোক তথায় বসবাস করে, সেই স্থানে একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিলে সাধারণের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। কলিকাতায় আর বাঁধা ঘাটের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি দেখিতেছি, এখান হইতে তিন ক্রোশ অন্তরে বিশিষ্ট গ্রাম বালীর নিম্নস্থ গঙ্গায় একটিও বাঁধা ঘাট

নাই, তজ্জন্য সাধারণের স্নানের পক্ষে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। সেই গ্রামে যদি একটি ঘাট প্রস্তুত করাইতে পার, তাহা হইলে সাধারণের উপকার করাও হইবে, এবং তোমার নামও দীর্ঘকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে।” বৃদ্ধের সেই কথাই বিবেচনাসঙ্গত বলিয়া কৃতী গ্রাহ্য করিলেন।

কোন স্থলে কোন একটি গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে, সেই কথার উপর নানা প্রকার আন্দোলন চলিতে থাকে। যাঁহারা বিবেচক লোক, তাঁহারা অনর্থক বাগাড়ম্বরে আপনার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিয়া তুলেন না, ঘোর তর্কের সময় তাঁহারা নিঃশব্দে বসিয়া থাকেন; যখন একটা বিষয় অবধারিত হইল, সকলে “ঠিক হইয়াছে! ঠিক হইয়াছে!” বলিয়া জয়ধ্বনি করিলেন, সেই সময় বিবেচক লোক একটিমাত্র কথাদ্বারা তাহাদিগের সমস্ত পরামর্শ বিফল করিয়া দেন। বিবেচক লোকেরা কখনও বাগাড়ম্বর করিয়া কাহারও সহিত তর্কে প্রবর্ত্ত হন না, তাঁহারা বিচারের সময় বিশেষ মনোযোগী হইয়া সমস্ত কথাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া শুনিয়া যান। তার্কিকেরা যে ভিত্তির উপর আপনার অভিমত স্থাপন করিয়াছেন, বিবেচক লোকেরা সেই ভিত্তির মূলে দোষ দেখাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসেন। এই মহানগরী কলিকাতার মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, বিবেচক লোক বলিয়া প্রতিপন্ন ছিলেন। তাঁহার একটি বিবেচনার কথা উদাহরণ-স্থলে গৃহীত হইল:—কোন পল্লীর মধ্যে একজন মাননীয় লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার উপযুক্ত সন্তানগণ পল্লীর কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোককে আহ্বান করিয়া কি প্রণালীতে শ্রাদ্ধ করিবেন, তাহা-রই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আগত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় সক-লেই কহিলেন, “তিনি যে প্রকার মান্যমান ছিলেন তাঁহার শ্রাদ্ধে

G. D. HAZRA & BROTHERS
PHARMACY

দানসাগর না করিলে ভাল দেখায় না, তাহা না হইলে নিন্দা হইবে। এ শ্রাদ্ধে ন্যূনাধিক দশ হাজার টাকা ব্যয় করা যুক্তি।" তাঁহাদিগের সেই পরামর্শ এক প্রকার অবধারিত হইয়া গেল। অবশেষে ব্রাহ্মণঠাকুর কহিলেন, "আপনারা যে পরামর্শ করিলেন ইহা আমার অন্যায় বলিয়া বোধ হইল না, বরং ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় করিলে হানি নাই, কিন্তু আমার বক্তব্য এই, বিষয় বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই যুক্তিসিদ্ধ। তিনি যে প্রকার মান্য গণ্য ছিলেন, তদুপযুক্ত বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন কি না তাহা আমি জানি না। এই যে দশ সহস্র টাকা ব্যয় হইবে, ইহা স্বর্গীয় কর্তার বিষয় হইতে অনায়াসে হইতে পারে, কি ঋণ করিতে হইবে?" এই কথা শুনিয়া মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র কহিলেন, "মহাশয়! কর্তার নাম ছিল বটে, কিন্তু তাদৃশ ধন রাখিয়া যান নাই। আমাদিগকে এখন ঋণের উপর নির্ভর করিয়া অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে।" শ্রবণে বৃদ্ধ কহিলেন, "যে দশ সহস্র মুদ্রা ঋণ করিবেন, তাহা পরিশোধের কি উপায় স্থির করিয়াছেন?" জ্যেষ্ঠপুত্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "আপাততঃ কিছুই তাহার স্থির করা হয় নাই, ঈশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।" বৃদ্ধ কহিলেন, "আপনাদিগের বাৎসরিক আয় কত?" জ্যেষ্ঠ পুত্র কহিলেন, "চার পাঁচ হাজার টাকা হইবে।" বৃদ্ধ তচ্ছ্রবণে কহিলেন, "যদি তাহা হইতে এক কপর্দ্দক অন্য ব্যয় না করেন, তথাচ ঋণ পরিশোধ হইতে দুই বৎসর লাগিবে। এতদ্ভিন্ন সেই টাকার সুদ আছে। আপনাদিগের যে আয় তাহাতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া ঋণশোধ কোন কালেই ঘটিবেক না। আবার যদি কোনও সূত্রে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। এরূপস্থলে আমার বিবেচনায় ঋণ করিয়া

উচ্চদরের শ্রাদ্ধ করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে।” বৃদ্ধের কথা গুলি মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠপুত্র ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে পরামর্শ ধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে পুত্রেরা বৃদ্ধের পরামর্শমতে দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন।

কার্য্য, কারণ ও ক্ষমতা এই তিনটি বিবেচনাস্থলে নিতান্ত প্রয়োজন। কোন লোক এক জন বিবেচক লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয়! আমার বাটীর সম্মুখটি ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণের প্রস্তুত করিবার অভিলাষ করিয়াছি।” বিবেচক ব্যক্তি কহিলেন, ‘ইহার কারণ?’ উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, “কারণ আর কিছুই নহে, কেবল বাটীর সম্মুখের শোভাবৃদ্ধি করা মাত্র।” বিবেচক ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাতে কতটাকা ব্যয় হইবে?” উক্ত ব্যক্তি উত্তর করিলেন, “পোনের হাজার টাকার ন্যূন নহে।” বিবেচক ব্যক্তি কহিলেন, “পোনের হাজার টাকা তুমি সচ্ছন্দে ব্যয় করিবার ক্ষমতা রাখ?” উক্ত ব্যক্তি কহিলেন, “হাঁ করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ঘটে, দুই এক খানি কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিতে হয়।” বিবেচক ব্যক্তি কহিলেন, যদি পরিবারগণের বাসোপযুক্ত ঘরের অপ্রতুল ঘটিত, তাহা হইলে অবশ্যই নূতন ঘর প্রস্তুত করণের প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইত। প্রয়োজনস্থলে অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলে না, যেমন ঘরে টাকা নাই অথচ ঔষধ ক্রয় করিতে হইবে, সে সময় ঋণ করিয়া ঔষধ ক্রয় করিতে কেহ নিষেধ করিবেন না। তুমি বলিতেছ ‘বাটীর শোভাবৃদ্ধিকরণজন্য পোনের হাজার টাকা ব্যয় করিবে,’ তাহার প্রয়োজন কিছুই নাই, কেবল মনের খেয়াল হইয়াছে বলিয়া করিতে যাইতেছ। ভাল জিজ্ঞাসা

ার, তুমি পোনের হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বাটীর যে শোভাবৃদ্ধি করিতে যাইতেছ, তাহা অপেক্ষা শোভাবিশিষ্ট বাটী অন্যের আছে কি না? যদি তাহা থাকে, তবে তোমার বাটীর কিঞ্চিৎ শোভা সম্পাদন করিয়া তাহাতে কি ফল হইবে? আর তোমার বাটী এখন সহস্র সহস্র বাটী অপেক্ষা শোভাবিশিষ্ট কি না? যদি তাহা হয়; তবে সেই শোভাতেই সন্তুষ্ট থাক, এই অনর্থক ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন ব্যতিরেকে এ সংসারে বিবেচকমাত্রেই কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না। তবে অপব্যয়ী লোকেরা আপন খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া অপ্রয়োজন বিষয়কে প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিতে পারে। তুমি যদি সেই শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহ, তাহা হইলে অপ্রয়োজন বিষয়কেও প্রয়োজন জ্ঞানে তৎসমাধার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবে, ও বিবেচক হইলে আমার কথাই গ্রাহ্য করিয়া লইবে।" অবশেষে ঐ ধনাঢ্যব্যক্তি বৃদ্ধের বিবেচনা সঙ্গত কথাই গ্রাহ্য করিলেন।

বিবেচনাসম্বন্ধে একটি পৌরাণিক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে:— রাবণের মধ্যম সহোদর কুম্ভকর্ণ বীরের অগ্রগণ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজনীতি ভাল জানিতেন না ইহা সকলেই অনুভব করিতেন; এই জন্য বিবেচনাস্থলে রাবণ কুম্ভকর্ণকে কখনও ডাকিতেন না। যখন রামচন্দ্রের সহিত সম্মুখযুদ্ধে রাবণের প্রধান প্রধান সেনাপতিরা হত হইল, তখন রক্ষঃকুলপতি ভয়প্রযুক্ত অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাইলেন। কুম্ভকর্ণ রাজসভায় আসিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদিগের লঙ্কারাজধানী বানর-সৈন্যে বেষ্টন করিতে পাইল কেন? যখন রাম সসৈন্যে সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সাগরের অপর পারেই কেন যুদ্ধক্ষেত্র মনোনীত

করিলেন না? তাহা হইলে ত রাজধানীর এরূপ দুর্দশা কখনই ঘটিত না। যখন সেতুবন্ধনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তখন ত আপনি আপনাকে বড় বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়াছিলেন। যে সময়ে লঙ্কার সিংহদ্বারে বানরীঠাট উপস্থিত হইল, তখনই সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজধানীর সিংহদ্বারে যুদ্ধক্ষেত্র মনোনীত করা কি বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে? যদি সাগরের পারে সংগ্রাম চলিত, তাহা হইলে কত অংশে আমরা সুবিধা পাইতাম, সে সুবিধা পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখেন নাই, একেবারে শত্রুকে গৃহের মধ্যে আনিয়া প্রবেশ করাইয়াছেন। বুঝিলাম, আপনার সভায় একজনও বিবেচক মন্ত্রী নাই। বিবেচনাবিহীন হইয়া কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই বানরেরা অক্লেশে লঙ্কার ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া বেড়াইতেছে।" কুম্ভকর্ণ বিবেচনার সহিত এই কয়েকটি কথা কহায়, মন্ত্রিগণ সকলেই মস্তক অবনত করিয়া রহিল। এস্থলে কুম্ভকর্ণ যে কতদূর বিবেচনার কথা কহিল, তাহা বিবেচক ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারেন। রাবণ যদি সাগরের অপর পারে রামের সহিত যুদ্ধ ঘটাইতেন, তাহা হইলে আর সাগরে সেতুবন্ধন হইত না। বানরীঠাট লঙ্কার চতুষ্পার্শ্বস্থ উত্তম উত্তম উদ্যান সকল নষ্ট করিতে পারিত না, এবং দুই তিন বার লঙ্কা দগ্ধ করিয়া রাজধানীর সমূহ অনিষ্টসাধনে সক্ষম হইত না। শত্রুকে যত অন্তরে রাখিয়া যুদ্ধ করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল, এটি রাবণ মন্ত্রিগণে পরিবৃত থাকিয়াও বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই; এই জন্য কুম্ভকর্ণকে অধিক বিবেচক বলিয়া ধরিতে হইবে। বিপদ্কালে বিবেচনার ব্যতিক্রম ঘটিলে সমূহ অনিষ্ট উৎপাদন করে, রাবণের তাহাই হইয়াছিল।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্স বাহাদুর কাবুলসম্বন্ধে একটি চমৎকার বিবেচনার কার্য্য করিয়া-

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

ছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন যে, "রুশিয়া এবং ভারতসাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে আফগানিস্থান। আফগানেরা প্রাণ অপেক্ষাও স্বাধীনতা অধিক ভালবাসে। বড় বড় রাজনীতিজ্ঞেরা সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন যে, 'আফগানিস্থান আমাদিগের শাসনাধীনে রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কেন না, রুসিয়ানেরা ঐ পথ দিয়াই ভারতবর্ষে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন।' আমার বিবেচনায়, আফগানজাতিরা মধুমক্ষিকাবিশেষ, এবং আফগানরাজ্য একখানি মধুচক্র, সে মধুচক্র ভেদ করিয়া রুসিয়ানেরা কখনই ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিবে না। স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা আফগানেরা বিলক্ষণ বুঝে ; এই জন্য আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি যে, আফগানেরা কখনই রুসিয়ানদিগকে সসৈন্যে তাহাদিগের রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিবে না। যদি রুসিয়ানেরা বলপূর্ব্বক সে চেষ্টা পান, তাহা হইলে এক আফগানিস্থান জয় করিতে তাঁহাদিগের সমূহ সেনানাশ এবং নির্ধন হইয়া পড়িতে হইবে। হীনবীর্য্য হইয়াও তাঁহারা যদি ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী হন, তখন আমরা তাঁহাদিগকে অক্লেশে সমূলে নিপাত করিতে পারিব, কারণ সম্মুখে আমরা ও পশ্চাতে আফগানগণ, এরূপ স্থলেও যদি রুসিয়ানেরা সাহস করিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহাদের একটিকেও আর দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। অতএব অলীক ভয় করিয়া আমাদিগের মধুচক্র ঘাঁটাইতে যাওয়া বিবেচনার কার্য্য হইবে না। আফগানেরা যেরূপ আছে সেইরূপেই থাকুক, তাহাতে আমাদের ভাল বই মন্দ হইবেক না।" লরেন্সের এই বিবেচনা উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎকালে সকলেই গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড লিটন্ তাঁহার সেই রাজনীতির প্রতিবাদ করিয়া অকারণ ধন ও প্রাণনাশ এবং আপনাকে সর্ব্বতোভাবে ভারতসাম্রাজ্যশাসন

সম্বন্ধে অক্ষম প্রতিপন্ন করিয়া স্বদেশে গিয়াছেন। আফগানরাজনীতি যে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, ইহা ইয়ুরোপখণ্ডের প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞেরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন।

বহু অধ্যয়নে, বহু দেশভ্রমণে, এবং বহুলোকের সহিত কথোপকথনে, লোককে বিবেচক করিয়া তুলে। যে হেতু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অসভ্য জাতির অপেক্ষা সভ্যজাতির বিবেচনাশক্তি অধিক। বিবেচনা দ্বারা সংসারের সকল বিষয় পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইতেছে। পূর্ব্বে লোকের যে সকল বিবেচনা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা শতগুণে মার্জ্জিত হইয়াছে। পুরাকালের শাস্ত্রকারেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্ভব কি অসম্ভব, বিবেচনা না করিয়াই এখনকারও অনেক লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ একটি অঙ্গুলির উপর গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, যাহারা বিবেচনাবিহীন লোক, শাস্ত্রে লিখিয়াছে বলিয়া এই অসম্ভব কথাও বিশ্বাস করিয়া থাকে। কিন্তু বিবেচক ব্যক্তিরা অনেক তর্কবিতর্ক দ্বারা অবধারিত করিয়াছেন যে, শাস্ত্রকারেরা অনায়াসে মিথ্যা কথা লিখিতে পারে ইহা সম্ভব, কিন্তু একটি মনুষ্য উন্নত ও বহুবিস্তৃত ভূধরকে কিরূপে আয়ত্ত করিয়া অঙ্গুলির উপর তুলিবেক তাহা কোন ক্রমেই বিবেচনায় আইসে না। কেবল এক অসাধারণ বিবেচনার প্রভাবেই নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই এই উপকরণে এইরূপ একটি সামগ্রী প্রস্তুত হইলে তাহাতে এইরূপ শক্তি সম্ভূত হইতে পারে, ইহাও বিবেচনার কার্য্য। বিবেচনাবিহীন অসভ্য জাতিরা অদ্যাপিও পর্ণকুটীরে ও গিরিগহ্বরে বাস করিতেছে। কিন্তু সভ্যসংসারের বিবেচক লোকেরা ইষ্টক, কাষ্ঠ ও প্রস্তরে নির্ম্মিত মনোহর ভবন প্রস্তুত করিয়া দেবতার

G. D. HAZRA & BROTHERS

ন্যায় পরম সুখে তাহাতে বাস করিতেছেন। বিবেচনার এমনই অদ্ভুত শক্তি যে, পাঁচ জন বিবেচক একত্রিত হইলে একটি নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হয়। পূর্ব্বে কলে কেবল সূতাই প্রস্তুত হইত, তাহার পর দশ জন বিবেচক লোক একত্রিত হইয়া বিবেচনা দ্বারা স্থির করিলেন যে, বাষ্পীয়যন্ত্রের সহিত এই এই বিষয় সংযুক্ত করিলে ইহার দ্বারা বস্ত্রবয়নকার্য্যও সম্পাদিত হইতে পারে। আজ কাল তাঁহাদিগের সেই বিবেচনার কার্য্য বিলক্ষণ ফলদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। অগ্রে একটি উৎকট কার্য্যের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, সেই প্রয়োজন সাধনের জন্যই বিবেচনার আবশ্যক। যথা—নানা কারণবশতঃ গঙ্গার উপর একটি সেতু বন্ধনের প্রয়োজন হইল। কিরূপে নির্ম্মিত হইলে সেই সেতু অনায়াসে গঙ্গার জলের উপর ভাসিতে পারে অথচ তাহার উপর দিয়া লোকের গমনাগমন চলে, বিবেচনা দ্বারা তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত করার প্রয়োজন হইল। সেতুবন্ধনকার্য্যে যাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই কয়েকজন একত্রে এই বিষয় লইয়া বিবেচনা করিতে বসিলেন। বিবেচনার উপর বিবেচনা চলিতে লাগিল, অবশেষে এরূপ একটি সূক্ষ্ম বিবেচনা দাঁড়াইল যে, তাহার উপর আর কাহারও তর্ক চলিল না, তখন সেই অনুযায়িক কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় প্রয়োজনীয় বিষয় অনায়াসে সুসিদ্ধ হইল। অগ্রে বিবেচনা তৎপরে কার্য্য, ইহা সকল বিষয়েই দেখা যাইতেছে। আমার এই গৃহে একখানি টানাপাখা ঝুলাইব, ইহাতে কত প্রকার বিবেচনার আবশ্যক। প্রথমতঃ বিবেচ্য এই যে, টানাপাখার প্রয়োজন কি? বিবেচনা দ্বারা স্থির হইল গ্রীষ্ম নিবারণের জন্য। তৎপরে বিবেচ্য আমি টানাপাখার বাতাস খাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি কি না? এবং ইহাতে যে ব্যয় হইবে

তাহা আমি অনায়াসে সমাধা করিতে পারি কি না? ইহার জন্য আমার গুরুজনের নিকট অনুমতি লইবার প্রয়োজন আছে কি না? এইগুলি যখন বিবেচনাসঙ্গত হইয়া গেল তখন অন্য প্রকার বিবেচনার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল ; কি প্রকারের পাখা হইবে, কি ভাবে ঝুলান যাইবে, কোথায় বসিয়া টানিবে ইত্যাদি। যখন দেখা যাইতেছে, এক খানি সামান্য পাখাসম্বন্ধে নানা প্রকার বিবেচনাস্থল আসিয়া পড়ে, তখন একটি গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে গেলে কতরূপ বিবেচনার আবশ্যক হয়। অগ্রে বিবেচনা পরে কার্য্য, ইহা সৃষ্টিপ্রকরণাবধি চলিয়া আসিতেছে। বাইবেলে লেখা আছে, ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্রে আলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কেননা সৃষ্টিপ্রকরণের পূর্ব্বে জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, দর্শন ব্যতিরেকে যখন কোন কার্য্যের উপর বিশেষরূপ বিবেচনা চলে না, এবং যখন এক জ্যোতিদ্বারাই সেই দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয়, তখন সেই জ্যোতির সৃষ্টিই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বলিয়া ঈশ্বরের নিকট বিবেচ্য হইয়াছিল।

বিবেচনা ব্যতিরেকে আমরা এ সংসারে কোন কার্য্যেই হস্তবিস্তার করিতে পারি না। সেই বিবেচনা যাহাতে কেবল সুবিবেচনায় দাঁড়ায়, বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেষ্টা দেখা উচিত। যে বিবেচনাবিহীন, তাহাকে লোকে পশু বলিয়া থাকে। বিবেচনাবিহীন কে? যে অনায়াসে সর্পবিবরে হস্ত দিতে পারে। কারণ তাহার এ বিবেচনা নাই যে, সর্পে দংশিলে আমার মৃত্যু হইবে। এক ব্যক্তির মাসিক সহস্র মুদ্রা আয়, সে যদি লক্ষ মুদ্রা ব্যয়োপযোগী একটি কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে বিবেচনাবিহীন বলিব। যে রিপুপরতন্ত্র হইয়া প্রাণের ভয় পরি-

ত্যাগ করে, ও সেই রিপুকে চরিতার্থ করিবার জন্য ন্যায় অন্যায় বিবেচনাবিহীন হয়, তাহাকেই আমরা অবিবেচক বলিয়া থাকি।

বিবেচনার স্থল অনেক। বোধ কর, এক সময়ে তিনটি কার্য্য উপস্থিত—কন্যার বিবাহ, বাটীর পশ্চাদ্ভাগে একটি পুষ্করিণী খনন ও বহির্ব্বাটীতে একটি বসিবার ঘর প্রস্তুতকরণ। এই তিনটি কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টি নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই বিবেচ্য। কন্যাটির বিবাহ দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন, এ কে না বলিবে? বাটীর পশ্চাদ্ভাগে একটি জলাশয় না থাকায় চৈত্র বৈশাখ মাসে জলাভাবপ্রযুক্ত পরিবারগণের কষ্টের অবধি থাকে না, এই কারণে পুষ্করিণী খননও প্রয়োজনের মধ্যে ধরিতে হইতেছে। বহির্ব্বাটীতে একটি বসিবার ঘর না থাকায় সময়ে সময়ে কুটুম্ব বান্ধব বাটীতে আসিলে, তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া বসাইতে হয়, তজ্জন্য স্ত্রীলোকেরা গৃহের বহির্ভাগে আসিয়া সাংসারিক কার্য্য করিতে পারেন না। এই সকল কারণে বহির্ব্বাটীতে একটি ঘর প্রস্তুত করাও অবশ্য প্রয়োজন হইয়াছে। উপরোক্ত তিনটি কার্য্যই প্রয়োজনীয় বলিয়া অবধারিত হইল। এখন দেখিতে হইবে এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই পর্য্যায়ক্রমে সমাধা করা উচিত ছিল, কিন্তু আয় সংক্ষেপ বলিয়া এককালীন তিনটি কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা হইয়া উঠিতেছে না। কন্যার বিবাহে সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইবে, পুষ্করিণী খনন করিতে গেলেও প্রায় সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন। বহির্ব্বাটীর গৃহ প্রস্তুতকরণেও ঐ পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন। এই তিনটি কার্য্যের একটি কার্য্য কৃতী অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন। অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া কৃতীই মনে মনে অবধারিত করিলেন যে, কন্যাটির বিবাহ দেওয়াই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহার কন্যাকাল

উত্তীর্ণ হইবার আর কালবিলম্ব নাই; যদি এখনও কন্যার বিবাহে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া অন্য কার্য্যে হস্তার্পণ করি তাহা হইলে সামাজিক নিয়মের অবমাননা করা হয়। আর এক বৎসরকাল কন্যার বিবাহে বিলম্ব করিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দুই বিষয়েই দোষী হইয়া পড়িব। আমার বাহিরবাটীতে একটি বসিবার ঘর নাই, লোকজন আসিলে অন্তঃপুরে লইয়া বসাইতে হয়, সে জন্য সমাজে নিন্দনীয় হইব না, কেন না অর্থাভাবে হইয়া উঠিতেছে না। ভিতরবাটীর পশ্চাদ্ভাগে একটি জলাশয় নাই, তজ্জন্য সময়ে সময়ে স্ত্রীলোকেরা অপরের বাটী হইতে জল আনিয়া গৃহকার্য্য সমাধা করেন, সে জন্যও সমাজের লোক আমার নিন্দা করিতে পারিবে না। কিন্তু কন্যাটির বিবাহ দিতে না পারিলে সমাজে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। কন্যার বিবাহের জন্য সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতে পারি, কিন্তু বহির্ব্বাটীর ঘর প্রস্তুতকরণ কি পুষ্করিণী খননের জন্য ভিক্ষা করিবার বিধান নাই। যদি কাহারও নিকট গিয়া এরূপ প্রার্থনা করি,—মহাশয়! আমি বহির্ব্বাটীতে একটি বৈঠকখানা ঘর প্রস্তুত করিব, আমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে হইবে। আমার বাটীর পরিবারেরা অপরের পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন করিয়া গৃহকার্য্য সমাধা করেন, তাঁহারা অপরিচিত পুরুষের সম্মুখ দিয়া গমনাগমন করেন বলিয়া আমাকে মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হয়। এই জন্য ভিতরবাটীর পশ্চাদ্ভাগে একটি পুষ্করিণী খননের মনন করিয়াছি, আমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করুন, আমি বড় বিপদগ্রস্ত! যাহার নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিব, সেই আমাকে উন্মাদ বলিয়া পরিহাস করিবে এবং অম্লানবদনে বলিবে, "যাহার অর্থের ক্ষমতা নাই; তাঁহার এত লজ্জার ভয় কেন? তোমার মত কতশত ভদ্র-

R. D. HAZRA & BROTHER
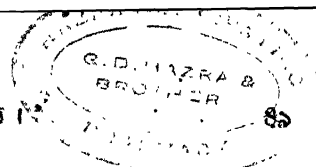
লোকের স্ত্রীলোকেরা দূরস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন করিতেছে। ভিক্ষা করিয়া বৈঠকখানা করিবার প্রস্তাব এই তোমার মুখে নূতন শুনিলাম, এরূপ প্রস্তাব আর কাহারও নিকট করিও না, তাহা হইলে লোকে উপহাস করিবে।” যদি আমি কন্যাভারগ্রস্ত বলিয়া কোন ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করিতে যাই, তাহা হইলে সদাশয় মনুষ্যমাত্রেই দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাদিগের সাধ্যমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই। তবে বিবেচনা দ্বারা এইটি প্রতিপন্ন হইল যে, গৃহপ্রস্তুত কি পুষ্করিণী খনন অপেক্ষা কন্যার বিবাহ দেওয়া কার্য্যটি গুরুতর, তাহার জন্য সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিলেও নিন্দনীয় হইতে হইবে না। অতএব যে কার্য্যের বিলম্ব হইলে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ হয়, সেই কার্য্য অগ্রে সমাধা করা উচিত। সকল বিষয়ের এইরূপ হেতুবাদকে বিবেচনা কহে।

বিবেচনাই আমাদের সকল সুখের মূল। যে বিবেচনা দ্বারা আমরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধার্য্য করিতে পারি, পাপ হইতে বিরত থাকিতে পারি, ন্যায় ধর্ম্ম ও যুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে পারি, এবং অবনত অবস্থাকে উন্নত করিতে পারি, সেই বিবেচনা ঈশ্বর যাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ইচ্ছা—ইচ্ছা মনের একটি তরঙ্গ মাত্র। ইচ্ছার প্রকৃত পরিভাষা স্থির করা সহজ ব্যাপার নহে। মন ও মনোবৃত্তিসম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ ধারণা তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের উপর বিশেষ প্রমাণ দর্শাইতে পারা যায় না, তবে মনের যে একটি ইচ্ছা আছে, ইহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। ইচ্ছার প্রতিশব্দ আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অভিলাষ ইত্যাদি।

এই সকল প্রতিশব্দের প্রভেদ ইংরাজি ও সংস্কৃতভাষায় ধীশক্তিমান্ পণ্ডিতেরা কিয়ৎপরিমাণে দর্শাইতে পারেন। বাঙ্গলাভাষায় আমরা তাহার প্রভেদ দর্শাইবার চেষ্টা করিলে, অনর্থক কতকগুলি বর্ণবিন্যাস করা হইবে এই মাত্র। এই জন্য ইচ্ছা কি এবং মনুষ্যের মনে কি জন্যই বা ইচ্ছার আবির্ভাব হয়, এ সকল বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে বিরত হইলাম। তবে ইচ্ছার উদ্দেশ্য কি, ইচ্ছা দ্বারা আমরা কিরূপ কার্য্য করি ও ইচ্ছার সময়ে সময়ে কতদূর তরঙ্গ উঠে তাহাই বিবৃত করিব।

যেমন উপাসনাভেদে হিন্দুরা পৃথক পৃথক পঞ্চ দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি যে দেবতার উপাসক হউন না কেন সকলেরই উদ্দেশ্য এক, অর্থাৎ স্বর্গ বা মুক্তিলাভ। সেইরূপ প্রবৃত্তিভেদে মনের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা হইয়া থাকে, কিন্তু সকল ইচ্ছারই অভিপ্রায় মনের সন্তোষলাভ। যেমন কোন ব্যক্তির সুন্দর বস্তু দর্শনের প্রবৃত্তি অধিক, সে কোথাও সুদৃশ্য পদার্থ দেখিলে তাহা গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হয়, অন্য কোন ব্যক্তির উপাদেয় বস্তু ভক্ষণের প্রবৃত্তি অধিক। যাহার তীর্থস্থানের দেবদর্শনের ইচ্ছা প্রবল হয়, সে তাহার অভীষ্ট দেবতাকে দর্শন করিবার জন্য শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই ধরে না, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয় না। নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া দেবদর্শন করিতে পাইলে পথের সমুদয় কষ্ট একেবারে ভুলিয়া যায়—মনে আনন্দের পরিসীমা থাকে না! সেইরূপ, যে, কোন উপাদেয় আহার সামগ্রীর জন্য বিশেষ লোলুপ হয়, সে সেই সামগ্রী সংগ্রহার্থে শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই ধরে না! বহু কষ্টে সঞ্চিত সেই সামগ্রীগুলি রসনার সহিত সংযোগ হইলেই মনের যথোচিত তৃপ্তি সাধন হয়।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা হয়। বোধ কর, দুই বন্ধুতে রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। একজন একটি চমৎকার পদার্থ দেখিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, সেই পদার্থ নয়নের তৃপ্তিকর বলিয়া মনেরও তৃপ্তি জন্মাইতে লাগিল। কিন্তু আর এক ব্যক্তি শুনিলেন যে, কিছু দূরে একজন সুকণ্ঠ গায়ক সুমধুর গান করিতেছে। তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণে বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল, এই জন্য তিনি আপন সঙ্গীকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "কি দেখিতেছ? আইস সঙ্গীত শ্রবণ করি গে, শুনিলে কর্ণ জুড়াইবে।" যিনি দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা মনকে পরিতুষ্ট করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার কথায় মনোযোগ না করিয়া যাহা দেখিতেছিলেন তাহাই একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। সঙ্গীতশ্রবণেচ্ছুক ব্যক্তি যদিও বন্ধুর অনুরোধে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোযোগ সেই সঙ্গীতের প্রতি রহিল, এবং তাঁহার মন সেই দূরাগত সঙ্গীতশ্রবণে পরিতুষ্ট হইতে লাগিল। তবেই প্রবৃত্তি অনুসারে যাহার যেমন ইচ্ছা হয়, সে সাধ্যানুসারে সেই ইচ্ছাকে চরিতার্থ করে।

যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উপাসনাভেদে একব্যক্তি শক্তি-আরাধনার নিমিত্ত সুরাসেবন করিয়া শক্তিমন্ত্র জপ করিতেছে, সেই সময়ে যদি একদল বৈষ্ণব মৃদঙ্গ করতাল ও তুরী ভেরী বাজাইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া যায়, তবে তাহা শুনিয়া শক্তিউপাসক শাক্তের মহা বিরক্তি জন্মিবে। সে ভাবিবে "অবোধ বৈষ্ণবেরা কি ভ্রান্ত! ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া ইঁহারা অনর্থক গণ্ডগোল করিয়া বেড়াইতেছে। শক্তি-উপাসনা ভিন্ন মানবের মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই, ইহা বৈষ্ণবেরা বুঝিতে পারিতেছে না।

পাঠক! বিবেচনা করিয়া দেখুন, শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ই আপনাপন ইষ্ট আরাধনা করিয়া আপনাদিগের মনের তুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছে। উভয় সম্প্রদায়েরই এক কামনা, কিন্তু উপাসনাভেদে পরস্পরের কতদূর মনের ব্যতিক্রম ঘটিয়া রহিয়াছে। আমাদিগের ইচ্ছার গতিকও সেইরূপ—আমরা যেরূপ ইচ্ছা করি সকলই মনের তুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য।

ইচ্ছা সকল সময়ে সমভাবে থাকে না। অবস্থাবিশেষে, বয়সবিশেষে, সময়বিশেষে ইহা নানা প্রকার হইয়া থাকে। নিয়মাধীন ইচ্ছার নাম সঙ্কল্প, আর অনিয়ম হইলে সাধারণ ইচ্ছা কহিয়া থাকে। আমার একটি উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা হইল এটি সাধারণ ইচ্ছা। আমার একটি বৃন্দাবনে কুঞ্জবাটী প্রস্তুতকরণের ইচ্ছা হইল এ ইচ্ছাকে সঙ্কল্প কহে। আমি কন্যাদান করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে তামা তুলসী ও গঙ্গাজল হস্তে লইয়া একটি সঙ্কল্প করিতে হয়: সে সঙ্কল্পটি কি? আমার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মাত্র। জ্ঞানিগণ ঈশ্বরকে ইচ্ছাময় কহিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহার ইচ্ছা সমস্তই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, অর্থাৎ তিনি যে ইচ্ছা করেন তাহাতে কোনও প্রতিবন্ধক ঘটে না, এইজন্য তিনি ইচ্ছাময়, যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। মনুষ্যের ইচ্ছা সেরূপ নহে, সকল সময়ে সকল ইচ্ছা সুসিদ্ধ হয় না; ইচ্ছার প্রতিকূলে অনেক প্রতিবন্ধক ঘটে। আমার রাজা হইতে ইচ্ছা হইল, এরূপ ইচ্ছা কেবল ইচ্ছামাত্র হয়, কোন কালেই ফলবতী হয় না। আমার গঙ্গাস্নান করিতে ইচ্ছা হইল—যদি শরীরে শক্তি থাকে, তাহা হইলে সে ইচ্ছায় আর কোন প্রতিবন্ধক ঘটে না। ইচ্ছার তরঙ্গ সকল সময়ে

সমান অবস্থায় থাকে না। এক সময় এক বিষয়ে ঘোরতর ইচ্ছা জন্মিল, আবার কিছুদিন পরে সেই বিষয়েই বিজাতীয় বৈরক্তি জন্মিতে পারে। আমি যখন সুস্থ শরীরে ছিলাম, তখন মৎস্য খাইতে কখনই ইচ্ছা হইত না, রুগ্ন হইয়া সেই মৎস্যের প্রতি যারপর নাই ইচ্ছা জন্মিল। ইচ্ছার সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়ের ও রসনেন্দ্রিয়ের অনেক সংস্রব আছে। আহার সম্বন্ধের ইচ্ছাকে রসনেন্দ্রিয় ও বিলাসসম্বন্ধের ইচ্ছাকে দর্শনেন্দ্রিয় পোষকতা করিয়া থাকে। যে জন্মান্ধ তাহার কখনও সাটিনের জামা পরিতে ও গোরার বাড়ীর জুতা পায়ে দিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ যে ইন্দ্রিয় বিলাস-সম্বন্ধীয় ইচ্ছার পোষকতা করে, স্বভাব সে ইন্দ্রিয়ের অভাব করিয়া রাখিয়াছেন; এই জন্য বিলাসসম্বন্ধে তাহার নিজের ইচ্ছা কিছুই হয় না। আহারসামগ্রী যদিও সে দেখিতে পায় না বটে, তথাচ রসনেন্দ্রিয় দ্বারা ভাল মন্দ দ্রব্যের আস্বাদন পাইয়া সুস্বাদু ও সুমিষ্ট দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। দেখিয়া শুনিয়া এবং খাইয়া আমাদের কতকগুলি বিষয়ে অনুরাগ জন্মে, সেইগুলি প্রাপ্তির অভিলাষকে ইচ্ছা কহে। যে সকল ইচ্ছা অসম্ভব ও লজ্জার আকর তাহা আমরা মনোমধ্যেই গোপন করিয়া রাখি।

সকল ইচ্ছা সকল সময়ে সকলের নিকট প্রকাশ করা যায় না। আমাদিগের যখন যেপ্রকার মনে ইচ্ছা হয়, তৎসমুদয় যদি জনসমাজে প্রকাশ করি, তাহা হইলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, সমাজচ্যুত হইতে হয় এবং জনসমাজে পাগল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হয়। মনুষ্যের মনে কখনও কখনও এরূপ অসম্ভাবিত ইচ্ছা উপস্থিত হয় যাহা আপনা আপনি পুনর্ব্বার ভাবিতেও লজ্জা বোধ করে। ইচ্ছার সীমা নাই, অর্থাৎ আদি অন্ত নাই। আমি এক সময়ে প্রতিবেশীর

অনিষ্ট ইচ্ছা করিলাম, যদি সেই কথা প্রকাশ করিয়া বলি, তাহা হইলে অবশ্যই আমি নিন্দনীয় হইব। আমার একটি কুকার্য্যে ইচ্ছা হইল, যদি সেই ইচ্ছাটি কার্য্যে পরিণত করি তাহা হইলে অবশ্য জনসমাজে ঘৃণাস্পদ হইতে হইবে। আমার একটি পরনারী হরণের ইচ্ছা জন্মিল, যদি বলপূর্ব্বক তাহা সফল করি, তাহা হইলে আমাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। আমরা বিবেচনা করিয়া দেখি না বলিয়া এক দিনের মধ্যে মনে কত প্রকার নূতন নূতন ইচ্ছার আবির্ভাব হয় যে, তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া রাখিতে পারা যায় না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বায়ু-সেবনার্থে বীডন্ গার্ডেনে প্রবেশ করিলাম। তথায় একঘন্টাকাল অবস্থান করিলে মনোমধ্যে কত প্রকার ইচ্ছা জন্মে পাঠকগণ! তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। প্রথমতঃ প্রবেশদ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাহার দুই পার্শ্বে নানাবিধ লতা উঠিয়া পুষ্পিত ও মুকুলিত হওয়ায় চমৎকার শোভা সম্পাদন করিতেছে! দৃষ্টিমাত্রে অমনি ইচ্ছা হইল, এই প্রকার কয়েকটি লতা কিনিয়া বাটীর প্রাঙ্গণে পুতিয়া দিব, তাহা হইলে প্রাচীরের উপর উঠিয়া এইরূপ পুষ্পিত ও মুকুলিত হইবে। প্রবেশদ্বার ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া দেখিলাম একজন বড়লোকের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি উদ্যানের মধ্যস্থলে স্থাপিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে ইচ্ছা হইল, আমারও এইরূপ হয় তাহা হইলে চিরকাল নাম থাকিয়া যায়। তাহার পর ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে যেখানে নূতন নূতন পুষ্পবৃক্ষ দেখিলাম, তাহাই আপন বাটীতে পুতিবার ইচ্ছা হইল। এই প্রকারে উদ্যানমধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে ভাবিলাম, যদি এই বাগানখানি আমার হইত, তাহা হইলে ইহার মধ্যস্থলে একটি মধ্যবিৎ রকমের বাটী প্রস্তুত করাইয়া আপনি বসবাস করিতাম, এবং অবশিষ্ট স্থানে রাইয়ত বসাইয়া দিতাম,

G D HAZRA & BROTHERS

তাহার আয় হইতেই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। তাহার পর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যে সকল ইচ্ছা হইয়াছিল, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন।

মনুষ্যের ইচ্ছার অবধি নাই। বাল্যকালে বৃদ্ধ হইতে ইচ্ছা হয়, বৃদ্ধ-কালে বালক হইতে ইচ্ছা হয়। অন্য কি কথা, কখন কখন গগনমার্গে উড়িয়া বেড়াইবারও ইচ্ছা হইয়া থাকে! এক দিবস প্রধানতম বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া বিচার দেখিতেছি, দেখিতে দেখিতে বিচার-পতি হইবার ইচ্ছা হইল। সেই ইচ্ছার সহিত আরও কতকগুলি ইচ্ছা সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পাগল প্রতিপন্ন হইব এই জন্য লিখিতে পারিলাম না। মনুষ্যের মনে যখন ইচ্ছার অবধি থাকে না, তখন সেই ইচ্ছা স্বাধীনভাবে চালনা করিলে না হইতে পারে এমন কার্য্যই নাই। যে স্বাধীনভাবে আপনার ইচ্ছার চালনা করে, তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়। লোকে একটা সামান্য কথায় বলিয়া থাকে "তোমার মনে যাহা ইচ্ছা যায় তাহাই কর, যে-হেতু তুমি আমাদিগের বারণ শুনিলে না।" বাইবেলে কথিত আছে যে, ঈশ্বর আমাদিগকে (Free will) স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া-ছেন, এই জন্য আমরা যাহা করি তাহার ফলভোগী আমরাই হইব। যে হেতু ঈশ্বর আমাদিগকে যেমন স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন তেমনই সদসৎ বিবেচনাশক্তিও দিয়াছেন; সেই কারণে আমরা যাহা কিছু করি, তাহা আমাদিগেরই বিবেচনার গুণে বা দোষে হইয়া থাকে। বাইবেলের এই এক স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া মনুষ্যকে সর্ব্ববিষয়ে দোষী করা হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যজাতির বেদান্ত-শাস্ত্র সেরূপ নহে। ঈশ্বর আত্মারূপে মনুষ্যশরীরে থাকিয়া যাহা করাই-তেছেন, মনুষ্য তাহাই করিতেছে; সেইজন্য মনুজকুল পাপপুণ্যের

ভাগী নহে। ঈশ্বর প্রাণিমাত্রকে সংসার-চক্রে ফেলিয়া এক চমৎকার ক্রীড়া করিতেছেন। এই সংসার-আবর্ত্তনে পড়িয়া যে, যে অবস্থায় যাইতেছে তাহার দ্বারা সেইরূপ কার্য্য হইতেছে। তবে এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে কতকগুলি নিয়মের অধীনে রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে সমস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। বালকের দুগ্ধ খাইতে ইচ্ছা নাই, দুগ্ধের পরিবর্ত্তে সে অম্ল খাইতে ইচ্ছা করে, এস্থলে পিতা মাতার শাসনে ইচ্ছা না থাকিলেও বালক দুগ্ধ খাইতে বাধ্য হয়। সেইরূপ মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া গুরুশাসনাধীনে থাকা নিতান্ত উচিত। যিনি আমা অপেক্ষা অধিক জানেন, যাঁহার কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা হয়, যাঁহার পরামর্শ আমার ইষ্টকর বলিয়া বোধ হয় এরূপ মান্যজনের শাসনাধীনে থাকিলে আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিব না। কিছুকাল এইরূপ শাসনে থাকিলে আপন বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়া উঠিবে, তখন আপনাকেই আপনি শাসন করিতে পারিব, তখন আর স্বাধীন ইচ্ছা আমাকে যথেচ্ছাচারী করিতে পারিবে না। পাঠক! যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই যদি কার্য্যে পরিণত কর, একবার বিশিষ্টবিধানে ভাবিয়া না দেখ, তাহা হইলে আর অধিক কাল জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। অন্যায়পথেই ইচ্ছা সর্ব্বদা বিচরণ করিতে চাহে। মনুষ্যস্বভাব ব্যতিরেকে ইহার কারণ আর কিছুই অনুভূত হয় না। অন্যান্য প্রস্তাবেও বলা হইয়াছে, পুনর্ব্বার এস্থলেও বলা যাইতেছে যে, ন্যায় যুক্তি ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার স্বাধীন ইচ্ছা চালনা কর কখনই অমঙ্গল হইবে না। উপরোক্ত ঐ তিনটি নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেই, মনুষ্যপ্রবৃত্তি মনুষ্যকে কখনই নষ্ট করিতে পারে না। আমার সুরাপান করিতে
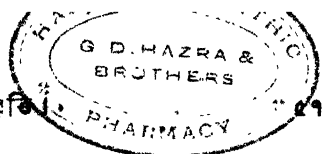
ইচ্ছা হইল, সেই ইচ্ছা ক্রমে প্রবল হইয়া দাঁড়াইল, সেই সময় ন্যায় যুক্তি ও ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলে অবশ্যই মনোবেগ নিবারণ করিতে পারিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মনের ইচ্ছা স্বতন্ত্র। প্রত্যেক বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা মনের সহস্র সহস্র অভীষ্ট সম্পন্ন করাই। কাহারও এরূপ বাসনা হয় না যে, আমি কষ্টভোগ করি। কেহই স্কন্ধে করিবার ইচ্ছা করে না, সকলেই স্কন্ধে উঠিবার ইচ্ছা রাখে। এরূপ ইচ্ছা কোন্ কালে কাহার হইয়াছে যে, আমি নির্ধন হইয়া উদরপোষণের জন্য পরের উপাসনা করি। ভাল খাইতে ভাল পরিতে এবং উত্তম স্থানে বাস করিতে সকলেরই অভিলাষ। যদিও সকল সময়ে সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা করিতে কেহই বিরত নহে।

পুরাকালে একজন ঋষি কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দৈবাৎ তাঁহার আশ্রমে একজন ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন নরপতি আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তপোধনের কঠোর বৃত্তি দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন এবং হাস্যবদনে কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি কি জন্য সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এরূপ কঠোর বৃত্তির অনুশীলন করিতেছেন? আপনার মনুষ্যদেহ ধারণ করা বৃথা হইয়াছে; যেহেতু কাল্পনিকসুখের প্রত্যাশায় একেবারে ঐহিকসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।" ঋষিবর কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ভ্রমে পড়িয়াছেন। আপনি যে সুখের ইচ্ছায় এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেছেন, সে সুখ অধিক, কি আমি মনে মনে যে সুখ অনুভব করিতেছি আপনার অপেক্ষা আমার সেই সুখ অধিক, তাহা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। আপনার অদ্য মৃগয়া

করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল, সেই ইচ্ছার বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সুরম্য রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছেন। কেবল এক চিত্তের সন্তোষের জন্য নিরীহ মৃগকুলের প্রাণবধ করিতেছেন। আপনি অস্ত্রপ্রয়োগে যে ইচ্ছার নিবৃত্তি করিতেছেন, আমি কিছুকাল পূর্ব্বে কেবল জ্ঞানাস্ত্রপ্রয়োগে কামক্রোধাদি ভয়ানক ভয়ানক পশুর প্রাণবধ করিয়াছি। আপনার মৃগয়া অপেক্ষা আমার মৃগয়া যে সমধিক হর্ষপ্রদ তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি। আপনি ইচ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া বনে মৃগশিকার করিতে আসিয়াছেন, আমিও ইচ্ছাকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া এই বনে রিপুসংহার করিতে বসিয়াছি। আপনার মৃগয়ার ইচ্ছা কোন কালেই নিবৃত্তি হইবে না, কিন্তু আমার রিপুসংহারেচ্ছা একেবারে নিবৃত্তি পাইয়াছে। আমার মন-অটবীতে আর একটিও অপকারী পশু নাই, জ্ঞানাসি দ্বারা প্রায় সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। এখন ক্ষমা শান্তি দয়া এবং ধর্ম্মরূপ কতকগুলি মৃগ আমার মন-অটবীতে নিরাপদে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। আমি নয়ন মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বদাই তাহাদিগের ক্রীড়াকৌতুক দেখিতেছি। আমার মনে মনে যাহা ইচ্ছা হইতেছে মনে মনেই সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতেছি। ইচ্ছাময় পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া আমার মনে যাহা ইচ্ছা হইতেছে তাহাই উপভোগ করিতেছি, কিছুরই অভাব বোধ হইতেছে না। প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি এ দুইটি শব্দের অর্থ কি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, সেইজন্য আমি সকল প্রবৃত্তিকেই ক্ষণকালের মধ্যে নিবৃত্তি করিতে পারি। কিন্তু আপনার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নাই, কোন কালে তাহা হইবে এরূপ আশাও করিতে পারেন না। অদ্য মৃগয়ার ইচ্ছায় বনপ্রবেশ করিয়াছেন, কল্য পররাজ্যহরণেচ্ছায় যুদ্ধে

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

প্রবৃত্ত হইবেন। মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন আপনার এই দুইটি ইচ্ছাই কতদূর অনিষ্টকর। আমরা যে ইচ্ছাকর্ত্তৃক চালিত হই, সেই ইচ্ছা কিয়ৎ পরিমাণে ফলবতী হইলেই আনন্দের সীমা থাকে না এবং সেই কার্য্য অধিক পরিমাণে করিতে পুনরেচ্ছা হয়। অদ্য কয়েকটি মৃগ-বধ করিয়া জীঘাংসাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এখন হয়ত মনে মনে ভাবিতেছেন 'নীরিহ মৃগ মারিয়া কি হইবে? যদি একটা শার্দ্দূল কি সিংহশিকার করিতে পারি, তাহা হইলে সমভিব্যাহারী সৈন্যেরা আমাকে বীরপুরুষ বলিয়া গণ্য করিবে।' দেখুন মৃগ মারিয়া আপনার জীবহিংসার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে কি না? পুনর্ব্বার শার্দ্দূলশিকারে ইচ্ছা করিতেছেন কি না? হয়ত সেই ভয়ানক হিংস্র পশুশিকারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ হারাইবেন এখন তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি-তেছেন না। আমি ষড়রিপু দলন করিয়া এক্ষণে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিদ্রাকে আয়ত্তে আনিবার ইচ্ছা করিতেছি, তাহা হইলে অবাধে সর্ব্বক্ষণ সেই ইচ্ছাময়ের আরাধনা করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিব।

রাজেন্দ্র! আপনি বিবেচনা করুন, আপনার ইচ্ছায় ও আমার ইচ্ছায় প্রভেদ কি? ইহার উত্তর আমিই করিতেছি,—যেমন সুরা-পায়ীর সুরাসেবনের ইচ্ছা হওয়ায় শুণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, সেখানে ইচ্ছামত সুরা গলাধঃকরণ করিয়া রাজপথে ধূল্যবলুণ্ঠিত হই-তেছে। সেই সময় অন্য একজন পণ্ডিত আপনার সুরম্য গৃহে বসিয়া বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ কি বিশিষ্টবিধানে তাহারই স্থিরসিদ্ধান্ত করণেচ্ছায়, এক প্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া আছেন। এই দুই ব্যক্তির স্ব স্ব প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছাদ্বারা উত্তেজিত হইয়া কিরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহা আপনি অনায়াসে

অনুভব করিতে পারিবেন। তবেই এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে, মনুজকুলের যাহার যেরূপ রুচি, তাহার সেইরূপ ইচ্ছা মনোমধ্যে উদয় হয়। তবে কু-ইচ্ছায় কষ্ট ও সু-ইচ্ছায় সুখ ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি। আমাদিগের মনের ইচ্ছার ইয়ত্তা নাই। সেই স্বাধীন ইচ্ছা যাহাতে আয়ত্তাধীনে থাকে তাহারই চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য। ইচ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে পরিতুষ্ট করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে; যে যতদূর পারে সে ততদূর দৌড়িয়া থাকে, ক্ষমতার অতীত হইলে আপনা আপনিই ক্ষান্ত হয়।"

ইংরাজিভাষার Think এই শব্দটির বাঙ্গালাভাষায় নানা অর্থ হয়। Think শব্দের প্রকৃত অর্থ চিন্তা। চিন্তা নানা প্রকার আছে। সৃষ্টবস্তু দেখিয়া আমরা যে একটা অলৌকিক কল্পনা করিয়া থাকি তাহাকে কল্পনাযুক্ত চিন্তা কহে।

এই ভূমণ্ডল সংখ্যাতীত প্রাণীর বাসস্থান, তন্মধ্যে মানবজাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্য চিন্তাশীল বলিয়াই সকল প্রাণীর অগ্রগণ্য হইয়াছেন। একটি সৃষ্ট বস্তু দেখিলে মেধাবী মনুষ্যেরা তদনুরূপ আর একটি কল্পনা করিতে পারেন। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি ইহা একটি গ্রহ। বুধও আর একটি গ্রহ। যখন পৃথিবীতে প্রাণিসমূহ বাস করিতেছে তখন বুধ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহে মনুষ্যের ন্যায় জীব থাকিলেও থাকিতে পারে। এইরূপ অনুমান কল্পনাকে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা চিন্তা কহিয়া থাকেন। যখন আমরা গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হই, তখন একেবারে বাহ্যজ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া যায়। এরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তি সকলে নহেন। যাঁহারা সুশিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহারাই চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, যাহারা মূর্খ ও স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ তাহাদিগের চিন্তাশক্তি যৎসামান্য বলিয়া কোন বিষয়ে গাঢ় মনো-

নিবেশ করিয়া তাহার ভদ্রাভদ্র বুঝিয়া লইতে পারে না, সুতরাং সংসার-তরঙ্গের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়; ডুবুরির ন্যায় চিন্তা-সাগরের তলস্পর্শ করিয়া অমূল্য রত্ন উদ্ধৃত করিতে পারে না। সামান্য কথায় বলিতে গেলে চিন্তা সৎ এবং অসৎ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা ইহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে আমরা কখন কখন চিন্তামণি বলিয়া ডাকি; তাহার ভাবার্থ এই—যখন আমরা ঈশ্বরচিন্তায় রত হই, তখন চিন্তা একেবারে যতদূর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে ততদূর উঠে। বহুচিন্তা না করিলে ঈশ্বরচিন্তায় মন রত হয় না, এই জন্যই ঈশ্বরকে চিন্তামণি বলা যায়।

পর্য্যবেক্ষণ আর একটি চিন্তার অঙ্গ। কোন বিষয়ের গাঢ়-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মনোমধ্যে তাহার তন্ন তন্ন হেতুবাদ করার নাম পর্য্যবেক্ষণ। এরূপ পর্য্যবেক্ষণ রাজা ও রাজকর্ম্মচারীর পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে রাজা বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি, তাঁহাকে সকল বিষয়ই পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অবধারিত করিতে হয়। রাজা কলিকাতায় আছেন কিন্তু আম্বালার প্রজারা কি অবস্থায় অবস্থিত তাহা বিশিষ্টবিধানে জানা চাই, নতুবা রাজ্যের কোন্ অংশে কি সূত্রে যুদ্ধ বা বিগ্রহ ঘটিবে পূর্ব্ব হইতে রাজা কি প্রকারে তাহার পথ বন্ধ করিবেন। বিস্তীর্ণ রাজ্য রক্ষাকরণসম্বন্ধে রাজাকে কেবল পরের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হয়। যাঁহার কোন কার্য্যে পর্য্যবেক্ষণ নাই তাঁহার রাজ্যেই সর্ব্বদা যুদ্ধ বা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। যখন আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, পর্য্য-বেক্ষণশূন্য একজন গৃহস্বামী একটি ক্ষুদ্র পরিবারশাসনে অক্ষম হন, তখন রাজ্যশাসনে কি বিস্তীর্ণ অধিকারশাসনে কতদূর পর্য্য-

বেক্ষণের আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। এক ব্যক্তি বিংশতি সহস্র লোকের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন, এই সমূহ লোক তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিলে সকল কার্য্যই শৃঙ্খলাপূর্ব্বক চলিতে পারে। যদি প্রভুর উপর অধীনস্থ লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে অন্য কি কথা অধীনস্থ লোকেরা একৈক্য হইয়া তাঁহার জীবনান্ত পর্য্যন্তও করিতে পারে। এই জন্য রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তিরা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের উপর সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠপদাভিষিক্ত অধীনস্থ লোক মনোনীত করিবার সময়ে যে কতদূর পর্য্যবেক্ষণের আবশ্যক তাহা রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারেন। এই ভারতবর্ষের মধ্যে বহুসংখ্যক করদ ও মিত্ররাজ আছেন। ইহাঁদিগের রীতি নীতি ব্যবহার সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার রাজপ্রতিনিধির উপর অর্পিত আছে। প্রতিনিধি স্বয়ং এ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, অথচ রাজারা কিরূপ প্রণালীতে আপনাদিগের রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেছেন, তাহা সম্রাটের প্রতিনিধির জানা নিতান্ত প্রয়োজন। এরূপস্থলে সম্রাটের প্রতিনিধি পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা কি কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন রাজকার্য্যসম্বন্ধে এই একটি গাঢ়চিন্তার স্থল। এই কার্য্যসম্বন্ধে অনেক রাজপ্রতিনিধি পর্য্যবেক্ষণদ্বারা অনেক উপায় অবধারিত করিয়াছেন, কিন্তু বিশিষ্টরূপে তাহার কোন উপায়ই ফলদায়ক হয় নাই। অনেক চিন্তার পর প্রত্যেক রাজদরবারে এক এক জন এজেন্ট নিযুক্ত করা অবধারিত হয়। কিন্তু কালে তাহাতেও অনেক বিশৃঙ্খল ঘটিয়া থাকে। কারণ এজেন্টেরা রাজাদিগের উপর সর্ব্বদাই আপনাদিগের স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে যান, রাজারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া রাজা এবং এজেন্টের সহিত ঘোর

বিবাদ উপস্থিত হয়। এজেন্টরা আপনাপন পক্ষ বলবৎ করিবার জন্য রাজাদিগের সম্বন্ধে অনেক মনঃকল্পিত কথা গবর্ণমেন্টের কর্ণে তুলিয়া দেন, তদ্দ্বারা নিরীহ রাজাদিগের সময়ে সময়ে অনেক অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে—বরদার রাজা গুইকুমার তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এই সকল অমঙ্গল নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্ট অনেক পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা অবধারিত করিয়াছেন যে, মধ্যে মধ্যে রাজাগণের সহিত তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ করা নিতান্ত প্রয়োজন; তাহা হইলে এজেন্টেরা সাহস করিয়া অলীক কথা উত্থাপিত করিতে পারিবেন না। এই প্রণালী আপাততঃ শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু একশত বৎসর পর্য্যবেক্ষণের পর এই উপায় উদ্ভাবিত হইল এটি যেন পাঠকগণের স্মরণ থাকে। রাজনীতিজ্ঞগণের পক্ষে কতদূর পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক তাহার একটিমাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইল। এইরূপ সকল কার্য্যেই রাজা এবং রাজকর্ম্মচারীরা পর্য্যবেক্ষণের সহিত চিন্তা করেন যে, কিসে কি হইবে এবং কি কার্য্যে কি হইয়াছে, অর্থাৎ অতীতকালের রাজাগণ কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিয়া প্রজার নিকট যশোলাভ করিয়াছিলেন, কিম্বা কোন্ কোন্ জঘন্য প্রণালী অবলম্বন করায় সমূলে নিপাত হইয়াছিলেন ইত্যাদি। তাঁহারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান রাজকার্য্যের উপর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আপনাপন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। রাজ্যশাসনাধিকারে এক পর্য্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে অন্য কোন চিন্তার তাদৃশ প্রয়োজন নাই।

পাঠার্থিগণের চিন্তার নাম অভিনিবেশ। একটি সামান্য কথায় বলিয়া থাকে, "অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ কর অবশ্য বিদ্যা অর্জ্জন হইবেক।" গাঢ়চিন্তার সহিত যে কোন্ কার্য্যে মনোনিবেশ করাকে

অভিনিবেশ করে। স্যর্ আইজাক্ নিউটন্ কিঞ্চিন্মাত্র বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে এক দিবস পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া উদ্যানমধ্যে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তিদূর করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, দৈবাৎ তাঁহার সম্মুখস্থ আভাবৃক্ষ হইতে একটি সুপক্ব আভাফল বৃন্তচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে নিউটন্ অভিনিবেশ পূর্ব্বক সেই বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে, 'আভা-ফলটি ঊর্দ্ধগামী না হইয়া অধোগামী হইল কেন?' এই চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্ত্তিত হইলেন। তাহার পর বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক এক পক্ষকাল ঐ আভাফলের বিষয় ক্রমা-গত চিন্তা করিতে করিতে মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার করিলেন। যখন নিউটনের এই নূতন আবিষ্কারের কথা পণ্ডিতমণ্ডলীতে প্রচার হইল, তখন তাঁহারাও অভিনিবেশপূর্ব্বক সেই বিষয় চিন্তা করিতে বসিলেন; ক্রমে মাধ্যাকর্ষণ লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীতে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। অনেক বিচারের পর এই অবধারিত হইল যে, জগৎ-সংসারের সমস্ত পদার্থেরই ন্যূনাধিক আকর্ষণশক্তি আছে। বিশ্ব-সংসারকে সুনিয়মে রক্ষা করিবার উপায় কেবল এক মাধ্যাকর্ষণ হইতেই হইয়াছে; ইহা না থাকিলে কি ভূগোল, কি খগোল সমস্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। চিন্তার কথা লইয়া আমাদিগের প্রস্তাব লিখিত হইয়েছে, কেবলমাত্র উদাহরণস্থলে মাধ্যাকর্ষণের কথা উত্থাপিত হইল, অতএব সে কথা লইয়া আর অধিক আন্দো-লনের প্রয়োজন নাই। কেবল এক অভিনিবেশদ্বারা কতদূর বিদ্যার উন্নতি হইয়াছে, এস্থলে তাহাই বক্তব্য।
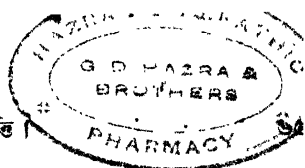
একজন চিন্তাশীল লোক বেদব্যাস এই ভারতভূমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অভিনিবেশ সহকারে কি মনুষ্যপ্রকৃতি, কি স্বভাবের কার্য্য, সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন। সেই অষ্টাদশ পুরাণ এখন যিনি সমগ্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য করিতে হয়। সেই সকল পুরাণ ও উপপুরাণের রচয়িতা কিরূপ চিন্তাশীল মনুষ্য ছিলেন, বিবেচনা করিয়া দেখ। কেবল এক অভিনিবেশযুক্ত চিন্তার বলে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে কি অদ্ভুত কল্পনাশক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনাগণের কৃষ্ণের প্রতি প্রেমানুরাগ বনবাসী তপস্বী হইয়া তিনি কি প্রকারে এতদূর বর্ণনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা ভাবিয়া আনিতে পারি না। ইহা দ্বারা কেবল এইমাত্র অনুভব হয় যে, সকল কার্য্যই তিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া চিন্তা করিতেন, এবং নানা প্রকৃতি একত্রে সমষ্টি করিয়া একটি নূতন প্রকৃতির কল্পনা করিতে পারিতেন। সেটি কেবল অভিনিবেশযুক্ত চিন্তার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদব্যাস যেরূপ চিন্তাশীল লোক ছিলেন, সেইরূপ চিন্তাকেই শাস্ত্রকারেরা গবেষণা কহিয়া থাকেন। পৃথিবীর আদিম অবস্থার লোকে অধিক চিন্তাশীল হইতে পারিত না। যে হেতু তৎকালের শাস্ত্রকারেরা লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়া চিন্তার পথ বন্ধ করিয়া রাখিতেন, এই জন্য তৎকালে একলক্ষ লোকের মধ্যেও একজন চিন্তাশীল লোক পাওয়া দুষ্কর হইত। ঈশ্বরের কার্য্যের উপর স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা অন্যের ছিল না, কেবল শাস্ত্রকারেরাই অর্থাৎ মহাপ্রাজ্ঞ মুনিঋষিরাই সেরূপ চিন্তার অধিকারী ছিলেন। কি রাজা, কি প্রজা পণ্ডিতগণের নিকট যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত

করিতেন, তাঁহারা আপনাদিগের কার্য্যের সুবিধামত সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সকলে সেই মুনিবাক্য সত্য বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সাধারণের চিন্তার পথ কিরূপে বন্ধ ছিল, নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

প্রজাপতি দক্ষরাজ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। তাঁহার পর্য্যায়-ক্রমে সপ্তবিংশতিটি কন্যা জন্মিয়াছিল। সর্ব্বশেষে সতীনাম্নী আর একটি কন্যা তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। বোধ কর, এই বিষয়টি কতকগুলি সাধারণ লোক ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "দক্ষের এই অষ্টবিংশতিটি কন্যার কোথায় কোথায় পরিণয় হইয়াছিল?" ঋষিরা অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "সপ্তবিংশতিটিকে চন্দ্র ও সর্ব্বকনিষ্ঠা সতীকে মহাদেব বিবাহ করিয়াছিলেন।" পুনরায় প্রশ্ন হইল, দক্ষের "সপ্তবিংশতিটি কন্যার নাম কি?" ঋষিরা সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের নাম করিলেন। একথার উপর আর প্রশ্ন নাই। আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে যে, অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হইয়া নক্ষত্রলোকে বাস করিতেছেন। মুনিবাক্যে সন্দেহ নাই বলিয়া যদি ক্ষান্ত হই, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় মিটিয়া যায়। আর যদি আমরা এতৎ-সম্বন্ধে নিগূঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হই, তাহা হইলে প্রথমতঃ এই চিন্তা উপস্থিত হইবে যে, দূরবীক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট দেখিতেছি, চন্দ্র পর্ব্বতাদি পরিপূরিত একটি জড়পিণ্ড মাত্র। সেই জড়পিণ্ড কি প্রকারে দক্ষের সপ্তবিংশতিটি কন্যাকে বিবাহ করিল? দক্ষ সত্যযুগের প্রারম্ভে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি কোথায় লয় হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কন্যাগুলি অদ্যাপি চন্দ্রের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি-

ভেছেন। খগোল-বিদ্যা পাঠে জানা গেল যে, অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি যে কয়েকটি নক্ষত্রের নাম আছে, তাহারাও এক একটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড মাত্র। জড়পিণ্ডের সহিত জড়পিণ্ডের পরিণয় কেবল কবিরাই দিতে পারেন! কবির অসাধ্য কিছুই নাই! এই সকল বিষয়ের উপর অভিনিবেশ পূর্ব্বক গাঢ়চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া অবধারিত হইল যে, চন্দ্রের সপ্তবিংশতি স্ত্রীর কথা সমস্তই অলীক, কবির রূপক বর্ণনাগুলি আমরা সত্য বলিয়া ধরিয়াছিলাম। কবিরা পদ্মফুলকে সূর্য্যের প্রেয়সী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে গেলে এইমাত্র উপলব্ধি হইবে যে, সূর্য্যকিরণ ব্যতিরেকে পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয় না। যেমন প্রণয়ীকে দেখিলে প্রণয়িনীর হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ সূর্য্যকিরণে যখন পদ্মিনী প্রস্ফুটিতা হইতেছে, তখন কাব্যকারেরা যে সূর্য্য ও পদ্মিনীকে নায়ক নায়িকারূপে বর্ণন করিবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। এইরূপ অলীক বর্ণনাকে চিন্তাশীল লোকেরা এখন একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা মুনিবাক্য মিথ্যাই হউক আর সত্যই হউক, সে বিষয়ে কিছু মাত্র লক্ষ্য করেন না। অভিনিবেশ সহকারে স্বভাবানুযায়িক চিন্তা করিয়া যেটি সত্য জ্ঞান হয়, সেইটিই তাঁহারা হৃদয়ের সহিত গ্রাহ্য করেন। ঊনবিংশ শতাব্দিতে চিন্তাশীল লোকের আধিক্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর কেহই সাহস করিয়া স্বাধীন চিন্তার পথে কণ্টক বিস্তার করিতে পারেন না। পূর্ব্বকালে যে সকল বিষয়ে লোকের অনুমান করিবার ক্ষমতা ছিল না, মনে উদয় হইলেও উৎকট পাপ বলিয়া বোধ করিত, এক্ষণে সেই সকল বিষয় স্বাধীন ইচ্ছা সহকারে চিন্তা করিয়া লোকে সত্যাসত্য অবধারিত করিতেছে।
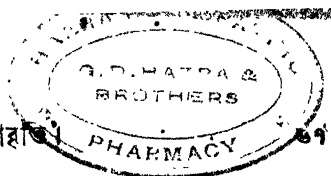
পুরাকালের শাস্ত্রকারেরা মুক্তকণ্ঠে কহিতেন, “আমরা যাহা বলিতেছি তাহাই বিশ্বাস কর, তর্ক করিও না।” শাস্ত্রের শাসনে তর্কবিহীন হইয়া থাকায় লোকে এক পরকালের ভয়ে জড়সড় হইয়া ছিল; নরক-ভয় অদ্যাপিও অশিক্ষিত লোকের মনে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। রাজা যতই কেন নারকী হউন না, প্রজারা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবেক; কেননা রাজার শরীর দেবতার ন্যায় পবিত্র, তাঁহাকে দর্শন করিলেও পুণ্য হয়; শাস্ত্রকারেরা প্রজাসাধারণের এইরূপ অলীক বিশ্বাস জন্মাইয়া পৃথিবীর কত অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই! এ দেশের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা এ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে শিখে নাই, শাস্ত্রের কথা যাহা শুনে তাহাই বিশ্বাস করে, সম্ভব অসম্ভবের উপর কখনও তর্ক করিতে যায় না। এইজন্য ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় তাহারা কঠোর ব্রত আচরণ করিতেছে, তীর্থভ্রমণ করিতেছে, এবং অকাতরে দীক্ষাগুরুর পাদপদ্মে অর্থ ঢালিয়া দিতেছে। এতৎসম্বন্ধে আর অধিক বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই, যে হেতু স্বাধীন চিন্তার ফল কি, তাহা এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রথমতঃ সক্রেটিস্ ও প্লেটো মনুজকুলকে চিন্তা ও কল্পনা করিতে শিক্ষা দেন, তাহার পর লুথর পর্য্যবেক্ষণ ও অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে কি ফল দর্শে তাহাই শিক্ষা দিয়া যান। তৎপরে হিউম্ সর্ব্বসাধারণকে মুক্তকণ্ঠে বলেন, “অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখ, আমাদিগের দেশপ্রচলিত (Bible) ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদয় মিথ্যা। যীশু মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করিয়াছিলেন, এ কথা কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখ, ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তারা আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া গিয়াছেন কি না? ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক চলিতেছে, কিন্তু

G. D. HAZRA & BROTHERS
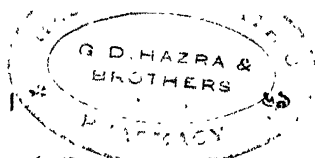
স্বভাবের চিরপ্রচলিত নিয়মে কখনও তর্ক চলিবে না। জগৎশুদ্ধ লোক মিথ্যা কথা কহিতে পারে, প্রবঞ্চনা করিতে পারে, কিন্তু স্বভাব কখনও বিপর্য্যয় হইতে পারে না। মানুষ মরিলে আর বাঁচিবে না, ইহাই সত্য। খ্রীষ্ট মরামানুষ পুনর্জ্জীবিত করা সম্বন্ধে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।” যখন এই কথা হিউম্ খ্রীষ্টিয়ানমণ্ডলীর মধ্যে সাহসের সহিত বলিতে লাগিলেন, তখন ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিরা ক্রোধে অধীর হইয়া হিউমের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাধীন চিন্তার প্রভাব দেখিয়া অনেকে মনে মনে সম্ভব ও অসম্ভব বিষয়ের চিন্তা করিতে শিখিল বটে, কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিত না। তাহার পর কম্‌ট প্রভৃতি অসাধারণ চিন্তাশীল লোক শাস্ত্রের অলীক কথা স্বভাব-সঙ্গত যুক্তিদ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া কাটিতে লাগিলেন। কম্‌ট প্রথমে এই আপত্তি উপস্থিত করেন যে, “যদি ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের বাক্য হয়, তবে ইহাতে ভবিষ্যৎ ঘটনা কেন লিখিত হয় নাই? প্রকাণ্ড ভারত-রাজ্য ব্রিটীস অধিকারভুক্ত হইবে, ইহা ধর্ম্মপুস্তকের কোনও স্থানে উল্লেখ নাই, কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডার মাসিডনের রাজা হইয়া দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইবেন, ইহা বাইবেলের পদে পদে লিখিত আছে। পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ আমেরিকা অতি অল্পকালমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, খ্রীষ্টের অনুচরবর্গ যদি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, তাহা হইলে কি জন্য তাঁহারা আমেরিকার কথা বাইবেলের কোনও স্থানে উল্লেখ করিয়া যান নাই। খ্রীষ্ট স্বর্গারোহণ করিলে পর, তাঁহার দ্বাদশজন শিষ্য অনেক অদ্ভুত কার্য্য দ্বারায় আপনারা যে ঈশ্বরজানিত লোক, তাহা জনসাধারণের নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এখনকার যাজকেরাও খ্রীষ্টের শিষ্য, তবে তাঁহারা এখন একটিও অদ্ভুতক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন

না কেন ?” কম্‌টের খ্রীষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে এই সকল হেতুবাদ যখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হৃদ্বোধ হইতে লাগিল, তখন বাইবেলের মধ্যে অনেকেই নানা দোষ দেখিতে লাগিলেন। স্বভাবের সহিত বাই-বেলের অনেক কথার ঐক্য হয় না, ইহা আজকাল অধিকাংশ লোকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে, রাজা এবং রাজপ্রতিনিধিগণ একটি কথামাত্র শুনিয়া অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেন। রাজধানীর শান্তিরক্ষক এক ব্যক্তিকে রাজার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং কহিল, “মহা-রাজ! এই ব্যক্তি চুরি করিয়াছে।” রাজা কহিলেন, “যদি যথার্থ চোর বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে শূলে আরো-পিত কর।” এখনকার চিন্তাশীল সংসারে এক ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্তকরণকালে কিরূপ তর্কবিতর্ক চলে, এবং বিচারপতিরা কত-দূর অভিনিবেশ সহকারে অপরাধের প্রকৃত ঘটনার উপর পর্য্য-বেক্ষণ করেন, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে মনুর ব্যবস্থামতে শূদ্রের প্রাণদণ্ড হইত; কিন্তু এখন চিন্তাশীল সংসারের লোক সে অপরাধকে অপরাধ বলিয়াই গণ্য করেন না। মনুর এরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া বরং হাস্য করিবেন, এবং তৎক্ষণাৎ কহিবেন যে, “কি পক্ষপাত! আমরা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া প্রভেদ রাখিবার যদি ঈশ্বরের অভি-প্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি জাতিবিশেষের আকার, প্রকৃতি ও ক্ষমতার প্রভেদ করিয়া দিতেন।” চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই এই সংসারে সুবিচারের পথ পরিস্কার করিয়াছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দিন দিন বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়া সংসারের মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে। যদি ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত লোক স্বাধীন চিন্তার

G. P. HAZRA & BROTHERS
PHARMACY

আলোচনা না করিতেন, তাহা হইলে কোন কালেই তাড়িতবার্ত্তা-বহের আবিষ্কার হইত না, এবং দুইরাত্রি দুইদিনে কলিকাতা হইতে দিল্লী গমনও সম্ভবপর হইত না। এক এক ব্যক্তি কেবল চিন্তাদ্বারা জীবননাশ করিয়া এক একটি বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ঘটিকাযন্ত্র প্রস্তুতকরণকালে কতদূর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তার প্রয়োজন হইয়াছিল। যদি প্রাচীনশাস্ত্রকারগণের কথার উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর চতুষ্খণ্ডবাসী লোক জীবনযাপন করিত, তাহা হইলে চিন্তাশক্তির অভাবজন্য আমরা এ কাল পর্য্যন্ত কোনও হিতকর বিষয়ের আবিষ্কার করিতে পারিতাম না।

অভিনিবেশ, কল্পনা, অনুমান ও পর্য্যবেক্ষণ এই কয়েকটি চিন্তার অঙ্গ। আমরা অভিনিবেশ সহকারে কল্পনা করি, কখন বা অভিনিবেশ সহকারে অনুমান করি, এতদ্ভিন্ন অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ সকল বিষয়েই আবশ্যক। অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা কহেন যে, চিন্তা ও কল্পনা পৃথিবীর সর্ব্বকালে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। আদি পিতামাতারও কল্পনাশক্তি ছিল, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে কোন বিষয় দেখিতেন না। তাঁহারা সৃষ্ট হইয়াই আকাশে সূর্য্যদর্শন করিলেন, কিন্তু সূর্য্য কি, কি জন্যই বা গগনমার্গে সমুদিত হইয়াছে, তাহা কিছুই জানিতেন না। সময়ে সূর্য্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আদিপিতামাতা তদ্দৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। কোথায় সেই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ লুক্কায়িত হইল, কেনই বা আমরা চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদি দেখিতে পাইতেছি না, তৎকালে ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল, পুনর্ব্বার আর একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন। পূর্ব্বে

যেটি দেখিয়াছিলেন, এটি সেইটি বা অন্য আর একটি, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎসম্বন্ধে উভয়ের বাদানুবাদও চলিল। অবশেষে আদিপিতা কহিলেন, "এটি স্বতন্ত্র জ্যোতিঃ, পূর্ব্বে যেটি দেখিয়াছিলাম, তাহার কিরণে আমাদিগের শরীর দগ্ধ হইতেছিল, ইহার কিরণে শরীর স্নিগ্ধ হইতেছে।' আদিমাতা কহিলেন, 'পূর্ব্বের সেই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ কি আর আমরা দেখিতে পাইব?' আদিপিতা উত্তর করিলেন, 'তাহা এখন বলিতে পারি না।' সময়ে সে রজনী প্রভাত হইল, পুনর্ব্বার পূর্ব্বদিকে সেই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সমুদিত হইল। তদ্দৃষ্টে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং অনুমান করিলেন. 'পুনর্ব্বার রাত্রের সেই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থটিও দেখিতে পাইব।' সময়ে তাহাই হইল। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে চন্দ্র সূর্য্যের অস্ত উদয় ও উদয় অস্ত দেখিয়া আদি পিতামাতা মনে মনে কল্পনা করিলেন যে, 'ইহাঁরাই দেবতা।' কালে তাঁহারা তিরোহিত হইয়া গেলেন, তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি রহিল। পিতামাতার নিকট সেই সন্তানেরা এইমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, 'যে দুইটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ আমরা দেখিয়া থাকি, ইহার একটি দিননাথ অপরটি রজনীনাথ, ইহাঁরা দেবতা আমাদিগের নমস্য।' আদিপিতার সন্তানসন্ততিগণ চন্দ্র ও সূর্য্যকে কেবলমাত্র দর্শন ও নমস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা ঐ দুই পদার্থকে ফল ও পুষ্প দিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের স্বভাবতঃ ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিয়াছিল, কিন্তু ভ্রমপ্রযুক্ত ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তুকেই ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাহাদিগের সন্তানসন্ততিরা জল, বায়ু ও অগ্নিকেও দেবতা বলিয়া গণ্য করিতে লাগিল। আদিম অবস্থায় স্বভাবের সহিত মনুষ্য প্রকৃতির কিরূপ সম্বন্ধ তাহা তাহারা

G. D. MAJRA & BROTHERS PHARMACY

কিছুই জানিত না, এবং অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহা চিন্তাও করিত না। এই জন্য যাহাদ্বারা উপকার পাইত, তাহাকেই দেবতা বলিয়া গ্রাহ্য করিত। এই অবস্থায় মনুজকুল বহুকাল অবস্থিত ছিল।

ক্রমে স্থানে স্থানে দুই একটি চিন্তাশীল লোক জন্মিতে লাগিল। বোধ কর, কতকগুলি অসভ্য লোক দুরন্ত বর্ষাকালে বৃক্ষতলে বসিয়া ভিজিতেছে। যাহাদিগের কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই, তাহারা ধৈর্য্যের সহিত সেই বৃষ্টি সহ্য করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে তৎকালোচিত চিন্তাশীল লোক বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ভাবিতে লাগিল,—"দেখিতে পাইতেছি অনাবৃত মাঠে দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা বৃক্ষতলে বসিলে বৃষ্টিতে অধিক ভিজিতে হয় না। একবিন্দু জলও গাত্রে না পড়ে এরূপ কোন উপায় হইতে পারে কি না?" এই চিন্তা, চিন্তাশীল লোকের মনে যখন উদয় হইল, তখন সে অভিনিবেশ সহকারে মনোমধ্যে তাহাই ভাবিল। মনের মধ্যে অনেক প্রকার ভাঙ্গাগড়া আরম্ভ হইল, তাহার পর বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানিল যে, একখানি ছাপ্পরের উপর বৃক্ষপত্র পুরু করিয়া বিছাইয়া দিলে আর গাত্রে জল পড়িবে না। ঐ চিন্তাশীল ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কিছু না বলিয়া আপনার মনগড়া একখানি ছাপ্পর প্রস্তুত করিল, অনেকে দেখিল যে, সেই ব্যক্তি বৃষ্টির সময় ছাপ্পরের তলে বসিয়া আছে, গাত্রে একবিন্দু জল পড়িতেছে না। অনুচিকীর্ষা মনুষ্যের একটি স্বভাবদত্ত প্রবৃত্তি। এক ব্যক্তির ছাপ্পর দেখিয়া অনেকে সেইরূপ ছাপ্পর প্রস্তুত করিতে লাগিল। প্রথমখানির অপেক্ষা দ্বিতীয়খানি আরও সুন্দর হইল, দ্বিতীয়খানির অপেক্ষা তৃতীয়খানির আরও অঙ্গসৌষ্ঠব হইল, চতুর্থখানিতে

আরও কতকগুলি নূতন উপকরণের সংযোগ হইল। মনুজকুল কোনরূপ একটি ভিত্তি পাইলে ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও অঙ্গসৌষ্ঠব অনায়াসে করিতে পারে। ভাবিয়া দেখ, অভিনিবেশ সহকারে কল্পনাদ্বারা সেই বৃক্ষপত্রের ছাপ্পর হইতে মনুষ্যের বাসোপযোগী ভবনের দিন দিন কতদূর উন্নতি হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে অভিনিবেশযুক্ত চিন্তার বলে আরও কতদূর হইবে, তাহা বলিতে পারি না। একজন পণ্ডিত তাঁহার ছাত্রকে কহিয়াছিলেন, "ভাবিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে ভাগ্যবন্ত হইবে।" প্রয়োজন না হইলে লোকে অভিনিবেশ সহকারে কোনও বিষয় ভাবে না, সেই প্রয়োজনও চিন্তাদ্বারা উদ্ভাবিত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই, পর্টুগালের লোকেরাই প্রথম জাহাজের সৃষ্টি করে। জাহাজ গঠনের চিন্তা তাহাদিগের মনে উদ্ভাবিত হইল কেন? প্রয়োজন বশতঃ। পর্টুগালের দক্ষিণ পশ্চিম দুইদিক্ সাগরে বেষ্টিত, অন্যদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। পর্টুগিজেরা সমুদ্রতীরে সর্ব্বদাই বাস করিত। দুই একজন চিন্তাশীল লোক সাগরোপকূলে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমাদের দেশ হইতে অন্য কোন দেশে যাইবার উপায় হইতে পারে কি না? অন্য একজন ভাবিলেন, জলে কোন দ্রব্য ভাসাইয়া তাহার উপর আরোহণ করিলে অন্য দেশে যাওয়া যায়। এইরূপ দুই তিন জন লোক একত্রিত হইয়া ক্রমাগত চিন্তা করিয়া এক প্রকাণ্ড বেতের ঝুড়ি প্রস্তুত করিল। সেই বেতের ঝুড়িতে আরোহণ করিয়া বহুকষ্টে পর্টুগালের উপকূলের অনতিদূরস্থ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে তাহারা উঠিয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার সময়ে সেই বেতের ঝুড়ি তুফান লাগিয়া লাগিয়া এক প্রকার ভগ্ন হইয়াছিল, তথাচ বহুকষ্টে সেই বেতের ঝুড়ি অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার আপনাদিগের উপকূলে
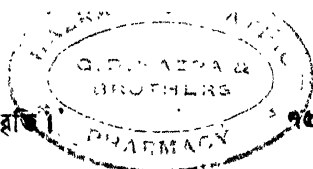
ফিরিয়া আসিল। ঝুড়ি অবলম্বনে কিয়দ্দূর গমনাগমন করায় অনেকের জলযাত্রায় সাহস হইল। তাহার অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিল যে, বেত অপেক্ষা কোন কঠিন পদার্থে ঝুড়ি প্রস্তুত করিতে পারিলে অনায়াসে জলের উপর বেড়াইতে পারা যায়। এদিকে ঝুড়ির সৃষ্টি হইতে না হইতেই অপর কয়েক জন চিন্তাশীল লোক একখানি কাষ্ঠের ডোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। যে দিবস তাঁহারা ডোঙ্গায় চড়িয়া উপকূলে বেড়াইতে লাগিলেন, সেই দিবস বহুসংখ্যক লোক সমুদ্রতীরে আসিয়া ঐ আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতে লাগিল। সেই দর্শকগণের মধ্যে যে সকল চিন্তাশীল লোক ছিলেন, তাঁহারা সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঐ ডোঙ্গার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন কল্পনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারাও দুই একখানি নূতন ধরণের ডোঙ্গা প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে অতি অল্পদিনের মধ্যেই পর্টুগালের উপকূলে বহুসংখ্যক ডোঙ্গা জলে ভাসিতে লাগিল। একটি নূতন চিন্তার হেতু উদ্ভাবিত হওয়ায় অনেকেই অভিনিবেশসহকারে সেই বিষয়ের নানা কল্পনা করিতে আরম্ভ করিল। অনেক চিন্তার পর একজন বলিল, একখানি অপেক্ষা চারিপাঁচখানি ডোঙ্গা একত্রে যোজনা করিলে তুফানে উল্টাইয়া ফেলিতে পারিবে না, তাহা হইলে সকল সময়েই আমরা জলপথে বেড়াইতে পারিব। তাহারি পরামর্শ, সঙ্গত বোধে, চারিপাঁচখানি ডোঙ্গা সরল বৃক্ষের ডাল ও লতায় পরস্পর যোজনা করিয়া একেবারে আট দশজন লোক পূর্ব্বকথিত সেই ক্ষুদ্রদ্বীপে চলিল, সেবার গমনাগমনে তাহাদিগের কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইল না। এই সময়ে কতকগুলি চিন্তাশীল লোক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, পাঁচসাতখানি ডোঙ্গা একত্রিত করিয়া যে পরিমাণে

ভারসহ হইয়াছে; এইরূপ একখানিতে হইলে ভাল হয়। অর্ণবযান নির্ম্মাণ সম্বন্ধের এই প্রথম উদ্যম। এখানে অভিনিবেশ, কল্পনা, অনুমান ও পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত চিন্তারই প্রয়োজন হইল। কেহ কেহ অভিনিবেশ সহকারে কল্পনা করিতে লাগিলেন, কি প্রকারের কাষ্ঠযোজনা করিয়া বড় ডোঙ্গা প্রস্তুত করা যাইবেক। কেহ বা অনুমানের দ্বারা বুঝিলেন, যে বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড করিয়া না চিরিলে যোজনা করা যাইবে না। কেহ বা সমস্ত বিষয়ের উপর পর্য্যবেক্ষণদ্বারা জানিলেন যে, কাষ্ঠযোজনাদ্বারা বৃহৎ ডোঙ্গা গড়িতে পারিলে, অন্যান্য দেশের দ্রব্য সামগ্রী নির্ব্বিঘ্নে আমরা আপনাদিগের দেশে আনিতে পারিব, এবং আমাদিগের দেশোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী অন্য অন্য দেশের দ্রব্যসামগ্রীর সহিত বিনিময় করিলেও বিশেষ উপকার দর্শিবে। এই স্থলে কতকগুলি চিন্তাশীল লোকের মনে বাণিজ্য এবং বাণিজ্যের প্রধান সহায় অর্ণবযানের উপর চিন্তার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে না হইতে পারে কি? আমরা এক সময়ে যে বিষয়টি নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ করিয়াছি, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে তাহার উপর চিন্তা পরিত্যাগ করি নাই, ক্রমান্বয়ে চিন্তা করিতে করিতে সেই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনের উপায় উদ্ভাবন করা গিয়াছে। সেইরূপ পর্টুগিজেরা দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া তৎকালের ব্যবহারোপযোগী জলযানগঠনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিল। ইহা একজনের চিন্তায় সম্পন্ন হয় নাই, বহুসংখ্যক লোকের কল্পনা ও অনুমান একত্রে সমষ্টি করিয়া বাণিজ্য সংসারের প্রধান আশ্রয়স্থল অর্ণবযান প্রস্তুত হইয়াছিল। যেরূপ অনুমান ও কল্পনাদ্বারা জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেইরূপেই বাষ্পীয়

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

যন্ত্র, ঘড়ী ও তাড়িতবার্ত্তাবহ প্রভৃতি সংসারের মহা শুভদায়ক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। যে সকল বিষয় উপরে উল্লেখ করা গেল, তাহার এক একটির অনুমান কল্পনায় চিন্তাশীল লোকে যে কত-দূর কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। 'ব্রিটিস-কমার্শ' নামক গ্রন্থে কিয়ৎ পরিমাণে ইহার বর্ণনা আছে।

চিন্তাই আমাদিগের সর্ব্বোন্নতির মূল। কিন্তু আবার সেই চিন্তাই ব্যক্তিবিশেষের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া উঠে। চিন্তাশীল মিল্‌টন্ অদ্ভুত চিন্তাশক্তির প্রভাবে 'প্যারাডাইজ্‌লষ্ট' রচনা করিয়া আধুনিক কবিকুলকে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়া যান। আবার ট্রয়ের যুবরাজ পেরিস কৌশলে হেলেনাকে হরণ করিয়া কুচিন্তার পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়াছেন। পেরিসও চিন্তাশীল লোক ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হেলেনা-হরণ সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল। চিন্তাশীল লোকের সম্মুখে যাহা পতিত হয়, তদ্দ-র্শনেই তাঁহার মনে চিন্তার তরঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা একখানি চেটাইয়ের উপর যদি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করি, তাহা হইলে কতদূর ভাবিয়া যাইতে হয় বিবেচনা করিয়া দেখ—লোকে চেটাই প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল কেন, প্রয়োজনের নিমিত্তই একার্য্যের অনুমান ও কল্পনা হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে চেটাইয়ে রাজাধি-রাজ শয়ন করিয়াছেন, এখন তাহা অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট বিছানা প্রস্তুত হওয়ায় আমরা পূর্ব্বপ্রস্তুত চেটাইকে এখন চরণে দলন করিয়া থাকি।

কতকগুলি চিন্তাশীল লোক একত্রিত হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করেন, যাহা না হইলে সংসারে এতদূর জ্ঞানের উন্নতি হইত না। অন্য আর এক দিকে কতকগুলি দুষ্টবুদ্ধি লোকের অনুমান ও কল্প-

নায় চুরি ও ডাকাতির কত কৌশল বিস্তারিত হইয়াছে এবং হই-তেছে। পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বর মনকে সর্ব্বদা চিন্তার সাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। সুচিন্তাই হউক বা কুচিন্তাই হউক, মন মুহূর্ত্তকাল চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তবে শিক্ষিত মনের চিন্তাই সংসারের মঙ্গলের কারণ হয়, ও অশিক্ষিত মনের চিন্তাই আত্মপীড়ক ও পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহারা সুশিক্ষা পাই-য়াছেন, তাঁহারা কিসে সেই শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করিবেন, সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকেন। কিসে রাজদ্বারে প্রতিপন্ন হইব, কিসে জন-সমাজে মাননীয় হইব, কিসে অর্থ উপার্জ্জন হইবে, কিসে পরিবার-বর্গকে সুখী করিব, কিসে জনসমাজের মঙ্গল করিব, পর্য্যায়ক্রমে এই সকল চিন্তাই তাঁহাদের মনে উদয় হইয়া থাকে। যাহারা অশিক্ষিত এবং নিয়ত অসৎ সংসর্গে কালহরণ করে, তাহাদিগের চিন্তা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহারা ঘোর হিংসক, তাহাদিগের মনে সর্ব্বদাই লোকের অনিষ্ট চিন্তারই উদয় হয়। যাহারা আইন আদালতে ফেরে, শয়নে স্বপনে কিসে সজ্জনে সজ্জনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে, এই তাহাদিগের চিন্তা। যে সিঁদ কাটিয়া চুরি করে, সে অমুকের গৃহে সিঁদ কাটিয়া কি প্রকারে নিরুদ্বেগে যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিবে, এই তাহার চিন্তা। যে ব্যক্তি দীন দরিদ্র, সে কোথায় দানশীল লোকের বাড়ী ক্রিয়াকাণ্ড হইবে, সর্ব্বদাই এই চিন্তায় রত থাকে। যাহারা নিষ্কর্ম্মা পরের সাহায্যে উদরপোষণ করে, তাহারা কোথায় তাস খেলিব, কোথায় পাশা খেলিব ও কিপ্রকার কৌশলে অদ্যকার বাজী জিতিয়া আসিব, এইরূপ অলীক আমোদের চিন্তাতেই তাহাদের মন রত থাকে। যাঁহারা চিকিৎসাব্যবসায়ী, তাঁহাদিগের সর্ব্বদা চিন্তা এই যে, সংসারে রোগের প্রাদুর্ভাব হউক, কিন্তু চিকিৎসাদ্বারা লোকে আরোগ্যলাভ করুক।

ইহা অপেক্ষাও লোকের জঘন্য চিন্তা আছে—অর্থাৎ অগ্রদানি ভাট ও মুর্দ্দফরাসেরা লোকের মৃত্যু চিন্তা করিয়া থাকে। ধনীরা কিসে ধনবৃদ্ধি করিব, এই চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছেন। কিন্তু যাঁহারা একাগ্রচিত্তে চিন্তামণির চিন্তা করেন, তাঁহাদের সেই চিন্তাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সকল দেশের সকল শাস্ত্রকারেরাই ঈশ্বরচিন্তাকে নির্ম্মল চিন্তা কহিয়াছেন। কোন চিন্তাই নির্ম্মল নহে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে সর্ব্ব অধিকারের সকল চিন্তাতেই সর্ব্বতোভাবে মনের তুষ্টিবর্দ্ধন ও শান্তিলাভ হয় না; কেবল এক ঈশ্বরচিন্তাই আনন্দের মূল। যাঁহারা বিশিষ্টবিধানে জ্ঞানোন্নতি করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক বিষয়ে ন্যায়ানুগত চিন্তাদ্বারা মনকে পরিতুষ্ট রাখিতে পারেন সত্য, কিন্তু তথাচ তাঁহাদিগের সে চিন্তাতেও অনেক মলা আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ চিন্তার উপর স্থূল স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করা গেল। যদি বাহুল্যবিস্তারে লেখা যায়, তাহা হইলে একটি প্রকৃতি বা পুরুষের মানসিক চিন্তার সবিশেষ বর্ণন করিতে গেলে লেখনী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শকুন্তলার সহিত যখন রাজা দুষ্মন্তের পূর্ব্ব অনুরাগ উপস্থিত হইল, তখন উভয়ের মনে কিরূপ চিন্তার তরঙ্গ হইয়াছিল অনুমান করিয়া দেখ। একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, তাহা না হইলে সে চিন্তার কণামাত্র ভাবিতে পারিবে না। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে একবারমাত্র চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি একেবারে সেই অজ্ঞাতকুলশীল যুবাপুরুষের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। দুষ্মন্ত নয়নের অন্তরাল হইলে তিনি বিরহ-বেদনায় অস্থির হইয়া কুটীরাভ্যন্তরে পদ্মপত্রশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার সখীরা কখনও তাঁহাকে ভাবনাযুক্ত দেখে নাই, হঠাৎ তাঁহার এই ভাবান্তর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। তিনি

আজীবনকাল মুনিকুটীরে বর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। কেবল অতিথিসেবা, মৃগশাবক লইয়া ক্রীড়া ও পুষ্পবাটিকায় জলসেচন করিতে জানিতেন। এতদ্ভিন্ন আর কোনও চিন্তাই তাঁহার মনে স্থানপ্রাপ্ত হইত না। অদ্য এক পরপুরুষদৃষ্টে তাঁহার মনে চিন্তার তরঙ্গ বহিতে লাগিল। যাহা কখনও মনে ভাবেন নাই ও ভাবিতে শিক্ষাও করেন নাই, সেই ভাবনা তাঁহার কোমল হৃদয়কে আকুলিত করিতে লাগিল। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেই দিকেই দুষ্মন্তের মনোহর মূর্ত্তি দেখিতেছেন! আবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া কল্পনা করিতেছেন, —"সেই পুরুষটি কেন আমার এই পর্ণশালায় আসিয়া বসুন না, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য চলিয়া গেলেন? আমি যে তাঁহার অদর্শনে চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি—তিনি কি ইহা জানিতে পারিতেছেন? জানিতে পারিলে অবশ্যই আমার নিকটে আসিয়া আমার এই অসহ্য যন্ত্রণা দূর করিয়া দিতেন। অনুমানে বোধ হইতেছে, তিনি রাজরাজেশ্বর হইবেন। পিতার মুখে শুনিয়াছি, রাজারা অত্যন্ত স্বার্থপর ও নিতান্ত পরপীড়ক। পরদুঃখে তাঁহারা কোনকালেই কাতর হন না, তবে এরূপ ভয়ানক লোকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম কেন? আমি ত ইচ্ছা পূর্ব্বক করি নাই, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্রই মন যে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল—আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মনের গতিরোধ করিতে পারিলাম না। আমি সরলা মুনিকন্যা, ভালমন্দ কিছুই বুঝি না, কেবল মনই আমাকে মাতাইয়া তুলিল। জানিলাম, মনই সর্ব্ব অনিষ্টের মূল—মনের বাসনা পূর্ণ হইতেছে না বলিয়াই সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, মন, অধৈর্য্য হইয়াছে বলিয়াই আমার সর্ব্বশরীর অধৈর্য্য হইয়াছে। মনকে আয়ত্তে রাখিতে পারি নাই বলিয়াই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলই আমার অবাধ্য হইল। ইহারা

সকলেই মনের ক্রীতদাস, মন যাহা করে চিরকাল সেই বিষয়েরই সহায়তা করিয়া থাকে। সেই পুরুষকে কে চিন্তা করিতেছে? মনই তাঁহাকে ভাবিতেছে। তবে আমি কষ্ট ভোগ করি কেন? মনে এবং আমাতে কি কিছুই প্রভেদ নাই? মনই কি আমি? আমি কি জন্য তাঁহাকে ভাবিতেছি? তাঁহার সহিত পূর্ব্বে আমার কখনও পরিচয় ছিল না, তিনি কোনকালে আমার কোন উপকার করেন নাই, করিবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই, পুনর্ব্বার যে তাঁহার দর্শনলাভ হইবে তাহাও দুরাশা বলিয়া ধরিতে হয়, তবে আমি তাঁহার হইলাম কেন? আমার প্রাণের সখীগণকে যে আজ ভাল লাগিতেছে না। পাছে তাহারা এ সময়ে কাছে আসিয়া বিরক্ত করে, এই ভয়ে আকুলিত হইয়া উঠিতেছি—এ কি আশ্চর্য্য কথা! সখীরা যে আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তাহাদিগকে আজ অনাদর করিয়া সেই সুপুরুষকে মনে মনে আদর করিতেছি কেন? আপনা আপনি যে ইহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। সখীগণ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কি হইয়াছে?' তাহা হইলে আমি কি বলিব? আমার ত কিছুই হয় নাই, কিন্তু মন যে বলিতেছে আমার কিছু হইয়াছে। আমি পূর্ব্বের মত আর প্রকৃতিস্থ নহি, হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে, শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে, এবং সেই পুরুষকে পুনর্ব্বার কি প্রকারে দেখিতে পাইব, সেই ভাবনাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া কি হইবে, তাহা ত কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারি না। তবে মন সেই পুরুষ-রত্নকে দেখিবার জন্য এত ব্যগ্র কেন? এ কথার মীমাংসা নাই, এ চিন্তার হেতু নাই, তবু ভাবিতেছি। যত ভাবিতেছি, ততই নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতেছে—এ কি

ভাবনা ? একজন পথপ্রদর্শক পাইলে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমি সেই পুরুষ-রত্নের নিকট অনায়াসে গমন করিতে পারি— যে পিতা আমাকে আজন্ম প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহার অনুমতিরও অপেক্ষা করি না। এখন আমি আর কাহারও নহি, একেবারে তাঁহার হইয়া গিয়াছি।”

শকুন্তলা এইরূপ ভাবিতেছেন, এ দিকে দুষ্মন্ত একবার মাত্র মুনিকন্যাকে দর্শন করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া কামিনীর সেই কমনীয় মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই রূপসাগরে ডুবিয়া পড়িয়াছিলেন, বাহ্যজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল, পশ্চাতে সৈন্যসামন্ত ও রথরথী আছে, তাহা কিছুই মনে ছিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে আপনা আপনিই চমকাইয়া উঠিলেন। সেই চমকের সহিত তাঁহার মনে ভাবনার তরঙ্গ উপস্থিত হইল। ভাবিলেন—“কি করিতেছি ? ঋষিকন্যার প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছি! পুরুবংশের কুলাঙ্গার হইবার উপক্রম করিতেছি! আমার শিক্ষিত মন এরূপ অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইল কেন ? যে নিধি প্রাপ্ত হইবার কোনও আশা নাই, তাহার প্রতি লোভ করিয়া নরাধমেরাই আপনার মনকে কষ্ট দিয়া থাকে। ঋষিকন্যার প্রতি অনুরাগ!—ইহা ভাবিতেও আপনা আপনি লজ্জাবোধ হইতেছে। তবে আর বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি কেন ? কোথায় সৈন্যসামন্ত গমন করিল, তাহার অন্বেষণ করিতে যাই—দেখি দেখি, আর একবার দেখি, দেখিতে কোনও বাধা নাই, এইবার মুনিকন্যাবোধে ভক্তিভাবে দেখিব। না না, ইনি মুনিকন্যা কখনও হইতে পারেন না। আমি ত অনেক মুনিকন্যা দেখিয়াছি—বোধ হয় বনদেবী আমাকে ছলনা করিবার জন্য
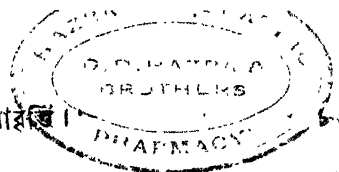
তপোবনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যদি আপনি বনদেবী হন, তবে আপনাকে নমস্কার। কি পাগলের মত ভাবিতেছি, এত লজ্জার প্রয়োজন কি? অদ্য যদি আমি মহামুনি কণ্বের আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করি? মুনিবর আপাততঃ আশ্রমে উপস্থিত নাই এই কন্যাত্রয়ই অবশ্য আমার অতিথিসৎকারে নিযুক্তা হইবেন, সেই সুযোগে ইহাঁদিগের পরিচয় লইতে পারিব। এমন উত্তম উপায়, সত্ত্বেও আমি নির্ব্বোধের ন্যায় এই বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি! যদি যথার্থই মুনিকন্যা হন, তাহা হইলে মন আপনা আপনিই ধৈর্য্য ধারণ করিবে। কারণ আকাশকুসুমের জন্য মন কখন উতলা হয় না।" এই কথা বলিয়া দুষ্মন্ত সাহস করিয়া শকুন্তলার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এস্থলে নায়কনায়িকার চিন্তা স্বতন্ত্র ভাব ধারণ করিল। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে পুনর্ব্বার দেখিবা মাত্রই আস্তেব্যস্তে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন, এবং অর্ঘ্যপাত্রহস্তে রাজাধিরাজের সম্মুখে শির অবনত করিয়া কহিলেন—"হে মহাভাগ! পিতা আশ্রমে উপস্থিত নাই, অতিথিসৎকারের জন্য আমাকেই আশ্রমে রাখিয়া গিয়াছেন, অতএব অর্ঘ্যগ্রহণান্তে আসন পরিগ্রহ করুন।" দুষ্মন্ত হাস্য করিয়া অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য দক্ষিণহস্ত বিস্তার করিলেন। শকুন্তলা তাঁহার হস্তে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "ইনি যখন আতিথ্যস্বীকার করিলেন, তখন পিতার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই আশ্রম পরিত্যাগ করিবেন না। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সখীদিগের দ্বারা সুযোগ করিয়া ইহাঁর পরিচয় লইতে হইবে। যদি ইনি রাজকুলোদ্ভব হন, তাহা হইলে অনেক অংশে আশ্বস্ত হইতে পারিব। পিতা এক দিন সখীগণকে বলিয়াছিলেন যে, 'শকুন্তলার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে, ইহাকে

আমি বহুযত্নে লালনপালন করিয়াছি, এক্ষণে সৎপাত্রের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই।' ইনি যদি সৎকুলোদ্ভব হন, তাহা হইলে ইহাঁ অপেক্ষা আর সৎপাত্র কোথায় পাইবেন?" শকুন্তলা এইরূপ ভাবিতেছেন, এদিকে দুষ্মন্ত আসন পরিগ্রহ করিয়া শকুন্তলার একটি সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনিপত্নীও কি আশ্রমে নাই? মহর্ষি কণ্ব কি সস্ত্রীক তপ আচরণে গমন করিয়াছেন?" শকুন্তলার সখী কহিল, "আপনি কি বলিতেছেন?—মুনিবর ত দারপরিগ্রহ করেন নাই।"

দুষ্মন্ত মনে মনে কহিলেন, "মন, আশ্বস্ত হও, একটু স্থির হইয়া শ্রবণ কর, উতলা হইও না।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তবে তিনি এ কন্যারত্ন কোথায় পাইলেন?" সখী কহিল, "এটি মহামুনির পালিতা কন্যা, অপ্সরা মেনকার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল।" এই কথা শ্রুতমাত্রেই দুষ্মন্তের সর্ব্বশরীর সাত্বিকভাবে কাঁপিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলেন, "আমি এ কন্যারত্ন লাভে কখনই বঞ্চিত হইব না, ইহাঁর জন্য মহামুনিকে অনুরোধ করিতেও প্রস্তুত আছি।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, শকুন্তলা তাঁহার সম্মুখে নাই। সখীগণকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল, "সখী আমাদের অসুস্থাবস্থায় পদ্মপত্র শয্যায় শয়ানা আছেন।" রাজা কহিলেন, "জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার কি অসুখ হইয়াছে? আমার দ্বারা তাঁহার কোনও উপকার হইতে পারে কি না?" সখীগণ হাস্য করিয়া কহিল, "আপনিই তাঁহার রোগের কারণ, এবং আপনিই তাঁহার মহৌষধ। আপনি আমাদিগের রাজা, আপনা হইতেই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইয়া থাকে। আপনার সম্মুখে আমাদিগের সখীকে যে উৎকট
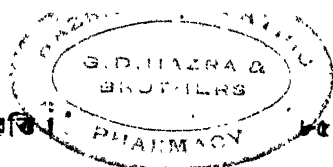
ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে, তাহার উচিত দণ্ডবিধান করুন, নতুবা এ নিদারুণ ব্যাধি সখীকে বর্ণনাতীত কষ্ট দিবে।” দুষ্মন্ত কহিলেন, “যদি আমা হইতে তোমার সখীর ব্যাধির উপশম হয়, তাহা হইলে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত আছি।” এখানে নূতন চিন্তার আর একটা হেতু উপস্থিত হইল। শকুন্তলা ভাবিতে লাগিলেন, “সখী ত এক প্রকার সমস্ত বলিয়া ফেলিল, এ যথার্থ কথাই বলিয়াছে। যদি ঐ মহাভাগ আমার শয্যায় আসিয়া উপবেশন করেন, তাহা হইলে ক্ষণকালের মধ্যেই আমি নির্ব্যাধি হইতে পারি। এ এক নূতন ব্যাধি, সুপুরুষ চক্ষে দেখিলেই বুঝি স্ত্রীলোকের শরীরে এ ব্যাধি উপস্থিত হয়। আর এক আশ্চর্য্য এই, মধ্যে ইহাঁকে না দেখিয়া বরং ছিলাম ভাল, পুনরায় দর্শন করিয়া অবধি আরও অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছি।” শকুন্তলা এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে আর একজন সখী কহিল, “সখি! মহারাজ তোমার ব্যাধির উপশম করিতে প্রস্তুত আছেন, এইরূপ চিকিৎসকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সাহস হয় কি?” এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা, স্ত্রীসুলভ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, “সখি! তোরা আমাকে বড় বিরক্ত করিতেছিস্—তোদের জ্বালায় কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আমি একটা বৃক্ষতলে গিয়া শয়ন করি। সহাস্যে সখী কহিল, “তুমি যাইবে কেন ভাই? আমিই এস্থান হইতে দূর হই,” এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে কুটীরের অনতিদূরস্থিত একটি পুষ্পবাটিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। *

পাঠকগণ! যদি চিন্তাশীল হইতে চাহ, তাহা হইলে সখীদ্বয় অন্তরালে গমন করিলে, যুবক যুবতীর মনে কিরূপ চিন্তার তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল, চিন্তা করিয়া দেখ। পদ্মপত্র শয্যায় শয়ানা

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে নির্জ্জনে কুটীরে পাইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি কে, কোথায় আছেন, কি জন্যই বা ভাবিতেছেন; তাহা কিছুই অনুধাবন করিতে পারেন নাই। সখীগণ চলিয়া গিয়াছে, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াও চৈতন্যসম্পাদন হইলে, চাতুরীযুক্ত কথা কহিলেন, 'সখি! আমার-পিপাসা হইয়াছে, একটু জল দাও।' দুষ্মন্ত কুটীরাভ্যন্তরে গিয়া কহিলেন, "এখানে আর কেহ নাই, এই জন্য আমিই তৃষিতা চাতকীকে জলদান করিতে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা নয়নোন্মিলন করিয়া দুষ্মন্তের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, দুই চক্ষে দুইটি জলধারা বিগলিত হইল। স্ত্রীলোকেরা যদিও পদে পদে অধৈর্য্যতার লক্ষণ প্রকাশ করে, কিন্তু প্রাণ বিয়োগ হইলেও ধৈর্য্যচ্যুত হয় না। দুষ্মন্ত শকুন্তলার চক্ষে জল দেখিয়া আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। গাত্রে করার্পণ করিলেন, এবং 'তুমি রোদন করিতেছ কেন? কি হইয়াছে বল,' এই কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করায় শকুন্তলা নিরুত্তরা হইয়া রহিলেন। সে যাহা হউক, উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নির্জ্জনে থাকিয়া গান্ধর্ব্ববিবাহের পর প্রকৃতিস্থ হইলেন সত্য, কিন্তু তাহার পর উভয়ের মনে একেবারে ভয় ও লজ্জাযুক্ত চিন্তার স্রোত বহিতে লাগিল। যে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি আর রাজার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না, লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। দুষ্মন্তও আস্তেব্যস্তে কুটীরের বাহিরে আসিয়া মৃগচর্ম্মে উপবিষ্ট হইলেন, কণ্বের অনভিমতে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া ভয়ে শরীর কাঁপিতে লাগিল। যখন কন্দর্পশরে আহত হইয়াছিলেন, তখন সে ভয় মনে কিছুই ছিল না। এক্ষণে ব্রাহ্মণের
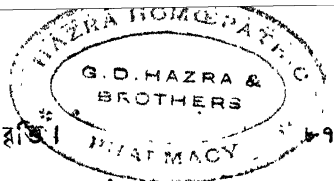
HAZRA HOMŒOPATHIC
G. D. HAZRA &
BROTHERS
PHARMACY

কোপানল স্মরণ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কি কুকর্ম্ম করিলাম! জানি না, বিধাতা আমার আজ কি দশা ঘটাইবেন। মুনির আগমন প্রতীক্ষা করা আমার নিতান্ত যুক্তিযুক্ত ছিল, এক্ষণে অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে তাহাই ঘটিবে, আর অনর্থক চিন্তা করিতে পারি না। যদি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখিতাম, তাহা হইলে এ সময়ে লজ্জাভয়ে আকুলিত হইতে হইত না। আর এখানে থাকা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। আমাকে সম্মুখে দেখিলে মহামুনির ক্রোধ সমধিক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে কটাক্ষ-পাতেই ভস্ম হইয়া যাইব।" পলায়ন করাই যুক্তিসিদ্ধ ভাবিয়া দুষ্মন্ত সবিনয়ে শকুন্তলাকে কহিলেন, "প্রিয়তমে! আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম, যদি দেবতা অনুকূল হন, তাহা হইলে অতি সত্বরেই তোমাকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া পাটেশ্বরী করিব।" এই কথা বলিয়াই অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, সখীগণের নিকট বিদায়গ্রহণ করিবারও অপেক্ষা করিলেন না। দুষ্মন্ত প্রস্থান করিলে পর শকুন্তলার একেবারে মনের শান্তি ভঙ্গ হইল। 'কি করিলাম, কি হইল এবং ভবিষ্যতেই বা কি হইবে,' এই চিন্তানলে মনের অভ্যন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, 'পিতার আগমনের পূর্ব্বেই আমি জলপ্রবেশ করি, তাহা হইলে মহারাজের কোনও অনিষ্ট হইবে না, পিতা ভাবিবেন, আমি দৈবাৎ জলে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছি।' আবার ভাবিলেন, 'তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, হয় ত ইতিমধ্যেই আমাদিগের এই পরিণয়ের কথা সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন।' শকুন্তলা এইরূপ অবস্থায় অবস্থিত, এমন সময়ে সখীরা আসিয়া ব্যঙ্গোক্তি আরম্ভ করিল। শকুন্তলা কহিলেন, 'সখি! ক্ষান্ত হও, যদি পিতার ক্রোধানল শীতল করিতে পার, তাহা হইলে অনেক পরিহাসের সময় পাইবে।'

প্রণয়সম্বন্ধের কোন্ অবস্থায় কিরূপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, শকুন্তলা-উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া তাহার তিনটি স্থল দর্শান হইল। প্রথমতঃ, পরস্পারের দর্শনের পর পরস্পারের মনে অনুরাগ সঞ্চার হইলে কিরূপ চিন্তার উদয় হয়। দ্বিতীয়তঃ, উভয়ের মিলনের সময়ই বা কিরূপ চিন্তার তরঙ্গ উঠে। তৃতীয়তঃ, মিলনের পর গুরুজনের ভয় উপস্থিত হইলেই বা মনের কিরূপ ভাবান্তর হয়। তাহা তিন স্থলে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করা গিয়াছে। শকুন্তলা-উপাখ্যানসম্বন্ধে যদি নায়কনায়িকার মনের চিন্তা সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে পাঠকগণ ধৈর্য্য রাখিয়া পড়িতে পারিবেন না, এই জন্যই সংক্ষেপে শেষ করা হইল। নায়কনায়িকাঘটিত চিন্তার বিষয় স্থানে স্থানে অতি রমণীয় হয় বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যার পর নাই অসংলগ্ন হইয়া পড়ে; এই জন্য সর্ব্বস্থানে পবিত্রতা রাখিতে পারা যায় না। ধনহীনের ধন-চিন্তা, পুত্রহীনের অপত্যচিন্তা, রোগীর রোগশান্তির চিন্তা এবং হৃতবিষয়ের পুনরুদ্ধারচিন্তা কষ্টকর বটে, কিন্তু প্রণয়চিন্তায় যত-দূর মনকে আকুলিত করে, এবং অসংলগ্নচিন্তায় নিমগ্ন করে, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া অবস্থা-ভেদে নানা চিন্তায় চিন্তিত হইতে হয়, তন্মধ্যে সংসারে অপ্রতুল ঘটিলে গৃহস্বামীর মনে যে একরূপ চিন্তা উপস্থিত হয়, সে চিন্তা উন্নতশ্রেণীর ধনবান্ লোকেরা চিন্তা করিয়াও মনে আনিতে পারেন না। কোন পুস্তকেও তাহার সবিশেষ বর্ণনা নাই। তবে প্রণয়-চিন্তা নরনারীর মনে কতদূর বলবতী হয়, তাহা কাব্য নাটকাদিতে অনেকেই পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন। যেরূপ পাঠ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাও অনেকে ভুক্তভোগী আছেন। তবে এক ব্যক্তির
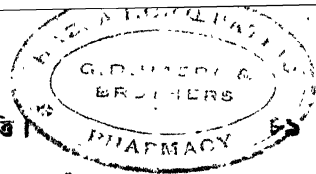
মানসিকচিন্তা বাহুল্যরূপে বর্ণনা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। যেমন শকুন্তলার উপাখ্যানে চিন্তার স্থল পৃথক্ পৃথক্ দর্শান হইয়াছে, তেমনি সকল নরনারীরই অবস্থাভেদে নানা চিন্তা আসিয়া হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। একজন বহুকষ্টে বহু বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রীতিমত বিষয়কার্য্য ঘটিয়া উঠিতেছে না—এরূপ অবস্থায় সে ব্যক্তির চিন্তা কিরূপ তাহা বর্ণন করিতে গেলে কতদূর অসংলগ্ন কথা কহিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিছুকাল পরে বোধ কর সেই ব্যক্তির উপযুক্ত একটি বিষয়কার্য্য উপস্থিত হইল। রজনী প্রভাত হইলে তিনি সেই পদে উপবেশন করিবেন, সেই রজনীতে তিনি কিরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হন, তাহাও অত্যন্ত রহস্যজনক। তাঁহার মনে পর্য্যায়ক্রমে হর্ষ ও বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন ভাবেন কল্য আমি উচ্চপদে উপবেশন করিব, তখন সেই উচ্চপদের গৌরবগুলি ভাবিয়া মনকে আহ্লাদিত করিয়া তুলেন। আবার যখন ভাবেন যদি আমি সে কার্য্য চালাইতে না পারি, হাস্যাস্পদ হইয়া কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হয়, তখন তাঁহার মন ভয়ে আকৃষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপ হরিষবিষাদযুক্ত চিন্তায় তিনি যে প্রকারে রজনীযাপন করেন, তাহার কিয়দংশ লিখিলেও একখানি পুস্তক হইয়া উঠে। "যে দিবস ইংলণ্ডের তৃতীয় জর্জ্জ মৃত্যুশয্যায় শয়ান আছেন,' সেই সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র জর্জ্জ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'পিতার মৃত্যুর পর কিরূপে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব এবং কিরূপে দম্ভের সহিত রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিব,' তাঁহার বাহুল্যবিস্তারে 'মিষ্ট্রিস্ অব্ দি কোর্ট অব্ লণ্ডনে' বর্ণনা আছে। সেগুলি পাঠ করিলে যুবরাজ জর্জ্জকে পাগল বলিয়া বোধ হয়; আর রাজসন্তানগণের পিতার প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাভক্তি ও তাঁহারাই বা কতদূর

স্বার্থপর তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্যের মনের চিন্তা যদি সমুদয় লিপিবদ্ধ হইত, এবং পরস্পর পরস্পরের মনের কথা জানিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় এ সংসারে কেহ কাহারও মুখাবলোকন করিত না। কারণ কোন গ্রন্থে বর্ণনা আছে, এক পুত্রশোকাতুরা জননী পুত্রশোকে অধৈর্য্য হইয়া ভূশয্যা-শয়ান আছেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছেন, "আমার একটি পুত্র তাহাও মরিল, দিদীর চারিটি ছেলে তাহার একটিও মরিল না। এখন যদি তাহার চারিটি পুত্র এক একটি করিয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে আমার শোকের সমতা হয়।" পুত্রশোকাতুরা জননী অন্যের অপত্যের প্রতি যার পর নাই ঈর্ষ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই সকল মনের চিন্তা যদি অন্য ভগিনীরা জানিতে পারিত, তাহা হইলে পরিবারমধ্যে কি বিশৃঙ্খলা ঘটিত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। মনুষ্য-চিন্তার লজ্জা নাই, ভয় নাই, স্থান নাই, অস্থান নাই এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অধ্যবসায়, অভিনিবেশ, অনুমান ও কল্পনা এই চারিটি চিন্তার অঙ্গ। যেমন স্রোতস্বতী নদীর দুই ধারে দুইটি সুদৃঢ় কূল থাকে, সেই জন্যই নদীর জল সর্ব্বত্র প্লাবিত করিতে পারে না; সেইরূপ চিন্তারূপ স্রোতস্বতীর কল্পনা ও অনুমান এই দুইটি তরঙ্গ ও তুফান। এই চিন্তা-স্রোতস্বতীর দুই পার্শ্বে যদি অধ্যবসায় ও পর্য্যবেক্ষণরূপ দুইটি কূল না থাকিত, তাহা হইলে চিন্তার অনুমান ও কল্পনা মনুষ্যের মনে স্থান-প্রাপ্ত হইত না, উছলিয়া পড়িত।

শোককালীন চিন্তা ও অভিলোভের সহিত অর্থোপার্জ্জনের চিন্তা এবং পূর্ব্বরাগের উপক্রমকালীন চিন্তার আদ্যমূল বুঝিয়া উঠা ভার। সেই সকল চিন্তার দুই পার্শ্বে অধ্যবসায় ও পর্য্যবেক্ষণ

PHARMACY
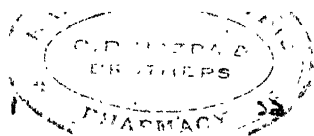
থাকে না, কেবল অনুমান ও কল্পনাই সেই চিন্তার একমাত্র অঙ্গ হয়। আসন্ন বিপদ্‌কালের চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা আরও আশ্চর্য্য। যেখানে দৈব অনুকূল ব্যতিরেকে আর নিস্তারলাভের কোনও উপায় থাকে না; সেখানে ঘোর নাস্তিকেরাও দেবতার শরাপন্ন হন। যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক গঙ্গাতীরস্থ হন, মরিবার দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি যে কি প্রকার চিন্তা করেন, তাহা আমরা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না; যে হেতু অনুমান ও কল্পনাদ্বারা তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। সকল বিষয় ভাবিতে পারা যায়, কেবল মরণকালীন চিন্তা বাহুল্যবিস্তারে ভাবিতে পারা যায় না। সে বিষয় অধ্যবসায়ের সহিত ভাবিতে বসিয়া দেখা গিয়াছে যে, সে ভাবনার পথে অনেক প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়ে। কোন চিন্তা-শীল লোক মিথ্যাভাবনা ভাবিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এই জন্য একখানি পুস্তকে প্রাত্যাহিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা করেন। এক দিবস একখানি পেনকাটা ছুরি হস্তে লইয়া নখ কাটিতে কাটিতে চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন। হঠাৎ চৈতন্য হওয়ায় দেখিলেন যে, তিনি ওয়াটরলুর যুদ্ধে আহত সৈনিকগণের ভগ্নশরীরে ঔষধ লেপন করিতেছেন, ও কাঁচিদ্বারা তাহাদের মাংস কাটিতেছেন। চৈতন্যসম্পাদনের পরে একটু হাস্য করিলেন, এবং ভাবিলেন যে, "অনর্থকচিন্তা হইতে মনকে বিরত করা মনুষ্যেরা সাধ্যায়ত্ত নহে! আমি একখানি ছুরি দিয়া নখ কাটিতে কাটিতে ওয়াটরলুর রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম কেন? এখন বুঝিতে পারি-লাম, স্বপ্নে যেমন আমরা অলৌকিক ও অসংলগ্ন কার্য্য করি, অনর্থক-চিন্তাও সেইরূপ—ইহাকে জাগ্রত অবস্থার স্বপ্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোথাকার চিন্তা কোথায় গিয়া পড়ে, যদি তাহার আদ্য-

মূল স্মরণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আপনা আপনিই হাস্য করিতে হয়।”

চিন্তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিষয় সংক্ষেপে এক প্রকার বলা হইল, এক্ষণে কুচিন্তাও সুচিন্তার বিষয় বিবৃত করা হইতেছেঃ—যদি আমরা সৎসঙ্গে থাকি, সৎকথার আলোচনা করি ও অধ্যবসায়ের সহিত বিশিষ্ট বিদ্যা অর্জ্জন করি, তাহা হইলে চিন্তার স্রোত সুপথেই বহিয়া থাকে। যদি অসৎসঙ্গ করি ও অসৎকথা শ্রবণ করি-অসতের ন্যায় আচরণ করি, তাহা হইলে অসৎচিন্তাই বলবতী হইয়া উঠে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ, যাঁহারা সৎপথাবলম্বী তাঁহারা সৎচিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া সৎকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন। এই সংসারে যে সকল কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই সৎচিন্তার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। আর যে সকল অসৎকীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অসৎলোকের অসৎচিন্তার ফল। কতকগুলি অসৎলোক একত্রিত হইয়া বহুকাল নানা কুচিন্তার পর, রুসিয়ান্ সম্রাটের জীবন নাশ করিল। একজন সম্রাটকে মারিবার জন্য তাহারা যে কতদূর চিন্তা করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়াও মনে আনিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে দেখ, সৎচিন্তাশীল লোকেরা ভারতবর্ষের কত স্থানে অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে মনুষ্যের চিন্তার ইয়ত্তা নাই, তবে সেই চিন্তা যাহাতে আত্মপীড়ক না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। কতকগুলি আত্মপীড়ক চিন্তার কারণ আমরা আপনা আপনি উদ্ভাবন করি যথা—প্রণয় ও বিচ্ছেদ, দুর্বুদ্ধি বশতঃ কলহ করা, কথায় কথায় মামলা মোকদ্দমা করিয়া তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য দিবারাত্র চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকা, ঈর্ষাবশতঃ বৈরনির্যাতনের চিন্তা আত্মপীড়ক

হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি চিন্তা দৈব কর্ত্তৃকও উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, যেমন প্রিয়বন্ধু-বিচ্ছেদজনিত শোকের চিন্তা, উৎকটরোগে প্রপীড়িত হইয়া মরণ ভয় চিন্তা ইত্যাদি। মনুষ্যকে অকারণ চিন্তা করিতেই হইবে, কোন ক্রমেই তাহা নিবারণ করা যাইবে না। এই জন্য মুনি ঋষিরা কেবল ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকিয়া অন্য চিন্তা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেন। আমরা তাহা সহজে পারিব না, কারণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে গিয়া অন্য দিকে সে চিন্তা ধাবিত হয়। বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া আমরা কি প্রকারে অনর্থক চিন্তা করিতে বিরত হইব, যেহেতু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এক চিন্তাদ্বারাই মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছেন। মন কখন স্থির থাকিবার নহে, সর্ব্বদা একটা না একটা চিন্তা লইয়া আছে, এইজন্য মনে কখনও কুচিন্তাকে স্থান দিও না, ও মনকে উচিত কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলে অনেকাংশে অনর্থক চিন্তা হইতে নিস্তার লাভ করিবে।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ক্রম্বি—স্মরণ, বিবেচনা, ইচ্ছা ও চিন্তা এই চতুর্ব্বিধ শক্তিধরকে মন বলিয়াছেন। আমরাও তাঁহার সেই মত বলবৎ রাখিয়া মনের ঐ কয়েকটি শক্তির বিষয় বর্ণনা করিলাম। আপাততঃ মনের অন্যান্য বৃত্তির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া ষড়রিপুর বিষয় লিখিতে অগ্রসর হইতেছি ; কারণ রিপু কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া দেহরাজ্যে মন কিরূপ কার্য্য করেন, তাহা না লিখিলে মনের অন্যান্য বৃত্তির প্রকৃত ভাব ও কার্য্য পাঠকগণকে বাহুল্য বিস্তারে বুঝাইতে পারিব না।

ষড়রিপু।

—০০—

লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুকে প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাদের লিখিত পুস্তকের প্রতিপংক্তিতেই মনুষ্যের পরম শত্রু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ বা এ ষড়রিপুকে মহিষ জ্ঞানে জ্ঞান-অসিদ্বারা আপন ইষ্টদেবী কালীর সম্মুখে বলিদান দিতেছেন, কখন বা ঐ রিপুগণকে ঘৃতাক্ত করিয়া জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দিতেছেন, কখন বা ঐ ষড়রিপুকে তস্কররূপে বর্ণনা করিয়া আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ষড়রিপুর দোষের ভাগই সকলে ধরিয়া গিয়াছেন, গুণের ভাগ কেহই গ্রহণ করেন নাই। স্বভাব দত্ত এই ছয় প্রকার তরঙ্গ মনুষ্য শরীরে না থাকিলে সংসার অরণ্যময় হইয়া থাকিত।

লোভ—লোভ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? প্রাপ্তি অভিলাষ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। এই প্রবল প্রাপ্তি ইচ্ছা কাহার? অবশ্য মনের বলিতে হইবে। লোভ একটা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। এই সংসারে যত প্রকার অনিষ্ট ঘটে, তন্মধ্যে প্রায় অধিকাংশের কারণ একমাত্র লোভ, লোভের কারণেই লোক সঞ্চিতার্থ নষ্ট করে, লোভ পরবশ হইয়াই লোকে দুর্গম পথের পথিক হয়, লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই লোক অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অন্য কি কথা, একমাত্র লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কতশত লোক মহামূল্য জীবনধন ও নষ্ট করিয়াছে। মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন—

[library stamp]
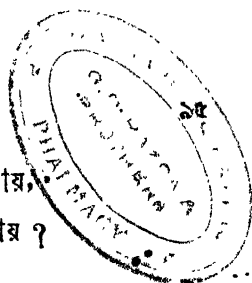
"লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়,
পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায় ?
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র মন্ত্র ফাঁদে,
নিরাকার ব্রহ্মদেহ ফাঁদে পড়ে কাঁদে !"

এ কথার উপর আর কোন কথাই চলে না। আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি যে, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী সকলেই লোভের অধীন। ইন্দুর ভর্জ্জিত তণ্ডুল বড় ভালবাসে, সেইজন্য যখন ইন্দুর মারিবার প্রয়োজন হয়, তখন গৃহস্থেরা ইন্দুর মারা যন্ত্রের মধ্যে ভর্জ্জিত তণ্ডুল দিয়া রাখে, মুষিকগণ সেই লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া যন্ত্রমধ্যে প্রবেশ মাত্রই প্রাণে বিনষ্ট হয়। সিংহ ও শার্দ্দূল-গণকে বিনষ্ট করিবার জন্য বন্যজাতিরা কলের মধ্যে অজা কিম্বা মেষ বাঁধিয়া রাখে। দূর হইতে সিংহাদি ছাগ বা মেষশাবককে দেখিয়া মাংস খাইবার লোভে মনুষ্য নির্ম্মিত ফাঁদে পড়িয়া বিনষ্ট হয়। বানরেরা কদলীফল অত্যন্ত ভালবাসে, বালকগণ তাহা জানিতে পারিয়া দূর হইতে একটা কদলীফল দেখা-ইয়া বানরগণকে আপনাদিগের কল্পিত ফাঁদের মধ্যে ফেলিয়া রাখে। বানরেরা পক্ক কদলী দেখিয়া লোভবশতঃ অকুতোভয়ে ফাঁদের ভিতর হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। মধুমক্ষিকার ও পিপী-লিকার মধুলোভে কিরূপ বিনাশ সাধন হয়, একটা মধুপাত্র খুলিলেই তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। মনুষ্যকে কোন কার্য্যে প্রবর্ত্ত করাইয়া আপন স্বার্থ সাধন করিতে হইলে লোকে নানা বিষয়ের লোভ দেখাইতে থাকে। যিনি আপন মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা না করিয়া লোভের অধীন হন, ভবিষ্যতে তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হয়। যদি কেহ বলেন যে, নিকৃষ্ট

প্রাণিগণ অজ্ঞান, হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে না বলিয়াই লোভ পরবশ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, মনুষ্য জ্ঞানবান্ হইয়া সেরূপ করিবে কেন? তদুত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, মনুজকুলের লোভাধিক্য বশতঃ কতদূর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভব তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। কারণ পশুপক্ষীর নিতান্ত প্রিয় সামগ্রী যদি আমরা বিশিষ্ট বিধানে সাবধান করিয়া রাখি, তাহা হইলে তাহাদিগের লোভ সত্ত্বেও প্রিয় সামগ্রীর প্রাপ্তি পথে বাধা দেখিয়া আপনা আপনি ক্ষান্ত হয়। কিন্তু মনুষ্যেরা যে দ্রব্যে নিতান্ত লোভ করেন, তাহার প্রাপ্তি পথে শত সহস্র বাধা থাকিলেও সে বিষয়ে ক্ষান্ত হন না, আপন আপন বুদ্ধিবলে সেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অভিলষিত বস্তুর প্রতি হস্ত বিস্তার করিতে যান, তৎকালে তাঁহার কোনও বিবেচনা থাকে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বানরে পক্ক কদলী অত্যন্ত ভালবাসে, সেই জন্য কদলীকাননের কৃষকেরা কদলীবৃক্ষগুলি কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখে, তাহা হইলে বানরের আর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু রজনীতে দুষ্ট লোকেরা কদলী খাইবার লোভে বাঁশের আকড়া দিয়া সেই সকল কণ্টক দূরে নিক্ষেপ করে, তাহার পর স্বচ্ছন্দে সেই পক্ক কদলীর কাঁদি কর্ত্তন করিয়া লইয়া ভবনাভিমুখে চলিয়া যায়। এ স্থলে ঐ রূপ আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন গৃহস্থের অঙ্গণমধ্যে একটি আম্রবৃক্ষ ছিল, সেই আম্রগুলি অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত, সেই জন্য প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই ঐ আম্রফলের প্রতি লোভ করিত। যাহারা সচ্ছল, তাহারা মূল্য দিয়া ক্রয় করিত, যাহাদিগের অর্থের অনাটন, অথচ লোভ আছে, তাহারা চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা অভিলাষ সম্পাদন করিবার
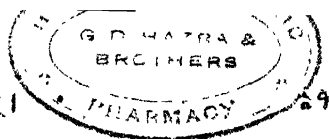
চেষ্টা দেখিত। কোন সময়ে ঐ প্রতিবেশীগণের মধ্যে একব্যক্তি আম্র চুরি করণ মানসে অন্ধকার রজনীতে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। ঐ আম্রবৃক্ষে একখানি ভীমরুলের ক্ষুদ্র চাক ছিল, চোর তাহা কিছুই জানিত না। সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বহুকষ্টে দুইটা মাত্র আম্র পাইয়াছিল, কিন্তু লোভের পরবশ হইয়া তাহাতে পরিতুষ্ট হইল না। পুনর্ব্বার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া অন্ধকারে অনুমান করিল যে, একটি বড়রকমের আম ঝুলিতেছে। সে বলপূর্ব্বক যেমন আম্র বোধে চাকখানি আকর্ষণ করিল, অমনি পাঁচ সাতটি ভীমরুল বহির্গত হইয়া চোরের সর্ব্ব শরীর এরূপে দংশন করিতে আরম্ভ করিল যে, সে জ্বালায় অস্থির হইয়া চিৎকার শব্দে বৃক্ষ হইতে ভূতলে নিপতিত হইবা মাত্রই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। এই উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, লোভের সীমা নাই। চোর যদি দুইটা আম্রফলে পরিতুষ্ট হইয়া চুপে চুপে নামিয়া আসিত, তাহা হইলে আর এরূপ অবস্থায় তাহাকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইত না।

লোভ আমাদিগের মনকে যখন উত্তেজিত করে, তখন আমরা কি না করিতে পারি? ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কেবল এক রাজ্যলোভে আপনার একমাত্র প্রিয়পুত্রকে আপনার সম্মুখে বিনষ্ট করাইয়াছিলেন। রামায়ণে বিভীষণকে যে ভাবে বর্ণনা করে করুক, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ইহাই প্রতীতি হয় যে, তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া যে রামচন্দ্রের শরণ লইয়াছিলেন, সে কেবল এক রাজ্যলাভের অভিপ্রায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাজ্যলোভে আপন জ্ঞাতিবন্ধু বিনষ্ট করিয়া অবশেষে কুপ্রবৃত্তির জন্য যথোচিত আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

যখন লোভরিপু প্রবল হয়, তৎকালে প্রায় কাহারও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কার্য্য শেষ হইলে অনেকে আবার অনুতাপ করিতেও ত্রুটি করেন না। অনেক রুগ্নব্যক্তি লোভপরবশ হইয়া গোপনভাবে কুপথ্য ভোজন করিয়া থাকে, কিন্তু সেই কুপথ্যের জন্য যখন রোগ ভীষণভাব ধারণ করিয়া যন্ত্রণা দিতে থাকে, তখন আবার সেই কুপথ্যভোজী অনুতাপ করিয়া কহে, "হায়! হায়! কি করিলাম! কেবল এক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণ হারাইতে বসিলাম!" নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলাগ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ সন্দেশ খাইতে বড় ভাল বাসিতেন। দৈবাৎ প্রতিবেশী একজন মদক, তাঁহাকে দোকানে বসাইয়া স্থানান্তরে গিয়াছিল। তিনি বিবিধ মিষ্টান্নপরিপূরিত মোদকের দোকানে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সর্ব্ব প্রকার মিষ্টান্ন এক একটি করিয়া উদরসাৎ করিতে লাগিলেন। পরে মোদক আপন বিপণিতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ ভূতলে পতিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে, 'ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া অপরিমিত মিষ্টান্ন আহার করিয়াছেন। এখন যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে অধিকক্ষণ জীবিত থাকিবেন এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, যে প্রকারে পারি ইহাঁকে বাটীতে পাঠাইয়া দিই'। মোদক পিতাপুত্রে একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণকে একখানি ভগ্ন খট্বার উপর তুলিল ও বহুকষ্টে তাঁহার ভবনে রাখিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ সেই অবস্থায় তিন দিবস পড়িয়া থাকেন, অবশেষে উদরাময়রোগে আক্রান্ত হইয়া বৎসরাবধি কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া উপাদেয় সামগ্রী আহার করিয়া অনেকেই ঐ ব্রাহ্মণের মত কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন।
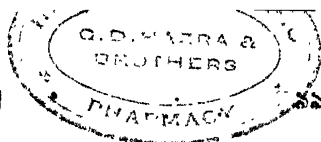
খাদ্যসামগ্রীর লোভে কেবল যে শারীরিক কষ্ট হয় এমত নহে, অনেকে কেবল এই লোভে আপন বিপুল সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছেন, ইহারও অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, লোভের সীমা নাই। যদি কেহ লক্ষমুদ্রা পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে সেই অর্থেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকা উচিত। কিন্তু অনেকেই বিজ্ঞের মত সেই ধনে সন্তুষ্ট হইয়া যাবজ্জীবন পরমানন্দে কালযাপন করিতে চাহেন না। সামান্য সুদের লোভে পিতৃপিতামহের বহুকষ্টসঞ্চিত অর্থ পরহস্তগত করিয়া ফেলেন। যদি কেহ অধিক সুদ দিতে চাহে, তাহা হইলে সঞ্চিতার্থ বাহির করিতে আর কালবিলম্ব করেন না। ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে যে, অনেক ধনবান্ লোক কেবল এক সুদের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রতারকগণের হস্তে ধনক্ষয় করিতেছেন, দুই একবার শিক্ষা পাইয়াও লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। বাণিজ্যব্যবসায়ীরা অধিক অর্থলোভে স্বদেশ হইতে সঞ্চিতার্থ লইয়া ব্যবসায়স্থলে আসিয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন, তাহার পর কেবল এক অর্থ বাড়াইবার লোভে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া বাণিজ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। যদি কেহ উচিত মূল্যের উপর মনকরা কিঞ্চিৎ অধিক লাভ দিয়া সপ্তাহ পরে মূল্য দিবার অঙ্গীকার করে, তাহা হইলে মহাজনগণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অনায়াসে তাহাকে পণ্যদ্রব্য ছাড়িয়া দেন। যাঁহারা সদাশয়, তাঁহারা অবশ্যই তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। কিন্তু কালপ্রভাবে বাণিজ্য-সংসারে অসৎ লোকের অপ্রতুল নাই, এই জন্য বৎসর বৎসর কতশত লোক হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছেন। কেবল বাণিজ্যব্যবসায়ীরা কেন, যাঁহারা চাকুরিব্যবসায় করেন, তাঁহারাও উচ্চ

বেতনের লোভে অস্বাস্থ্যকর দেশে গমন করিয়া প্রাণ পর্য্যন্তও হারাইতেছেন।

ষড়্‌রিপুর মধ্যে সকল রিপুই এককালে বালকবালিকার শরীরে প্রকাশ পায় না; কিন্তু লোভ পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মনেও দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। যদি পাঁচটি বালক একস্থানে ক্রীড়া-কৌতুক করে, তাহাদের একটির হস্তে ঘূড়ীলাটাই থাকিলে অপর চারিটির তাহার প্রতি লোভ হয়। এ কথা সকলেই অবগত আছেন যে, বালকেরা কেবল এক লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে তালপত্র, মস্যাধার ও লেখনী প্রভৃতি চুরি করিয়া আনে; ইহার কারণ এক লোভ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। বাল্যকালে অনেকের পক্ষিশাবকের প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকে; সে পক্ষী যদি আবার অন্য কাহারও গৃহপালিত হইয়া সুযোগক্রমে পলাইয়া আইসে, তাহা হইলে সেই পক্ষীর লোভে কাহারও কাহারও কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল ঃ—

কোন সময়ে এক যুবক তাহার বাটীর ছাদে একটি পক্ষী বসিয়াছে দেখিয়া লোভের অধীন হইল। বহুকষ্টে প্রাচীরে উঠিয়া ঐ পক্ষী ধরিবার উপক্রমে পদস্খলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হওয়ায় পঞ্চত্ব লাভ করিল।

যদি কেহ জানিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির অমুক বিষয়ে লোভের আধিক্য আছে। তাহার দ্বারা কোন স্বার্থ সাধন করিবার প্রয়োজন হইলে, যে বিষয়ে সে ব্যক্তি লোভসম্বরণ করিতে না পারে, সে তাহারই লোভ দর্শাইতে আরম্ভ করে। প্রাচীন লোকের মুখে গল্প শুনা গিয়াছে, এই নগরের কোন ধনবান্ ব্যক্তির বড় বড় কৈ মৎস্যের প্রতি লোভ ছিল। এই কথা পারিষদগণ জ্ঞাত হইয়া

কেবল এক কৈ মৎস্য দিয়া আপনাদিগের অভীষ্টসিদ্ধ করিয়া লইত। "লোভে ক্ষোভ, পাপে মৃত্যু," কোন বিষয়ে লোভ করিলে যদি তাহা প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে আর ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না। সেই ক্ষোভবশতঃ পুনর্ব্বার লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা বহুকষ্টেও প্রাপ্ত হই নাই, পুনঃ পুনঃ তজ্জন্য ক্ষোভ পাইতে হইয়াছে, তথাচ লোভ পুনর্ব্বার সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের লোভেও নিস্তার আছে, কারণ সে, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল আপনার অনিষ্ট করে, কিন্তু রাজাধিরাজগণের পর-রাজ্য, পরধন ও পরস্ত্রীর প্রতি লোভ হইলে রাজ্যশুদ্ধ লোকের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। তিনি আপন লোভরিপুকে চরিতার্থ করিবার জন্য সম্মুখযুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাইয়া এক দিবসে দশ সহস্র লোকের প্রাণ বিনষ্ট করাইতে পারেন।

যখন লোভরিপুর এতদূর উত্তেজনাশক্তি, তখন সেই লোভ যাহাতে আয়ত্তাধীনে থাকে ও মনকে উত্তেজিত করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত। যখন অবস্থানুরূপ সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন অকারণ লোভ করিয়া মনকে কলুষিত করিবার ও পরের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন কি? লোভরিপু প্রবল হইলে মনের শান্তি থাকে না। অভিলাষমত সমস্ত বস্তু সত্ত্বেও আহারে অরুচি জন্মে, কেবল একমাত্র লোভ প্রবল হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা বিশ্রামাদি সমস্ত সন্তোষই নষ্ট করিয়া দেয়। যাহার যে বিষয়ের উপর লোভ পড়িয়াছে, তাহার সেই বিষয় প্রাপ্তি ব্যতিরেকে আর কিছুতেই সন্তোষ লাভ হয় না। তবে, এক লোভের বশীভূত হইয়া সমস্ত সুখে বিসর্জ্জন দেওয়া কি বুদ্ধি-মানের কার্য্য?

[library stamp]

বাদশাহ আলাউদ্দীন বহুকষ্টে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আপনার একজন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, 'শত্রুদলন করিয়া যদি এক দিনের জন্যও দিল্লীর সিংহাসনে বসিতে পারি, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট হইল।' কালে তিনিই দিল্লীর অধীশ্বর হইলেন। ভারতের প্রায় সমস্ত করদ ও মিত্ররাজগণ তাঁহার পদানত হইল, রাজকোষ ধনে পরিপূর্ণ হইয়া লেগ, রাজপ্রাসাদে কতশত সুরূপা কামিনীকুল সম্রাটের সেবাশুশ্রূষায় ও চিত্তবিনোদনে নিযুক্তা হইল, প্রাসাদের সজ্জা দেখিয়া আমীরওমরাহগণেরও ইন্দ্রালয় বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল, প্রবল যবনসৈন্য ও মহাবীর সেনাপতিগণ প্রাণপণে রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। সম্রাট্ এক ঘণ্টামাত্র রাজদরবারে সমাসীন হইতেন, অবশিষ্ট সময় সুখের সাগরে ভাসিয়া থাকিতেন। যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন, মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাহা সম্পাদিত হইত। কিছুকাল এইরূপ সুখ সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময়ে একজন চাটুকার সম্রাটের কর্ণকুহরে চিতোরাধিশ্বরী পদ্মিনীর রূপগুণের ও চিতোররাজ্যের রাজকোষের কথা নিবেদন করিল। কর্ণের দ্বারা সম্রাটের মন, সমৃদ্ধিশালী চিতোররাজ্যের সংবাদ পাইয়া লোভের অধীন হইল। চাটুকার পুনরায় কহিল, "চিতোররাজ্যের সমস্ত স্ত্রীলোকই সুন্দরী। তাহাদিগের ন্যায় একটিও অদ্যাপি আপনার অবরোধভুক্ত হয় নাই। মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া চিতোরাধিশ্বরীকে যে চক্ষে না দেখিয়াছে, তাহার জন্মই বৃথা। আপনি সমস্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বটেন, কিন্তু আপনাপেক্ষা চিতোরেশ্বর ভীমসিংহ অধিক সুখী। যে হেতু তাঁহার তুল্য রাজমহিষী, তাঁহার তুল্য রাজকোষ ও উর্ব্বরা রাজ্যভূমি অদ্যাপিও আপনার হয় নাই। চাটুকারের এই সকল কথা শুনিয়া

আলাউদ্দীনের মনে লোভরিপু শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি পরদিবসই সসৈন্যে চিতোরাক্রমণে অগ্রসর হইলেন। দিল্লী হইতে চিতোর বহুদূরে স্থিত, তাহার উপর আবার সৈন্যচালনের পক্ষে সর্ব্বত্র সুগম পথ ছিল না। সময়ে সময়ে বাদশাহকে বহুকষ্টে পর্ব্বতোল্লঙ্ঘন ও নদ নদী পার হইতে হইয়াছিল। এক দিবস এমন একটা কদর্য্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, জলাভাবে সমস্ত সৈন্য অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়াছিল। বহুকষ্টে সৈন্যেরা একটি পয়ঃপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া জলপানদ্বারা জীবন রক্ষা করিল। বাদশাহ সে দিবস সসৈন্যে সেই প্রান্তরেই ছিলেন, প্রস্তরময় প্রান্তর বলিয়া শিবির সংস্থাপনের সুবিধা হইল না, সেই জন্য সম্রাটকে একটি বৃক্ষতলে বাস করিতে হইল। তিনি একখানি কম্বল বিছাইয়া বৃক্ষতলে বসিলেন, সম্মুখে হস্তস্থিত তরবারিখানি রহিল। সম্রাট্ পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার সে কষ্ট কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় নাই। যে হেতু তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া চিতোরেশ্বরী পদ্মিনীর রূপমাধুরী, বহুকালের সংগৃহীত চিতোরের রাজকোষ, ও উর্ব্বরা রাজ্যখণ্ড ধ্যান করিতে করিতে স্বীয় করে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। যবন রাজ্যে নাগা, ফকির ও সন্ন্যাসীগণ সর্ব্বস্থানে গমনাগমন করিতেন। সেই সময়ে দুই জন সন্ন্যাসী বহুদেশ পর্য্যটনের পর সম্রাটের সৈন্য-নিবাসে উপস্থিত হইলেন, এবং অকুতোভয়ে তাহার মধ্য দিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই জন সন্ন্যাসীর মধ্যে এক জন গুরু ও অপর জন [illegible] শিষ্য সর্ব্বাগ্রে কম্বলশায়ী সম্রাটকে দেখিয়া গুরুকে [illegible] বৃক্ষতলে ও কে মহাপুরুষ শয়ন করিয়া র[illegible]

'লোভের দাস দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীন।' শিষ্য কহিলেন, 'কি জন্যে ইনি ইন্দ্রালয় তুল্য রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে কম্বল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন?' গুরু কহিলেন, "ইহার অন্য কারণ আর কিছুই নাই, কেবল এক লোভের দাস হইয়া স্বইচ্ছায় বৃক্ষতলা সার করিয়াছে। তুমি ইহার বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া পড়িয়াছ. কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উহার অন্তরের ভাব আরও শোচনীয়! যে ব্যক্তি স্থায়ী-সুখ পরিত্যাগ করিয়া অস্থায়ীসুখের প্রতি লোভ করে, তাহার ন্যায় মূর্খ আর নাই। দুই তিন দিবস পূর্ব্বে এই আলাউদ্দীন সেই সম্রাটের শয়নোপযোগী শয্যায় শয়ন করিয়াও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইত না; আজ দেখ, লোভপরতন্ত্র হইয়া কম্বলের উপর নিদ্রা যাইতেছে! যে সুখের দিকে, হরিণের ন্যায় মরীচিকাকে জল-ভ্রমে ধাবিত হইয়াছে, সে সুখ ঘটিবে কি না তাহার স্থিরতা নাই। হয়ত উপস্থিত সংগ্রামে সম্রাটের প্রাণনাশ পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে, সে সকল চিন্তা একবারও ঐ অতিলোভীর মনে উদয় হইতেছে না। উহার দিল্লীর প্রাসাদে যে অতুল সুখ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রমেও তাহার প্রতি একবার মনোনিবেশ করিবার অবসর হইতেছে না, কেবল মনোমধ্যে চিতোরেশ্বরীকে নানা উপকরণে গঠন করিতেছে। সেই অসম্ভাবিত সুখের লোভে উহার [illegible] ঘটিয়াছে, সেই জন্যই জ্ঞানশূন্য হইয়া অনায়াসে কম্বলে শয়ন করিয়াছে। হে শিষ্য! তোমা আমা অপেক্ষা দিল্লী-শ্বরকে [illegible] সুখী বোধ করিও না। আমরা যখন যে অবস্থায় [illegible] অবস্থাই [illegible]। ভিক্ষায় অর্জ্জিত অর্দ্ধসের আটার [illegible] করিয়া তোমাকে দুইখানি দিই ও

আপনি দুইখানি খাই, তাহার পর এই কমুণ্ডলতে জলপান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করি। কি বৃক্ষতলা, কি গিরিগহ্বর, কি প্রান্তর, যেখানে সেখানে বসিয়া দুইজনে যখন আত্মতত্ত্বের কথা কহিতে থাকি, এবং মধ্যে মধ্যে স্বভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করি, তখন এই সংসারকে তৃণতুল্য জ্ঞান হয়। যে ষড়রিপুর তাড়নায় দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের অন্তর্দ্দাহ হইতেছে, সেই ষড়রিপু আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। হে শিষ্য! বাদশাহ যদিও রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছে, তথাচ মনে মনে গল্প করিতেছে যে, 'আমিই দিল্লীর সম্রাট, এই বহুসংখ্যক রণনিপুণ সৈন্য আমার। কল্য সম্মুখ সংগ্রামে চিতোরেশ্বরকে পরাস্ত করিয়া যখন তাহার রাজ্ঞীকে আমার শিবিরে আনয়ন করিব, তখন কি আনন্দই অনুভূত হইবে!' হে শিষ্য! বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি কল্য আলাউদ্দীন চিতোরেশ্বরকর্ত্তৃক পরাস্ত হয় ও আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমাদিগের আশ্রমে আসিয়া জল বাঞ্ছা করে, আমরা সরলহৃদয়ে তাহাকে জল পান করাইতেছি, এমন সময়ে চিতোরের কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য আশ্রমে আসিয়া বাদশাহকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, তখন ইহার কি দশা ঘটিবে? কেবল অতিলোভের বশবর্ত্তী হইয়া স্বইচ্ছায় সেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিবে কি না? এ দিকে আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ, অশ্বারোহী সৈন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দিল্লীশ্বরকেই বন্ধন করিবে, তৎপরে আমাদিগের চরণে শির অবনত করিয়া চলিয়া যাইবে। আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে না কেন? যে হেতু, আমাদিগের লোভ নাই, সেই লোভসম্ভূত স্ত্রীরত্ন নাই, রাজ্য নাই; এই অলাবুপাত্র ব্যতিরেকে আর কিছুই সঞ্চিত নাই। যে পঞ্চ-

ভূতের দ্বারা এই দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই পঞ্চভূত লইয়াই আমরা কালযাপন করি। আমাদিগের অগ্নিতে প্রয়োজন, জলে প্রয়োজন, বায়ুতে প্রয়োজন, আকাশ ও মৃত্তিকায় প্রয়োজন; এতদ্ভিন্ন আমরা আর কিছুই চাহি না। এই পঞ্চ পদার্থ সকলের পক্ষেই সুলভ, এই জন্য কেহ কাহারও হরণ করিতে আইসে না। যদি আমাদিগের এই কুটীরে একটি রমণীরত্ন থাকিত, তাহা হইলে একজন যবন ওমরাহ আসিয়া আমাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া তাহাকে কাড়িয়া লইয়া যাইত। পঞ্চভূত লইয়া ঘরকন্না বলিয়া কেহই আমাদিগের শত্রু হয় না। সম্রাটেরা লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়া এক রজনীতে যে আনন্দ অনুভব করিতে পান না, এক অর্দ্ধপয়সার গাঞ্জা আমাদিগকে তদপেক্ষা শতগুণে আনন্দ অনুভব করায়; আমাদিগের এ আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনকালে কেহই হইবে না। কিন্তু বাদশাহ আলাউদ্দীনের সুখ পদ্মপত্রের জলের ন্যায় প্রতিক্ষণ টলটল করিতেছে। হয়ত এই চিতোরের যুদ্ধেই তাহার সমস্ত সুখ শেষ হইয়া যাইবে। যে কম্বলে অদ্য শয়ন করিয়া রহিয়াছে, এই কম্বল স্কন্ধে লইয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত হইতে হইবে। যেমন সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রপশু শত্রুভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে, এই লোভের দাস আলাউদ্দীন কি ভাল কি মন্দ দুই অবস্থাতেই শত্রুভয়ে সশঙ্কিত হইয়া আছে। সিংহ ব্যাঘ্রের আশ্রয় নিবিড় অরণ্য, ইহাদিগের আশ্রয় সুদৃঢ় দুর্গ এইমাত্র। কিন্তু আমাদিগের প্রাণরক্ষার জন্য কোনকালে মনুষ্যকে ভয় করিতে হয় না, তবে নরঘাতক পশুদিগকে ভয় করিতে হয় এইমাত্র। হে শিষ্য! আলাউদ্দীন কেবল লোভের দাস হইয়াই বৃক্ষতলে কম্বলশয্যায় শয়ান আছে, যাহারা এককালে ষড়রিপুর দাস হয়, তাহাদিগের কতদূর অনিষ্ট ঘটে বিবেচনা

কর।” এই কথা বলিতে বলিতে যোগীবর আশ্রমাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে আলাউদ্দীন সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম চলিল। পর্য্যায়ক্রমে উভয় পক্ষেরই জয়পরাজয় হইতে লাগিল। অবশেষে চিতোরেশ্বর ভীমসিংহ সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত হইয়া নিহত হইলেন, অমাত্যেরা রাজকোষ বহুস্থানে লুকাইয়া ফেলিল। যখন বাদশাহ ও সেনাপতিগণ ক্ষত্রিয়মহিলাদিগকে বন্দী করিবার জন্য রাজধানী আক্রমণ করিলেন, তখন অবলা কুলকামিনীরা নিঃসহায় হইয়া সতীত্ব রক্ষার জন্য অনলকুণ্ডে আত্মনাশ করিতে উদ্যোগী হইলেন। রাজপত্নীগণের সাহস দেখিয়া পর্য্যায়ক্রমে চিতোরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলারা স্থানে স্থানে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া আত্মনাশ করিতে লাগিলেন। যখন যবনসৈন্য চিতোরের রাজধানীতে প্রবেশ করিল, তখন চারিদিকে কেবল অগ্নি ও ধূমরাশি ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। বাদশাহ যে অতিলোভের দাস হইয়া চিতোরে আসিয়াছিলেন, তাহাও ধূমাকারে পরিণত হইল! চিতোর আক্রমণের তিনটি কারণ ছিল,—প্রথম, চিতোরেশ্বরীর সতীত্বরত্ন হরণ; দ্বিতীয়, বহুকালসঞ্চিত রাজভাণ্ডার হরণ; তৃতীয়, উর্ব্বরা রাজ্যখণ্ড দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করণ। তুমুল সংগ্রাম ও বহুসংখ্যক সৈন্য নাশের পর সে রমণীরত্ন পাইলেন না, রাজভাণ্ডার কোথায় রহিল, তাহার কিছুই স্থির হইল না। অবশেষে প্রায় প্রজাশূন্য রাজ্যখণ্ড অধিকার করিয়া শিবিরে আসিয়া বসিলেন। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখিতে হইবে যে, চিতোরেশ্বরী পদ্মিনী, অনলে পুড়িয়াছিলেন কি পলায়ন করিয়াছিলেন, পামর আলাউদ্দীন তৎকালে তাহা কিছুই স্থিরীকৃত করিতে পারে নাই।

এই রূপে আলাউদ্দীন চিতোরের যুদ্ধে যার পর নাই ভগ্নোৎসাহ হইলেন; যেহেতু তিনি পূর্ণমনোরথ হইতে পারিলেন না। যে চিতোরেশ্বরীর জন্য বহু সৈন্য নষ্ট হইল, বহু অর্থ ব্যয় হইল এবং আপনি যৎপরোনাস্তি শারীরিক কষ্ট ভোগ করিলেন, সেই চিতোরেশ্বরীকে না পাওয়াতেই সমুদয় বিফল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অতিলোভের বশবর্ত্তী হইয়া চিতোরে আসিয়াছিলেন, সেই অতিলোভের সহিত একটি আত্মাভিমানও উপস্থিত হইয়াছিল। আলাউদ্দীন তাঁহার বয়স্যের উত্তেজনায় চিতোর আক্রমণে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। বয়স্য বলিয়াছিলেন, "আপনি দিল্লীশ্বর বটেন, কিন্তু চিতোরেশ্বর আপনা অপেক্ষা অধিক সুখী। তাঁহার ন্যায় রমণীরত্ন আপনার নাই, নানা রত্নে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার নাই, ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজ্যখণ্ড তিনিই ভোগ করিতেছেন।" এই সকল কথা শুনিয়া আলাউদ্দীনের মনে লোভরিপু প্রবল হইয়া উঠিল, সেই লোভের সহিত আত্মাভিমান আপনা আপনি আসিয়া উদয় হইল:— "আমি আলাউদ্দীন দিল্লীর বাদশাহ, ভারতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট আছে, তাহা আমিই ভোগ করিব। তাহা না হইয়া একজন সামান্য রাজা একটি রমণীরত্ন ভোগ করিতেছে, সে রত্ন আমারই ভোগ্য হওয়া উচিত। রণে পারি, ছলে পারি, যে প্রকারে পারি, তাহাকে হরণ করিয়া আনিব। ইহাতে যদি নিরুৎসাহ হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমির ওমরাহগণ আমাকে কাপুরুষ বলিয়া গণ্য করিবে।"— এইরূপ আত্মাভিমান আলাউদ্দীনের মনে উদয় হইয়াছিল।

চিতোরেশ্বর আলাউদ্দীনের কোনও অনিষ্ট করেন নাই, আজন্মকাল দিল্লীশ্বরের সহিত মিত্রতা রাখিয়া আসিতেছেন। বাদশাহ কি বলিয়া তাঁহার নিকট যুদ্ধ প্রার্থনা করিবেন? কে কথা বলিয়া তিনি

যুদ্ধ প্রার্থনা করিবেন, সে কথা একজন সামান্য কৃষকও সহ্য করিতে পারে না—অর্থাৎ, 'হে চিতোরেশ্বর! হয় তুমি তোমার প্রিয়তমা রাজমহিষীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজ্যরক্ষা কর, না হয় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।' দিল্লীশ্বর যখন এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন, তখন কি তাঁহার মনে একবারও উদয় হইল না যে, 'যে ব্যক্তি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেও এরূপ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না। বিশেষতঃ আমি দিল্লীর বাদশাহ, জগদীশ্বর আমার হস্তে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়াছেন। আমি কেবল এক অতিলোভের দাস হইয়া কি প্রকারে একজন মহৎকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় রাজার নিকট এরূপ ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইব?' সে যাহা হউক, দিল্লীশ্বর এরূপ ভাবিতে পারেন নাই। তিনি চিতোরেশ্বরীর মোহিনী মূর্ত্তি চক্ষে দেখেন নাই, কেবল এক কর্ণে শুনিয়া দিল্লীশ্বরের নামে কলঙ্কারোপ করিলেন। যদিও আপনার বাহিনী প্রবল থাকায় বহুকষ্টে রণজয়ী হইলেন, কিন্তু তাহাতে মনের সন্তোষ জন্মিল না। "হায়! কি করিতে চিতোরে আসিলাম! চিতোরেশ্বরীকে পাইলাম না, দিল্লীর রাজপ্রাসাদে গিয়া কি দেখিব? অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ সকলেই শুনিয়াছে যে, আমি চিতোরেশ্বরীকে বন্দিনী করিয়া আনিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছি। এখন আমি একাকী তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে—কেহ বলিবে, 'কই জাঁহাপনা! নূতন রাজমহিষী কোথায়?' কেহ বলিবে, 'চিতোরেশ্বরী বন্দিনীভাবে আসিতেছেন বলিয়া কিঞ্চিৎ কালবিলম্ব হইয়াছে, বোধ হয় আগতাপ্রায়, আইস তাঁহার উচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়া থাকি।'

স্ত্রীলোকের মুখে এরূপ বিদ্রূপের কথা আমার কখনই সহ্য হইবে না। যদি প্রধানা বেগম চিতোরের জয়লব্ধ কোন বহুমূল্য রত্ন আমার নিকট যাচ্ঞা করেন, তাহা হইলে রত্নের বিনিময়ে তাঁহার হস্তে কি রমণীকুলের দগ্ধ অঙ্গার দিব? উঃ! কি ভয়ানক কষ্ট! আশার সুসার হইল না।” এমন সময় একজন গুপ্তচর আসিয়া কহিল, “পদ্মিনী অনলে আত্মহত্যা করেন নাই, পলায়ন করিয়াছেন।” এই কথা শুনিয়া আলাউদ্দীনের অভিমান হইতে ক্রোধ-সঞ্চার হইল। আপনা আপনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আমার বহুসংখ্যক সেনা একটা স্ত্রিলোকের গতিরোধ করিতে পারিল না! নিশ্চয় বুঝিতেছি, কেবল সেনাপতিগণের দোষেই পদ্মিনী ধৃত হইলেন না—তাহারা সাবধান পূর্ব্বক কার্য্য করে নাই।” আরও উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “ইহারা সকলেই অকর্ম্মণ্য! এই অকর্ম্মণ্য লোকের উপর বিশ্বাস করিয়া আমি যার পর নাই অপমানিত হইলাম। এক্ষণে সুপরামর্শ এই, আপাততঃ এস্থান হইতে শিবির উত্তোলন করা হইবে না, রাজমহিষীর অন্বেষণে নানা স্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করা যাউক, তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ করুক।”

ষড়রিপুর মধ্যে কেবল আমরা লোভকেই গ্রহণ করিয়াছি। কার্য্য-গতিকে দেখিলাম, সেই লোভ হইতে অভিমান, অভিমানের পর কিঞ্চিৎ ক্রোধ, তাহার পর আশা আসিয়া সমস্ত বিষয়ের সমাধা করিয়া দিল। আশা অস্ফুটস্বরে কাণেকাণে কহিল, “ভয় নাই, উতলা হইতেছ কেন? জান না, কোরাণে লিখিত আছে, ‘অনু-সন্ধান কর অবশ্য মিলিবে।’ বাদশাহ এক্ষণে সেই আশাকেই অব-লম্বন করিয়া শিবিরমধ্যে সুস্থিরভাবে বসিলেন। এক্ষণে আশাতরঙ্গে তাঁহার মন অনুক্ষণ আন্দোলিত হইতে লাগিল—একবার ভাবিলেন,
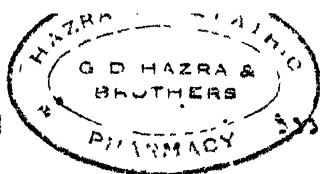
"দুর্ব্বলা নারী কতদূর পলায়ন করিবেন? সূর্য্যতাপে ক্লান্ত হইয়া কোন বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন, আমার কিঙ্করেরা দেখিবামাত্র চিনিয়াছে—ধরিয়াছে! নিশ্চয় ধরিয়াছে!—শিবিরের অনতিদূরে ও কিসের গোলযোগ? নিশ্চয়ই রাজমহিষীকে লইয়া আসিতেছে!—সাবধানের সহিত আনিতেছে ত?—অদ্য সকলেই রাজমহিষীকে নয়ন ভরিয়া দেখিতেছে, কল্য আর কেহই দেখিতে পাইবে না—চন্দ্র সূর্য্যও দেখিতে পাইবে না!" আলাউদ্দীন খট্বা ত্যাগ করিয়া পটগৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে সময় তাঁহার মন কি অবস্থায় অবস্থিত, কবিরাও তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারেন না। 'রাজমহিষী ধৃত হইয়াছেন, ঐ আসিতেছেন! ঐ আসিতেছেন!' এই আশায় তাহার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল, নাসিকা ও কর্ণপথে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। যখন দেখিলেন, একজন সৈনিক সশস্ত্রে তাঁহার শিবিরাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে, তখন নিশ্চয় ভাবিলেন, "ঐ ব্যক্তিই শুভসংবাদবাহক। উহার মুখ হইতে যদি 'রাজমহিষী ধৃত হইয়াছেন' এই সংবাদ নির্গত হয়, তাহা হইলে আমি উহাকে এই বহুমূল্যের অঙ্গুরীয় পুরস্কার দিব " এইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে ঐ সৈনিক আসিয়া করযোড়ে কহিল, "জাঁহাপনা! শিবিরে একজন গুপ্তচর প্রবেশ করিয়াছিল, সেনাপতির আদেশে তাহাকে ধৃত করিয়া কারাগারে রাখিয়াছি, এক্ষণে জাঁহাপনার যেরূপ আদেশ হয়, তদ্রূপ কার্য্য হইবে।" বাদশাহ কহিলেন, "তোমার মাথা হইবে! যাও এখান হইতে যাও! আমাকে বিরক্ত করিও না।" এই কথা বলিয়া ক্ষুণ্ণমনে খট্বায় আসিয়া শয়ন করিলেন। আপনাকে আপনি আয়ত্ত করিতে অর্দ্ধঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। তিনি কে, কি করিতেছেন, কোথায়

আছেন, তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। আলাউদ্দীনের মনে পুনর্ব্বার এইরূপ আশা হইল যে, "রাজধানীর লোককে পীড়ন করিলেই রাজমহিষী কোথায় লুকাইয়া আছেন, তাহারা বলিয়া দিবে। এ কি কথা যে, রাজপ্রাসাদের লোক তাঁহার পলায়নসংবাদ কিছুই জানে না? আমাকে যেমন কষ্ট দিতেছে, ইহার শতগুণ কষ্ট তাহাদিগকে দিব!" পরদিবস প্রাতেই শত শত লোককে ধরিয়া আনিয়া তিনি পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পীড়নে অনেকের প্রাণবিয়োগ হইল, তথাচ রাজমহিষীর পলায়নের সটীক সংবাদ কেহই বলিতে পারিল না। বাদশাহ সে বিষয়েও হতাশ হইলেন। কিন্তু আশা তখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। আশার নূতন তরঙ্গ উপস্থিত হইল যে, "যেখানে যেখানে নিবিড় বন আছে, তাহার চারিদিকে আগুন ধরাইয়া দাও। বিপিনমধ্যে অবশ্য লুকাইয়া আছেন, অগ্নির উত্তাপে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবেন।" কিন্তু এ পরামর্শানুযায়ী কার্য্য হইল না, যেহেতু তিনি সংবাদ পাইলেন যে, "ভীমসিংহের প্রতি অন্যায় ব্যবহার হওয়ার কতকগুলি চিতোরের মিত্র ও করদ রাজা একত্রিত হইয়া তাঁহার প্রতিকূলে আসিতেছেন।" যে সময় এই সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অতি অল্প ছিল। চিতোরের যুদ্ধে কয়েক জন সেনানায়ক নিহত হওয়ায় সৈন্যদলের আর সুশৃঙ্খলা ছিল না। বাদশাহ আত্মরক্ষায় ভীত হইয়া সে স্থান হইতে শিবির তুলিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া দিল্লীপ্রত্যাগমনই অবধারিত হইল। কিছুদিনের মধ্যে ভগ্নোৎসাহ হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সে সময়েও আশা নির্জ্জীব অবস্থায় তাঁহার অন্তঃকরণে বাস করিতে লাগিল।

বহুদিনান্তে বাদশাহ রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য নানা দিকে নানা আয়োজন হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সুখবোধ হইল না। দিল্লীর প্রাসাদে তৎকালে বিলাস মূর্ত্তিমান্ হইয়াছিল, সেই বিলাসের মধ্যে বসিয়াও আলাউদ্দীনের মন এক অনির্ব্বচনীয় কষ্টভোগ করিতে লাগিল। বিবেচনা করিলে যে কষ্ট কিছুই নহে, তাঁহার পক্ষে সেই কষ্টই মর্ম্মান্তিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যিনি সুখের সাগরে পড়িয়া কেবল এক মনের দোষে কষ্ট ভোগ করিবেন, তাঁহাকে কে রক্ষা করিতে পারে? এক ব্যক্তি একটি সুরূপা কামিনীর পাণিগ্রহণ করিতে পাইলে তাহাকেই হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারে। শত শত সুরূপা কামিনী যে বাদশাহের সহবাসসুখের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, সেই বাদশাহ উপস্থিতসুখ বিষবৎ জ্ঞান করিয়া কল্পনায় চিতোরেশ্বরীকে ধ্যান করিতেছেন, ইহাকে কিরূপ দুর্দ্দশা বলে? এক ব্যক্তি নদীকূলে দাঁড়াইয়া পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইতেছে, তথাচ সে জল পান করিতেছে না; আলাউদ্দীনও তদনুরূপ শত শত রমণীরত্নের মধ্যস্থলে বসিয়াও 'চিতোরেশ্বরীকে পাইলাম না' বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, ও চিন্তানলে হৃদয় দগ্ধ করিতেছেন।

এক্ষণে অতিলোভের দাস আলাউদ্দীন এবং সেই পর্ণকুটীরবাসী দুইজন সন্ন্যাসীর অবস্থা বিবেচনা কর। তাঁহারা দুইখানি কাষ্ঠ জ্বালাইয়া শীত নিবারণ করিতেছেন, আর আনন্দে দেহতত্ত্বের কথা কহিয়া উভয়ে উভয়কে তৃপ্ত করিতেছেন। পত্রের কুটীর, কাষ্ঠখণ্ডের আলোক ও মৃগচর্ম্মের শয্যা; রক্ষক পরমেশ্বর, ভাণ্ডারী স্বভাব, ইহাতেই দুইজন যোগীর আনন্দের সীমাপরিসীমা নাই!

সে আনন্দ ভেদ করিয়া দুঃখের সাধ্য কি যে, সেই পর্ণকুটীরের সমীপবর্ত্তী হয়? এদিকে আলাউদ্দীন ইন্দ্রালয়তুল্য রাজপ্রাসাদ, শত শত বর্ত্তিকালোকে সমুজ্জ্বলিত গৃহ; দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও শত শত দেবাঙ্গনাতুল্য কামিনীমণ্ডলিতে বেষ্টিত হইয়াও কেবল মনের দোষে মর্ম্মান্তিক কষ্ট ভোগ করিতেছেন। তাঁহার মন মার্জ্জিত নহে, শিক্ষিত নহে ও শাসিত নহে, এই জন্য এক লোভরিপুর আক্রমণেই সমস্ত সুখে বঞ্চিত হইয়া চিতোরেশ্বরীকে ভাবিতেছেন। যাঁহাকে ভাবিতেছেন, তাঁহারও রীতিনীতি ও ব্যবহার কিছুই অবগত নহেন। অর্থাৎ যদি রাজ্ঞী ধৃত হইতেন, তথাচ যবনের প্রতি অনুরাগিনী হইতেন কি না, তাহারও স্থিরতা নাই; তথাচ নিজ পত্নীগণকে পরিত্যাগী করিয়া তাঁহাকেই ভাবিতেছেন।

মনুষ্যের দ্বিতীয় রিপু মোহ—মোহশব্দের অর্থ মূর্খতা, অজ্ঞানতা ও মতিভ্রম। মোহশব্দের স্থানে স্থানে অন্য অর্থও আছে, যথা—ভীমের গদাঘাতে দুর্য্যোধন মোহ গিয়াছিলেন, গান্ধারী শতপুত্রশোকে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহারাজ দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপমাধুরী দর্শনে অবিবেচকের ন্যায় অর্থাৎ মূর্খের ন্যায় মহামুনি কণ্বের অনুমতি প্রতীক্ষা না করিয়াই শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করেন। রাজর্ষি ভরত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহার পর একটি হরিণশাবকের মায়ায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে উন্মাদদশায় প্রাণ ত্যাগ করেন। এতদ্ভিন্ন ইতিহাস ও পুরাণাদিশাস্ত্রে মোহমুগ্ধ মনুষ্যের শতসহস্র দৃষ্টান্ত আছে। যদি মনুষ্য অগ্রপশ্চাৎ ও হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে কখনই মোহে মুগ্ধ হইতে হয় না। মোহ মনুষ্যশরীরে একেবারে বলপ্রকাশ করে না। ক্রোধাদি রিপু ক্ষণকালমধ্যেই ভীষণ

ভাব ধারণ করে, কিন্তু মোহ সর্পবিষের ন্যায় ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে। মোহের আর একটি নাম মায়া। কারণ অনেক স্থানে কবিরা বলিয়াছেন যে, অমুক ব্যক্তি মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া কি দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে! যখন বৈরাগ্যশতকের গ্রন্থকার বেশ্যার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রজনীতে নদী পার হইবার জন্য একটি গলিত শবকে কাষ্ঠ-ফলক বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, বেশ্যার বাটীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় সর্পলাঙ্গুলকে অশ্বত্থবৃক্ষের মূল বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, তাহার পর যখন সেই মায়ামুগ্ধকারিণী বারবিলাসিনী তাঁহার গাত্রে গলিত শবের দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া কৌশলে বাটী হইতে দূর করিয়া দিল, তখন তাঁহার মায়ামোহ একেবারে দূর হইয়া গিয়াছিল। মোহান্ধকার দূর হইয়া চৈতন্যোদয় হওয়ায় তিনি আত্মশরীরের দুর্গন্ধ অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রাচীরে সর্পলাঙ্গুল অনুভূত হইল এবং নদীতীরস্থ সেই কাষ্ঠফলক এক্ষণে দুর্গন্ধময় শব বলিয়া জানিতে পারিলেন। সেই শব সহায় করিয়া পুনর্ব্বার নদী পার হইতে আর সাহস হইল না। যেমন মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণচন্দ্র মেঘমুক্ত হইলে দ্বিগুণ সুধাময় কিরণজাল বিস্তার করে, সেইরূপ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্ঞানেন্দু মোহমেঘ হইতে মুক্ত হইয়া শতগুণে বিকশিত হইল। তিনি সমস্ত রজনী সেই নদী-তীরে বাস করিয়া সূর্য্যপ্রকাশকালে সূর্য্যসাক্ষী করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ভাবিলেন, "এ সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর। যাহার মায়ায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় কত অন্যায়কার্য্য করিয়াছি, অদ্য পিতৃশ্রাদ্ধবাসর অগ্রাহ্য করিয়া ভোগাভিলাষে যাহার নিকট আসিয়াছিলাম, সে একটি সামান্য ছল ধরিয়া অনায়াসে আমাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিল! আমার সহিত দীর্ঘসহবাসহেতু কিছু মাত্র মমতা করিল না! আমি বহুকাল অধ্যয়ন করিয়া যে জ্ঞান

লাভ করিতে পারি নাই, এই বেশ্যা বিনা শিক্ষায় সেই জ্ঞানের কার্য্য দেখাইল! সে আমার পরিবর্ত্তে আর একজন পুরুষ লইয়া অনায়াসে তৃপ্তিলাভ করিতেছিল, কিন্তু আমি কল্য রজনীতে বিদ্যাধরী প্রাপ্ত হইলেও তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিতাম না। এই জন্য ঐ বেশ্যাকে সাধুবাদ দিয়া আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতেছি। যে আপনার মনকে আয়ত্তে রাখিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে, লোকে তাহাকে কেন যত স্নেহ করুক না, যত মমতা করুক না, সে কাহারও স্নেহমমতার বশীভূতা নহে। কিন্তু আমি বহুকাল মহামহোপাধ্যায় গুরুর নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তথাচ একবারমাত্র ঐ বেশ্যার রূপমাধুরী দর্শন করিয়া দর্শনশাস্ত্র মন হইতে অদর্শন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে, বিনা শিক্ষায় তাহার ব্যতিক্রম কিছুমাত্র ঘটাইল না। অধিক অর্থ পাইলেই বেশ্যারা বহুকালের প্রণয় মুহূর্ত্তকালে ভুলিতে পারে, কিন্তু আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা সুরূপা রমণী পাইলেও তাহাদিগের মোহপাশ ছিন্ন করিতে পারি না। আমি যখন সংসার পরিত্যাগ করিলাম, তখন সর্ব্বতোভাবে স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে হইল। অদ্য একেবারে সমস্ত সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিলাম, কিন্তু গত রজনীতে সেই মোহবেগ সহ্য করিতে পারি নাই। এখন জানিতে পারিলাম যে, মূর্খতার একশেষ না করিতে পারিলে হঠাৎ বিবেক উপস্থিত হয় না।' বোধ হয় এই জন্যই জনকঋষি তাঁহার সমাগত ছাত্রকে কহিয়াছিলেন, 'তুমি কিছুকালের জন্য নষ্টস্ত্রীলোকের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হও, তাহার পর আমি তোমাকে বিবেক ও বৈরাগ্যের উপদেশ দিব।' সেই বহুশাস্ত্রদর্শী যুবক ছাত্র দুষ্টানারীর প্রণয়পদ্ধতি অতি অল্পকালেই অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার এক দিবসে যে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল,

আমার বহুকালে তাহা হইল। বিদ্যাশিক্ষা কখনও নিষ্ফল হয় না। পূর্ব্বে বহুশাস্ত্রে দৃষ্টি ছিল বলিয়াই কল্য রজনীতে নদীতীরে বসিয়া অল্পে অল্পে মোহপাশ ছিন্ন করিতে সক্ষম হইলাম। বেশ্যার সহিত প্রণয়সম্বন্ধে কাব্য ও নাটকাদি যেরূপ সহায়তা করিয়াছিল, নিবৃত্তি-সম্বন্ধে গত রজনীতে দর্শনাদিশাস্ত্রও সেইরূপ করিল। যদি আমি নিতান্ত মূর্খ হইতাম, তাহা হইলে অত লাঞ্ছনাতেও মোহপাশ ছিন্ন করিতে পারিতাম না, অদ্য তাহারই চরণে লোটাইয়া পড়িতে হইত। তাহার শত দোষ সত্ত্বেও আমি আপন মুখে আপনাকে দোষী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম।"

প্রস্তাবের প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, মোহযজ্ঞের আহুতি স্বার্থ-ত্যাগ ও দক্ষিণা মানত্যাগ। বোধ কর, কোন ব্যক্তি মোহবশতঃ আপনার একমাত্র পুত্রকে যথোচিত আদর দিতে লাগিলেন। পাছে ছেলেটি কাঁদে, কাঁদিলে পীড়া হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সে যখন যাহা বলিত তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন, মোহবশতঃ পুত্রের বিরসবদন দেখিতে পারিতেন না। পুত্র যাহার যাহা দেখিত পিতামাতার নিকট আসিয়া তাহাই চাহিত, পিতা আপন ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া পুত্রের অভিলাষ পূর্ণ করিতে বাধ্য হইতেন। সে বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিল না, পিতামাতা তজ্জন্য পুত্রের প্রতি বিরক্ত নহেন। এরূপ মোহের কারণ কি? যদি স্বার্থের জন্য হইত, তাহা হইলে বিশেষ যত্ন করিয়া পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইতেন; কারণ বিদ্যা ব্যতিরেকে ধনলাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। ঐ বালকের পিতা ভাবিতেন যে, 'আমাদিগের কিঞ্চিৎ বিষয় বৈভব আছে, পুত্রটি বাঁচিয়া থাকিলে এই বিষয় হইতেই তাহার রাজার মতজুলিকে

অকারণ লেখা পড়ার জন্য তাহাকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই।' এইরূপ কিছু কাল পুত্রমোহে তিনি উন্মত্ত হইয়া রহিলেন, দৈব-বশতঃ সেই পুত্রটির মৃত্যু হইল। পূর্ব্ব হইতেই পুত্রের মোহে বিহ্বল হইয়াছিলেন, পুত্রের প্রতি পিতামাতার প্রকৃত কার্য্যে বিস্মরণ ঘটিয়াছিল, এক্ষণে হঠাৎ সেই মহামোহের ধন অন্তর হওয়ায় দম্পতি-শোকশয্যায় শয়ন করিলেন। 'আর সংসারে কায কি? ধন ঐশ্বর্য্য লইয়া কি হইবে?' এই রূপ আক্ষেপোক্তি করিয়া আরও মোহের কার্য্য দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে মোহে মুগ্ধ দেখিয়া আত্মীয় বন্ধু ও কর্ম্মচারীরা নানা কৌশলে ধন হরণ করিতে লাগিল। জনকজননী তিন বৎসরকাল ক্রমাগত মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকি-লেন। স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না থাকায় ভিতরে ভিতরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। যখন অপমানের উপক্রম হইল, তখন কিয়ৎ পরি-মাণে মোহ কাটিয়া গেল। কর্ত্তা বলিলেন, "তোমরা একৈক্য হইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিলে, ইহার পর উদরান্নের জন্য কোথায় যাইব?" পূর্ব্বে ধনের জন্য কোন বিষয়েরই ভাবনা ছিল না, এই জন্য এক পুত্র লইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। এক্ষণে একে পুত্র-নাশ, তাহার উপর ধননাশ হওয়ায় দুই শোক একত্রিত হইল। যেমন বিষে বিষক্ষয় হয়, অনলে শরীর পুড়িলে, সেই স্থানে অনলের উত্তাপ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ বোধ হয়, সেই রূপ ধনের শোক কিয়ৎ পরিমাণেও পুত্রশোকের সমতা করিয়া দিল। অকারণে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া যে জ্ঞানের উদয় হইল, পুত্রের মৃত্যুর এক পক্ষ পরে সে জ্ঞানের উদয় হইলে সকল দিক রক্ষা পাইত। তাঁহাদিগের বৃদ্ধ বয়সে সেই পুত্রটি হইয়াছিল, তাহার দ্বারা পিতামাতার কোন উপকারের সম্ভাবনা ছিল না। যদি তাঁহা-

G D HAZRA & CO
BROTHERS
PHARMACY
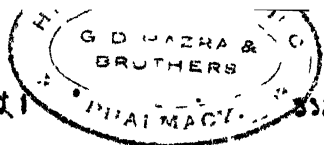
দিগের কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিত ও অতদূর মোহান্ধ না হইতেন, তাহা হইলে মনে মনে এইরূপ ভাবিতে পারিতেন যে, "আমাদিগের কোন চিরশত্রু এই সন্তান রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, পুত্রের জন্য আত্মাকে ঘোর কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিলাম, এখন ধর্ম্মাচরণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করি। মোহপাশ আপনাপনি ছিন্ন হইয়া গেল ভালই হইল। আমাদিগের অপর উত্তরাধিকারী কেহই নাই, সুতরাং অর্থব্যয়ে কিছু মাত্র মায়া উপস্থিত হইবে না। কেবল সেই পুত্রের মোহতেই সংসার ত্যাগী হইয়া তীর্থপর্য্যটনে অগ্রসর হইতে পারি নাই। পাছে পুত্রের টাকা কমিয়া যায় এই ভয়ে বহুব্যয় সাধ্য পুরাণাদি শ্রবণেও সাহস হয় নাই। পূর্ব্বে অভিলাষ ছিল যে, একটি পঞ্চরত্ন প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ইষ্টমূর্ত্তি স্থাপনা করিব, পুত্র জন্মিয়া অবধি সে কথা এক দিবসের জন্যও মনে করি নাই। পূর্ব্বে এই দুরন্ত পৌষের শীতে দীন দরিদ্রকে এক এক খানি বস্ত্র দান করিতাম, পুত্র হইয়া অবধি তাহাও উঠাইয়া দিয়াছি, পাছে ছেলের অর্থ কমিয়া যায়, এই আশঙ্কায় কোনও সৎকার্য্যে হস্ত বাড়াইতাম না। কিসে পুত্র ভবিষ্যতে সুখী হইবে, এই ভাবনাতেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতাম। দেখ! যাহার জন্য আমরা এত কষ্ট করিয়াছি, এত ভাবিয়াছি, এত স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছি এবং যাহার জন্য লোকে কৃপণ বলিয়া আমাদিগকে কত অপমানের কথা বলিয়াছে, সেই পুত্র অনায়াসে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, আর কখন ফিরিবে না। সেই মৃত ব্যক্তির অনুশোচনায় আজ তিন বৎসর কাল আমরা শোকানলে জীবিত শরীরকে দগ্ধ করিতেছি, তথাচ মোহপাশ ছিন্ন করিবার চেষ্টা দেখি নাই, শুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্ম্মাচরণের দ্বারা মনকে আমোদিত করিবারও চেষ্টা দেখি নাই, ধন্য মোহের ক্ষমতা!"

মোহ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন, কেবল মোহ বশতই আমরা নিত্য সুখের অনুসন্ধান করিতেছি। এই সংসারই মোহের আকর স্থান, সংসার পাতিয়া প্রতিপদে আমরা মোহপাশে নির্ম্মল আ-ত্মাকে জড়াইতেছি। একটি পুত্র বা কন্যার বিয়োগে মোহবশতঃ কষ্টভোগ করিব ইহা কিছু বিচিত্র নহে, কারণ তাহাদিগের দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক উপকারের প্রত্যাশা থাকে। একটি উত্তম সামগ্রী যাহা বহুকালাবধি আদর করিয়া গৃহে রাখিয়াছি, মধ্যে মধ্যে এক একবার চক্ষে দেখিয়া নয়নের তৃপ্তি সাধন করি, হস্তে ধরিয়া আমার জ্ঞানে আনন্দিত হই! যদি হঠাৎ সেইটী ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আর মোহ বশতঃ দুঃখের পরিসীমা থাকে না। সে সময়ে আমাদিগের একবার মনে হয় না যে, এই সামান্য বস্তু ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আমরা কি জন্য অনুতাপ করি-তেছি, হয়ত কল্য এই অমূল্য দেহ ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন, "যদি হঠাৎ সংসার পরিত্যাগ করিতে না পার, তাহাতে বিশেষ হানি কিছুই নাই, কিন্তু মোহবশতঃ সকল বিষয়ে মুগ্ধ হইও না।" পিঞ্জরাবদ্ধ একটি পড়াপক্ষী উড়িয়া গেল বলিয়া কোন ধনী তিন দিবস অন্ন জল পরিত্যাগ করিলেন, মাসা-বধি সর্ব্বদা সেই পক্ষীকেই মনোমধ্যে ধ্যান করিলেন। তিনি এরূপ লোক হইতে পারিলেন না যে, যেমন পক্ষীটি উড়িল, অমনি হাসিয়া উঠিলেন——বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এতদিন যাহাকে লালনপালন করিলাম, সে পলাইবার সময় আমার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না! আমি তাহাকে মোহবশতঃ আপনার ভাবিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে আমাকে আপনার ভাবে নাই, এই জন্য অনায়াসে পলাইতে পারিল। এই পক্ষিশাবককে এতদিন

লালনপালন করা কি আমার অকার্য্য হইল? না,* পক্ষী আমাকে বিস্তর জ্ঞান দিয়া গেল। ইহাদ্বারা আমাকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, পক্ষী যেমন সুবিধা পাইবামাত্রই পলাইল, সেইরূপ আমার প্রাণপক্ষী এক দিবস পলায়ন করিবে। যাহাকে দীর্ঘকাল এই দেহ-পিঞ্জরে রাখিবার জন্য এতদূর যত্ন করি, যাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মোহবশতঃ কত গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হই; পাছে আমার মন ব্যথা পায়, এই কারণে শারীরিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কত নিয়ম লঙ্ঘন করি, কিন্তু কিছুতেই সে আমার হইবে না, তাহা এক্ষণ হইতে জানিয়া রাখা উচিত। স্ত্রীপুত্র ও আত্মীয়বন্ধু সকলেই এক দিন না এক দিন ঐ পক্ষীর ন্যায় কার্য্য করিবে। যে স্ত্রীর তুষ্টিসাধনের জন্য এই ভবের হাটে মুটের ন্যায় কার্য্য করিতেছি, সে হয়ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এক দিবস পলায়ন করিতে পারে। এই দীর্ঘকালের সহবাস জন্য যে একটা মোহ জন্মিয়াছে, তাহা একবারও মনে করিবে না। তবে পক্ষিকে আমি কেন অকারণ দোষ দিতেছি ও আপনার মনকে কলুষিত করিতেছে? সে ইচ্ছাসুখে পলায়ন করিয়া আমার মোহ-রজ্জুর একটি সূক্ষ্ম সূত্র কাটিয়া দিয়া গেল। সে উড়িল, আমি হাসিলাম, কিন্তু মোহবশতঃ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম না। সেইরূপ আমি যাহাদিগকে লইয়া সংসার করি, তাহারা যখন একে একে আমাকে ত্যাগ করিয়া পলাইতে আরম্ভ করিবে, তখন যদি ঐ পক্ষী পলায়নের মত হাসিতে পারি, তাহা হইলেই এই মোহময় সংসারের মধ্যে থাকিয়া প্রকৃত জ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করা হইবে। কি আশ্চর্য্য, এই মোহপাশে বদ্ধ হইয়া লোক সর্ব্বদা হাহাকার করিতেছে, অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও একটির বিয়োগে সকল সুখে জলাঞ্জলী দিয়া ভুলিয়া

আছে। সকলেই স্পষ্টরূপে জানিতে পারিতেছেন যে, 'এ সংসার কেবল মায়াময়, কিছুতেই কিছু নাই—' মুখে এ কথা সকলেই আবৃত্তি করেন সত্য, কিন্তু কার্য্যকালে সকলেরই এক অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্য যিনি পুত্রশোকাকুলিত ব্যক্তিকে বিশিষ্ট-বিধানে বুঝাইয়া গেলেন, কল্য তাঁহাকেই আবার শোকশয্যায় শয়ন ও অপত্য-বিয়োগে হাহাকার করিতে দেখা যায়—তবে সক-লেই মোহমুগ্ধ! পরের কষ্ট দেখিলে উপদেশ দিতে সকলেই পারেন, কিন্তু উপদেশ গ্রহণে কাহার কতদূর ক্ষমতা সে কথার দিকে কেহই দৃষ্টি রাখেন না।

আমি সংসারে থাকিব, স্ত্রীপুত্রপরিবার লইয়া সংসার করিব, অথচ মোহে মুগ্ধ হইব না—এই ক্ষমতা আমার কিসে জন্মিবে? ইহার জন্য বড় বড় লোকের জীবনচরিত পাঠ করিতে আরম্ভ করি-লাম, তাহাতে কিছুই হইল না। অবশেষে পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে একটি চরিত্র পাইলাম। তিনি সংসারের মধ্যে থাকিয়াও মোহবশতঃ কিছুতেই লিপ্ত হন নাই। তাঁহার নাম মহা-দেব। মহাযোগী বলিয়াও অনেকে তাঁহাকে সম্বোধন করেন। তাঁহার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! যে নবযুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে একে-বারে লোকে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তিনি এতাদৃশী কামিনীকে বাম উরুদেশে বসাইয়া প্রতিক্ষণ পরমাত্মাকে ধ্যান করিতেন। মোহবশতঃ একবারও সেই ত্রিভুবনসুন্দরী ভগ-বতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সংসারী বটেন, কিন্তু সংসারে লিপ্ত নহেন। মহাদেব স্বর্গসুখকে তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া কৈলাস পর্ব্বতের নিভৃত অংশে দারাপুত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া তপঃসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। তাঁহার মন এতাদৃশ

নির্ম্মল ছিল যে, অন্যান্য দেবের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও সেই মহা-যোগীর কিছু মাত্র চিত্ত চাঞ্চল্য হইত না। আনন্দের মধ্যে তিনি সর্ব্বক্ষণ সিদ্ধি খাইয়া সঙ্গীত করিতে ভাল বাসিতেন। ভূত প্রেত পিশাচাদি (পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতিবিশেষ) তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া অনুক্ষণ আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিত, এবং তিনিও তাহাদিগের সহবাসে সমধিক সুখী হইতেন। আপনি সর্ব্ব সুখে জলাঞ্জলী দিয়া কেবল সংসারের মহান্ কল্যাণকর বিষয়ে লিপ্ত থাকিতেন। তিনিই বহু অনুসন্ধানের পর উৎকট উৎকট ব্যাধির মহৌষধ আবিষ্কার করেন। শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া অস্থিসমূহ সংগ্রহদ্বারা শারীরস্থান বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। স্ত্রীপুত্রগণ তাঁহার অভিলষিত কার্য্যে ব্যাঘাত না ঘটায়, এই জন্য তাহাদিগকে সামান্য অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। পৃথিবীতে কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না। ইন্দ্রাদি দেবগণ কত সময় স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছেন, এবং সেই ঐশ্বর্য্যের মোহে কেহ বা আপনার ভ্রাতার, কেহ বা ব্রাহ্মণের কেহ বা স্ত্রীলোকের প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করিয়া আপন আপন বিষয়-বৈভব রক্ষা করিয়াছেন। এটি নিশ্চয় কথা যে, মহামোহ না ঘটিলে কখনই কেহ পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার ইষ্টসাধনে তৎপর হয় না। বেশ্যার মোহে মুগ্ধ হইয়া রত্নাকর বনমধ্যে দস্যুবৃত্তি করিতেন; মহাপ্রাজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য (পুত্র দুগ্ধপান করিতে পাইল না,) এই মোহে তপোবন পরিত্যাগ করিয়া আজন্মকাল কুরুকুলের দাসত্ব করিলেন। মোহবশতই রামচন্দ্র বানরজাতির সহিত সখ্যতা করিতে ঘৃণাবোধ করেন নাই। কৈকেয়ীর কপট মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মহারথ দশরথ রাম হেন প্রিয়পুত্রকে অনায়াসে বনে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার পর সেই পুত্রমোহে মুগ্ধ হইয়া অসময়ে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন।

কাম—রমণেচ্ছার নাম কাম। প্রজাবৃদ্ধির জন্য নরনারীর মনে স্বভাবকর্ত্তৃক কামরিপুর সঞ্চার হইয়াছে। আবার আশ্চর্য্য এই যে, এই সংসারে যে প্রাণীর যেরূপ প্রয়োজন, কাম সেই পরিমাণে সেই সকল প্রাণীর হৃদয়ে সঞ্চার হয়। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশু অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে লোকালয়ের অনিষ্টসাধন হইবে, এই জন্য বৎসরের মধ্যে একবারমাত্র তাহাদের কামোদ্ভব হয়। খেচর পক্ষিগণ বসন্তকালেই কামে আকুল হইয়া সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে, অন্য সময়ে তাহাদের রতি ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যে সকল পক্ষী ও পশু মনুষ্যেরা আহার করিয়া থাকে, অর্থাৎ কুক্কুট, হংস, পারাবত, চড়াই, ছাগ, মেষ ইত্যাদি তাহারা সর্ব্বদাই কামাতুর হইয়া রতিক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে।

অন্যান্য রিপু অপেক্ষা কামরিপু অধিক প্রবল ও ততোধিক অনিষ্টকর। পাছে মনুষ্যগণ কামরিপুর তাড়নায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়, ও শৃগালকুক্কুরের ন্যায় লজ্জাশূন্য হইয়া যেখানে সেখানে কাম-রিপু চরিতার্থ করিয়া বেড়ায়, সেই বিশৃঙ্খলতা নিবারণজন্য প্রাচীন ব্যবস্থাপক ঋষিগণ বিবাহপ্রথা প্রচলিত করেন। একজন পুরুষ একটি স্ত্রীলোককে শাস্ত্রমতে বিবাহ করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। পতি পত্নীর প্রতি অনুরাগশূন্য হইয়া যদি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্যভিচারদোষে দূষিত হইবেন। ব্যভিচারদোষে দূষিত ব্যক্তির প্রতি মনুর ব্যবস্থামতে উৎকট দণ্ড আছে। পুরুষের প্রতি যেরূপ দণ্ডের বিধান আছে, স্ত্রীলোকের প্রতিও তদনুরূপ ব্যভিচার-দোষের সামাজিক ও রাজদণ্ড ব্যতিত পরকালে অনেক দণ্ডের উল্লেখ আছে। শাস্ত্রে কত প্রকারে নরনারীকে নরকের ভয় দর্শান হই-

G D HAZRA & BROTHERS

য়াছে, অর্থাৎ পরস্ত্রীহরণ ও দেবর এবং ভগ্নী পুত্র প্রভৃতি নিকট-সম্পর্কীয়ের সহিত রতিরঙ্গে লিপ্ত হইলে যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য, তাবৎ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের মনে কামানল প্রজ্জ্ব-লিত হইলে সে ভয়ে কয়েক জন লোক ভীত হয়? আরও শাস্ত্র-কারেরা ন্যায়যুক্তিসঙ্গত অনেক প্রবন্ধ প্রকটন করিয়া নরনারীর কামরিপু দমনের বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছেন। অবশেষে রতিক্রিয়ায় যাহাতে ঘৃণা জন্মে, তৎসম্বন্ধে কয়েকজন তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু কামরিপু এতদূর প্রবল যে, তাহা-তেও নরনারীর ঐ রিপুর সমতা বিশেষরূপ কিছুই হয় নাই।

কামে মত্ত হইলে কি নর, কি নারী একেবারে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়, অকাতরে অর্থব্যয় করিতে থাকে, তৎকালে তাহাদিগের পশ্চাদ্দৃষ্টি থাকে না, ভবিষ্যতে কি হইবে ভাবিয়া দেখে না। যে যাহার প্রতি আসক্ত হয়, তাহাকে পাইবার জন্য অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে, যে নারী অন্ধকার রজনীতে একাকিনী আপন গৃহে থাকিতে ভয় পায়, সেই স্ত্রীলোকই কামাতুরা হইয়া মেঘাচ্ছন্ন ঘোরা রজনীতে একাকিনী নির্জ্জন কাননে বসিয়া রজনীযাপন করিয়াছে। অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কহেন যে, উপদেশদ্বারা অন্যান্য রিপুগণের দমন করিতে পারা যায়, কিন্তু কামরিপুর দমন সহজে হইবার নহে। পৃথিবীতে নরনারীর যত প্রকার আমোদস্থল আছে, রতিক্রিয়া তাহার সর্ব্বোপরি। কামে মনুষ্যকে যতদূর বিহ্বল করে, কামরিপু চরিতার্থের জন্য লোকে যত-দূর অকাতরে অর্থব্যয় করিতে পারে ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, এরূপ আর কোন কারণেই পারে না।

কামের অধিষ্ঠাতা দেব মদন। গ্রীকেরা তাঁহাকে "কিউপিড"

নাম দিয়াছেন; কিউপিডের দুই চক্ষু অন্ধ—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কামাতুর ব্যক্তিমাত্রই অন্ধ হইয়া পড়ে। হয় ত একজন কন্দর্প-তুল্য পুরুষ দেবাঙ্গনার ন্যায় বিবাহিতা মহিলাকে পরিত্যাগ করিয়া একটা কুৎসিতা বেশ্যার প্রতি কামাসক্ত হয়। তবেই মদন নিতান্ত অন্ধ, তাঁহার চক্ষু থাকিলে তিনি ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারিতেন। আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক সময়ে যাহার জন্য লোকে উন্মাদ হইয়া উঠে, ক্রীতদাসের ন্যায় যে কামিনীর সেবা করে, যাহার তুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে না, সেই কামিনীর সহিত রিপু চরিতার্থ হইলে, মুহূর্ত্তকালের মধ্যে পূর্ব্বানুরাগ একেবারে তিরোহিত হইয়া পড়ে। কোন কোন পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, উৎকট কামরিপুর প্রাদুর্ভাবে যে স্ত্রীপুরুষ রতিরঙ্গে লিপ্ত হয়, তাহাদের প্রণয় কোনকালে দীর্ঘকালস্থায়ী হইবার নহে। এরূপ সঙ্ঘটন একটি রোগের মধ্যে ধরিতে হয়। প্রাপ্তির জন্য যতদূর ব্যগ্র, পরিত্যাগেও তদনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ কর, দুইটি যুবক যুবতী বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছে, পরস্পরের দীর্ঘকাল মিলনে সৌহার্দ্দ্য বদ্ধমুল হইয়া উঠে, সে বন্ধুতা আজীবনকাল চলিয়া আইসে। কিন্তু যে নরনারী কামানলে প্রপীড়িত হইয়া উভয়ের চেষ্টায় উভয়ে সংযুক্ত হয়, কিছুকাল উপভোগের পর, তাহাদিগের মনে আর পুর্ব্বানুরাগ থাকে না, এ ব্যবহার স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমান দেখিতে পাওয়া যায়। তবেই যে সকল পণ্ডিতেরা কামকে একটি রোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না। এ কি আশ্চর্য্য কথা! এক সময়ে যাহার মিলনের জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে, কিছুকাল পরে সেই সাধের ধনকে বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্রও কষ্ট বোধ হয় না। তবেই প্রকৃত প্রণয়ের

G. D. HAZRA & BROTHERS
PHARMACY

সহিত কামের অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি আপনার স্ত্রীর প্রণয়পাশে বিলক্ষণ আবদ্ধ আছে, হৃদয়ের সহিত আপন পত্নীকে স্নেহ মমতা করে, তথাচ সেই ব্যক্তি সময়ে সময়ে কামাতুর হইয়া অন্যা স্ত্রীতে আসক্ত হয়; আবার কিছু পরেই তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করে। এরূপ শত শত দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটি নর বা নারী ক্ষণকাল উভয়ে সংযুক্ত হইবার জন্য আপনাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বহুদিনে ও বহুকষ্টে তাহাদিগের সেই আশার সুসার হইলেই অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই তরঙ্গ একেবারে নিবৃত্তি পাইয়া যায়, আর পরস্পরের সে রূপ ব্যগ্রতা থাকে না। তবেই কাম নূতনপ্রিয়—যেমন গোবৎসাদিকে পুরাতন তৃণ পরিত্যাগ করিয়া নব নব তৃণের অগ্রভাগ ভক্ষণ করিতে দেখা যায়, কামাতুর যুবক যুবতীরাও তদনুরূপ। অনেক যুবক যুবতীর গোপনচরিত্র অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায় যে, কোনও কোনও যুবতী তাহার স্বামীর প্রতি বিশেষ অনুরাগিনী, তথাচ সুযোগ পাইলেই পরপুরুষে আসক্ত হইয়া আপন কামরিপুকে চরিতার্থ করে। কিন্তু পরক্ষণেই আর তাহার সে ভাব কিছুই থাকে না, 'কি করিলাম' বলিয়া হয়ত আপনা আপনিই লজ্জিতা হয়, কাম যখন শরীরে প্রবল হইয়াছিল, তখন লজ্জা ভয় কিছুই ছিল না। অনেক স্ত্রীলোকের ভাব এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যতদিন তাহাদিগের সন্তান সন্ততি না জন্মিয়াছিল, ততদিন তাহারা ব্যভিচারিণী ছিল, যখন পুত্রবতী হইল, তখন তাহাদিগের সে কুপ্রবৃত্তি একেবারে নিবৃত্তি পাইয়া গেল। তবেই এই সংসারে কামদেব নরনারী লইয়া যেরূপ ক্রীড়া কৌতুকে অবস্থান করিতেছেন, তাহার বিশেষ তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে মানুষের মনে হঠাৎ বিবেক আসিয়া উপস্থিত

হয়। কোন ব্যক্তি আপনার স্ত্রীকে পরম পবিত্রা বলিয়া জানিত, তাহার ন্যায় পতিপরায়ণা ও সুশীলা আর কাহাকেও দেখিত না। দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ এক দিবস তাহার স্বামী দেখিতে পাইল যে, বাটীর একজন ভৃত্যের সহিত গোশালার অভ্যন্তরে তাহার সেই পতিপরায়না স্ত্রী রতিবিহ্বলা হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইতেছে! তাহার পতি এই অঘটন ঘটনা দেখিয়া চিত্রপুত্তলির ন্যায় কিয়ৎকাল সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া কহিল, "পৃথিবীতে এমন স্ত্রীলোক নাই যে, একপুরুষে অনুরক্তা হইয়া আজীবন কাটাইতে পারে। এই দুশ্চারিণীদিগের জন্য যাহারা একেবারে পরমাত্মচিন্তায় বিরত হয় এবং তাহাদিগেরই অন্ন বস্ত্রের কারণ গর্হিত পাপাচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে ধিক্! আমি এই অকিঞ্চিৎকর সংসার এক্ষণেই পরিত্যাগ করিতেছি। আজি বুঝিলাম, অসতী স্ত্রীলোকের পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই!"

সহজেই এই ভূমণ্ডলের সমস্ত প্রাণী কামমদে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার উপর আবার মনুজকুলের রসজ্ঞ কবিগণ সেই কামাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতেছেন। কিসে কাম নিবারণ হইবে তাহার অনুসন্ধান করেন না। যাহারা কামের উদ্দীপক তাহাদিগকে নানা ছন্দবন্ধে বর্ণন করিয়াছেন—যথা দক্ষিণদিকের শীতলবায়ু, চন্দ্রের শুভ্র ও স্নিগ্ধ কিরণ, ভ্রমরের ঝঙ্কার, কোকিলের কুহুরব, পুষ্পোদ্যান, সঙ্গীত, বিলাসগৃহ, রমণীর কটাক্ষশর, মরালের ন্যায় জঘন, গুরুভার নিতম্ব, উন্নত বক্ষ, এই সকল, বিষয় লইয়া কবিরা এরূপ অলঙ্কারযুক্ত করিয়া বর্ণন করিয়াছেন যে, তৎপাঠে অনভিজ্ঞ যুবক যুবতীগণের মন কামরসে বিহ্বল হইয়া উঠে। মহাপ্রাজ্ঞ পরাশর মুনি তীর্থস্নান মানসে যমুনা পার হইতেছিলেন, ধীবরকন্যা

নবযৌবনা মৎস্যগন্ধা সেই পরাশর মুনিকে একক পার করিতে ছিল। যুবতী হাবভাবের সহিত নৌকাচালনা আরম্ভ করিলে, বৃদ্ধ পরাশর মুনিও একেবারে কামমদে মাতাল হইয়া উঠিলেন! ধীবর-কন্যার নিকট লোকধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে লজ্জা-বোধ করিলেন না,—ধীবরকন্যা বলিয়া মনে ঘৃণাবোধ হইল না! অনূঢ়া কন্যাহরণে কিঞ্চিন্মাত্রও ধর্ম্মভয় করিলেন না! যে পরাশর মুনি আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়নকর্ত্তা, সেই মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিবর মৎস্যগন্ধার বাহ্যিক লাবণ্যদর্শনে সর্ব্বধর্ম্ম নাশ করিয়া এক প্রকার বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিয়াছিলেন। কামরিপুর ভয়ঙ্কর ক্ষমতার বিষয় বিশেষ বর্ণনা করিতে গেলে আপনা আপনি লজ্জাবোধ হয়। মহাভারতে লেখা আছে, কোনও বিপিনবাসী ঋষিকুমার একটি যুবতী হরিণীর লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া-ছিলেন, দৈব প্রতিকূলবশতঃ পাণ্ডুরাজার শরক্ষেপণে সেই ঋষি-কুমারের মৃত্যু হয়। সুযোগমত স্থানে লাবণ্যবতী যুবতী পাইলে, পরিত্যাগ করেন এরূপ পুরুষ সংসারে আছেন কি না সন্দেহ। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, 'এককুম্ভ ঘৃত অনলের উত্তাপে রাখিলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তাহা দ্রবীভূত হয়।' সেইরূপ যুবতী স্ত্রী মনোমত পুরুষের নিকট কিয়ৎক্ষণের জন্য উপবেশন করিলে সাত্ত্বিক ভাবে তাহার মন আর্দ্র হইবেই হইবে, নিতান্ত নৈকট্যসম্বন্ধ থাকিলেও মনের চাঞ্চল্য নিবারণ থাকিতে পারিবে না, কেবল সুযোগের অভাবেই অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে থাকিবে।

কামসম্বন্ধে যে কয়েক পৃষ্ঠা লিখিত হইল, ইহাই পাঠ করিয়া পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, ষড়রিপুর মধ্যে কামরিপুর কার্য্য কতদূর জঘন্য এবং লোকাচার ও ধর্ম্মাচারবিরুদ্ধ। কোনও কবি অর্থক-

যানে আরোহণ করিয়া সমুদ্রপথে আসিতেছিলেন, দৈবাৎ সিন্ধুকূলে একটি পরমা সুন্দরী যুবতী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। পোতস্থ অন্যান্য ব্যক্তিরা ঐ রমণীকে দর্শন করিয়া কবিবরকে কহিলেন, "মহাশয়! আমরা অনুমান করিতেছি, এই স্ত্রীলোকটি কোনও জলমগ্ন পোত হইতে বহুকষ্টে আত্মরক্ষা করিয়াছে, এক্ষণে উপায়বিহীনা হইয়া এই জনশূন্য উপকূলে বসিয়া আছে—আসুন, আমরা সাধ্যানুসারে ঐ ললনার সাহায্য করি।" কবি কহিলেন, "ঐ যুবতীর জন্য আপনাদিগকে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যগ্র হইতে হইবে না; ও সাঙ্কেতিক স্থানে বসিয়া আপন নায়কের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। রমণী যেরূপ হর্ষপ্রফুল্ল-মুখে বসিয়া আছে, বোধ হয় উহার নায়ক আগতপ্রায়!" কবির এই কথা শুনিয়া পোতস্থ অন্যান্য লোক হাস্য করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি কবি, কবির কল্পনার সীমা নাই, এই জনশূন্য স্থানে একটি সুন্দরীকে দেখিয়া আপনি যে এ কথা বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!" এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে একটি পরম সুন্দর যুবা পুরুষ অশ্বারোহণ করিয়া ঐ স্ত্রীলোকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যুবতীর হস্ত ধরিয়া আপন অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। তাহার পর যুবকযুবতী কোথায় চলিয়া গেল, কেহই দেখিতে পাইল না। এই অভূতপূর্ব্বব্যাপার দর্শনে পোতস্থ সমস্ত ভদ্রলোক একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন ও সবিনয়ে কবিকে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি যথার্থই ভাবুক; যুবতীর প্রকৃতভাব কিরূপে বুঝিতে পারি-লেন, আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন।" কবি কহিলেন, "এ ত সামান্য কথা, ইহাও আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবেক? ঐ স্ত্রী-লোক যদি বিপদে পড়িয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তিনী হইয়া থাকিত, তাহা হইলে অনুক্ষণ জলের দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিত এবং আমাদিগের
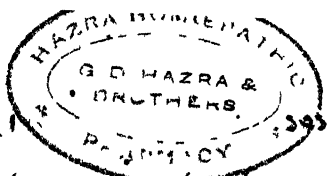
পোত দেখিয়া সঙ্কেতদ্বারা বিপদ জানাইত; তাহা না হইয়া ঐ দুশ্চারিণী একদৃষ্টে বনপথের দিকে চাহিয়াছিল। পোতে বসিয়া আমরা উহাকে বহুক্ষণ হইতে দেখিতেছি, কিন্তু ও আমাদিগের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করে নাই; যেহেতু উহার অন্য দিকে দৃষ্টিপাতের অবসর ছিল না, কেবল তদ্গতচিত্তে নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া ছিল।"

কামে নরনারীকে যেরূপ বিহ্বল করিয়া রাখিতে পারে, এরূপ আর কোনও রিপুদ্বারাই হয় না। লোকে লজ্জাহীন, ভয়হীন, জ্ঞানহীন ও স্নেহমমতাবিহীন যেমন কামরিপুদ্বারা হইতে পারে, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পুরাণ ও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটি সুরূপা যুবতীকে লাভ করিবার জন্য, অসহায় বৃদ্ধ জনক-জননীকে পরিত্যাগ করিতে পুত্রের মনে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কোচ হয় না। এমন কতশত দেখা গিয়াছে যে, কেবল কামরিপু চরিতার্থ করিবার জন্য সম্ভ্রান্তকামিনীগণ অনায়াসে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া উপপতির সহিত দেশদেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে। যে কামের দ্বারা এতদুর অনিষ্ট ঘটে, যাহার দ্বারা জগৎ মুগ্ধ হইয়া আছে, সে কাম নিবারণ কিসে হইবে, তাহার চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য।

কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন যে, যাহার শরীরে কামের আধিক্য, সে প্রণয় কি পদার্থ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রকৃত প্রণয় এক ভিন্ন দুইয়ের সহিত হয় না। যেমন লোভী ব্যক্তিরা যাহা দেখে তাহাই লইতে ইচ্ছা করে, অসম্ভব ও সম্ভব বলিয়া জ্ঞান করে না, প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজন বলিয়া বোধ থাকে না, কামুক ব্যক্তিরাও তদনুরূপ—তাহারা পরমাসুন্দরী ও সুশীলা-পত্নীর পতি হইয়াও পরকীয়া রসাস্বাদনের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়ায়! যুবতী

স্ত্রীলোক তাহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইবা মাত্রই তাহার সহিত সহবাস ইচ্ছা একবারে প্রবল হইয়া উঠে। বোধ কর, সেই পুরুষের অভিলাষ মত কার্য্য একবার সম্পন্ন হইল, তাহাতে তাহার কামের শমতা হওয়া দূরে থাকুক, পুনর্ব্বার নূতন রমণী-উপভোগ ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে! একজন পণ্ডিত পরিহাসচ্ছলে কহিয়াছেন যে, "আমাদের তেত্রিশ কোটী উপাস্য দেবদেবী আছেন, তাহাতেও আমরা সন্তুষ্ট না হইয়া এক্ষণেও নূতন নূতন দেবদেবীর আবিষ্কার করিতেছি, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা সেই একমাত্র ঈশ্বরকে ভজনা করিয়াই পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। সেইরূপ কামুক পুরুষেরা পতিপরায়ণা রমণীর ভর্ত্তা হইয়াও বিশুদ্ধ প্রেম যে কি পদার্থ— তাহা জানিতে পারে না, কেবল কুক্কুরের ন্যায় নিত্য নূতন নূতন কুক্কুরীতে আসক্ত হয়। তাহারা যদি রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহানুভবগণের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিত, তাহা হইলে মনোমত এক রমণীতেই আশক্ত হইয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।"

কামাতুর ব্যক্তিরা অকারণ কতদূর লাঞ্ছনা ভোগ করে যে, তাহা বর্ণনাতীত! এক কামরিপুর আধিক্যের জন্য সময়ে সময়ে তাহারা সমস্ত সুখে বঞ্চিত হয়, তথাচ তাহাদিগের চৈতন্যোদয় হয় না! সকল কার্য্যেরই একটি মুল অভিপ্রায় আছে, কিন্তু কামুকদিগের সর্ব্বদা নূতন রমণীর লালসা যে কি জন্য হয়, তাহা তাহারা নিজেই অনুভব করিতে পারে না। যেমন কতকগুলি লোক আপনার জেদ বজায় রাখিতে গিয়া বর্ণনাতীত কষ্টভোগ করে, সেইরূপ কামুক ব্যক্তিরা যখনই একটি সুরূপা স্ত্রীকে নয়নপথে

প্রাপ্ত হন, দৃষ্টিমাত্রেই তাহার সহিত সহবাস করিবার জন্য একেবারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠে, ঐ কামুক ব্যক্তির মুহূর্ত্তকালমধ্যে বুদ্ধির ভ্রম ঘটিয়া যায়, সে ভাবিতে পারে না যে, "কি জন্য মনের চাঞ্চল্য ঘটিল? উহাকে আমার প্রয়োজন কি? যেহেতু উহাপেক্ষা শতগুণে রূপসী আরও আছে, যদ্যপি এই স্ত্রীলোকের জন্য আমাকে বিশেষ বেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ অর্থনাশ, তৎসঙ্গে মাননাশ, লোকলজ্জা ও অজ্ঞাত স্থানে প্রবেশ জন্য প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।" এই ক্ষণিকসুখের কারণে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, তথাচ কামুকের চৈতন্য হয় না। এই নিমিত্ত আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, "এক পবিত্র প্রণয় শিক্ষা দেওয়া ব্যতিরেকে কামুকের কাম দমনের উপায়ান্তর নাই। বিশিষ্ট বিধানে লোককে বুঝাইয়া দেওয়া চাই যে, এক প্রণয় কখনও দ্বিখণ্ড হয় না।"

দাম্পত্যপ্রণয় অপেক্ষা সুখ পৃথিবীতে আর নাই! পরকীয়ের পদে পদে উপসর্গ। মনন হইতে উন্মাদ পর্য্যন্ত পরকীয় প্রেমের নয় প্রকার লক্ষণ। এই প্রণয়ে কখনও কখনও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে, ইহাকেই দশম দশা কহে। দর্শন মাত্রেই মনন হইবে, সেই মননকালীন যদি মনকে জ্ঞানদ্বারা প্রবোধ দিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে মন আর কামিনী-বশীকরণে প্রবৃত্ত হয় না। সেই ক্ষমতা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের আছে, অজ্ঞানের নাই। যেমন কোনও ব্যক্তি নদীতীরে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, অপর পারে যাইবার নিমিত্ত নৌকা প্রস্তুত নাই, কার্য্যের ত্বরা আছে বলিয়া সেই ব্যক্তি সন্তরণদ্বারা নদী পার হইবার মনন করিল; সে কার্য্যটি সম্ভব কি অসম্ভব, মনে মনে আবার আপনি তাহার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। অবশেষে ধার্য্য করিল যে, "এতবড় প্রশস্ত নদী সন্তরণ দ্বারা পার হওয়া

আমার সাধ্য নহে!' সুতরাং একেবারে সে কার্য্যে ক্ষান্ত হইয়া নৌকার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। এক ব্যক্তি অত্যন্ত আম্র ভাল বাসেন, নিজগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইবার সময় পথিপার্শ্বস্থ আম্রবৃক্ষের উচ্চশাখায় একটি পক্ক আম্র দেখিলেন, সেই ফলটি খাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত লালসা হইল। দর্শন ব্যতিরেকে লালসা জন্মে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। আম্রফলপ্রাপ্তির মনন হইবা মাত্রই পথিক মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 'অত বড় উচ্চ শাখায় আরোহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, ও শাখা মনুষ্যের ভার সহনের উপযুক্ত হইতে পারিবে না।' সুতরাং আম্রের আশা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই দুইটি স্থলে দুই ব্যক্তি যেমন বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিলেন, নারীদর্শনে কামুকের পক্ষে সে বিবেচনার ব্যতিক্রম ঘটিয়া যায়।

বোধ কর, একজন পথিক রাজপথ দিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে কোনও ধনাঢ্য লোকের অট্টালিকার গবাক্ষদ্বারে একটি সুরূপা যুবতী দাঁড়াইয়া ছিলেন। দৈবাৎ পথিক এবং সেই স্ত্রীলোকের চারি চক্ষু একত্রিত হইল। স্ত্রীলোক তৎক্ষণাৎ গবাক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিলেন, কিন্তু পথিক সেই খানেই দাঁড়াইল, আর চলিতে পারিল না! স্ত্রীলোকটি পুনর্ব্বার গবাক্ষের দ্বার খুলিয়া রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সেই পথিক সেই খানেই দাঁড়াইয়া আছে!—যুবতী স্ত্রীসুলভ মৃদু হাস্য করিয়া পুনরায় গবাক্ষ রুদ্ধ করিলেন। সেই হাস্যে পথিক একেবারে মরিল, সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। ভাবিল 'আর সংশয় কি, আমার প্রতি অবশ্যই যুবতীর মনন হইয়াছে!' এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে পুনর্ব্বার সেই যুবতী দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন এবং আপন সহচরীকে অঙ্গুলিদ্বারা সেই পুরুষকে দেখাইয়া উভয়ে হাস্য করিতে করিতে পুনর্ব্বার দ্বার রুদ্ধ

G D HAZRA & BROTHERS
PHARMACY

করিয়া দিলেন। তদ্দৃষ্টে পথিক আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া মনে মনে ভাবিল, 'এইবার সহচরী আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আসিতেছে!' এই ভাবিয়া গবাক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল। রাজপথে অবিরত লোকজন চলিতেছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। স্তম্ভিতের ন্যায় কেবল সেই গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময়ে ঐ বাটীর একজন যুবক বেত্রহস্তে দ্রুতপদে তাহার সম্মুখে আসিয়া—'পাজি! তুই কি জন্যে জানালার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিস্?' বলিয়া দুই তিন বেত্রাঘাত করিলেন। বেত্রাঘাতে পথিকের চৈতন্যোদয় হইল। 'না মহাশয়! কই কিছু নয়' বলিয়াই সে স্থান হইতে পলায়ন করিল! পথিক বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া আপন বাটীতে গমন করিল বটে, কিন্তু তৎনও ভয়ানক কামরিপু তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। কামের উত্তেজনায় পুনর্ব্বার তাহার মনে অনুকূলচিন্তা আসিতে লাগিল। পথিক ভাবিল, "ঐ ছোঁড়াই আজ সমস্ত কাজ পণ্ড করেছে। বোধ হয়, ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের এই সব কাণ্ড দেখ্‌তে পেয়ে মারমুখো হয়ে এসেছিল। সেই যুবতীর মন আমার প্রতি সমানভাবেই আছে, কাল পুনরায় সেই জায়গায় দাঁড়াতে হবে, এ সকল কার্য্যে অনেক দৈববিড়ম্বনা ঘটে থাকে, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া পথিক সে দিবস অতিবাহিত করিল। পরদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই অট্টালিকার সম্মুখবর্ত্তী রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেও সেই গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটিত হইল না। পথিক হতাশ হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল। পুনর্ব্বার কাম তাহার দুরাশা উদ্দীপন করিয়া

দিল। ভাবিল, "সেই যুবকই হয়ত সেই রমণীর ভর্ত্তা। সে দিবস সে আমাকে যেরূপ প্রহার করিয়াছিল, ঐ রমণীও আমার জন্য সেইরূপ প্রহার সহ্য করিয়া থাকিবেন, এই জন্যই অদ্য গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিতে সাহসী হইলেন না। যাহা হউক ক্ষান্ত হওয়া হইবে না, বাটীর অভ্যন্তরে একজন চতুরা দূতী পাঠাইতে হইবে।" অনেক অনুসন্ধানের পর সেই বাটীর গোয়ালিনীকে দূতী নিযুক্ত করিল। চতুরা গোয়ালিনী তাহাকে আশা দিয়া একবৎসরকাল অর্থশোষণ করিল, অবশেষে আর তাহাকে দেখা দিল না। পথিক যদিও সর্ব্বতোভাবে হতাশ হইল, তথাচ সেই পথ দিয়া গমনাগমন করিবার সময় সেই গবাক্ষের দিকে কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিপাত না করিয়া যাইতে পারিত না।

কামের আধার কামিনীগণকে দর্শনমাত্রেই পুরুষের মন মুগ্ধ হইয়া উঠে। যদ্যপি সেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিতে পারে, তবেই সুমঙ্গল, নতুবা আশার দাস হইয়া অকারণ অবিরত নানা কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

চিকিৎসকেরা কহিয়া থাকেন যে, "বলবানের শরীরেই রোগ প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করে, শুষ্কশরীরে তদনুরূপ হয় না।" সেইরূপ ধনবান্ ও ভোগবিলাসী লোকের মনে কাম অধিক প্রবল হয়। নির্ধন ও কষ্টসহিষ্ণু লোকের মনে তাদৃশ হয় না। মুনিঋষিরা সর্ব্বাগ্রে ষড়রিপুকে আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিতেন—অর্থাৎ চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়া তন্মধ্যে বসিয়া থাকিতেন, শীতের সময় স্নিগ্ধজলে শরীর মগ্ন করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন, ক্রমে ক্রমে আহার কমাইয়া শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেন। এইরূপ কঠোর বৃত্তি অবলম্বন করায়

G D HAZRA & BROTHERS
PHARMACY

রিপুগণ হীনবল হইয়া পড়িত। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে বলা হইয়াছে, যে পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা মন যে সকল সংবাদ প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা তিনি বাহ্যজগতের সমস্ত অবগত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন। সেই পাঁচটি ইন্দ্রিয় মুনিগণের মনকে কোন মতেই মত্ত করিতে পারিত না, যেহেতু তাঁহারা নিবিড় বনমধ্যে বসিয়া কঠোর তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতেন। যখন দেখিতেন যে, কামাদি রিপুগণ সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তে আসিয়াছে, তখন কেহ কেহ লোকালয়ে আসিয়া নরপতিগণের মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করিতেন। যদিও তাঁহাদিগকে বিলাসপরিপূরিত রাজপুরে কার্য্য-গতিকে বহুক্ষণ বাস করিতে হইত, তথাচ আপনাদিগের শরীরকে পূর্ব্বের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু করিয়া রাখিতেন। বিলাসের মধ্যে অহরহ বাস করিয়াও বিলাসী হইতেন না—সেই পর্ণশালায় শয়ন, সেই ফলমূল আহার করিয়াই শরীর ধারণ করিতেন। যে সকল রাজগণের মন্ত্রিত্বপদে থাকিতেন, তাঁহাদিগকে অত্যাচারী, রাজকার্য্যে অমনোযোগী ও অন্তঃপুরবিহারী দেখিলেই সদুপদেশ দ্বারা কর্ত্তব্য-কর্ম্মে মনোনিবেশ করাইতেন। মহামুনি বশিষ্ঠ দিলীপকে কহিয়া-ছিলেন—"রাজন্! কামরূপা কামিনীর ন্যায় পুরুষে স্বার্থপর হইতে পারে না। দেখুন রাজ্ঞী কেবল আপন কামরিপুকে চরিতার্থ করিবার জন্য দীর্ঘকাল আপনাকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আপনি মহাবলপরাক্রান্ত রাজা, পৃথিবী আপনার তেজ সহ্য করিতে সমর্থা নহেন, সেই তেজ রাজ্ঞী তিনবৎসরকাল অবলীলাক্রমে সহ্য করিলেন, তথাচ তাঁহার কামের শমতা হয় নাই! এখনও তিনি প্রসন্নবদনে আপনাকে রাজকার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিতেছেন না। তাঁহার ইচ্ছা—আপনার এই বিপুল রাজ্য

নাশ হইয়া যাউক, অরাজকের জন্য তস্করে প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করুক, চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠুক, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কেবল আপনি তাঁহার অন্তঃপুর হইতে বাহিরে না আসিলেই যথেষ্ট হইল। মহারাজ! কামাতুরা কামিনীর কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহাদিগের ক্ষমতারও পরিসীমা নাই! দেখুন একটি রমণী আপনাকে তিনবৎসরকাল অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক দিনের জন্যও বলেন নাই যে, 'আপনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন।' তিনিও আপনার নিকট ধর্ম্মপাশে বদ্ধ আছেন, আমিও ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া আপনার মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করিয়াছি। সেই জন্য রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, কিন্তু রাজ্ঞী অনায়াসে স্থির ছিলেন। রাজ্যশাসনে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে রাজ্ঞীকেও যে পাপপঙ্কে নিপতিত হইতে হয়, বোধ হয় তাহা তিনি একবারও ভাবেন নাই।"

রাজা লজ্জিত হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন, "হে গুরো! যে কামে মুগ্ধ হইয়া আমি তিনবৎসরকাল অন্তঃপুরে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই কামের শমতা কি প্রকারে হইবে, তাহা বিবৃত করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" বশিষ্ঠদেব কহিলেন, "কঠোর শাসনের অধীনে না থাকিলে রিপুদমনের উপায়ান্তর নাই। দেখুন যে কার্য্যে যত উপেক্ষা করা যায়, সেই কার্য্য তত অনায়ত্ত হয়। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, 'আহার, নিদ্রা ও রমণীসঙ্গম, যত বাড়াইবে ততই বাড়িবে, যত কমাইবে ততই কমিবে।' আপনি দীর্ঘকাল ভোগবিলাসে লিপ্ত ছিলেন, স্ত্রীসহবাস ও বিলাসভোগ ব্যতিরেকে আর কিছুই করেন নাই এবং আরও কিছুকাল অন্তঃপুরে ঐরূপে আবদ্ধ থাকিলে কেবল আহার, নিদ্রা ও স্ত্রীসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিতেন না।

এক্ষণে আমার উপদেশ গ্রহণ করুন সমস্ত মঙ্গল হইবে। আপনি বহু-কাল স্ত্রীসংসর্গে থাকিয়া হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন, করদরাজগণ আর আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভয় করে না। এই জন্য অচিরাৎ অশ্ব-মেধযজ্ঞ আরম্ভ করুন, কার্য্যগতিকে অবশ্যই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইবে, তাহা হইলেই কিছুকালের জন্য রাজ্ঞীকে চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হইবেন না। রাজ্যরক্ষা ও নিজ নামের গৌরবরক্ষা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। তাহার পর অসিপত্রব্রত আচরণে দীক্ষিত হইলে, কি প্রকারে কাম নিবারণ করিতে হয়, অনায়াসে তাহা শিক্ষা করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা-পালনই পরম ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়সন্তানেরা অক্লেশেই প্রাণ দিতে পারে' তথাচ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না. এই জন্য অসিপত্রব্রত আচরণের ভার আপনাকে সাহস করিয়া দিতেছি। আপনি ও রাজ্ঞী এক বৎসর কাল সর্ব্বদা একাসনে উপবিষ্ট ও এক শয্যায় শয়ন করিবেন, উভয়ের মধ্যস্থলে একখানি শাণিত খড়্গ সংস্থাপন করিতে হইবে, আপনাদিগের উভয়ের মধ্যে যে অগ্রে কামাতুর হইয়া অন্যকে স্পর্শ করিতে যাইবে, সে তৎক্ষণাৎ ঐ শাণিত অস্ত্রে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিবে। অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধানানু-সারে এরূপ পতি বা পত্নীহত্যাতে পাতক নাই।

রাজা কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া অসিপত্রব্রতাচরণে প্রতিজ্ঞা-রূঢ় হইলেন। একবৎসরকাল এইরূপ কঠোর ব্রত আচরণ করিবার উপায় উভয়ে আপনা আপনি অনুসন্ধান করিয়া লইলেন। পাছে পরস্পরকে দেখিলে পরস্পরের কামোদ্রেক হয়, এই জন্য তাঁহারা নির্জ্জনবাসের সময় নয়ন মুদ্রিত করিয়া পরমার্থচিন্তা করিতেন। এক বৎসরের পর উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে, "পুত্রবৎ প্রমদা-

ধর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা অপেক্ষা এরূপ অবস্থায় আমাদিগের চিত্তের সন্তোষ জন্মিয়াছে।' অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্তির পর রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই নিরূপিত সময় ব্যতিরেকে বিলাসগৃহে প্রবেশ করিতেন না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয় বিষয়ই মনুষ্যের আয়ত্তাধীন। তবে অজ্ঞানের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার ক্ষমতা থাকে না বলিয়াই তাহারা দুষ্প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে। জ্ঞানবানের মনেও প্রায় সর্ব্বদা দুষ্প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয়, কিন্তু জ্ঞান-জ্যোতিতে তাঁহাকে ভালমন্দ দেখাইয়া দেয়। যেমন রজনী দুষ্প্রবৃত্তিসাধনের উপযুক্ত সময়—দিবস নহে। সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তিরাই দুষ্প্রবৃত্তির দাস—জ্ঞানীরা নহেন। তস্কর ও লম্পটেরা দিবসে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকে, রজনীতে আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে না, অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের মনের অবস্থাও সেইরূপ। তাহারা সদসৎ কার্য্যের প্রভেদ বুঝিতে পারে বলিয়াই কর্ত্তব্যকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গর্হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু সকল দিক রক্ষা করিয়া যদি সুযোগ হইয়া উঠে, তখন গর্হিতাচরণে আর ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

জ্ঞানবান্ লোকেরা যে কোন কার্য্যে অগ্রসর হন, তাহার চরম ফল বিবেচনা করিয়া সে কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া থাকেন। অজ্ঞানের সে চরমফল বিবেচনা করিবার শক্তি নাই। বোধ কর, কোনও সম্পন্ন লোকের গৃহে দীক্ষাগুরু আসিয়াছেন। বাটীর কর্ত্রীকে দেখিয়া গুরুদেবের কামানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কর্ত্রী যখন গুরুর চরণ পূজা করিতে বসিলেন, তৎকালে গুরুর সাত্ত্বিক ভাবে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, অথাচ গুরু ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না, যেহেতু তিনি

সেই অবস্থাতেই ঐ গর্হিতকার্য্যের চরমফল ভাবিতে লাগিলেন। আপনার মনে আপনি এইরূপ তর্ক করিলেন—"আমি কিসের জন্য ব্যগ্র হইয়াছি? এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নবযৌবনা স্ত্রী কি আমার ভোগ্যা হইতে পারে? যদি আমি বলপ্রকাশ করিতে যাই, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোকটি একবার চীৎকার করিলে, আমার আর লাঞ্ছনার অবধি থাকিবেক না। এমন সম্পন্ন শিষ্যের গৃহ হইতে জন্মের মত তাড়িত হইতে হইবে। আমার শিষ্যের এই অতুল বৈভব দেখিয়া আমি ত লুব্ধ হইতেছি না, তবে শিষ্যের সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়া কামবাণে আহত হইয়া তাহাতে লুব্ধ হইতেছি কেন? এই ক্ষণকালের জন্য কি আমার পশুত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল? কি কারণে আমার শরীর কম্পিত হইল? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কুক্কুরশৃগালের ন্যায় কামাতুর হইয়াছিলাম বলিয়া শরীর কাঁপিয়াছিল। যে কামের দাস হইয়া মহামহোপাধ্যায় মুনিগণও যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, দুরাত্মা কন্দর্প আমাকে সেই পদবীতে লইয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে, যুবতী কন্যার নিকটে নির্জ্জনগৃহে পিতাকেও থাকিতে নাই। পিতা অপেক্ষাও পূজ্য-নীয় জ্ঞানে শিষ্যা আমার চরণবন্দনা করিতে আসিয়াছিল, এই নির্জ্জন গৃহে আমার সমীপবর্ত্তিনী হইতে কিছুমাত্র ভয় করে নাই, এই কন্যা-তুল্য শিষ্যাকে দেখিয়া আমি কন্দর্পপীড়ায় প্রপীড়িত হইলাম? তবেই সময় বুঝিয়া কন্দর্প নরনারীকে আক্রমণ করে, সকল সময়ে নিকটে আসিতে সাহস করে না। সাবধানতা ব্যতিরেকে কন্দর্পের হস্তে নিস্তারলাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। আমি আর কখনও এরূপ যুবতীকে নির্জ্জনগৃহে আমার সমীপবর্ত্তিনী হইতে দিব না, সুন্দরী স্ত্রী সম্মুখে আসিবার অগ্রেই নয়ন মুদ্রিত করিব। যদিও

কার্য্যগতিকে নয়ন উন্মীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই সকল সুন্দরী স্ত্রীকে মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিব। কারণ মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া আমার ত কখনও কামোদ্ভব হয় নাই; তবে এই রক্তমাংসনির্ম্মিত নারীমূর্ত্তি দেখিয়া কি জন্য কামোদ্ভব হইবে ও বুদ্ধির ভ্রম ঘটিবে।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কাম উদ্দীপনের সমস্ত উপকরণই জঘন্য। স্ত্রীলোকের মুখে মুখারোপ করিয়া কামুক পুরুষেরা সুধাপান করিয়া থাকে। কি জঘন্য ব্যাপার! অপর লোকের পরিত্যক্ত মুখের লালা দর্শন করিলেও ঘৃণাবোধ হয়। রতিকার্য্যের সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া এখানে লিখিতে পারা যায় না। তবে পাঠকেরা অনুমানে বুঝিয়া লউন যে, মলমূত্র পরিত্যাগের উপক্রমে যেরূপ নরনারী জ্ঞানশূন্য হয়, স্থান অস্থান বোধ থাকে না, লজ্জা-ভয় তিরোহিত হইয়া যায়, তাহার পর সেই স্বভাবের কার্য্য শেষ হইলেই মনোমধ্যে শান্তির উদয় হয়, রতিক্রিয়াও তদনুরূপ। যাহার তরঙ্গলহরী উপস্থিত হইলে প্রকৃতি ও পুরুষমাত্রেরই বিভ্রম ঘটে, লজ্জা থাকে না, মৃত্যুভয় পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া যায়। তাহার পর ক্ষণকাল সেই পশুবৎ আচরণে লিপ্ত থাকিয়া মন প্রকৃতিস্থ হয়, পূর্ব্বভাবের একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। 'কোথায় আসিয়াছি, কি করিলাম, কি জন্য এতদূর উন্মত্ত হইয়া এই অবস্থায় আসিয়াছি,' এইরূপ মনের ভাব দাঁড়ায়। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, 'রতিক্রিয়ার পর, শ্মশানে শবদাহ করিয়া আসিবার সময় ও উৎকট রোগের শমতার সময় মনুষ্যের মন যেরূপ নির্ম্মল হয়, সেই অবস্থা স্থায়ী হইলে সকলেই সাধুশব্দে বাচ্য হইতেন।'

স্বভাবের বেগ ধারণ করা কাহারও সাধ্য নহে। যেমন নিদ্রা-

HAHNEMANNIC PHARMACY
G. D. HAZRA & BROTHERS

কর্ষণ হইলে বৃক্ষতলে দূর্ব্বাদলশয্যায় লোক অক্লেশে নিদ্রা যাইতে পারে, ক্ষুধার্ত্ত হইলে জঘন্য দ্রব্য আহার করিতেও অরুচি বোধ হয় না, রমণী-উপভোগও সেইরূপ। যাহাদিগের কাম অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, তাহাদিগের পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। কন্দর্পপীড়ায় প্রপীড়িত হইলে নারীমাত্রকেই তাহারা উপভোগ করিতে পারে। আহার নিদ্রা ও স্ত্রীসঙ্গ এই তিনটিকেই আয়ত্তাধীনে না আনিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লোপ হইয়া যায়। যে অধিক নিদ্রা যায়, সে ক্রমে অলসের দাস হইয়া পড়ে। যে অধিক আহার করে, সেও অলসের দাস। যে সর্ব্বদা রমণী-উপভোগ করে, সেও অলসের দাস। এক কাম হইতে মনুষ্যের নিদ্রার আধিক্য হয়, আহারাধিক্য হয় ও আলস্যের আধিক্য হয়। শারীরবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, 'অধিক স্ত্রীসংসর্গ করিলে শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয়, শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিহ্রাস হইতে থাকে।' যে বুদ্ধিপ্রভাবে আমরা অপরাপর জীবের উপর আধিপত্য করিতেছি, যে বুদ্ধিপ্রভাবে আমরা আপনার ও পৃথিবীর কত প্রকার উন্নতি-সাধন করিতে পারি, যে বুদ্ধির অভাব হইলে আমরা কোন কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি না, সেই বুদ্ধি যখন অধিক স্ত্রীসংসর্গে নষ্ট হয়, তখন কামরিপুকে দমন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

হে জ্ঞানবান্ যুবকবৃন্দ! আপনারা একবার বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, একজন কামুকের কামিনী উপভোগ করিবার জন্য যে সকল আয়োজন করিতে হয়, তাহারই নাম বিলাস কি না। যদি পৃথিবীতে পরস্ত্রীলোলুপ পুরুষ না জন্মাইত, তাহা হইলে এতদূর বিলাসের সৃষ্টি হইত না। একটি কুপুরুষ বৈকালে রমণী-মোহন-বেশ

ধারণ করিয়া বাটীর বাহির হইতেছে, তাহার কুরূপকে স্বরূপ করিবার জন্য কতগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন হয় দেখুন,—কদাকার মস্তক ঢাকিবার কারণ একটি বহুমূল্যের টুপী পরিতে হইবে, চক্ষু দুইটি কুঁচের মত ক্ষুদ্র, রমণীমণ্ডলে সে চক্ষু দেখাইতে লজ্জাবোধ-হয়, এই জন্য চক্ষুপীড়ার ভাণ করিয়া স্বর্ণমণ্ডিত একযোড়া চশমাদ্বারা চক্ষু ঢাকিতে হইবে, কৃষ্ণবর্ণ সমুজ্জ্বল করিবার জন্য সাবান, পাউডার প্রভৃতি অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া গাত্রে ঘর্ষণ করিতে হইবে, কেশ সুচিক্কণ করিবার জন্য পমেটম ও ব্রুস প্রভৃতি অনেকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে; নাকটি খাঁদা, দাঁতগুলি ঈষৎ বড়, এইজন্য নাকের অর্দ্ধাংশ চশমায় ঢাকিতে হইবে এবং অপর অর্দ্ধাংশ ও দন্তগুলি রুমালে আবৃত করিতে হইবে! আবার সেই রুমালখানিতে অর্দ্ধভরি আতর ঢালিয়া সৌরভযুক্ত করা চাই! বাবুর শরীর অত্যন্ত মোটা, সেইজন্য গলায় মহিষের কাঁধের মত বিবিধ রঙ্গের ছুলী বাহির হইয়াছে, সেইটি আবরণ করিবার জন্য একটি পাঁচহাতি কম্ফোর্টারের তিন চার ফের দিয়া গলায় জড়াইতে হইবে, লোমযুক্ত জালার ন্যায় উদরটি আট নয় গজ কিঙ্খাপের চীনে কোটে আবৃত; হস্তে দস্তানা, পরিধেয় কালাপেড়ে ধুতী, পায়ে মোজা ও গোরার বাড়ির বুট জুতা; হস্তের দস্তানার উপর দুই তিনটি হীরকাঙ্গুরী; পীঠের দিকে একটু কোল-কুঁজো বলিয়া একখানি সাড়ে তিন গজের শালের রুমালে গাত্র আবরণ করিতে হইবে! এক্ষণে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, বাবুর নিজমূর্ত্তি নাই বলিলেই হয়। সমস্ত পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলে বাবুতে আর একটি কদাকার কাফ্রিতে কিছুমাত্র প্রভেদ বোধ হয় না। এইরূপ বিলাসের শরণাপন্ন হইবার কারণ এই যে, সেই ব্যক্তি যে স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হইয়াছে, সে তাহাকে দেখিয়া সুন্দর বলিবে। যাহা

হউক, সে পরিচ্ছদের উপযুক্ত একখানি শকটারোহণে চিৎপুর রাস্তায় চলিল।

এ দিকে একজন যুবতী বারবিলাসিনী, যাহার শরীরে কয়েকখানি অস্থি একখণ্ড চর্ম্মে আবৃতমাত্র। মুখের বর্ণ সমুজ্জ্বল করিবার জন্য উপরোক্ত বাবু অপেক্ষাও অধিক পরিশ্রম করিয়াছে। রমণীর প্রধান ভূষণ কেশ, সে কেশ বিধাতা তাহাকে যৎসামান্য দিয়াছেন—এই জন্য তাহাতে পরচুলা সংযোগ করিয়া বহুকষ্টে নানা ছাঁদে একটি কবরী বন্ধন করিয়াছে, তাহার উপর অনেকগুলি সোণার ফুল বসান হইয়াছে। চক্ষু দুইটি অতিক্ষুদ্র, স্ত্রীলোকের চক্ষে চশমা ব্যবহার নাই, সেই কারণ কজ্জলের দ্বারা ক্ষুদ্র চক্ষু আকর্ণ টানিয়া লইয়াছে। ভ্রূতে লোম নাই বলিয়া সেই কজ্জল ভ্রূতে সংযোগ করিয়া কামের ধনুকের ন্যায় ভ্রূ আঁকা হইয়াছে। নাসিকার পক্ষে কোন উপায়ই হয় নাই। শুষ্ক ঠোঁট দুখানি অলক্তে রঞ্জিত করিয়া তাহার উপর তাম্বূল চর্ব্বণে সমধিক সমুজ্জ্বল করা হইয়াছে। সোণারই হউক বা গিল্টীরই হউক, বিবিধ আভরণে কর্ণ ও গলদেশ খচিত হইয়াছে। শরীর কাঁচলি ও সাটীনের আঙ্গিয়া আবৃত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যদিও সেই বারবিলাসিনী তরুণবয়স্কা, তথাচ স্বভাবের যে অভাব ঘটিয়াছে, কৃত্রিম কাঁচলি তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়াছে; কোন অংশেই ন্যূনতা লক্ষিত হইতেছে না। হস্ত নানাবিধ আভরণে সুশোভিত হইয়াছে, করপল্লব অলক্তেও অঙ্গুরীতে ভূষিত; গলদেশে হার ও সাতনর দোদুল্যমান, নিতম্বে চন্দ্রহার; বিবিধ ছাঁদে একখানি রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান। চরণে মোজা, লেডী-সুজ ও তাহার উপর মল বাজিতেছে! যেরূপে, স্বভাব তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেইরূপে

চতুরা বারবিলাসিনী নানা কৃত্রিম সজ্জায় তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইয়া ব্যারাণ্ডার কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট আছে। দূর হইতে যে পুরুষ দেখিতেছে, সেই তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বলিয়া বোধ করিতেছে। আমাদিগের পূর্ব্বকথিত বাবুও ঐ ললনাকে দৃষ্টি করিয়া পতঙ্গের ন্যায় সেই নরকাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে ব্যগ্র হইল! *

স্বভাবের অভাব মোচন করিবার জন্যই নানা প্রকার বিলাস-দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তপোবনে শকুন্তলা একখানি বল্কল পরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাতেই মহারাজ দুষ্মন্ত একেবারে মুগ্ধ হন। তিনিও রমণীমোহনবেশে তপোবনে প্রবেশ করেন নাই, শকুন্তলাও রমণীয় বেশ ধারণ করিয়া পুরুষের মনোহরণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তথাচ উভয়কেই দেখিয়া উভয়ের কামনা সিদ্ধ হইল। এক্ষণকার নরনারীগণ কৃত্রিম বেশে কামনাসিদ্ধির চেষ্টা করে, সে কামনা এক জনের সিদ্ধ ও অপরের অসিদ্ধ হইয়া থাকে। একের কামনা—অর্থ, কৃত্রিম-বেশ ধারণ করিয়া সে কামনা তাহার অনায়াসে পূর্ণ হইল। কিন্তু, যে প্রণয়ের কামনায় কুৎসিত শরীর কেবল পরিচ্ছদে সাজাইয়াছিল, তাহার সে বাসনা পূর্ণ হইল না, সুতরাং পরকীয় কেবল বিড়ম্বনা মাত্র সন্দেহ কি? আপনার অবস্থা বুঝিয়া কামনা করা শ্রেয়ঃ। তাহা না হইলে, সে কামনা পূর্ণ হয় না। এখনকার লোকে অবস্থার অনুরূপ কামনা করে না, সেই জন্যই সকলে অসুখী হয়। কোন কদাকার কুৎসিত পুরুষ আপন ধনবলে মত্ত হইয়া এক সুরূপা কামিনীর প্রণয় প্রত্যাশা করিল, কিন্তু সে কামিনী তাহার সম্মুখে আসিতে ভয় করে, তথাচ অর্থের লালসায় তাহাকে নয়ন মুদ্রিত

* এইখানে কামরিপুর প্রসঙ্গ উত্থাপনে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কুরুচির পরিচয় দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।
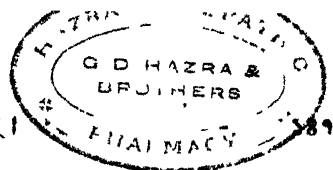
করিয়া বিষভোজনে রত হইতে হইল! এস্থলে কামুক পুরুষের কাম-নিবৃত্তি হইল এইমাত্র, কিন্তু প্রণয় তাহার কাছ দিয়াও গেল না। এরূপ অসংলগ্ন প্রণয় কামনা করা মূর্খের কার্য্য, ইহাতে কেবল পদে পদে কষ্টভোগ করিতে হয় এইমাত্র। একজন বৃদ্ধ যুবকের ন্যায় বেশ ভূষা করিয়া যুবতীর প্রণয়পাত্র হইতে গিয়া সকলের নিকট যেরূপ হাস্যাস্পদ হয়, সেইরূপ একজন বৃদ্ধাও যুবতীর সাজ সাজিয়া যুবজনের মনোহরণ করিতে গিয়া মুহূর্ত্তকালের মধ্যে লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া থাকে। তবেই প্রণয়প্রসঙ্গে যাহার যাহা সাজে তাহার সেইরূপ করাই উচিত।

কোন সুরূপ যুবক এক নৃত্যসভায় বসিয়া বারাঙ্গনাগণের নৃত্য দেখিতেছিল। তাহার মধ্যে সুরূপা ও কুরূপা উভয়বিধ স্ত্রীলোকই ছিল, কিন্তু সকলেই সজ্জা করিয়া হাবভাব ভঙ্গীর সহিত নৃত্য করিতেছে দেখিয়া যুবকের মনে কামাগ্নি জ্বলিল। কামনা হইল যে, 'এই রজনীতেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী স্ত্রীলোকটির সহিত সহবাসসুখে কালহরণ করিব।' কিন্তু গুটিকতক প্রতিবন্ধকের জন্য তাহা হইল না। প্রথম প্রতিবন্ধক, কে উত্তরসাধক হইবে; দ্বিতীয়, লজ্জা ও ভয়; তৃতীয়, সেই মনের চাঞ্চল্যের সময়েও ক্ষণপ্রভার ন্যায় জ্ঞান এক এক বার মনোমধ্যে দর্শন দিতে লাগিল। জ্ঞানের সহিত বুদ্ধির সংযোগ হওয়ায় উভয়ের তর্ক আরম্ভ হইল—জ্ঞান দুর্ব্বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি জন্য তুমি আমাকে হারাইয়া অবোধের ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছিলে?' দুর্ব্বুদ্ধি কহিল,—'আমি চির-কালই বাহ্য শোভায় মুগ্ধ হইয়া থাকি, বিশেষতঃ যুবতীর লাবণ্য-দর্শনে অধিক জ্ঞানহারা হই। কেন হই, তাহা আপনিই বুঝিতে পারি না। অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া এই স্থির করিয়াছি যে, মনু-

ষ্যের শরীরে যত প্রকার স্বাভাবিক শক্তি আছে, তন্মধ্যে কাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রখর। স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিমাত্রেই যেন যথার্থ কন্দর্প আসিয়া কামুকের হৃদয়ে পঞ্চশর নিক্ষেপ করে। তাহা না হইলে হঠাৎ তাহাদের এরূপ ভ্রম ঘটিবে কেন? যখন যে, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অগ্রপশ্চাৎ একবার ভাবিয়া লয়, কিন্তু কামুকেরা কন্দর্পশরে আহত হইলে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না, এই জন্য কামশরে প্রপীড়িত লোকের সহসা বিপদ ঘটিয়া যায়।' একজন কামুক পুরুষ উপর হইতে সিঁড়ি ধরিয়া নামিয়া আসিতেছে, দুইটি যুবতী স্ত্রীলোক সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে, মধ্যপথে তিনজনের সাক্ষাৎ হইল; সে সময় স্ত্রীলোকের মনোগত-ভাব কি, বলিতে পারি না। কিন্তু পুরুষ হিতাহিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও অগ্র-পশ্চাৎ সমস্ত ভুলিয়া গিয়া উন্মাদের ন্যায় বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরিতে গেল! যে কুলটা, সে কহিল,—'কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ কর,এ উপযুক্ত সময় নহে।' কিন্তু যিনি সাধ্বী, তিনি চীৎকার করিয়া উঠি-লেন। তাঁহার চীৎকারের শব্দে আর পাঁচজন লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হইয়াছে?' তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলে, সেই পুরুষ পলায়ন করিল। কামুক পুরুষ নিভৃত স্থানে গিয়া হায় হায় করিতে লাগিল—'কেন এমন কর্ম্ম করিলাম?— এখন কি করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইব!—আমি কি 'ক্ষণ-কালের জন্য পাগল হইয়াছিলাম?' এইরূপ নানা প্রকার অনুতাপ এককালে মনোমধ্যে উদয় হওয়ায় সমস্ত সুখ সত্ত্বেও তাহাকে বর্ণনা-তীত অসুখী করিয়া ফেলিল।

পূর্ব্বের কথা পুনরায় বলা যাইতেছে, যে যুবাপুরুষ সেই নর্ত্ত-কীকে দেখিয়া সহসা জ্ঞানহারা হইয়াছিল, তথাচ সুশিক্ষার কারণে

সেই ভয়ানক সময়েও জ্ঞান ও বুদ্ধির উদয় হওয়াতে সে কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিল। পূর্ব্বে যে কামিনীকে দেখিয়া মত্ততা ঘটিয়াছিল, সে নৃত্যসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, যুবক শান্তমূর্ত্তি ধরিয়া সভায় বসিয়া রহিল। যদিও সেই কামিনীর কমনীয় মূর্ত্তি মধ্যে মধ্যে তাহার মনোমন্দিরে আবির্ভাব হইতে লাগিল, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে আর দুইটি যুবতী আসিয়া রঙ্গভূমে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের রূপমাধুরী পূর্ব্বকথিত কামিনীর অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ঐ দুই জনের মধ্যে একজনের আবার রূপগুণ দুইই সমান। সে যখন হাবভাবের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল, তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সেই যুবক পুনরায় জ্ঞানহারা হইল। উন্মত্তের মনে কখনও জ্ঞানবুদ্ধির লেশ থাকে না, বুঝাইলেও তাহারা বুঝিতে পারে না। যেমন পূর্ব্বে সোপানে উঠিবার সম্বন্ধে একটি কথার উল্লেখ করা গিয়াছিল, যুবকের সহসা সেই পুরুষের ন্যায় উন্মাদ দশা ঘটিল। চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সেই যুবতীর প্রতি চাহিয়া রহিল। সেই ব্যক্তি যে কন্দর্পপীড়ায় প্রপীড়িত হইয়াছে, নর্ত্তকী ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না। কিন্তু যুবক ভাবিতেছে যে,—'যুবতী আমারই দিকে চাহিয়া সঙ্গীত করিতেছে। বোধ হয়, আমারও যে দশা, উহারও সেই দশা ঘটিয়াছে!' সময়ে সভাভঙ্গ হইলে যুবতী সদলে আপন শকটে উঠিল, যুবকও কুটুম্ববান্ধবদের নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়াই আপন শকটারোহণে তাহার অনুসরণ করিল। উভয় শকটই নর্ত্তকীর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। যুবতী সর্ব্বাগ্রে শকট হইতে নামিয়া বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে যুবক সেই অবসরে নর্ত্তকীর অনুচরকে কহিল—'তোমার কর্ত্রীকে সংবাদ দাও যে, নৃত্যসভার একজন বাবু

আসিয়াছেন।'—কিঙ্কর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া ক্ষণকালমধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া কহিল,—"তিনি কহিলেন, 'আমি যে ধনবান্ কর্ত্তৃক রক্ষিতা, তিনি এখানে আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না, অতএব আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন'।" কিঙ্কর যে কয়েকটি কথা বলিল, সকল গুলিই যুবকের পক্ষে বিষবৎ বোধ হইলেও কেবল শেষ কথাটি অর্থাৎ 'অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন'—এই কথাটি কর্ণকুহরে যেন সুধা ঢালিয়া দিল! কিঙ্করকে দুইটি টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইল—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নর্ত্তকী শুনিয়া যদি তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। সে যাহা হউক, যুবক আশায় নৈরাশ হইয়া বাটী প্রত্যাবর্ত্তিত হইল। আসিবার সময় "অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন"—'আহা! কি সৌজন্যের কথা!' ইহা ভিন্ন আর কিছুই ভাবিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। অধিক রাত্রে বাটী আসায় সহধর্ম্মিণী 'বিলম্ব হইল কেন?' বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত যুবক নানা প্রকার মিথ্যাকথা কহিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী সে কথায় প্রত্যয় না করিয়া মনোদুঃখে শয়ন করিলেন। সেই সময় শিক্ষিত যুবকের মনে হঠাৎ জ্ঞানোদয় হওয়ায় আপনা আপনি হাস্য করিয়া উঠিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে,—"মনুষ্যমাত্রেই উন্মাদ। একটি যুবতীকে দেখিয়া আমি এই রজনীতে যাহা যাহা করিলাম, পাগলে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি করিয়া থাকে? নর্ত্তকীকে আমার পূজ্যপাদ কুটুম্ব মহাশয় নৃত্য করাইবার জন্য অদ্য রজনীতে আনাইয়াছিলেন; আমি তাহাকে দেখিয়া কন্দর্পশরে আহত হইলাম! তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম! কিন্তু সে বাটীর দ্বার

হইতে দূর করিয়া দিল! তথাচ তাহার প্রতি অনুরাগের হ্রাস হইল না! আশার দাস হইয়া তাহার কিঙ্করের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিলাম। আবার বাটী আসিয়াও সহধর্ম্মিণীর তিরস্কার খাইলাম। ধন্য কন্দর্পদেব! তুমি যে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবকে ক্ষণকালের জন্য মাতাইয়াছিলে এ কথা সত্য। তুমি লোককে পাগল করিতে পার, অট্টালিকা হইতে লোককে শ্মশানে আনিয়া বসাইতে পার! কাহাকেও প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতে দাও না, কাহাকেও সুখের আবাস হইতে লইয়া গিয়া অরণ্যবাসী করিতে পার। যে জ্ঞানপ্রভাবে তোমার দর্পচূর্ণ করিতে না পারে, তাহার মনুষ্যজন্ম ধারণ করাই বিফল!"

কন্দর্পশরে প্রপীড়িত হইলে অর্থাৎ হৃদয়ে কামাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে, সহসা লোকের নিম্নলিখিত ব্যতিক্রম ঘটে। লজ্জা ও ভয় একেবারে যায়, হঠাৎ বিভ্রম (চিত্তচাঞ্চল্য) ঘটে, আত্মীয়জনের প্রতি মমতাশূন্য হয়, অপরিমিত ব্যয়ে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না। জ্ঞানিগণের নীতিপরিপূরিত কথা বিষবৎ জ্ঞান করে, ক্রোধ ও অভিমানের আধিক্য হইয়া উঠে এবং সমস্ত চিন্তা—যে নারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তন্ময় হইয়া উঠে। কামপ্রসঙ্গে অনেক কথা বলা হইল। কাম উৎপত্তির কারণ বহুবিধ, এক্ষণে নিবৃত্তির কোন উপায় আছে কি না, তাহারই অনুসন্ধান করা যাউক। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'বয়স অধিক হইলে, কাম আপনা হইতেই নিবৃত্তি পায়।' একথা নিতান্ত অলীক। যতকাল শরীরে শক্তি থাকে, ততকাল কামের নিবৃত্তি নাই। তবে শক্তির অভাব হইলে, নিবৃত্তি পাইলেও পাইতে পারে। যাহার বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইয়া ক্ষমতার হ্রাস করিয়াছে, তাহারও

মনের বিকার নিবৃত্তি পায় নাই, ইহার শত শত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কি নিবৃত্তির উপায় নাই? আছে, কিন্তু দুরূহ ব্যাপার! শিব বলিয়াছেন,—'কঠোর যোগ সাধন ব্যতিরেকে কাম-জয়ী হইবার উপায়ান্তর নাই।' কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, অস্মদ্দেশীয় ভদ্রকুলোদ্ভবা স্ত্রীলোকেরা যৌবনে বিধবা হইয়া আজন্মকাল পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন। এদেশের কতকগুলি পুরুষও বহুকালাবধি ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া কাম-রিপুকে একেবারে মন হইতে দূর করিয়াছেন। শিবের উক্তিই সত্য, যোগ ব্যতিরেকে কামকে কোন ক্রমেই দমন করা যায় না। সে যোগ কি? কতকগুলি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হওয়া। আমি পরস্ত্রী স্পর্শ করিব না, যেহেতু কামকে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশের লোক কুকার্য্য বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। যে বিষয়ে পৃথিবী শুদ্ধ লোকের একমত, সে বিষয় অবশ্যই মন্দ, তাহাতে আর সংশয় কি। পূর্ব্বে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে, যে আহার নিদ্রা ও স্ত্রীসহবাস যত বাড়াইবে ততই বাড়িবে। কিন্তু আহার ও নিদ্রার সহিত কামের তুলনা করা যায় না। কেন না, আহার ও নিদ্রার অভাবে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, অন্য কি কথা আহার নিদ্রার অভাবে মনুষ্যের মৃত্যু উপ-স্থিত হয়। চিকিৎসকেরা ধার্য্য করিয়াছেন, এক সপ্তাহকাল আহার না করিলে মৃত্যু ঘটিবে, উপর্য্যুপরি তিন অহোরাত্র নিদ্রা না যাইলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া আপনা আপনিই ঘুমাইয়া পড়িতে হইবে, কোন ক্রমেই নিদ্রাকে বাধা দিতে পারিবে না। কিন্তু কাম সেরূপ নহে, যদি কেহ কার্য্যগতিকে পূর্ণ এক বৎসরকাল কামরিপু চরিতার্থ না করে, তাহা হইলে, তাহার শারীরিক বৈলক্ষণ্য কিছুই ঘটিবে না, তবে মধ্যে মধ্যে মানসিক চাঞ্চল্য ঘটিতে পারে।

মনুষ্যের মন স্বভাবতই চঞ্চল। ইচ্ছার প্রতিকূলে একটা না একটা প্রতিবন্ধক থাকিলে, মনুষ্য মাত্রেই সমস্ত নিষিদ্ধ কার্য্য করিতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অনেক স্ত্রীলোক নব-যৌবনে বিধবা হইয়া আজন্মকাল সৎপথে থাকেন। তাঁহারা যে কখন কখন মদন পীড়ায় প্রপীড়িত হন না—এ কথা কোন ক্রমেই বলিতে পারিব না, তবে যে ইচ্ছাসত্ত্বে কামের অধীন হন না, সে কেবল বিধবাদের ধৈর্য্যগুণ। সে ধৈর্য্য কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? —'পাছে আমার পিতা কি ভ্রাতার কলঙ্ক হয়, পাছে কুলটা বলিয়া আমাকে লোকে বিদ্রূপ করে, পাছে পরপুরুষ সংস্রবে আমার গর্ব্ভ হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে জনসমাজে মুখ দেখাইব? হয় ত লজ্জা ও অপমানের ভয়ে আত্মঘাতিনী হইতে হইবে!' এই সকল বিবেচনা করিয়া অনেক বিধবা মদনবিকার সহ্য করিয়া থাকেন। একটা বিষয় কিছু কাল সহ্য করিয়া থাকিলে, ক্রমে ক্রমে সেটা নিবৃত্তি পাইয়া যায়। আরও এক কথা এই, যে যে বিষয়ে রত নহে, সে সে সকল কার্য্যের প্রতি সহজেই অবহেলা করিয়া থাকে। এক জন সুরাপায়ী অপর এক ব্যক্তিকে সুরা সেবন করিতে দেখিলে, সুযোগ করিয়া তাহার নিকটস্থ হইবেই হইবে, সুরাপায়ী একবার মাত্র অনুরোধ করিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাহার সহিত সুরা পান করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু যে সুরাপানে বিরত, সুরাপাত্র ও সুরাপায়ীকে দেখিলেও তাহার বিরক্তি জন্মিবে। সেই রূপ ধর্ম্মপরায়ণা বিধবারা কামে আজন্ম বিরত হইয়া আছেন। তাঁহাদের নিকট কেহ উক্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেও তাঁহাদের বিরক্তি জন্মে। বিশেষতঃ, যে যে বিষয় ভাল বাসে, সে সেই প্রকার নরনারীর সহিত আলাপ করিয়া থাকে। [illegible] ও কুলটের

দোষগুণ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইতেছে। কুলোক কখন সুলোকের নিকট আসিতে চাহে না; কেননা, কুলোক সুলোকের সহবাসে আমোদ বোধ করে না, সেইরূপ সুলোকও কুলোকের নিকটস্থ হইতে চাহে না। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তাহার সহচর-গণের আচরণ দেখিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। যে কোন কালে বেশ্যালয়ে প্রবেশ করে নাই, লম্পটের সহিত তাহার কি জন্য প্রণয় হইবে? সেই রূপ সতী অসতীর কখন প্রণয় সম্ভবে না। মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, এক জন অসতের বিষয় কার্য্যের অনুরোধে সতের সহিত প্রণয় হইল, যদি সেই অসতের ধারণাশক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই সৎসঙ্গে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। সেই রূপ যদি এক জন ধর্ম্মপরায়ণা বিধবা কার্য্যগতিকে দুই তিন জন কুলটার সহিত বাস করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে ঐ দুষ্টাদিগের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় সেই সতী-রও পূর্ব্ব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতে পারে।

অসৎ কার্য্যে হঠাৎ লোকের সাহস হয় না। যখন কাহারও মনোবৃত্তি অসৎ হয়, তাহার উপর এক জন উত্তর সাধক যুটিলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়! যদি কেহ সেই অসৎ প্রবৃত্তির প্রতি-বন্ধকতাচরণ করে, তাহা হইলে অনেক সময়ে, অসৎ প্রবৃত্তিরও শাম্যভাব উপস্থিত হয়। এক্ষণকার কালে অসৎ প্রবৃত্তির প্রতি-বন্ধকতাচরণ প্রায় কেহই করেন না; এই জন্যই যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিয়া থাকে। পূর্ব্ব কালে দশখানি গ্রামের মধ্যে যদি কোন নরনারী ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে সমাজশুদ্ধ লোক তাহাদিগের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া যত দূর তাহাদিগকে শাসন করা সম্ভব, তাহা অবশ্যই করিতেন। সেই উৎকট শাসনই

অনেক কামুকের অসৎ প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হইত। এ সময়ে সকলেই আপন আপন লইয়া ব্যস্ত; অন্যের দোষানুসন্ধান ও দণ্ড বিধান করিতে কাহারও অবসর হয় না। সুতরাং অসৎ প্রবৃত্তিব নিবৃত্তি পাইবার যে স্থলে কোন বাধা নাই, সে স্থানে অবশ্যই উহা শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। যাহারা আপন গুরু জনকে ভয় ভক্তি করে, ও তাঁহাদিগের উপদেশ নিতান্ত অবহেলা করে না, তাহারাই কুপ্রবৃত্তি সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ শাম্যমূর্ত্তি ধারণ করে।

কোন কোন পণ্ডিত অবধারিত করিয়াছিলেন যে, 'কামে কামুকের ঘৃণা জন্মাইয়া দিতে পারিলেই মনুষ্য সমাজের বিস্তর উপকার হইবে।' তাঁহারা আপন আপন অভিপ্রায়মত কার্য্যও করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু একাল পর্য্যন্ত 'শান্তিশতক' ও 'বৈরাগ্যশতক' পাঠ করিয়া পরস্ত্রী হরণে কোন্ কামুক বিরত হইয়াছে? এই স্থলে রমণী-সঙ্গ সম্বন্ধে দুই জন পণ্ডিতের অর্থ পরিপূরিত সদুপদেশযুক্ত অথচ ব্যঙ্গজনক কথোপকথন নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

রাম ও শ্যাম দুই পণ্ডিত। রাম শ্যামকে কহিলেন—"ওহে, বহু কাল বারাঙ্গনা গৃহে গমন করি নাই।" শ্যাম কহিলেন, "ভালই করিয়াছ, শীঘ্র শমন ভবনে গমন করিতে হইবে না।" রাম কহিলেন—"তুমি অত্যন্ত অর্ব্বাচীন, রমণী ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আর কি সুখের স্থল আছে? শ্যাম কহিলেন—"হাঁ, যদি অসুখকে সুখ বলিয়া ধর, যদি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ধর, যদি নরককে স্বর্গ বলিয়া ধর, তাহা হইলে রমণীর ন্যায় সুখের স্থল আর নাই। তাই, সুরসিক কবিরা রমণীর মুখের সহিত পূর্ণচন্দ্রের, দন্তের সহিত মুক্তার, মুখের লালার সহিত অমৃতের

তুলনা করিয়াছেন। এই কয়েকটি তুলনা লইয়াই অগ্রে তর্ক করা যাউক। রমণীর মুখশ্রী পূর্ণ শশধরের ন্যায় ধ্যান করিয়া লইতে হইবে। অন্য সময়ে হউক বা না হউক, যখন কেহ যুবতীর মুখ দেখিয়া কামোন্মত্ত হয়, তখনই সেই মুখকে চন্দ্র বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। এ শিক্ষা তাহার আপনা আপনিই হয় নাই—অর্থাৎ স্বভাব দত্ত শিক্ষা নহে। কতকগুলি সুরসিক কবি অজ্ঞান যুবাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন। যেমন বালকেরা 'চাঁদা মামার ভিতর বুড়ী চরকা কাটিতেছে,' প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, সেই রূপ কামমত্ত যুবকেরা রমণীর মুখশ্রীকে চন্দ্রের ন্যায় জ্ঞান করে! ভাল, ভাই রাম! তুমিই বিবেচনা করিয়া দেখ, চন্দ্র এক খানি রূপার থালার মত; লাবণ্যবতী রমণীর মুখের সহিত তাহার কি সাদৃশ্য আছে, আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দাও। কতকগুলি কবি রমণীর নাসার সহিত বংশীর তুলনা করিয়াছেন; এই জন্য সচরাচর স্ত্রীলোকেরা কহিয়া থাকে—'আহা! নাকটি যেন বাঁশী!' বংশীত এক পর্ব্ব বংশে নির্ম্মিত হয়, তাহার সহিত সুন্দর নাসিকার কি সাদৃশ্য আসিল, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।"

এই কথা শুনিয়া রাম কহিলেন—"ভাই, তুমি সুরসিক হইলে এ কথা কখনই বলিতে না। রমণীর মুখ কি ঠিক চন্দ্রের মত? তা নয়—অর্থাৎ পূর্ণ চন্দ্র দেখিলে, যেমন মনে মহান্ হর্ষ জন্মে, সুন্দরী স্ত্রীলোকের মুখ দেখিলে, সেই রূপ হর্ষোদয় হয়।" শ্যাম কহিলেন—"তবে এ কথার কি অর্থ করিবে? এক জন সুন্দরী যুবতী মান করিয়া বসিয়া আছেন, তখন তাঁহার মুখখানি ঠিক তোলো হাঁড়ির মত দেখাইতেছে, সুরসিক কবি সে স্থলে বর্ণন

করিলেন—' পূর্ণ চন্দ্র যেন নবীন মেঘে আচ্ছাদিত হইয়াছে!' মান একটা মনের গতিক, অর্থাৎ ক্রোধের শাম্যভাব। কবি সেই মানকে কি বুঝিয়া মেঘ বলিয়া বর্ণন করিলেন? তবে তাঁহারা যাহা বলিবেন, আমাদিগকে তাহাই যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। সুন্দরী রমণীর ভুজের সহিত মৃণালের তুলনা করা হইয়াছে। আইস, আমরা এক খণ্ড কাষ্ঠ কাপড়ে ঢাকিয়া দুই দিকে দুইটি মৃণাল ঝুলাইয়া দিই, উপরে বড় একটা পদ্ম ফুল বসাইয়া তাহার উপর একটা বাঁশী রাখিয়া দিই, বুকের উপর দুইটি জলপূর্ণ কলসী বসাইয়া দিই এবং চরণের স্থানে দুইটি বড় বড় কলাগাছ দিই, এক্ষণে রমণী মূর্ত্তি দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে! কোথায় কালিদাস! কোথায় ভারতচন্দ্র! আসুন, আপনাদিগের বর্ণনানুসারে নারীমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে, আপনারা আসিয়া প্রাণ দান করুন!—তাহার পর, আমাদিগের রাম ভায়া এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর সহিত অদ্য রজনীতে আলাপ করিবেন। ওহে রাম! কবিদিগের কতদুর ক্ষমতা এখন বুঝিতে পারিলে? তাঁহারা কল্পনার দাস— যখন যাহা মনে উদয় হয়, তখনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া বসেন! স্বভাবের সহিত তাহার কোন সংস্রব রাখেন না। এই জন্য বলিতেছি, কবিদিগের সৌন্দর্য্য বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না; স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি সাক্ষাৎ কৃতান্তের মূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিও। যেমন কৃতান্তের চৌষট্টি প্রকার রোগ অনুচর আছে, সেই রূপ রমণী মূর্ত্তিতেও চৌষট্টি প্রকার উপসর্গ আছে। নারী অঙ্গে তাহার সমস্তগুলি বর্ণনা করিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়িবে; এই জন্য দুই চারিটি মাত্র বলা যাইতেছে।

•চরকে লিখিত আছে, 'কৃতান্তের মূর্ত্তি ভাবনা করিলেই মনুষ্য

শরীরে জ্বর আবির্ভূত হয় ' এ দিকে সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিলেও জ্বরের সমস্ত লক্ষণ মনুষ্য শরীরে লক্ষিত হয়। শরীর কম্পিত হয়, গাত্র দাহ হয়, পিপাসা হয়, আহারে অরুচি জন্মে, নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে, অবশেষে মনে বিভ্রম জন্মে। কৃতান্ত-দর্শনে যেমন লোকে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করে, নূতন সুন্দরী নারীমূর্ত্তি দেখিলেও লোকে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে পাইবার জন্য কোন বাধাই বাধা বলিয়া গ্রাহ্য করে না। কৃতান্তের করাল কবলে পতিত হইলে, মৃত দেহ প্রজ্জ্বলিত চিতা-নলে দগ্ধ হয়, রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিলেও কামানলে জীবন্ত শরীর সর্ব্ব ক্ষণ দগ্ধ হইতে থাকে! ঘোর বিকারের সময় মনুষ্যেরা যেমন প্রলাপ দেখিতে থাকে, কামানলে শরীর জর্জ্জরীভূত হইলে নরনারীরাও সেই রূপ প্রলাপ দেখিয়া থাকে; এই জন্যই কুবেরের অনুচর যক্ষ প্রিয়তমা পত্নী বিরহে উন্মত্ত হইয়া প্রাবৃট্ কালীন নব মেঘ দর্শনে তাহাকে দৌত্যপদে নিযুক্ত করিয়া আপন প্রণয়িনীর নিকট সম্বাদ প্রেরণ করিয়া ছিল। এই জন্যই বিয়োগ বিধুরা রাধা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নকে দূত করিয়া মথুরায় পাঠাইতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। প্রলাপ সম্বন্ধে এই দুইটি কথাই যথেষ্ট হইল।

অনেক বিষয় আমরা দেখিতে ভাল বাসি, কিন্তু স্পর্শ করি-লেই অনিষ্ট ঘটিবে, এই জন্য কোন কালে সেই সকল বস্তু স্পর্শ করি না। যখন একটি সুরম্য গৃহে শত শত বর্ত্তী এক কালে জ্বলিয়া উঠে, তখন সে গৃহের শোভা অতি রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই—সে শোভা চক্ষে দর্শন কর; স্পর্শ করিলেই দগ্ধ হইবে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িবে! যখন তিন চারিটি বিষধর সর্প ফণা

বিস্তার করিয়া দুলিতে থাকে, তখন তাহাদিগের সেই ভাব দেখিতে বড় সুন্দর! কিন্তু দেখিতে দেখিতে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া যদি সেই বিষধর সর্পকে ধারণ কর, তাহা হইলে, কালকূট বিষের জ্বালায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। যদি কোন কুহকিনী মদনমোহনী রূপ ধারণ করিয়া কোন বনস্থলীতে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাকে দেখিবা মাত্রই কামাতুর পুরুষ দ্রুতপদে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে চাহিবে, সেও মৃদু মৃদু কপট হাসি হাসিয়া কামমদে মাতাল পুরুষকে যথেচ্ছ স্থানে লইয়া গিয়া প্রাণে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। সেই কামাতুর পুরুষ মৃত্যুকালে আক্ষেপ করিয়া বলিবে—"আমি রাক্ষসীকে মদনমোহিনী ভাবিয়া প্রাণ হারাইলাম! আমি একাকী নহি, আমার ন্যায় অনেক কামাতুর পুরুষ কুহকিনী নারীর হস্তে পড়িয়া এইরূপে বিনষ্ট হয়, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াও কামাতুর পুরুষদিগের চৈতন্য হয় না!"

হে কামুক পুরুষ! পাশব বৃত্তির চরম ফল কি, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? যে নারীর সহবাস সুখের জন্য একেবারে উন্মাদ হইয়াছিলে, কামরিপু চরিতার্থ হইলে আর তাহাকে তত দূর ভাল লাগে না। এই প্রেতের ন্যায় কার্য্য করিবার জন্য, এই নরকভোগ করিবার জন্য, এত উতলা কেন? যখন কামমদে তোমরা মত্ত হও, তখন গৃহের সুখদ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে পদব্রজে বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে কর্দ্দম পরিপূরিত দুই ক্রোশ পথ চলিতে পার! কিন্তু অন্য সময়ে বিশেষ কার্য্য থাকিলেও যানারোহণ ব্যতিরেকে এক পদ চলিতে কষ্ট বোধ হয়। আপন জীবন রক্ষার জন্য যে সকল দ্রব্যের নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা ক্রয় করিবার সময় মূল্যের

লাঘব করিতে মস্তকের ঘর্ম্ম চরণে পাতিত কর, হয়ত অল্প মূল্যের পাইলে উচ্চ মূল্যের দ্রব্য ক্রয় কর না; কিন্তু ঘোর অনিষ্ট-কারী বেশ্যা সংসর্গের জন্য বহু অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতে পার ! যদি আপন বাটীর কোন স্থানে একটা নিষ্প্রয়োজনে আলো জ্বলে, তাহা হইলে, কিঙ্কর বা বাটীর অন্যান্য পরিজনের উপর ক্রোধের পরিসীমা থাকে না ; কিন্তু কামমদে মত্ত হইয়া কত অর্থ অনর্থক ব্যয় কর, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি ! হয় ত কোন কোন সময়ে কোন কুলটার লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য দূতীকে অর্থ দান, আপন বেশভূষা ক্রয় ও অন্যান্য প্রকারে কত দূর অপব্যয় করিয়া থাক।

যে অর্থ নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়া উপার্জ্জন কর, তাহা এই রূপ অপব্যয় করিতে কষ্ট বোধ হয় না কেন ? কিসের জন্য এতদূর বিভ্রম ঘটে ! বেশ্যা সংসর্গের ফল কি ? তাহাতে কি উপকার হইতে পারে ? যে কার্য্যের জন্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, যে কার্য্যের ক্ষণিক সুখ ব্যতীত কিছু মাত্র ফল নাই, সে কার্য্যের জন্য এতদূর ক্লেশ স্বীকার করিবার, এতদূর চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাইবার প্রয়োজন কি, সে কথা একবারও চিন্তা কর না কেন ? কেন ইচ্ছা পূর্ব্বক অসুখকে সুখ জ্ঞান করিয়া পুরীষ পরিপুরিত কূপে নিপতিত হও। যদি বাৎসল্যভাবে আপন দ্বাদশবর্ষীয়া দুহিতাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পার, তবে সেই-রূপে দ্বাদশবর্ষীয়া একটা গণিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে মনের ভাবান্তর ঘটিবে কেন ! সেস্থলে ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম মনে বিরাজ-মান না রাখ কেন !

কামের আর একটি নাম কামনা, কাম ও কামনায় প্রভেদ কি ?

G D HAZRA & BRUTHERS PHARMACY

আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা চতুর্ব্বর্গ ফলের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। তাঁহারা বলেন 'ধর্ম্ম হইতে অর্থ হয়,' অর্থ হইতে কামনা সিদ্ধ হয়, কামনা সিদ্ধ হইলেই মোক্ষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।' দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এ কথা সর্ব্বকালে ও সকল অবস্থায় খাটে না। পুরাণাদি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, পূর্ব্বকালে ধর্ম্ম হইতে অর্থ হইত সত্য; কিন্তু এক্ষণকার কালে এক অধর্ম্মই হইয়াছে ধনের আকর স্থান। এক্ষণকার লোকেরা এমন একটা প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন না যে, কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মপথে চলিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ধর্ম্ম-সঞ্চিত অর্থদ্বারা লোকে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনারূঢ় হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন; এইজন্য রাজকোষ অতি অল্পদিনের মধ্যেই ধনে পরিপূর্ণ হইল, তদ্দৃষ্টে সজ্জন সভাসদেরা কহিলেন "মহারাজ! আপনার কোষে যথেষ্ট ধন সঞ্চিত হইয়াছে, যদি কোন কামনা থাকে ত এই সময়ে সম্পাদন করুন্।" ধর্ম্মপুত্র তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে তাঁহার রাজকোষে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে ধন সঞ্চিত হইল। এইরূপ স্থলে ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কামনা সিদ্ধ, কামনা সিদ্ধির পর মোক্ষ হইল, দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় অধিকাংশ লোকে নানা কৌশলে, নানা পাপাচরণে, কায়মনোযত্নে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাদিগেরও উদ্দেশ্য যে, ধনদ্বারা কামনা সিদ্ধ করিবে; কিন্তু এক্ষণকার লোকের কামনাও স্বতন্ত্র। ধন হইলেই ভাবে, 'কিসে আপনি সুখে ও আমোদে কালহরণ করিব, গবর্ণমেণ্টের নিকট মান

পাইব, লোকে আমার পদানত হইয়া থাকিবে, ক্রমে ক্রমে আমি ঐশ্বর্য্য বাড়াইব, আমার অবর্ত্তমানে আমার পুত্রপৌত্রাদি আমোদ আহ্লাদ ও সুখে কাল কাটাইবে ইত্যাদি।

মনের অভীষ্টকে কামনা কহে। কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি পাতাল সকল স্থলের জীবই কামনার অধীন। মরুৎরাজ শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন কি জন্য?—ইন্দ্রত্ব কামনায়। লঙ্কাধিপতি দশানন স্বহস্তে আপন শিরশ্ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন কি জন্য?—অমর হইবার কামনায়। এই সংসারের মনুষ্যমাত্রেই আপন আপন কামনা সিদ্ধির জন্য শশব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাহারও কামনার অন্ত নাই! এক কামনা হইতে অন্য কামনা, এইরূপ কামনা ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে। বোধ করুন, ধন নাই—উৎকট পরিশ্রম করিয়া ধনকামনায় বিদ্যা অর্জ্জন করিলাম, বিদ্যার প্রভাবে ধনের মুখ দেখিলাম, ধনবান্ হইবা মাত্রই কি কামনার শেষ হইয়া গেল? না, ধন পাইয়া ধনলালসা আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল! কামনাও সহস্রবদনে কামনা আরম্ভ করিল—ধন হইল, পুত্র নাই। পুত্র কামনায় যাগযজ্ঞ দ্বারা দেবতার তুষ্টিসাধন করিতে আরম্ভ করিলাম, দেবানুগ্রহে পুত্র হইল। বিদ্যার প্রভাবে ধন হইল, দেবতা প্রসাদে পুত্র হইল; তাহাতেও মনের কামনা শেষ হইল না। পুনরায় কামনা হইল, 'কিসে সমাজে মান প্রাপ্ত হইব? সমাজে মান প্রাপ্ত হইতে লাগিলাম, তথাচ কামনার শেষ নাই! 'কিসে সমাজের শ্রেষ্ঠ লোক হইব?—এই কামনা উদয় হইল। এইরূপ যিনি রাজা, তিনি সম্রাটের পদ কামনা করেন, সে কামনা সিদ্ধ হইলেই ইন্দ্রত্বপদ পাইবার কামনা হয়, তাহার পর ব্রহ্মত্ব—এইরূপ ক্রমে ক্রমে কামনা ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে।

কামনা দুই প্রকার, সৎকামনা ও অসৎকামনা। সৎকামনা সাধারণের অনিষ্টকর হয় না, বরং সর্ব্বতোভাবে সকলের পক্ষেই ইষ্টকর হয়। অসৎকামনা সর্ব্বদাই আত্মপীড়ক ও পরপীড়ক হয়। রাণী অহল্যা বাই স্বর্গলাভের কামনায় জলশূন্য স্থানে শত শত জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। পান্থ জনের গমনাগমনের সুবিধার জন্য বন জঙ্গল কর্ত্তন করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতেন, দরিদ্রকে ধন দান করিতেন এবং সজ্জন ও সাধুব্যক্তিগণকে বিবিধ উপচারে পূজা করিতেন। তাঁহার এই সৎকামনার জন্য শতসহস্র লোকের বিশেষ রূপে উপকার হইয়াছিল। এ দিকে আলাউদ্দীন চিতোরেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইবার কামনা করায়, তাঁহাকে সহজে প্রাপ্ত হইবার উপায় না দেখিয়া হরণ করিবার জন্য সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সেই যুদ্ধে আলাউদ্দীনের বিপুল অর্থনাশ হইল ও উভয় পক্ষের সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া গেল।

সকল কামনাই সহজে সিদ্ধ হয় না। একটি কথা আছে যে, 'প্রথমে উপযুক্ত হও, তাহার পর কামনা করিও।' কোন ব্যক্তির সমাজে শ্রেষ্ঠত্বলাভের কামনা জন্মিল। একপ কামনা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেখা উচিত যে, যে সকল গুণ থাকিলে সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায়, তাহা তাঁহার আছে কি না? সমাজের শ্রেষ্ঠত্বলাভ কামনা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। ইহাতে ধৈর্য্য চাই, বীর্য্য চাই, গাম্ভীর্য্য চাই, বিনয় চাই, নম্রতা চাই, বুদ্ধি চাই ও সময়ে সময়ে অকাতরে অর্থব্যয় করা চাই। সক্রেটিসে ঐ সকল গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত বলিয়া সমাজের লোক তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে মান্য করিত। গ্রীসের অজ্ঞ

কতকগুলি লোক, যাঁহাদিগের ঐ সকল গুণ ছিল না, তাঁহাদিগেরও শ্রেষ্ঠত্বলাভ কামনা ছিল; কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন, 'সক্রেটিস গ্রীসের মধ্যে শ্রেষ্ঠলোক' এই কথা অরেকেল্ হইতে দৈববাণী হইয়াছে, তখন বিনা কারণেও তাঁহারা সক্রেটিসের শত্রু হইলেন। কারণ কতকগুলি দাম্ভিক লোক গুণবান্ না হইয়াও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কামনা করে! সেই অসৎদিগের কামনা সিদ্ধ না হইলে, অকারণ সাধু ব্যক্তির শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এ দিকে কতকগুলি সৎ লোক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া সক্রেটিসের নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিতে গেলেন। তাঁহারা সক্রেটিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাত্মন্! কি গুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়, তাহা আপনার নিকট শিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আমাদের এই কামনা পূর্ণ করুন। কারণ অরেকেল্ হইতে দৈববাণী হইয়াছে যে, আপনি গ্রীসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" সক্রেটিস কহিলেন "হাঁ, দৈববাণী অবশ্যই সত্য; কিন্তু আমাতে যে কি শ্রেষ্ঠত্ব আছে, তাহা আমি আপনা আপনি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনারা বিশেষ মনে রাখিবেন যে, সৌজন্য কামনা সিদ্ধি চেষ্টার একমাত্র উপায়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা খড়ি মাখিয়া সুন্দর হইবার চেষ্টা দেখে; কিন্তু তাহাতে কখনই বর্ণ সুন্দর হয় না। যাহারা না জানিয়াও 'জানি' বলিয়া আত্মশ্লাঘা করে, তাহারা আপন উন্নতির পথে কন্টক বিস্তার করিয়া থাকে এই মাত্র।"

যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন উভয়েরই হস্তিনার সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার কামনা ছিল। যুধিষ্ঠির নিজ গুণে সর্ব্বসাধারণ প্রজার মনোরঞ্জন করায় প্রজারা সর্ব্বদাই বলিত "আহা! কবে যুধিষ্ঠির রাজা হইবেন, রাজপুত্রগণের মধ্যে তিনিই রাজসিংহাসনের

BROTHERS
PHARMACY

যোগ্যপাত্র।” দুর্য্যোধনের তাদৃশ গুণ ছিল না, তথাচ তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির কামনা থাকায় তিনি নানা প্রকার অসৎ কৌশলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে নষ্ট করিয়া আপনার কামনা সিদ্ধির চেষ্টা দেখিতেন; কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; কেননা, সজ্জনকে সজ্জনেরাই রক্ষা করেন, আর অসৎকে অসতেরাই নষ্ট করে। যাহাদিগের প্রবৃত্তি অসৎ তাহাদিগের কামনাও অসৎ। সেই অসৎকামনা সিদ্ধির জন্য অসতের দ্বারা অসৎকার্য্যের সম্পাদন করাইতে হয়, সুতরাং তাহার দ্বারা সাধারণের অনিষ্ট ঘটে।

মনুষ্যগণের দুরূহ কামনা করা উচিত নহে। সেরূপ কামনা কখন সুসিদ্ধ হয় না, সুতরাং দুরূহ কামনা সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে নানা ক্লেশ ও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে; অবশেষে হয়ত সেই দুরূহ কামনা সিদ্ধির চেষ্টাই তাহার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রান্সের সম্রাট হইয়া কামনা করিয়াছিলেন, সমস্ত ইয়ুরোপ বাসীকে এক ভাষায় কথা কহাইবেন, এক ধর্ম্মাবলম্বী করিবেন, এবং তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে; কিন্তু তাঁহার এই অসম্ভব কামনা সুসিদ্ধ হইল না। তিনি এই কামনা সিদ্ধির জন্য যে চেষ্টা করিলেন, সেই চেষ্টাই তাঁহার পতনের প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

আমাদিগের শাস্ত্রে নিষ্কাম হইয়া কার্য্য করিবার কথা আছে। আমি দুঃখীকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ দান করিলাম, কিন্তু যশঃকামনায় দশজন লোকের সম্মুখে করিলাম না; আমি সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে একটি পুষ্করিণী খনন করাইলাম; কিন্তু সম্মানের প্রত্যাশায় গবর্ণমেণ্টের চক্ষের উপর না করাইয়া যে স্থানে

জলকষ্টের পরিসীমা নাই, সেইখানেই পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিলাম, এরূপ কার্য্যকে নিষ্কাম কার্য্য কহে।

কেহ কেহ কল্পিত সুখের কামনায় আপন বর্ত্তমান সুখে জলাঞ্জলি দেয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে 'দুই হস্ত ঊর্দ্ধে রাখিয়া জীবন কাটাইলে চরমে শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।' সেই কল্পিত সুখের কামনায় জন্মের মত দুই হস্ত অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিলাম। যাহারা অতুল সুখ স্বত্বেও সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বনে প্রবেশ করে, আমরা তাহাদিগকে ঘোর মূর্খ বলি। যাহারা পৃথিবীর অতুল সুখ প্রাপ্ত হইয়াও কল্পিত স্বর্গ সুখের আকাঙ্ক্ষায় আপনাকে বর্ণনাতীত কষ্ট দেয় ও নিজের কামনা সুসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আপন পরিবারদিগের কামনা সিদ্ধির পক্ষে স্বয়ংই বিষম বাধক হইয়া উঠে, সেস্থলে তাহাদিগকে মূর্খ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? সজ্জনগণের মতে মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া পরিমিতাচারে আপনি সুখী হও, আত্মীয় বান্ধবকে সাধ্যমত সুখী কর ও জনসাধারণ যাহাতে পরস্পর সুখী হয়, এই কামনা কর; তাহা হইলেই ইহ জগতে থাকিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করা হইবে।

গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া কতকগুলি কামনা অপরিবর্জ্জনীয়। যেমন বাল্যকালে বিদ্যালাভের কামনাকে কোন কালেই কেহ অন্যায় বলেন না; তৎপরে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য ধনের কামনা অবশ্য ন্যায়সিদ্ধ বলিয়া ধরিতে হয়; অপত্যবিহীন লোকের অপত্য কামনাও সেই রূপ।

সংসারের প্রজাপুঞ্জ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত,—রাজ্যেশ্বর, ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র। এই চতুঃশ্রেণীর আপন আপন অবস্থানুরূপ

BROTHERS PHARMACY

কামনা করাই উচিত, ইহা অপেক্ষা অতিরেক কামনা করিতে গেলেই সে কামনা প্রায় সুসিদ্ধ হয় না, সুতরাং অকারণ মনঃপীড়া ভোগ করিতে হয়। অবস্থানুরূপ যাহা প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া যে ধরে ও অপরিমিতাচারে উহা ব্যয় না করে, সেই ইহ সংসারে পরমসুখে কালযাপন করিতে পারে। কোন ব্যক্তির মাসিক দুই শত টাকা আয়। তাহার পিতা পূর্ব্বে যে বেতন পাইতেন, সেই টাকার উপর নির্ভর করিয়া আপন মান সম্ভ্রম রক্ষা করত পুত্রকে দুইশত টাকা মাসিক বেতন আনিবার উপযুক্ত করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। এখন তাঁহার পুত্রের দুই শত টাকাতেও কামনা পূর্ণ হয় না! সে অধিক ধনলোভের কামনায় আপনার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাতে ব্যবসায় আরম্ভ করিল। যে চিরকাল কেরাণীগিরি করিয়া আসিতেছে, সে ব্যবসায়ের কি জানে? সুতরাং পরের দ্বারা ব্যবসায় চালাইতে গিয়া লাভে মূলে নষ্ট হইল। সেই ব্যক্তি দুই শত টাকা মাসিক আয়ে কিছুকাল যে টুকু সাংসারিক সুখ ভোগ করিয়াছিল, অধিক ধনের কামনায় ব্যবসায় করিতে গিয়া তাহার বিনিময়ে এক্ষণে দশগুণ কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল।

সকল কালের ও সকল দেশের পণ্ডিতেরা কামনা সম্বন্ধে নানা প্রকার যুক্তিমূলক উপদেশ দিয়া থাকেন। সময়ের স্রোতে আপনার অবস্থানুরূপ যাহা কিছু সম্মুখে আসিতেছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও। কামনার দাস হইয়া আমরা সময়ে সময়ে অনেক মনঃপীড়া সহ্য করিয়া থাকি। কামনার দাস হইয়া একটি কামনা করিলাম, সেই কামনা সিদ্ধির জন্য যথোচিত চেষ্টা করিলাম; কিন্তু অবশেষে তাহা সুসিদ্ধ হইল না। সেই কারণে অনর্থক

একটি মনঃপীড়া সহ্য করিতে হইল। যদি মনের শান্তি চাও, তাহা হইলে, আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক, ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া ধর, নিষ্কাম হইয়া আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিলে, পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবে। ইহা নিশ্চয় জানিও যে, কামনাই আমাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে কষ্ট দিয়া থাকে। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মকে কহিয়াছিলেন, যে ‘ অঋণ ও অপ্রবাসী না হইয়া দিবসের শেষভাগে যে শাকান্ন ভোজন করিতে পায় সেই সুখী।’ আর একস্থলে বশিষ্ঠ মুনি দিলীপকে কহিয়াছিলেন, ‘ যদি নিষ্কাম হইতে পার, তবেই সুখী হইবে, নতুবা কামনার দাস হইয়া চিরকাল সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, কোন কালেই মনে শান্তিলাভ করিতে পারিবে না।

ক্রোধ—ছয় রিপুর মধ্যে ক্রোধ আত্মপীড়ক ও পরপীড়ক। ক্রোধ উদয় হইলে মনুষ্যের হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি হঠাৎ ভয়ানক কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে! একাল পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই ক্রোধকে অনিষ্টকর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, স্বভাবদত্ত আমাদিগের যে কয়েকটি রিপু (নিকৃষ্ট বৃত্তি) আছে, কার্য্যবিশেষে তৎসমুদয়েরই প্রয়োজন হয়। ক্রোধ আত্মপীড়ক ও পরপীড়ক বটে, কিন্তু সেই ক্রোধই সময়ে সময়ে আত্মরক্ষক ও পররক্ষক হয়। যেমন কোন ব্যক্তি আমাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেখানে ক্রোধরিপু না থাকিলে আত্মরক্ষা হয় না; কিম্বা কোন ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তি অকারণ দারুণ প্রহার করিতেছে, সেস্থলে আমি এই অন্যায় কার্য্য দর্শনে ক্রোধে স্ফীত হইয়া তাহাকে সেই নির্দ্দয় ব্যক্তির হস্ত হইতে নিস্তার করিতে

অগ্রসর হইলাম। ক্রোধের প্রধান সহচর সাহস; সেই সাহসই ক্রোধকে উত্তেজিত করে। সাহস ও ক্রোধ স্বরাজ্য রক্ষা ও পররাজ্য হরণের প্রধান উপয়োগী। ক্রোধের আর একটি সহচর আছে, তাহার নাম কলহ। ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইলেই সাহস আসিয়া উপস্থিত হয়, সাহসের পশ্চাতেই কলহ সহচর দাঁড়াইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, ক্রোধের উৎপত্তি স্থল কোথায়? মনঃক্ষুণ্ন হইলে অসন্তোষ জন্মে, সেই অসন্তোষই ক্রোধের উৎপত্তি স্থল। আমি যাহা দেখিতে চাহি না, যাহা শুনিতে চাহি না, যাহা খাইতে ইচ্ছা করি না, যাহা সহ্য করিতে পারি না, অর্থাৎ এক কথায় বলিতে হইলে, ইচ্ছার প্রতিকুলকার্য্য ঘটিলেই অসন্তোষ উপস্থিত হয়; সেই অসন্তোষ হইতেই ক্রোধের আবির্ভাব। ক্রোধের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে, অর্থাৎ সামান্য ক্রোধ, অভিমানযুক্ত ক্রোধ, আত্যন্তিক ক্রোধ ইত্যাদি। যে ক্রোধের কলহ সহচর হয়, সেই ক্রোধ ক্রমে ক্রমে উদ্দীপ্ত হইতে থাকে। যে ক্রোধকে সাহস সহায়তা না করে, সে ক্রোধ অভিমানে পরিণত হয়।

সামান্য অপরাধে আমাকে একজন প্রহার করিল, তৎক্ষণাৎ আমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল; কিন্তু সাহস নাই বলিয়া তাহাকে আমি প্রহার করিতে পারিলাম না, সুতরাং ক্রোধ উগ্রমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অভিমানে পরিণত হইল। যদ্যপি সেই প্রহারের কোন রূপে পরিশোধ লইতে পারি, তাহা হইলে মনের শান্তি হয়, নতুবা সেই অভিমান আত্মপীড়ক হইয়া আঘাতকারীর অনিষ্ট চেষ্টায় দীর্ঘকাল চেষ্টিত থাকে; রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিবার কারণই সেই। একজন প্রজা ভুম্যধি-

কারী কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি প্রপীড়িত হইল, সেই কারণে তাহার মন ক্রোধে অভিভূত হইয়া উঠিল; কিন্তু ভূম্যধিকারী সবল ও সে হীনবল এই জন্য তাহার ক্রোধ অভিমানে পরিণত হয়। অভিমানীরাই ঈশ্বর ও রাজার নিকট আপন মনের আক্ষেপ বিজ্ঞাপিত করে। পীড়ক অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কখন আত্মনাশ করিয়া থাকে। কোন পতিপ্রাণা সতীর পতি বেশ্যাসক্ত হইয়া উঠিল; সেই সংবাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ক্রোধে শরীর জ্বলিতে লাগিল! ভৎর্সনাচ্ছলে পতিকে যথোচিত উপদেশ দিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র ফল দর্শিল না; অবশেষে, সেই ক্রোধ ঘোর অভিমানে পরিণত হইল। মনের আক্ষেপ মনের মত লোকের নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহাতেও মনঃস্থির হইল না; অবশেষে, অভিমান ভীষণ ভাব ধারণ করায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই সাধ্বী কুলকামিনী অনায়াসে আত্মনাশ করিয়া ফেলিলেন।

কিঙ্কর পরিধেয় বস্ত্রখানি আমার মনোমত করিয়া কোঁচাইতে পারে নাই, এই জন্য 'তুই বেটা কি কাপড় কোঁচাতে শিখ্‌চিস্?' বলিয়া তাহাকে এক চপেটাঘাত করিলাম; তাহাতে সে অভিমানবশতঃ কার্য্য পরিত্যাগ করিল। আমি দুই তিন দিবস উপযুক্ত কিঙ্কর প্রাপ্ত হইলাম না। যে কাপড় কোঁচানতে সামান্য বৈলক্ষণ্য ঘটায় উপযুক্ত কিঙ্করকে প্রহার করিয়া বিদায় করিলাম, অদ্য কিঙ্করাভাবে বস্ত্র 'হাতকোঁচা' করিয়া পরিতে হইল। পূর্ব্বে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলাম, তজ্জন্য অদ্য কিঙ্করাভাবে আপনা আপনি অনুতাপ করিতে হইল।

একজন সৌখিন বাবু অন্নাহার করিতে বসিয়াছেন, প্রথম

BROTHERS PHARMACY

ব্যঞ্জন মুখে দিয়াই দেখিলেন, তাহাতে অতিরেক্ত লবণ দেওয়া হইয়াছে। সেই জন্য ক্রোধে অন্ধ হইয়া পাচককে এক চপেটাঘাত করিলেন ও তাহারই সম্মুখে অন্নের থালখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আহার স্থানের কিঞ্চিৎ অন্তরে তাঁহার বৃদ্ধা জননী বসিয়া হরিনাম জপ করিতেছিলেন, সেই থাল ছুটিয়া আসিয়া জননীর জানুদেশে আঘাত লাগাতে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, চারি দিক হইতে হাহাকর ধ্বনি উঠিল! বাবু দৌড়িয়া আসিলেন, ক্রোধ কোথায় পলায়ন করিল! 'হায়, মাতৃহত্যা করিলাম!' বলিয়া বাবুকে ক্ষণকালের জন্য রোদন করিতে হইয়াছিল। মাতার চৈতন্য সম্পাদন হইলে, বাবু সর্ব্বসমক্ষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'অদ্য আমার বিলক্ষণ চৈতন্য হইল। যাহাতে একেবারে ক্রোধ-রিপুকে দমন করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা দেখিব।' এরূপ ক্রোধকে পণ্ডিতেরা শিক্ষাস্থলে উপমা দিয়া থাকেন। যাঁহারা সামান্য ক্রোধে অন্ধ ও দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের উপরোক্ত উদাহরণ দুইটি স্মরণ করিয়া রাখা উচিত।

আত্মপীড়ক ক্রোধের আর একটি ঘটনা লেখা যাইতেছে। একজন কেরাণী বিংশতি মুদ্রা বেতনে কোন কার্য্যালয়ে নিযুক্ত ছিল। এক দিবস সে নিয়মিত সময়ের অর্দ্ধঘণ্টা পরে কর্ম্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় অফিস-মাষ্টার তাহাকে যথোচিত ভৎসনা করাতে কেরাণী ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাটী চলিয়া গেল। দুই তিন মাস বেকার বসিয়া থাকায়, সংসার নির্ব্বাহের জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল। উত্তমর্ণেরা প্রত্যহ তাগাদা করিতে আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে যথোচিত ভৎসনা

করিতে আরম্ভ করিল। তখন সে মনে মনে অনুতাপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, “তখন প্রভুর ভর্ৎসনা অসহ্য বোধে কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে এই নীচ লোকের ভর্ৎ-সনা অনায়াসে সহ্য করিতেছি! ভবেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা গেল যে, কর্ম্ম ত্যাগ আমার ক্ষমতার অধীন বলিয়া ক্রোধ বশতঃ তাহা করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে ঋণ পরিশোধে অক্ষম বলিয়া অনায়াসে উত্তমর্ণগণের কটু বাক্য সহ্য করিতেছি! তাহাদিগের কথায় ক্রোধ করিতেছি না, বরং অপ্রতিভ হইতেছি। যদি হস্তে টাকা থাকিত, তাহা হইলে, আমার প্রকৃতি আর এক প্রকার হইয়া দাঁড়াইত; হয়ত উত্তমর্ণগণকে তিরস্কার করিয়া বলিতাম, যাও, আমার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ কর গে, কটু কাটব্য বলিবার কি ক্ষমতা রাখ? না হয়, কটু বাক্য অসহ্য বোধে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলি-তাম। আমি কি অবস্থায় অবস্থিত তাহা মনুষ্য মাত্রেই বুঝিতে পারে। অবস্থানুসারে রিপুগণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এক জন মাননীয় লোক আমার বাটীতে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে “আসিতে আজ্ঞা হউক” এই কথা বলিতে যদি বিলম্ব হয়, তাহা হইলে হয় ত, তিনি ক্রোধ করিয়া আমার বাটী পরিত্যাগ করেন। তাহা অপেক্ষা উচ্চ বংশাবতংশ এক ব্যক্তি দীনতা প্রযুক্ত আমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে, তাহার কথায় কর্ণপাত না করিলেও সে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমার বাটী পরিত্যাগ করে না। আমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য করিয়াছি, ইহাকে এক প্রকার বালকের ‘আবদার’ বলি-লেও বলা যায়। ক্রোধের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা। সর্পের

লাঙ্গুল মাড়াইলে সে তৎক্ষণাৎ দংশন করে; কেন করে? আমা কর্ত্তৃক আহত হইয়াছে বলিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া আমার অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। আমি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রভুর কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছি? আমার কার্য্যকেই প্রবাদ কথায় বলিয়া থাকে—'চোরের উপর রাগ করিয়া মৃৎপাত্রে ভাত খাওয়া।' অবোধ ও অক্ষমের ক্রোধ কেবল আত্মপীড়ক ব্যতিরেকে পর-পীড়ক হয় না; যথা—বালক জননীর উপর ক্রোধ করিয়া সমস্ত দিবস আহার করিল না, বধূ শাশুড়ীর উপর ক্রোধ করিয়া বস্ত্রাভরণ পরিত্যাগ করিলেন, গৃহিণী ক্রোধ করিয়া ভাণ্ডারের চাবি স্বামীর নিকট ফেলিয়া দিয়া আসিলেন—এইরূপ ক্রোধ কেবল আত্মপীড়ক হয়, পরপীড়ক হয় না।

বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্যতিরেকে ক্রোধকে আয়ত্তে রাখিয়া পরের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারে বাঙ্গালার সমস্ত সম্পন্ন ব্যক্তিই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সে ক্রোধকে ধৈর্য্য-রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিয়া অত্যাচারীকে একেবারে জন্মের মত নষ্ট করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন; সময়ে তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। ঐ সকল মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক যে রূপ অপমানিত হইতেন, এক জন সামান্য ব্যক্তিও তাহা সহ্য করিতে পারে না, তথাচ তাঁহারা ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিয়া শেষে যথেষ্ট সুখসম্ভোগ করিয়াছিলেন।

ধনবান্, বলবান্ ও ক্ষমতাবান্ লোকেরও অধিক ক্রোধ হয়। ধনবান্কে যখন সর্ব্ববিধায় সন্তোষ করিতে স্বভাব পারেন না, মনুষ্য কি প্রকারে তাঁহার সন্তোষ সাধন করিবে? ধনীর মন

সদা সর্ব্বদাই, অসন্তুষ্ট হইয়া আছে ; কারণ, পৃথিবীর সমস্ত অসন্তোষ ইচ্ছাপূর্ব্বক টানিয়া আনিয়া তাঁহারা হৃদয়ে স্থানদান করেন। সেই সকল অসন্তোষে মন সর্ব্বদাই চঞ্চল হইয়া থাকে, তাহার উপর পুনরায় অসন্তোষ ঘটিলেই আর ক্রোধের পরিসীমা থাকে না। কোন ধনবান্ উদ্যান বিহারে যাইবার জন্য সজ্জা করিতেছেন। বহির্দ্বারে শকট প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে এক কিঙ্করী আসিয়া কহিল, 'ঠাকুরাণী আপনাকে ডাকিতেছেন।' এই কথাটি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই ধনিকের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহাকে কর্কশ বচনে কহিলেন, 'এই বুঝি তোর ডাক্‌বার সময়,—এতক্ষণ ডাকিস্‌নি কেন ?' তিনি যে উদ্যান বিহারে গমন করিতেছেন, ইহা গৃহিণী অবগত ছিলেন না, এই জন্যই কিঙ্করীকে পাঠাইয়াছিলেন। কিঙ্করী কর্ত্রীর আজ্ঞা প্রতিপালনে আসিয়াছে, ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত যুবক সে সকল বিবেচনা না করিয়া কিঙ্করীর প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন। এরূপ ক্রোধ ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত লোকেরাই প্রায় করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অসন্তোষই ক্রোধের এক মাত্র কারণ। সেই অসন্তোষ যখন ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত লোকের মনে সর্ব্বদা বিরাজমান, তখন তাঁহাদিগের সম্মুখে কথা কহিতে কে সাহস করিবে ? ধনবান্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আপনার মনকে বিষাক্ত করিয়া রাখেন। তাঁহার মন যে সর্ব্বদা ক্রোধানলে পুড়িতেছে, ইহা তিনি ভিন্ন কেহই অবগত নহেন। কাজেই সন্তোষ বিহীন লোককে মিষ্ট কথা কহিলেও তিনি রুষ্ট হইয়া উঠেন ; এই জন্যই পুরাকালের ঋষিরা সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে সিংহ

ও ব্যাঘ্রের সহিত তুলনা করিয়া কত শত নীতিগর্ভ গল্প রচনা করিয়াছেন। সিংহ ও ব্যাঘ্রেরা ক্রোধী বলিয়া দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, তাহারা এক-একটি নির্জ্জন বিপিনে অবস্থান করে। সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধী, হিত বুঝাইলে বিপরীত ভাব ধারণ করে, অন্যের কি কথা তাহার নিকটে তাহার স্ত্রীপুত্রগণও সহজে যাইতে চাহে না। যাহার শরীরে অত্যন্ত ক্রোধ, সে কখন পরের মনোহরণ করিতে পারে না। ক্রোধী ব্যক্তির কেহ কখন যথার্থ বন্ধু হয় না—সে নিজে ক্রোধী বলিয়া জগৎশুদ্ধ লোককে ক্রোধের ভাজন করিয়া তুলে। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধের বশবর্ত্তী, সে কখনও পরের নিকট নিজের প্রয়োজন সাধন করিয়া লইতে পারে না। বিনয় ব্যতিরেকে জগৎ বশ হয় না; যেখানে উগ্রমূর্ত্তি ক্রোধের আবির্ভাব, বিনয় তাহার বহুদূরে অবস্থান করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বল, ধন ও ক্ষমতা এই তিন স্থলেই ক্রোধের আধিক্য। যাহার শরীরে বল আছে, সে পৃথিবীকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে, সামান্য কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া হীনবলের প্রতি অত্যাচার করিতে চাহে। যিনি অনেক লোকের প্রভু তাঁহারও ক্রোধের আধিক্য হয়, ক্ষমতা আছে বলিয়া অধীনস্থ লোকের প্রতি সামান্য কথায় ক্রোধ করিয়া থাকেন। কোন পণ্ডিত কহিয়াছেন, 'যে বহুসংখ্যক লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, কার্য্যগতিকে সর্ব্বক্ষণই তাহাকে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়। যখন অসন্তোষই ক্রোধের কারণ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে, তখন শত শত লোকের প্রভু কত অসন্তোষের কারণ প্রাপ্ত হন, তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না; কিন্তু এই সংসারে নিতান্ত ক্রোধশূন্য হইয়া

থাকিলেও স্বপ্রতুল ঘটে না। বহুসংখ্যক সৈন্যের সেনাপতি যদি ক্রোধ বিহীন হন, তাহা হইলে প্রতিদিন তাঁহার সৈন্যদলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে পারে।• সময়ে সময়ে ক্রোধের নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু সেই ক্রোধ একেবারে ক্ষমাবিহীন হইলে, অনিষ্টকর হইয়া উঠে। যেমন ক্রোধী ব্যক্তির কেহ বন্ধু হইতে চাহে না, তেমনই নিতান্ত ক্রোধ বিহীন ব্যক্তিরও অধীনস্থ লোক আয়ত্তাধীনে থাকে না। তেজ ভিন্ন কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ কালীন, যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা ও ভীমের ক্রোধ এই দুই গুণ একত্রে কার্য্য করায়, মহাসমারোহের যজ্ঞে কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটে নাই। তবেই যে বহুসংখ্যক লোকের প্রতিপালক, তাঁহার ক্রোধ বিহীন হইয়া কার্য্য করিলে কোন ক্রমেই চলে না। অধিকারের সময়েই ক্রোধের প্রয়োজন হয়, সেই অধিকার ক্ষমাদ্বারা শাসন ও পালন করিবে, রাজনীতির এই প্রধান মর্ম্ম। ক্রোধ ব্যতিরেকে কে কোথায় অধিকার স্থাপন করিতে পারিয়াছে?

আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা ক্রোধকে চণ্ডালের সহিত তুলনা করিয়াছেন; এ কথাটির অবশ্যই কোন মহৎ তাৎপর্য্য আছে। পূর্ব্বকালে চণ্ডাল অপেক্ষা আর নীচ জাতি ছিল না, হিংসাবৃত্তিই তাহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। এ হিংসাবৃত্তির অর্থ হনন। বধ্যভূমিতে চণ্ডাল নিয়োজিত হইত, তৎকালের শান্তিরক্ষকের কার্য্য চণ্ডালের হস্তেই ছিল, চণ্ডালেরাই পশ্বাদি শীকার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; অর্থাৎ যেখানে ক্রোধের কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজন, সেই সকল স্থলেই চণ্ডাল নিয়োজিত হইত। বিনা ক্রোধে কেহ কখন একটি পতঙ্গেরও প্রাণনাশ করিতে পারে না।

দেব দেবীর সম্মুখে যাহারা পশ্বাদি বলিদান করিয়া থাকে, অস্ত্র খানি হস্তে লইলেই তাহাদিগের মুখমণ্ডলে ক্রোধের স্পষ্ট লক্ষণ ঈক্ষণ হয়। যখন সেই পশুটি হনন করিয়া ফেলে, তখন তাহাদের মূর্ত্তি দেখিলে, কৃতান্তের অনুচর বলিয়া বোধ হয়।

এস্থলে পীড়ক ক্রোধের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। মহামুনি বিশ্বামিত্রের ন্যায় ক্রোধপরতন্ত্র ব্যক্তি তৎকালে পৃথিবীতে আর ছিল না। তিনি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বশিষ্ঠের শত পুত্র সংহার করেন ও মহাত্মা হরিশ্চন্দ্রকে বর্ণনাতীত কষ্ট দেন। পণ্ডিতপ্রবর চাণক্য নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই; তাহার পর, নন্দকুলের সচীব রাক্ষসকে দাসীপুত্র চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বপদ স্বীকার করাইতে না করিয়াছিলেন, এমন কার্য্যই নাই। ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি যদি পীড়ক ক্রোধের বশবর্ত্তী হন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের দ্বারা সংসারের ঘোর অনিষ্ট উৎপাদন করে। যখন মনুষ্য শরীরে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, সেই সময় যে ব্যক্তি একেবারে জ্ঞানশূন্য না হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করেন, তিনিই মনুষ্য। ক্রোধের চরম ফল কতদূর দাঁড়াইবে, তাহা অগ্রে স্থির করিতে পারা যায় না। ক্রোধে অন্ধ হইয়া যদি মুখ দিয়া 'মার!' এই কথাটি নির্গত হয়, সেই 'মার' শব্দ উচ্চারণ হওয়ায় হয়ত এক ব্যক্তির সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু যাহারা পীড়ক ক্রোধের বশবর্ত্তী, তাহারা ক্রোধকালীন যে প্রতিজ্ঞা করে, তাহা কৌশলে সাধন করিবার জন্য মনোমধ্যে নানারূপ কল্পনা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা সাধনের চেষ্টা দেখে। সেই ক্রোধ যদিও পরপীড়ক হয়, কিন্তু অনেক সময়ে আত্মপীড়ক হয় না; যেমন রাজা নন্দকুমার হেষ্টিংস্ সাহেবের অনিষ্ট

সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ায়, হেষ্টিংসের মনে অত্যন্ত ক্রোধের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি মনে করিলে দুষ্টলোকের দ্বারা গুপ্তাঘাতে নন্দকুমারের প্রাণ নষ্ট করিতে পারিতেন; কিন্তু নিতান্ত নীচের একরূপ কার্য্য বলিয়া তাহা করেন নাই। অবশেষে নিজের অসাধারণ বুদ্ধির প্রভাবে সুকৌশলে নন্দকুমারের প্রাণান্ত করাইলেন। তদ্দ্বারা এক ব্যক্তির জীবনান্ত হওয়াতেই হেষ্টিংসের ক্রোধের শমতা হইল, বহুসংখ্যক লোকের অনিষ্ট হইল না।

নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এক কালীন আত্মপীড়ক ও পরপীড়ক হইয়া উঠে। যেমন একজন গোঁয়ার কোন প্রতিবেশীর সহিত সামান্য কলহসূত্রে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিবেশীকে যষ্টিঘাত করিল; সেই আঘাতেই সে ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হইল। একটি আম্র কলহের সূত্র হইয়াছিল। এক ব্যক্তি পল্লীর মধ্যে আম্র বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল, তাহার নিকট একটি ভিন্ন দুইটি আম্র ছিল না। একজন গোঁয়ার ও অপরজন আত্মাভিমানী এই দুই ব্যক্তিতে আম্র ক্রয় করিতে অগ্রসর হইল। গোঁয়ার বলিল, এ 'আম্রটি আমি ক্রয় করিব।' আত্মাভিমানী বলিল, 'আমি থার্কি ত নহে, ইহার যত মূল্য হউক, আমি তাহাই দিব, তুমি তাহা পারিবে না।' গোঁয়ার কহিল, 'তুমি কি আমাকে টাকার বল দেখাইতেছ? জুয়াচুরি বাটপাড়ি করিয়া গোটাকতক টাকা করিয়াছ বলিয়া কি এত জোর?' আত্মাভিমানী কহিল, 'মুখ সামলাইয়া কথা ক'স্! এখনি দুই গালে দুই চড় লাগাইয়া দিব!' গোঁয়ার কহিল, 'কোন্ বেটা মারে? তার বাড়ী এখানে নয়!' আত্মাভি-

মানী কহিল, 'তুই ত তুই তোর বাপকে মারি!' এই কথা শুনিবা মাত্র গোঁয়ার চীৎকার করিয়া বলিল, 'খামকা বাপ তুল্লে, খামকা বাপ তুল্লে, বেটার মাথা ভেঙ্গে দোফাক কোরে দেব! আত্মাভিমানী তাহা অপেক্ষা দশ গুণ চীৎকার করিয়া বলিল, 'যদি না ভাঙ্গিস্, তো তোর বা——' গোঁয়ার এই কথা শুনিবা মাত্রই, তাহার মস্তকে এমন এক যষ্টি আঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই আত্মাভিমানী'র পঞ্চত্ব লাভ হইল! একটা মানুষ খুন হইল দেখিয়া রাস্তার দশজন লোক গোঁয়ারকে ধরিল, কেহ কেহ আপন মনের সাধ মিটাইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। ঘটনাস্থলে যে উপস্থিত হয়, সেই হত্যাকারীকে প্রহার করে, সকলে মিলিয়া তাহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া পুলিসের হস্তে অর্পণ করিল। যে গোঁয়ার পূর্ব্বে একটি কথাও সহ্য করিতে পারে নাই, এক্ষণে সেই গোঁয়ার ভূতের মত মার ও গালাগালি অনায়াসে সহ্য করিল। এই স্থলে দেখিতে হইবে, সেই গোঁয়ার যখন কটুক্তিকারীকে প্রহার করিয়াছিল, তখন মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে তাহার উন্মাদ দশা ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই।

লিউনেটিক্ এসাইলামের এক জন ডাক্তার লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মহা ক্রোধের পরবশ হইয়া আত্মনাশ ও পরের প্রাণনাশ করে, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তাহার মনের কি রূপ অবস্থা হয়, মহাপ্রাজ্ঞ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা মনেও ভাবিতে পারেন না। আমি এক জন বন্দীর অনুতাপ স্বকর্ণে শুনিয়াছি— এক ব্যক্তি তাহার ভগ্নীপতিকে হত্যা করায় ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। যে দিবস প্রত্যুষে তাহার ফাঁসি হইবে, সেই রজনীর শেষভাগে আমি সেলের নিকট দাঁড়াইয়া শুনিলাম,

সেলের মধ্যে বন্দী আপনা আপনি বলিতেছে—'উঃ কি যন্ত্রণা! আমি চারিদিকে যে কত ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিতেছি! আমি যাহাকে হত্যা করিয়াছি, সে যে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে! আমি যে পূর্ব্বে মরিতে বড় ভয় করিতাম—আজি সেই মৃত্যু আমার নিকটবর্ত্তী—কোথায় যাব? এ সংসার ছাড়িয়া কোথায় যাব? যাহার জন্যে মরিলাম সে কোথায়? আমার ভগ্নীপতি মণির গায়ে হাত দিয়াছিল বলিয়া তাহাকে কিল ও লাথি মারিয়া, মারিয়া ফেলিলাম, এক্ষণে সে মণি কোথায়? সে এখন আপন উন্নত শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে; আর আমি যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি! যম-যন্ত্রণা নয়—নয় নরক যন্ত্রণা; নরক যন্ত্রণা নয়—আগুনে সর্ব্ব শরীর পুড়িয়া যাইতেছে! গলা শুকাইয়া গেল, একটু জল পাইলে খাই। আবার খাব কি? আমার খাওয়া জন্মের মত ফুরাইয়াছে। হা ঈশ্বর! আমাকে রক্ষা কর। ঈশ্বরের সাধ্য কি যে আমাকে রক্ষা করেন? — আমি কি পাগল হইয়াছি?— না; এখন পাগল হই নাই— যখন সেই হতভাগাকে অকারণে মারিয়া ফেলিয়াছিলাম, তখনি পাগল হইয়াছিলাম। কেন মারিয়াছিলাম?—গোপনে মণির গায়ে হাত দিয়াছিল বলিয়া। মণি আমার কে? ও মণি! ও মণি! তোর গায়ে এক জন অপর পুরুষ হাত দিয়াছিল বলিয়া আমি তাহার জীবনান্ত করিয়াছি! এক্ষণে আমাকে যাহারা হত্যা করিতেছে, তাহাদিগের হস্ত হইতে তুই আমাকে বাঁচা,—তোর ক্ষমতা কি যে আমাকে বাঁচাবি? তুই নরকের কীট হইয়া এখনও আমার হৃদয়ে দংশন করিতেছিস্! কখন মরিব? আর যে যন্ত্রণা সহ্য

G D HAZRA & BROTHERS PHARMACY

হয় না, লোকে যে কথায় বলে মরিলেই বাঁচি, সে এই অবস্থায়, আর কোন অবস্থায় নহে।—উঃ!—মরণ হইলেই বাঁচি!'

আমি সেই সময়ে ধীরে ধীরে পদ সঞ্চালন করিয়া সেলের দরজায় দাঁড়াইয়া বন্দীকে কহিলাম—তুমি ঈশ্বরকে ডাক, বন্দী আমাকে দেখিবা মাত্রই—'যমদূত! যমদূত!' বলিয়া অজ্ঞান হইল। বন্দী পরীক্ষা করিবার প্রকৃত সময়েই আমি দরজায় দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহা না হইলে, আরও কিয়ৎক্ষণ তাহার অনুতাপের কথা শুনিতাম। কারণ আমি বাল্যকালাবধি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি, হাঁসপাতালে অনেক রোগীর আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি; কিন্তু ফাঁসিকাষ্ঠে মরিবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে অপরাধীর কিরূপ মনের অবস্থা হয়, তাহা এই শুনিলাম, আর কখন শুনি নাই। যাহা হউক, সে ব্যক্তির মুখে জল দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করায়, সে পুনর্ব্বার উঠিয়া বসিয়া আমাকেই বলিতে লাগিল—'মহাশয়! আমাকে কখন ফাঁসি দিবেন? আর আমি যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না! আমার সে রাগ এখন কোথায় গেল? যাহার গায়ে হাত দেওয়া সহে নাই, সেই বা এখন কোথায়? সে কি আমার মৃত্যু দেখিতে আসিয়াছে? আমাকে একবার ছেড়ে দাও, আমি চীৎকার করিয়া জন কতক লোককে বলিয়া আসি যে, ভাই, তোমরা আর কেহ কখন রাগ করিও না। রাগ কি রকম করিয়া বাড়িয়া উঠে তা এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সেই হতভাগাকে একেবারে মারিয়া ফেলিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। তাহাকে যখন প্রথম একটি লাথি মারিলাম, সে সময়, যেন কালান্তক যম আসিয়া আমার ঘাড়ে চড়িল। যত মারি ততই মারিতে ইচ্ছা হয়। মারের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যত মারি কিছুতেই

তৃপ্তি হয় না—আরও মারিতে ইচ্ছা করে, এইরূপে মারিতে মারিতে সেই হতভাগা মরিয়া গেল। আর অমনি ক্রোধও কোথায় পলাইয়া গেল, ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম; কিন্তু এক্ষণে সেই উৎকট ক্রোধের ফলভোগ করিতেছি। ক্রোধ যে পৃথিবীতে আছে, এক্ষণে তাহাও অনুভব করিতে পারিতেছি না; এখন যে অবস্থায় আমি অবস্থিত এ অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে, আমি অনায়াসে মণিকে একেবারে তাহাকে দিতে পারি।'

বন্দীকে এই অবস্থাপন্ন দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। বলিলাম, হতভাগ্য যুবক! তুমি আর অনর্থক প্রলাপের কথা কহিও না, ইহজগৎ একেবারে পরিত্যাগ করিতেছ, এই সময়ে একবার ঈশ্বরকে ডাক। বন্দী হাস্য করিয়া কহিল, 'পরকাল ত পরের কথা, এখন যতক্ষণ ইহকালে আছি, এই সময় টুকু কিসে কাটে বলুন।' সময় উপস্থিত হওয়ায় আমি বন্দীকে বধ্য ভূমিতে লইবার আদেশ করিলাম। গমনকালে বন্দী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে চলিল—'ক্রোধ পরতন্ত্র ব্যক্তির শাস্তি দেখ। অসন্তোষ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়াছিল, মৃত্যুতে তাহার শমতা হইল। ভাই রে! কেহ কখন রাগ চণ্ডালকে ঘাড়ে উঠিতে দিও না,' কেহ কখন মদ খাইও না, কারণ সুরা ক্রোধের উদ্দীপক। কেহ কখন বেশ্যাকে আমার বলিয়া ভাবিও না, কারণ বেশ্যার মনস্তুষ্টির জন্যই সুরা আনিয়া ছিলাম, সেই সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া আপন ভগ্নীপতিকে হত্যা করিয়াছি। এক্ষণে আমার মৃত্যু দৃষ্টে ক্রোধের চরমফল অবগত হইয়া তোমরা আপন আপন গৃহে গমন কর, ক্রোধের কারণ পাইলেও ক্রোধ করিও না। ক্রোধ রিপুকে জয় করিতে পারিলে পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে

পারিবে। আমি নিতান্ত মূর্খ নহি, কেবল ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মহামূর্খের পরিচয় দিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলাম'।”

ক্রোধ কর্ত্তৃক যেখানে যত ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে বিষয় হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিলেও চলিতে পারিত, সেই বিষয়ের জন্য এক জন ধনীকে নির্ধন হইতে হইয়াছে, একজন মহা-মানীকে অপমানের শেষ হইতে হইয়াছে, একজন সম্পন্ন যুবককে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইয়াছে ইত্যাদি। বোধ কর, একজন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী লোক দুই চারিজন মোসাহেব সমভিব্যাহারে রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, দৈবাৎ একজন মূর্খ দোকানে বসিয়া কুলকুচা করিয়া রাস্তায় জল ফেলিতে তাঁহার গায়ে ছিটকাইয়া লাগিল। বিজ্ঞ ও শান্ত প্রকৃতির লোক হইলে, তিনি অবশ্যই এই কথা বলিতেন, কি রে বাবু, কল্লি কি? দেখে জল ফেলিস্‌নে?' এ কথা শুনিলে, যে জল ফেলিয়াছিল, সে অপ্রতিভ হইয়া বলিত, 'মহাশয়! কিছু মনে করিবেন না, দৈবাৎ হইয়াছে।' এই রূপ কথাবার্ত্তা দ্বারা উক্ত ঘটনা মিটিয়া যাইত। তাহা না হইয়া, বাবুর গায়ে কুলকুচার জল লাগিবা মাত্রই বাবু —'হারামজাদ্‌!' বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যে ফেলিয়াছিল, তখনও সে বলিল, “মহাশয় দৈবাৎ হইয়াছে।” । বাবুর সমভিব্যাহারী এক জন মোসাহেব বলিল, 'বেটা, লোক চেন না? কে যাচ্চেন জান না!' যে জল ফেলিয়াছিল সে কহিল, 'মহাশয়, রাস্তা দিয়া অনেক লোক যাইতেছে, আমি ক'জনকে চিনি বলুন? আর এক জন মোসাহেব কহিল 'বেটা দোষ কোরে আবার ঠাট্টা?'

দোকানদার কহিল, দৈবাৎ গায়ে জল লেগেচে, তার জন্যে আপনার গালাগাল দেবার কোন ক্ষমতা নাই, আপনি না হয়, আদালতে নালিশ করুন গে। এই কথা বলিবা মাত্রই বাবুর এক জন মোসাহেব তাহার হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলন করিয়া দোকানদারকে এক ঘা বসাইয়া দিল। এক জন দোকানদারের অপমানে অপর দশজন দোকানদার অপমান বোধ করিয়া বাবুর দলকে আক্রমণ করিল, বাবু দোকানদার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বাটীতে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন; বাটী হইতে দশ জন দ্বারবান্ আসিয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইল। বাবু হুকুম দিলেন, 'মার, বজ্জাত লোককো।' দ্বারবান্‌গণ প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দোকানদারদিগকে যষ্টি প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আপনাপন দোকানে প্রবিষ্ট হইল। বাবু তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া দোকানে ঢুকিয়া মারিতে হুকুম দিলেন। কয়েক জন দ্বারবান্ ও বাবুর সমভিব্যাহারী মোসাহেব দোকানদারগণকে বর্ণনাতীত পীড়ন করিয়া দম্ভের সহিত বাসায় প্রস্থান করিল। এদিকে যে সকল দোকানদার কলহে লিপ্ত হয় নাই, তাহাদিগের মধ্যে কেহ পুলিসে কেহ জমীদারের বাটীতে সংবাদ দেওয়ায়, উভয় স্থান হইতেই অনেক লোক জন আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। দোকানদারেরা একে একে পুলিসের নিকট মারপিটের নালিশ উপস্থিত করিল। সেই মোকদ্দমায় বাবুকে গ্রেপ্তার হইয়া এক দিন জেলে থাকিতে হইয়াছিল। তাহার পর, সেই মোকদ্দমায় প্রায় দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলেন। এই সকল সংবাদ

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY
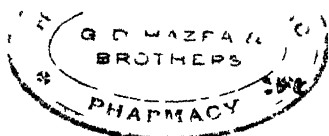
স্বদেশে উপস্থিত হওয়ায় বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুঝিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ কলিকাতায় গিয়া কোন ধনবানের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গাম উপস্থিত করিয়াছেন, সেই সূত্রে আমাদিগের অর্থ-নাশ হইতেছে। এক্ষণে যদি আমি আমার অংশ বুঝিয়া না লই, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ভাবি অনিষ্টের ভয়ে কনিষ্ঠ আপন অংশ বুঝিয়া লইয়া জ্যেষ্ঠের সহিত পৃথক্ হইলেন, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের অংশ বুঝাইয়া দিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিজ অংশে কিছুই নাই। এই স্থলে দেখিতে হইবে, অসাবধানতা বশতঃ এক জন একবিন্দু কুলকুচার জল গায়ে দেওয়ায় বাবু ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন; অনভিজ্ঞ স্বার্থপর মোসাহেবেরা সেই ক্রোধাগ্নিতে উৎসাহরূপ ঘৃতাহুতি দিয়া আরও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। যদি বাবুর সহিত একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোক থাকিত, তাহা হইলে, যে সূত্রে বাবু একেবারে উৎসন্ন হইলেন, সেই ক্রোধাগ্নি দুই চারিটা কথায় নির্ব্বাণ করিয়া দিতে পারিতেন। এই কয়েকটা কথা বলিলেই যথেষ্ট হইত—'দৈবাৎ হইয়াছে, চলুন এই সামান্য বিষয় লইয়া কি নীচলোকের সহিত বিবাদ করিতে আছে?' মোসাহেবের মধ্যে যদি কেহ এই কয়েকটা কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিত, তাহা হইলে, বাবুও সেই মতে মত দিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে পুরুষ কাণপাতলা, অর্থাৎ যে যাহা বলে তাহাই বিশ্বাস করে, তাহারই ক্রোধে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়া সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। যে সকল স্থানে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়া এক একটা সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে, তাহার ভিত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, হয় এক

পলা তৈল, না হয় এক পোয়া দুগ্ধ, না হয় হীনবলের কিঙ্করকে সবলের কিঙ্কর অপমান করিয়াছে, মূলে এই মাত্র বিরোধের হেতু। এক্ষণকার স্ত্রীলোকের মনে স্বতন্ত্র থাকিবার ভাব আবির্ভূত হইয়াছে, এই জন্য, তাঁহারা স্বামীর ক্রোধ জন্মাইয়া দিবার চেষ্টায় সর্ব্বদাই উৎসুক থাকেন। যে পুরুষ সেই সকল রমণীর কথায় বিশ্বাস করিয়া বিনা তথ্যানুসন্ধানে ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়, তাহাদিগকে পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হইবে।

বোধ কর, কোন সম্পন্ন ব্যক্তির স্ত্রী স্বতন্ত্রভাব অবলম্বনের পন্থায় ফিরিতেছেন; কিন্তু পতির ক্রোধানল উদ্দীপনের কোন উপায় না পাইয়া বহুকাল নিস্তব্ধে কালহরণ করিতেছিলেন। এক দিবস তাঁহার পুত্র স্কুলে যাইবার অগ্রে অন্নাহার করিতে করিতে পাচকের নিকট আর একখানি মৎস্য চাহিল, পাচক কহিল 'আমি কি প্রকারে দিই, কর্ত্রী ঠাকুরাণী সকলকে এক একখানি' দিবার আদেশ করিয়াছেন। তৎ শ্রবণে বধূ ঠাকুরাণী কহিলেন, "আমি বলিতেছি, তুমি আর এক খানি দাও;" কিন্তু পাচক তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করাতে বধূ ঠাকুরাণী অপমানিত হইয়া পাচককে ভৎর্সনা করিতেছেন, এমন সময়ে গৃহিণী পাকশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মৎস্য সম্বন্ধের আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা শুনিয়া মৎস্যপ্রার্থী আপন পৌত্রকে বিদ্রূপচ্ছলে কহিলেন, "তুই কাল অবধি আর মৎস্য পাইবি না; সকলে যাহা পাইয়া থাকে, তাহাই পাইয়াছিস্, তাহার উপর আবার কথা কেন? ওরকম করিলে কাণ মলিয়া দিব!" এই কথা শুনিবা মাত্র বধূ ঠাকুরাণী পুত্রের হাত ধরিয়া মারিতে মারিতে পাতের নিকট হইতে

তুলিয়া লইয়া গেলেন। তদ্দৃষ্টে গৃহিণী কহিলেন, "কেন গো! একেবারে রণমূর্ত্তি কেন?" তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ছেলের হাত ধরিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন ও ভাল করিয়া খাওয়া হয় নাই বলিয়া তাহাকে চারিটি পয়সা দিয়া স্কুলে বিদায় করিলেন এবং আপনি গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। আহারাদির সময়ে সকলেই তাঁহাকে ডাকাডাকি করিল, কেহই দ্বার খুলাইতে পারিল না। অবশেষে গৃহিণী আসিয়া ডাকিলে বধূমাতা উত্তর দিলেন, "আমার বাছা যখন না খাইয়া স্কুলে গিয়াছে, তখন আমার এ পোড়া পেটে আমি আজ ভাত দিতে পারিব না।" গৃহিণী কহিলেন, "কেন একটা সামান্য বিষয়ের ছল ধরিয়া সকলের আহারাদির সময়ে গোলযোগ উপস্থিত করিতেছ। কাল তোমার ছেলের পাতে আমি একথাল মৎস্য দিব।" বধূ কহিলেন, "কেন সে ত আর রাক্ষস নয়! আজ বড় একখানা পেলে?—"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে বড়বাবু গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ত্রী পুত্রকে দেখিয়া কহিলেন, "ওগো বউ রাগ কোরেচে, তাকে বুঝিয়ে নীচে পাঠিয়ে দাও, আর আমি সাধতে পারি নে, আজ বাড়া ভাতে ছাই পোড়বে, তা আমি সকাল থেকেই জানি।" এই কথা বলিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী চলিয়া গেলেন। বড়বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সহধর্ম্মিণী শয়ন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। বাবু কারণ জিজ্ঞাসা করায় বধূ ঠাকুরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমার বিনোদ একখানি মাছ চেয়েছিল, এরি জন্যে রাঁদুনী বামুণ আমাকে ও বিনোদকে যা মুখে এলো

ভাই বল্লে—আবার ঠাকরুণ এসে তার দিক হয়ে ছেলে-টিকে বোল্লেন, 'কেন রে! তোর পেটে কি রাক্ষস ঢুকেছে?' বিনোদ আমার না খেয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে স্কুলে গিয়েছে, আমি কোন্ মুখে ভাত খেতে যাব বল দেখি? ঠাকুরপো'র ষেঠের কোলে পাঁচটি ছেলে, তোমার সাতটা নয় পাঁচটা নয়, একটা। তুমি ত কিছু চেয়ে দেখ্‌বে না—আমি যা বোল্‌বো হেসে উড়িয়ে দেবে। ছেলে উপোস কোরে স্কুলে গেল, যদি পিত্তি পোড়ে বাছার ব্যারাম হয়—তখন আমার কি হবে?"

এই কয়েকটি কথা শুনিয়া বড়বাবুর মন কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইল। প্রথম আক্রোশ পাচকের উপর পড়িল; তাহাকে ডাকাইয়া সহধর্ম্মিণীর সম্মুখে আরক্ত নয়নে কহিলেন, "বিনোদ একখানা মাছ চেয়েছিল, তুই দিস্‌নি কেন? তোর জন্যই ত দুপুর বেলা এই তুল কাণ্ড হয়েছে।" পাচক কহিল, "আমি কি কর্ব্বো মহাশয়! মা ঠাকরুণ যেমন বলে দিয়েছিলেন, আমি তেমনি করেচি; আমি চাকর বই ত নয়, যা হুকুম কোর্ব্বেন তাই কোর্‌বো। আমি ত আর বিনোদ বাবুকে কিছু বলি নি, মা ঠাক-রুণই বল্লেন, 'তোর কাণ মলে দেব,' তাইতে তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উঠে গেলেন।" বধূ ঠাকুরাণী এই কথাটির সুবিধা পাইয়া বলিলেন— "শুন্‌লে ত, আমি যা বলি—তাই যে তোমার কাছে মিছে কথা হয়! আমাকে এখন দিন কতকের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তুমি নিষ্কণ্টক হয়ে থাক। বিনোদ আমার আব্‌দারে ছেলে"—বাবু কহিলেন, "বিনোদকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি কাকে নিয়ে থাক্‌বো? আমার এ সংসার ধর্ম্মে কাজ কি?"

বধূ কহিলেন—"সে তুমি বোঝ গে, সে কথার উত্তর আমি দিতে পারি নে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে গৃহিণী আসিয়া কহিলেন, "হাঁ গা বউ! একটি সামান্য কথা নিয়ে কি এত বাড়াবাড়ি কোত্তে হয়?" বাবু ক্রোধে অন্ধ হইয়া কহিলেন—"এটা বুঝি সামান্য কথা হোলো—বিনোদ একখানা মাছ চেয়ে পায় না! তুমি যদি না একচোখী হবে, তা হলে ঘর ভাঙ্গবে কেন? গিন্নেপনা করা সহজ কাজ নয়! আচ্ছা, এর প্রতীকার কত্তে পারি ঘরে থাকবো, না হয় একদিকে চোলে যাব।" স্বামীর কথায় মানিনী স্ত্রী মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। পুত্রের মুখে রুক্ষ কথা শুনিয়া গৃহিণী ছেলেকে যতদূর বলা যায়, তাহা বলিতে কিছুই বাকী রাখিলেন না। নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন—"এক জন সহিলে কোন্দল হয় দূর।" এস্থলে কেহই কাহারও কথা গায়ে রাখিলেন না, সুতরাং এক দিনের মধ্যেই ঘোর গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল।

আমাদিগের ক্রোধ লইয়াই প্রস্তাব, সুতরাং গৃহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে বড়বাবুর যাহা অনিষ্ট ঘটিল এ সকল স্থলে তাহা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই; কেবল তিনি যে ক্রোধে অন্ধ হইয়া পরম পূজনীয়া জননীর অবমাননা করিলেন. সে ক্রোধ কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, এখানে তাহাই বক্তব্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে অসন্তোষই ক্রোধের মূল কারণ। বড়বাবু বাটীর ভিতর আসিয়া দুইটি অসন্তোষের কথা শ্রবণ করিলেন, প্রথমটি প্রিয়পুত্র আহার না করিয়া স্কুলে গিয়াছে—দ্বিতীয়টি সহধর্ম্মিণী উপবাস করিয়া রহিয়াছেন। এই দুইটি কথা শ্রবণ করিয়া বড়বাবুর কিঞ্চিৎ চিত্ত-

করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন, সে সময় তাঁহার চাটুকারগণ সকলেই বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিল। বাবুর গম্ভীরমূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমতঃ কেহই কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। বাবু যখন স্বয়ং একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "এ সংসার ধর্ম্মের কপালে আগুন!" তখন সকলেই ঐক্যতানস্বরে বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞা হাঁ, এ অসার সংসারে কিছুমাত্র সুখ নাই।" বাবু কহিলেন, "বিশেষতঃ, কতকগুলিকে লইয়া একত্রে জড়াইয়া থাকা আরও ঝক্‌মারী!" সেই সময়ে আর একজন মোসাহেব কহিয়া উঠিল, 'হুড়ো গোলে কি আপনার থাকা পোষায়? ইংরাজেরাত উহারি জন্য আপনার স্ত্রীপুত্র লইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে বাস করে, কখন কখন আপনার ভাই বন্ধুকে দেখিতে গেল; কনিষ্ঠও বা কখন জ্যেষ্ঠ সহোদরের বাটীতে আসিয়া দুই চারি দিবস আমোদ আহ্লাদ করিয়া আপন স্থানে চলিয়া গেল। এইরূপ প্রণালীতে ইংরাজেরা সংসার ধর্ম্ম করে বলিয়া তাহাদিগের সংসারে কলহ কচ্‌কচি নাই। আমরা হতভাগা বাঙ্গালী—ভ্রাতা ভাগিনেয়, মামী মাসী প্রভৃতি দেশের কুটুম্ব বান্ধব একত্রে জড় করিয়া চিরকাল কষ্ট ভোগ করি! কথায় বলে জানেন না—"অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।" এই কথাগুলি বাবুর মনের মত হইল। তিনি বলিলেন, 'আমিও ইংরাজদিগের মত স্বতন্ত্র ভাব অবলম্বন করিব; আর প্রত্যহ কলহ কিচ্‌কিচি সহ্য করিতে পারি না।' বাবুর নিকটে যে সকল লোক বসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন আদালতের প্রাচীন মোক্তার অনেক দিন ধরিয়া বাবুর বাটীতে যাওয়া আসা করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটিও মোকদ্দমা মামলা প্রাপ্ত হয় নাই। সে মনে মনে ভাবিল—'বুঝি এত দিনের পর দেবতা

মুখ তুলিয়া চাহিলেন! যেরূপ সূত্র উঠিয়াছে, ইহাতে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটিবার আর কাল বিলম্ব নাই; কিন্তু ক্রোধাগ্নিটা যাহাতে নির্ব্বাণ না হয়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে। এ ঘরে একটা ইকুইটীর মোকদ্দমা বাধাইতে পারিলে, আমাকে আর পাঁচ বাড়ী বেড়াইতে হইবে না।' স্বার্থপর মোক্তার এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "মোক্তার মহাশয়! সহোদরকে কি স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের অংশ দিতে হয়?" মোক্তার কহিল, 'না, কখনই না; আমি নিজে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা আপনিই ভোগ করিব, তাহার এক কপর্দ্দকও সহোদরেরা প্রাপ্ত হইবেন না; দেওয়ানী কার্য্য বিধিতে ইহা পরিষ্কার রূপে লিখিত আছে।' বাবু কহিলেন, "আচ্ছা, আপনি কাল একবার আসিবেন, অনেক কথাবার্ত্তা আছে।" মোক্তার 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মনে মনে অত্যন্ত প্রফুল্ল হইল।

সেই এক খানি মাছ লইয়া যে কলহ উপস্থিত হইল, সেই সূত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমায় উভয় ভ্রাতার বিপুল অর্থ নষ্ট হইয়া গেল। যদি বড় বাবু স্ত্রীলোকের কলহে নিজে যোগ না দিতেন ও সেই তুচ্ছ কথা শুনিয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী না হইতেন, তাহা হইলে, ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইত। তিনি সহধর্ম্মিণীর কথায় বিশেষ মনোযোগী হওয়াতেই অল্পে অল্পে ক্রোধ আসিয়া তাঁহার মনোমন্দিরে আবির্ভূত হইল, তাহার উপর আবার জননীর সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হওয়ায় সেই ক্রোধ ক্রমে ক্রমে বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ক্রোধ সর্ব্বদাই প্রতিপক্ষকে প্রতিফল দিতে চাহে, অর্থাৎ আমাকে যে গালি দিয়াছে, তাহাকে আমি প্রহার করিব; আমার যে

ধন হরণ করিয়াছে, রাজদ্বারে তাহাকে দণ্ড দেওয়াইব; আমাকে যে বঞ্চনা করিয়াছে, নিজ সম্পত্তি হইতে তাহাকে আমি বঞ্চিত করিব; আমাকে যে অপমান করিয়াছে, শতগুণে আমি তাহার অপমান করিব; এই সকলকেই ক্রোধের কার্য্য কহিয়া থাকে।

একটা সামান্য কথায় আমাদিগের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইতে পারে। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যে কথায় আমরা ক্রোধ করি, সেই কথা অক্লেশে অন্যকে বলিতে কুণ্ঠিত হই না। যেমন মনুষ্য শ্রেণী তিন অংশে বিভক্ত—অর্থাৎ উচ্চ, মধ্যম ও অধম। তেমনি ক্রোধের কারণও এই তিন শ্রেণীতে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। যে কথায় উন্নত শ্রেণীরা ক্রোধ করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলেন, নিম্ন শ্রেণীরা হয়ত সে কথা যে অপমানজনক তাহা অনুভবও করিতে পারে না। জমীদারেরা এক জন কৃষককে পাদুকা প্রহার করিয়া নিস্তার পান, কৃষক সে অপমানকে অপমান বলিয়াই গণ্য করে না; বরং আপনাকে দোষী জ্ঞানে জমীদারের স্তব করিতে থাকে। প্রকাশ্য বিচারালয়ে এক জন ভদ্রলোককে অন্য আর এক জন ভদ্রলোক 'তুমি ক্ষান্ত হও, তোমার আর কথা কহিতে হইবে না'—এই কথাটি মাত্র বলিয়াছিলেন। অপর ভদ্রলোক এই অপমানটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, সেই সূত্রে উভয় পক্ষে তিন চারি হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গেল; কিন্তু যাঁহারা এইরূপ মোকদ্দমা করিয়া উভয় পক্ষের বিপুল অর্থ নষ্ট করিলেন, তাঁহারাই আবার সময়ে সময়ে স্থান বিশেষে ইহা অপেক্ষাও শতগুণে কটু কথা শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র ক্রোধ করেন নাই;

এ কথার মীমাংসা কে করিয়া উঠিতে পারে? অনুমানে বোধ হয় যে, সবলেরা হীনবলের প্রতি সামান্য কথায় ক্রোধ করিয়া থাকে; কিন্তু সমতুল্যের প্রতি লোকে সহসা ক্রোধ করিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ক্রোধের মূল অভিপ্রায় প্রতিহিংসা। যে স্থলে প্রতিহিংসা করিবার উপায় নাই, সে স্থলে ক্রোধের আবির্ভাব হয় না; যদিও হয়, সে ক্ষণপ্রভার ন্যায় অতি অল্প কালের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে, উন্নত, নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর ক্রোধের কারণ স্বতন্ত্র দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ক্রোধও স্বতন্ত্র। বাল্যকালে পিতা মাতা সন্তান সন্ততিকে যথোচিত প্রহার করেন, সে প্রহারে তাহারা ক্রোধ না করিয়া বরং ভয়প্রযুক্ত তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত হয়; কিন্তু সেই সকল সন্তান সন্ততিরা যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে পিতা মাতারা আর তাহাদিগকে প্রহার করিতে সাহস করেন না। যদিও কেহ অবোধের ন্যায় সেইরূপ কার্য্য করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে অন্য লোকে বলে—'অতবড় ছেলের গায়ে হাত তুল্‌তে আছে? এখন ওদের জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে; যদি রাগে উন্মত্ত হয়ে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলে, তখন কি কর্‌বে?' যে ছেলে অবাধে বাল্যকালে পিতার প্রহার সহ্য করিয়াছে, যৌবনে সে আর সহ্য করে না; তাহার কারণ এই অনুভূত হয়, কিঞ্চিৎ ক্ষমতা স্বত্বে কেহ কাহারও অপমান সহ্য করে না। ক্রোধ তাহাকে বলিয়া দেয় যে, এরূপ অপমানিত হইয়া পিতার অধীনে থাকা অপেক্ষা উপার্জ্জন করিয়া আত্মপোষণ কর। যেমন একজন কিঙ্কর

কোন ধনীর নিকট বহু কাল কাজ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে। সে যখন প্রথম নিযুক্ত হইয়াছিল, তখন তাহার হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিল না, সেই জন্য প্রভুর যথোচিত তিরস্কার ও মধ্যে মধ্যে প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিত। কালে সেই কিঙ্করের কিঞ্চিৎ সংস্থান হইল। পূর্ব্বের ন্যায় প্রভু তাহাকে এক দিবস প্রহার করায় কিঙ্কর-উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'আর আমি আপনার কার্য্য করিব না, এরূপ প্রহার সহ্য করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল।' সে সময় তাহার কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ হওয়ায় অর্থের ওজন মত মানাপমান জ্ঞান হইয়াছিল, প্রভু প্রহার করায় মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভাবিয়া লইল, 'আমার যাহা সংস্থান হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনায়াসে চাষবাস করিয়া চালাইতে পারিব, কেন আর নিত্য নিত্য এই নির্দ্দয় প্রভুর হস্তে প্রহার সহ্য করি?' তবেই অপমান জন্য যে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, সেটা মনুষ্যের অবস্থানুরূপই হইয়া থাকে, প্রকৃতির অনুযায়িক নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ক্রোধ প্রকৃতি সম্ভূতই বটে; কেবল স্বার্থপর সভ্য সংসারেই অবস্থাগত ক্রোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণায় এক জন উন্নত শ্রেণীর লোক কোন নিম্ন শ্রেণীর লোককে অপমান করিলে সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর লোক সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা পায়। কেননা তাহাদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া আত্ম প্রাণকে অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে। মানই তাহাদিগের এক মাত্র ধন। যে তাহাদিগের মর্য্যাদা নষ্ট করে, প্রাণপণ করিয়াও তাহার অনিষ্ট সাধনে চেষ্টার ত্রুটি করে না; কিন্তু সভ্য সংসারের লোক মর্য্যাদা অপেক্ষা ধনকে অধিক আদর করিয়া থাকে।

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

যেখানে ধনের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেখানে তাহারা অপমানকে অপমান জ্ঞান করে না। অধিক কি, ক্রোধ যে তাহাদিগের শরীরে আছে, ইহা অন্য লোককে জানিতেও দেয় না। ক্রোধ করিলে সকল দিক নষ্ট হয়, সভ্য জগতের লোক ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছে, এই জন্য তাহারা যে সকল স্থানে অর্থাগমের সুযোগ দেখে, সে সকল স্থলে সহস্র প্রকার অপমানেও ক্রোধ করে না; কিন্তু তাহারাই আবার কিয়ৎ পরিমাণে সম্পন্ন হইয়া উঠিলে, আপন মর্য্যাদানুরূপ ক্রোধ করিয়া থাকে।

মর্য্যাদানুরূপ ক্রোধ একটি স্বতন্ত্র কথা। বোধ কর, এক জন ধনী ও আর একজন নির্ধন এই দুই ব্যক্তিতে বিলক্ষণ বন্ধুতা আছে, কার্য্য গতিকে ঐ দুই জনকে কোন ধনবান্ নিমন্ত্রণ করেন। বন্ধুদ্বয় আহার করিতে বসিয়া দেখিলেন, আহার স্থলে যে কয়েক খানি পাত হইয়াছে, তৎসমুদই এক প্রকার, অর্থাৎ এক উপকরণে সজ্জিত। যে আটজন ব্যক্তি সেই আটখানি পাতে আহার করিতে বসিলেন, তাহার মধ্যে সাতজন ধনবান্ ও একজন মাত্র নিঃস্ব লোক ছিলেন। সকলে আসনে উপবিষ্ট হইলে পর, একজন কিঙ্কর আসিয়া প্রত্যেক পাতের সম্মুখে এক একটা রজত নির্ম্মিত পানপাত্র রাখিয়া গেল, কেবল সেই নিঃস্ব লোকের সম্মুখে একটি কাংস্যপাত্র রাখিল। যদিও সেই নিঃস্ব লোক কখন রজতপাত্রে জলপান করে নাই, তথাচ ঐ ধনীর ব্যবহারে তাহার মনে ক্রোধের আবির্ভাব হইল। এ ক্রোধের কারণ কি? অনুমানে এই বোধ হয়, নির্ধন মনে মনে ভাবিল, 'আমি যে দরিদ্র তাহা আমি জানি ও এই সমাগত ব্যক্তিরাও সকলে জানেন; কিন্তু সর্ব্বজন সমক্ষে আমার এরূপ অনাদর সহ্য হয় না।'

ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সেই ব্যক্তি উত্তম রূপ আহার করিতে পারিল না, ইহা তাহার প্রাণের বন্ধু ধনী সন্তান বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বন্ধুর অপমানে তিনিও ক্রুদ্ধ হইলেন। আচমনান্তে দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিলেন যে, এ অপমানের প্রতিফল অবশ্য দিতে হইবে। কাংস্যপাত্রে জলপান দূরে থাকুক, যে ব্যক্তির মৃত্তিকাপাত্রে জলপান করা অসম্ভব নহে, সে মনে মনে এরূপ অপমান বোধ করিল কেন? এই জন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মনুষ্যের ক্রোধ অবস্থার অনুবর্ত্তী হয়। নির্ধন ধনীর সহিত ধনবানের বাটীতে আহার করিতে আসিয়াছে বলিয়া ধনীর সমতুল্য সম্মানের প্রত্যাশা করিয়াছিল; কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে তাহার খর্ব্ব হওয়াতেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহার প্রতিফল দিবার জন্য ধনবান্ বন্ধুকে উত্তেজনা করিতে আরম্ভ করিল। ধনবান্ বন্ধু এই ভাবিয়া ক্রোধ করিলেন, 'এ ব্যক্তি যখন আমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন ও আমি যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আদর করিয়া থাকি, তাঁহাকে অপমান করা ও আমাকে অপমান করা এ দুইই সমতুল্য। অতএব যে আমার বন্ধুকে অপমান করিল, তাহার অপমান করিয়া বন্ধুর চিত্ত বিনোদন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।' এই রূপ উভয়ে ক্রোধ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। উন্নত শ্রেণীর মধ্যে এই রূপ কারণের ক্রোধে সমূহ অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, ক্রোধ পাপেরই প্রবর্ত্তক; কিন্তু ক্রোধ কখন কখন পুণ্যেরও প্রবর্ত্তক হইতে পারে। কোনঃ ধনবান্ লোক কস্মিন্ কালে এক কপর্দ্দকও সৎকার্য্যে ব্যয় করেন না, ইহাতে লোকে তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া যথোচিত নিন্দা করে।

এক জন এক দিবস তাঁহার সমক্ষে কহিল, 'তোমার ধন ও যক্ষের ধন দুইই সমান!' এই কথায় ঐ কৃপণ ধনী ক্রোধ করিয়া কহিলেন, 'দেখ আমি এক দিনে আমার সমস্ত অপযশ তিরোহিত করিয়া দিতে পারি কি না?' পর দিবস প্রাতে ঐ কৃপণ ধনী দুরন্ত পৌষ মাসের শীতে বহুসংখ্যক গাত্রবস্ত্র আনিয়া দুই হস্তে দীন দরিদ্রকে বিতরণ করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার বহুকালের সঞ্চিত অপযশ এক দিনের দানে তিরোহিত হইয়াগেল।

ক্রোধ সৎ ও অসৎ কার্য্য উভয়েরই প্রবর্ত্তক হইতে পারে। বিখ্যাত মুকুট রায় জননীর তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করেন, গমন কালে মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যান, 'যদি কখন লক্ষপতি হইতে পারি তবেই বাটী আসিব।' তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা পঞ্চ বর্ষে পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি একেবারে কোটিপতি হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তিনি যদি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বাটী পরিত্যাগ না করিতেন, তবে কখনই তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিত না। মুকুট রায়ের ন্যায় অনেকেই একমাত্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন অবস্থার উন্নতি করিয়াছিলেন। বিভীষণ ও সুগ্রীব যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপমান সহ্য করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে, কোন কালেই তাঁহাদিগের রাজ্য লাভ হইত না। উভয়েই মহাক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বৈরনির্য্যাতনের জন্য কায়মনে যত্ন করিয়াছিলেন, অবশেষে মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করেন।

সকলেই ক্ষমাগুণের প্রসংশা করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু সর্ব্বদা সকলের প্রতি ক্ষমা করিলে, সে ক্ষমা দ্বারা যশোলাভ হয় না।

নিতান্ত অধীনের প্রতি ক্ষমা করাই ক্ষমাগুণের প্রধান মাহাত্ম্য। বিশেষতঃ, গৃহীর পক্ষে একেবারে অক্রোধ হইয়া কার্য্য করিলে কোন ক্রমেই চলিবে না। ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্যই ঈশ্বর আমাদিগকে ক্রোধ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন কোন্ সময়ে সেই ক্রোধের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় ও কোন্ সময়েই বা ক্ষমাগুণ দর্শাইতে হয়, ইহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। বোধ কর, একজনের সহধর্ম্মিণী গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন, পথে একজন দুরাত্মা তাঁহার অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এই সম্বাদ ক্ষমতাবান্ পতির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার উচিত দণ্ড বিধান করিবেন? না 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে'—এই বচনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? 'নীচ যদি উচ্চভাষে'—এই বচনের সাহায্য হীনবলেরাই লইয়া থাকে; কিন্তু সবলেরা আপনার সহধর্ম্মিণীর অপমানের কথা শুনিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। দ্রৌপদী যখন কুরুসভার মধ্যে দুঃশাসন কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইতে লাগিলেন, তখন হীনবল যুধিষ্ঠিরই ধৈর্য্যগুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাবল ভীমসেন তাহা পারেন নাই। যদি তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয় না রাখিতেন, তাহা হইলে, সেই দিনেই গদাঘাতে কুরুকুল নির্ম্মূল করিয়া দ্রৌপদীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবেই গৃহীর পক্ষে ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার সময় ক্রোধের সহিত কার্য্য না করিলে, কা-পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। যাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া ঋষি তপস্বীর ন্যায় কাল যাপন করেন, ক্ষমাগুণ তাঁহাদিগেরই শোভা পায়। আপন সম্ভ্রম স্থাপনের একটা প্রধান উপায়

ক্রোধ। যে ব্যক্তি নিতান্ত ক্রোধবিহীন অন্য কি কথা আত্ম পরিবারেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করে না। অক্রোধ ব্যক্তির অকারণ অনেক শত্রু হয়, স্বভাবের দ্বারা ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নিরীহ ছাগমেষগণকে মনুজকুল বলি প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু ভয়ানক ক্রোধী সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকাদিকে বলি প্রদানের ব্যবস্থা হয় নাই। তাহারা স্বভাবতঃ ক্রোধী বলিয়া সকলেই তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাকে। যদি পল্লীর মধ্যে কোন এক ব্যক্তি ভয়ানক ক্রোধী বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, সহসা তাহার অনিষ্ট করিতে কেহই অগ্রসর হয় না; কিন্তু যিনি নিতান্ত অক্রোধ ও ক্ষমাবান্ তিনি শুদ্ধ ভদ্রলোকের নিকটেই পূজ্য হন; দুষ্ট লোকেরা তাঁহার অনিষ্টসাধনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

ক্রোধ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান গ্রন্থকারেরা যাহা বলিয়াছেন, সেই মতই প্রশংসনীয়, অর্থাৎ ক্রোধকে কার্য্যের সাধক করিও, পাপের প্রবর্ত্তক করিও না। ক্রোধ সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উত্তম উপদেশ আর কি আছে? সামান্য কারণে ক্রোধ করিয়া কেহ এক জনের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ফেলিল, সেই ক্রোধই পাপের প্রবর্ত্তক। কেহ বা কোন প্রতিবেশীর সহিত কলহ করিয়া উৎকট কোপে তাহার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইল; অন্য কোন রূপ অনিষ্ট করিতে না পারিয়া রজনীতে তাহার গৃহে অনল সংলগ্ন করিয়া দিল। সেই ক্রোধই পাপের প্রবর্ত্তক। মহাপ্রজ্ঞ বিশ্বামিত্র বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াও ক্রোধ রিপুকে জয় করিতে পারেন নাই। তিনি সামান্য কারণে উৎকট ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মহাত্মা হরিশ্চন্দ্রকে বর্ণনাতীত কষ্ট

দিয়াছিলেন। সেই ক্রোধের জন্য তিনি আপনার প্রকৃত কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল একমাত্র হরিশ্চন্দ্রকে গুরুতর কষ্ট দিব, এই মানসে পুনর্ব্বার রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; হরিশ্চন্দ্রকে কষ্ট দিতে গিয়া তাঁহার নিজের শান্তিসুখ এক কালে ভঙ্গ হইয়াছিল। যে বিশ্বামিত্র নিবিড় অরণ্যে শান্তমনে নয়ন মুদ্রিত করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিতেন, ক্রোধবশতঃ সেই বিশ্বামিত্র কিসে হরিশ্চন্দ্রকে ক্লেশ দিব, দিন যামিনী সেই ধ্যানেই রত থাকিতেন। ক্রোধ যে পাপের প্রবর্ত্তক, ইহা অপেক্ষা আর উত্তম দৃষ্টান্ত কোথায় পাইবে?

দুষ্টবুদ্ধি চতুর লোকেরা আপন আপন কার্য্য উদ্ধারের জন্য যে সকল উন্নত শ্রেণীর লোকদিগের নিকট সর্ব্বদা গতায়াত করে, তাহারা সময় বুঝিয়া ও বিষয় বুঝিয়া সেই সকল লোকের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা পায়; কারণ ক্রোধের সময় লোকে জ্ঞানশূন্য হইয়া অনেক বিষয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় এবং কখন কখন মনের আভ্যন্তরিক ভাব ও আত্মচ্ছিদ্র প্রকাশ করিয়া ফেলে। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে যে, ক্রোধকালে লোকে অনেক মনের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে; দুষ্ট লোকেরা সেই সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া কেবল নানা বিষয়ে ক্রোধ জন্মাইয়া দিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করে। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ নামক গ্রন্থে সুহৃদ্ভেদ প্রস্তাবে ইহা বাহুল্য বিস্তারে লিখিত আছে। সুহৃদ্ভেদ করাইবার জন্য দুষ্ট-লোকেরা কিরূপ কৌশল জাল বিস্তার করে এবং কর্ত্তাকে ক্রোধিত করিয়া কিরূপ প্রণালীতে আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লয়, মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণুশর্ম্মা পশুজাতির উপর দিয়া তাহা বিলক্ষণ

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কি মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত করা, কি ভাতৃ-ভেদ ঘটাইয়া দেওয়া, কি নিতান্ত সুহৃদ্ ব্যক্তিকে দূর করিয়া দিবার পন্থা, এক ক্রোধের আশ্রয় ব্যতিরেকে কখনই ঘটিয়া উঠে না। এই জন্য গোপাল ভাঁড় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিয়া-ছিল যে, "যাহাকে কথার কৌশলে রাগাইতে পারিলাম, তাহারই সর্ব্ব নাশ করিলাম; যাহাকে কথার কৌশলে রাগাইতে না পারা যায়, সে সংসারের তরঙ্গ বিলক্ষণ সহ্য করিতে পারে।" এক বংশের দুই জন ভিন্ন প্রকৃতির লোক, অর্থাৎ এক জন ক্রোধী, এক জন নিক্ক্রোধ; কিন্তু উভয়েই সমান ব্যবসায় কার্য্য করিয়া থাকে। যে সামান্য কথায় ক্রোধ করে, সে ব্যবসায় কার্য্য সম্বন্ধে অন্যের ঋণ রাখিতে পারে না; কারণ রূঢ় ও রুক্ষ কথা তাহার সহ্য হয় না। যাহার সহিষ্ণুতা গুণ আছে, অর্থাৎ পাঁচজন পাওনাদারেরা দুইটা কটু কাটব্য বলিলেও হাস্য বদনে সহ্য করে, সেই ব্যবসায় কার্য্যের উন্নতি করিতে পারে। বিষয়ী লোকের যে পরম সুহৃদ্ থাকে, তাহাকে পৃথক্ করাইতে দুষ্ট লোকেরা বিলক্ষণ চেষ্টা পায়; সে পার্থক্য ঘটাইবার প্রধান অঙ্গ এক ক্রোধ ব্যতি-রেকে আর কিছুই হইতে পারে না। এই জন্য নীতিজ্ঞেরা বলিয়া-ছেন, উৎকট ক্রোধের সময়, একাকী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া থাকা উচিত। সেই গৃহে স্বর্ণাক্ষরে ইহা লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে "ক্রোধ পরম শত্রু, ক্রোধে অধীর হইয়া কোন কার্য্য করিও না; বিশেষতঃ, ক্রোধ কালে কোন আজ্ঞা দিও না; মনে মনে চিরকাল এই প্রতিজ্ঞা রাখিও, যে পর্য্যন্ত ক্রোধের শমতা না হইবে, সে পর্য্যন্ত বিষয় কার্য্যে হস্তার্পণ করিব না।" যদি কেহ

এই উপদেশ মত কার্য্য করেন, ক্রোধের জন্য তাঁহার ধন প্রাণ ও মান কখনও নষ্ট হইবে না।

ক্রোধ অসন্তোষে উৎপত্তি; ভয়, সন্তোষ ও বশ্যতায় নিবৃত্তি। কখন কখন মনুষ্য জেদ যুক্ত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। যত দিন অর্থ ছিল, তত দিন ক্রোধের শমতা হয় নাই। যাহার প্রতি ক্রোধ করিয়াছিল, ধনবলে তাহার সর্ব্ব নাশ করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইয়া অবশেষে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। তখন সেই ক্রোধ আক্ষেপে পরিণত হইল। 'হায়! কি করিলাম' দিন কতক এই রূপ ভাবিল। আক্ষেপের পর অভিমান উদয় হইল, অর্থাৎ "শত্রুর অনিষ্ট করিতে পারিলাম না, অথচ সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। এক্ষণে আমাকে দেখিয়া যদি প্রতিপক্ষেরা হাস্য করে, বিদ্রূপ করে, তাহা কি প্রকারে সহ্য করিব? ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অবশেষে এই দশা ঘটিল! যাহারা আমার বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতে সাহস করিত না, এক্ষণে তাহারা আমাকে বিদ্রূপ করিয়া অনায়াসে নিস্তার পাইবে। আমি বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় কেবল গর্জ্জন করিব এইমাত্র। এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, যড়রিপুর মধ্যে একটা রিপু ঘোর প্রবল হইলেই একটি রাজ্যেশ্বরকেও ভিখারী করিয়া দিতে পারে; বিশেষতঃ, কাম ও ক্রোধ এই দুই রিপু সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। আমি অন্য কোন দোষে দোষী ছিলাম না; কিন্তু তখন বুঝিতে পারি নাই, এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি, স্বার্থপর লোকেরা কৌশল করিয়া আমাকে ক্রোধিত করিয়া দিতে পারিত, রাগের সহিত জেদ আসিয়া উপস্থিত হইত। সেই জেদ ঘটিত ক্রোধই আমার সর্ব্ব অনিষ্টের মূল হইল! পূর্ব্বে

আমার এক প্রতিবেশী, ঢোলক তানপূরা বাজাইয়া গীত গাইত, তাহাই আমার সহ্য হয় নাই। দুষ্ট আইনবাজ লোকের পরামর্শে সামান্য সূত্রে মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়াতে আমার ক্রমে ক্রমে ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রোধবশতঃ, প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, উহার বসৎ বাটী ক্রয় করিয়া ঐখানে পুষ্করিণী খনন করিব। এক্ষণে আমার সে প্রতিজ্ঞা বিফল হইল। পূর্ব্বে তবলার বাদ্য সহ্য হইত না; এক্ষণে বিপক্ষেরা জয়যুক্ত হইয়া ঢাক ঢোল ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে, তাহা অনায়াসে সহ্য হইল। এক এক বার আত্মনাশ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, আবার আপনা আপনিই বুঝিয়া সেই উৎকট পাপে ক্ষান্ত হইতেছি। আর এ কলহ পরিপূরিত সংসারে থাকিব না। সংসারী হইয়া থাকিতে গেলেই হিংসা, দ্বেষ, মায়া প্রভৃতির হস্ত হইতে কখনই এড়াইতে পারিব না। বিশেষতঃ, যাহারা নির্ধন তাহারা রিপুর তাড়না সহ্য করিতে পারে। যাহাদিগের ধন অধিক, তাহাদিগের মনের তরঙ্গও অধিক; ধনবলে পৃথিবীকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। এক্ষণে আমার যেরূপ বোধ জন্মিয়াছে, ধনসত্ত্বে এরূপ বোধ থাকিলে, পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম; কিন্তু গতশোচনায় আর ফল কি? যাহা অবশিষ্ট আছে, বিক্রয় করিয়া কোন নির্জ্জন তীর্থস্থানে গিয়া বাস করি, সেখানে সংসারের তরঙ্গ আমার মনকে আকুলিত করিতে পারিবে না; কিন্তু আক্ষেপ রহিল এই যে, ক্ষমতাসত্ত্বেও যদি সর্ব্ববিষয়ে নিবৃত্ত হইতে পারিতাম, তাহা হইলেই মনুষ্যের কার্য্য হইত।”

উপসংহারে এই মাত্র বলিতেছি যে, ক্রোধ যাহাতে উদ্দীপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে, মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

যে সকল স্থলে ক্রোধ মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবস্থান করে, সে সকল স্থলে পদার্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। উৎকট ক্রোধকালে কখন কাহারও উপর হস্তোত্তোলন করিও না, কখন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইও না, কখন ক্রোধমুখে কাহারও প্রতি কোন আদেশ করিও না। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

পঞ্চম রিপু মদ—মদ শব্দের অর্থ অহঙ্কার, দর্প ও ঘোর অভিমান। ধন, বিদ্যা ও শারীরিক বল এই কয়েকটি একাধারে অধিক পরিমাণে হইলে উপরোক্ত দোষগুলি প্রায়ই মনুষ্যের মনে আবির্ভূত হয়। যাঁহাদিগের হয় না, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্যশব্দের বাচ্য হইতে পারেন। আজ কাল ইংরাজেরা বলবুদ্ধিতে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়াছেন, সেই জন্য ইংরাজ জাতির অবালবৃদ্ধবনিতার মনে একটি ঘোর অহঙ্কার উদয় হইয়াছে। সেই অহঙ্কার ভারতবর্ষের জিত জাতির উপর তাঁহারা পদে পদে প্রকাশ করিতেছেন। একটি অষ্টবর্ষীয় ইংরাজ বালকের সম্মুখে যদি এক জন পঞ্চাশৎ বর্ষীয় বাঙ্গালী ভারতের পূর্ব্ব শ্লাঘার কথা উত্থাপন করেন, তাহা হইলে, সেই ইংরাজ বালক দম্ভের সহিত বলিয়া উঠে, "আমরা ব্রিটন জাতীয়; ভারতবর্ষীয়দিগের উপর প্রভুত্ব করিতে ভারতে আসিয়াছি। আমরা প্রভু; তোমরা অধীন; ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।" এক জন উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ কোন করদ রাজার নিকট দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন; "দেখ, ঈশ্বর আমাদিগকে কত দূর বাড়াইয়াছেন, হিমালয় অবধি কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ আমাদিগের আজ্ঞা ব্যতিরেকে একটি বন্দুক ছুড়িতেও সাহস করে না। আমাদিগের দর্পে ভারতবর্ষে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইতেছে!" ইংরা-

জেরা পদে পদে আমাদিগের নিকট এইরূপ দর্পের কথা কহিয়া থাকেন।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ষড়রিপুর মধ্যে আমাদের মদ, অর্থাৎ দম্ভ রিপু পরাধীনতা শৃঙ্খলে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিয়া একেবারে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত দম্ভ কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানি না, তবে 'মেগের কাছে পেকের বড়াই' যে একটি প্রবাদ কথা আছে, আমাদিগের এক্ষণকার দম্ভও সেইরূপ। জাতি সাধারণের যে একটি দম্ভ, কিম্বা মহাবংশে উদ্ভব জন্য যে একটি দম্ভ, পূর্ব্ব পুরুষেরা করিতেন, সেই দম্ভই যথার্থ দম্ভ। এক্ষণে যে আমরা দম্ভ করি, তাহাকে দম্ভ বলে না, তাহার নাম নীচাশয়তা। ভারতবর্ষীয়গণ বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা আর কিসের দম্ভ করিবে? ধনের? ধন কোথায় আছে? ধন ত বহুকাল হইতে রাজকোষভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যার? বিদেশীয় ভাষায় পটুতা লাভকে বিদ্যা বলা যায় না। যে বিদ্যা অভ্যাস করিয়া আমরা পণ্ডিত বলিয়া বাচ্য হইতাম, সেই বিদ্যা এক্ষণে ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছে। বলের? বলসত্ত্বেও আমাদিগের বল নাই; যেহেতু আমাদিগের বল থাকিলে পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইব কেন? বল থাকিলে রাজার এত দুর অত্যাচার সহ্য করিব কেন? বল থাকিলে দাসত্ব জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইব কেন? পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাসিক বেতনের দাসত্ব পাইলে, যাহারা পরিতুষ্ট হয়, বলের কথা তাহারা মুখে আনিবে কেন? এক্ষণে ইংরাজ জাতির দম্ভের সময়, তাঁহারা আমাদিগের উপর দম্ভ করুন, আমরা কেবল স্থির ভাবে তাহা সহ্য করি। এক্ষণে বংশ মর্য্যাদার দম্ভ কাহাকে বলে,

এদেশের লোক তাহা একবারও ভাবিয়া দেখে না। আপনাদিগের বংশমর্য্যাদার দম্ভ করিলে, তাহাকে দাম্ভিক বলা যায় না; কারণ অনেক যত্নে অনেক কষ্টে সে মর্যাদা লাভ হইয়া থাকে। ইংরাজেরা আমাদিগের উপর দম্ভ করিতেছেন, সে দম্ভ সহজে সমুদ্ভূত হয় নাই; ইহার জন্য কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে, সর্ব্বগুণান্বিত কতশত লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে; বড় বড় রাজনীতিজ্ঞেরা কত প্রকারে আপনাদিগের বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছেন। ধনবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল ও শারীরিক বল এই কয়েকটি বল একত্র সমবেত হইয়া একটি অসাধারণ বল সমুদ্ভূত হইয়াছিল, সেই বলের নিকট এদেশের সমস্ত বল পরাজয় স্বীকার করে; সেই জন্যই ইংরাজ জাতি জিত জাতির উপর দম্ভ করিয়া দুই পদে তাহাদিগকে দলন করিতেছেন। একটা বংশমর্য্যাদা সংস্থাপন করিতেও পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেক কষ্ট পাইয়া থাকেন; অনেক অর্থ ব্যয় অনেক বুদ্ধি ব্যয় করিয়া এক এক জন অসাধারণ লোক একটি বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া যান। সেই বংশে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা কার্য্যকালে সেই মর্য্যাদার দোহাই দিলে কোনক্রমে তাঁহাদিগকে দাম্ভিক বলিতে পারা যায় না।

প্রারম্ভে মদ সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথার উল্লেখ করা গেল, উহা কেবল শব্দার্থ পোষক মাত্র। প্রকৃত মদগর্ব্ব অনিষ্টের মূল, ইহা সকল শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। যাঁহার মনে নিয়মাতীত মদগর্ব্ব উপস্থিত হইয়াছে, চরমে তিনিই অপমানিত হইয়াছেন। বলি রাজা ভুজদম্ভে এই সসাগরা ধরাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেন। সংসারে তাঁহার সমকক্ষ কেহ আছে, এরূপ মনে ধারণাই হইত না।

অবশেষে বামন দেবকে ত্রিপাদ ভূমিদানে অক্ষম হইয়া রসাতল-বাসী হইয়াছিলেন। গর্ব্বিত লোকেরা কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করে না। বামনের চাতুরীযুক্ত প্রার্থনায় বলির সহধর্ম্মিণী বৃন্দাবলী ত্রিপাদ ভূমিদানে প্রতিশ্রুত হইতে অনেকবার নিষেধ করিয়াছিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিকে বিশিষ্ট বিধানে বুঝাইয়াছিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ বালকের প্রার্থনা পূরণ করিতে গেলে, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে; অতএব আমার কথায় কর্ণপাত কর, ত্রিপাদ ভূমিদানে স্বীকৃত হইও না। ইহাতে বলি মদগর্ব্বে কহিলেন, "আমি দান দিতে অক্ষম হইলাম, এরূপ কলঙ্ক শিরোভূষণ করিতে কখনই পারিব না। আমি প্রহ্লাদের পৌত্র, বিরোচনের পুত্র; আমার কাছে যাচক বিমুখ হইবে?" এইরূপ গর্ব্ব করিয়া বলিরাজা ত্রিপাদ ভূমি দানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহার পর তাঁহার অদৃষ্টে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, ভাগবতে তাহা বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে। বলির যজ্ঞে বামনের ভিক্ষাগ্রহণ যে সত্য, ইহা কখনই বলিতে পারি না; তবে শাস্ত্রকারেরা "বলিযজ্ঞ" এই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া দাম্ভিকের দর্পচূর্ণের বিষয় যে সাধারণকে বুঝাইয়াছেন, এই সার ভাগ অবশ্য আমরা গ্রহণ করিব।

ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে ক্ষত্রিয়কুলান্তক পরশুরাম আপন ভুজবলে, একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন; তাহার পর পরশুরামের মনে এরূপ দম্ভ উপস্থিত হইয়াছিল যে, 'পৃথিবীতে আমার ন্যায় বীর আর নাই। ব্রাহ্মণের ঔরসজাত যে সকল ক্ষত্রিয় এক্ষণে ধরাধামে রাজত্ব করিতেছে, আমার নাম শুনিলে তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' অবশেষে

দশরথাত্মজ রামচন্দ্র যখন হরধনু ভঙ্গ ও জানকীর পাণি-গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছেন, তখন পরশুরাম রাম নামধারী একজন ক্ষত্রিয় সীতার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, এই কথা শুনিয়া ভুজদম্ভে মত্ত হইয়া উঠিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি-লেন, পৃথিবীতে এক রাম ভিন্ন দুই রাম রাখিব না। গর্ব্বিত পরশুরাম বিনা কারণে সশস্ত্রে রামচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, ও তুমি জরাজীর্ণ একখান ধনু ভাঙ্গিয়া কি বীর শব্দে বাচ্য হইয়াছ? আমার এই ধনুতে জ্যা রোপণ কর দেখি।” রামচন্দ্র কহিলেন, “ব্রহ্মন্! আপনি বিনা কারণে কি জন্য আমাদিগের সহিত দ্বন্দ্বে, প্রবৃত্ত হইতেছেন?” পরশুরাম আরক্ত নয়নে কহিলেন, “তোমার এতদূর গর্ব্ব যে, রামনাম ধারণ করিয়াছ? যদি আমার এই ধনুতের জ্যা রোপণ করিয়া একটি শর সন্ধান করিতে পার, তবেই মঙ্গল; নতুবা এই তীক্ষ্ণ-ধার কুঠার দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন করিব।” রামচন্দ্র অনায়াসে পরশুরামের প্রদত্ত ধনুকে জ্যা দিয়া শরযোজনা করিলেন এবং বীরদর্পে কহিলেন, “ব্রহ্মন্! আপনি যতই কেন অপরাধী হউন না, আমার অবধ্য; এক্ষণে বলুন, এই শরত্যাগ দ্বারা আপনার কি অনিষ্ট সাধন করিব? আমার শর কখনও নিষ্ফল হইবে না।” পরশুরাম রামচন্দ্রের বীরদর্পে হতবীর্য্য ও হতবুদ্ধি হইয়া বিনয়-বাক্যে কহিলেন, ঐ শরক্ষেপণে আমার স্বর্গপথ রোধ কর; আমি আর অস্ত্র ধারণ করিব না; অদ্যই ব্রাহ্মণপুত্রের ন্যায় তপোবনে তপস্যা করিতে চলিলাম। তপস্যাই ব্রাহ্মণের একমাত্র ধর্ম্ম। পরশুরাম হতবীর্য্য হওয়াতে ক্ষত্রিয়েরা তাঁহার অপমান করি-বার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে রামচন্দ্র কহিলেন, “পরশু-

রাম মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আপন ইচ্ছায় হতবীর্য্য হইয়াছেন; এক্ষণে তোমরা আর দুর্ব্বলের উপর বল প্রয়োগ করিও না; যেহেতু, দর্পহারী ভগবান্ সকলেরই গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া থাকেন। দর্পের সহিত কোন কার্য্যে অগ্রসর হইও না। অতিদর্পের শেষ রক্ষা হয় না।”

গর্ব্বিত লোকেরা মর্য্যাদার ভয়ে প্রথমতঃ কাহারও পরামর্শে কর্ণপাত করে না। আপনার মদগর্ব্বে স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করিতে যায়; কিন্তু যে মর্য্যাদার ভয়ে ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম-পথে জলাঞ্জলি দেয়, মদগর্ব্বে সেই মর্য্যাদাই একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। রাবণ যখন তৃতীয় বার যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন, সেই সময় মন্দোদরী আসিয়া তাঁহাকে গলবস্ত্রে কহিলেন, “মহারাজ! এখনও ক্ষান্ত হউন, আর মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবেন না। সকলই নষ্ট করিয়াছেন, কেবল প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন যে দম্ভ করিতেছেন, সে কেবল স্বভাবসিদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। বন্য পশু বানরের নিকট পদে পদে অপমানিত হইয়াও স্বভাবসিদ্ধ দম্ভ এখনও পরিত্যাগ করিতেছেন না। আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি, রামচন্দ্রের সীতা প্রত্যর্পণ করুন। ইহাতে আপনার কিছুমাত্র মর্য্যাদার হানি হইবে না।”

“রাবণ কহিল—‘সীতা দিতে পারি ফিরে।’
হাসিবেক বিভীষণ সবে না শরীরে!
কহিবেক ইন্দ্র আদি যত দেবগণ—
যুদ্ধে হেরে সীতা ফিরে দিল দশানন।
ছোট হয়ে বড় কবে বড় ভয় বাসি,
শান্ত হয়ে গৃহে গিয়ে বৈসগে রূপসি;

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY HOMŒOPATHIC
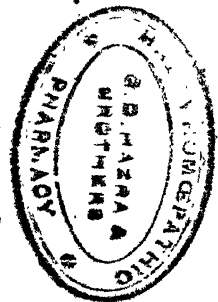
বরঞ্চ রামের বাণে ত্যজিব জীবন—
সীতা ফিরে দিতে না পারিব কদাচন'।”

মদগর্ব্বে গর্ব্বিত লোকেরা প্রকৃত মর্য্যাদার অর্থ বুঝিতে পারে না। বিনয়, নম্রতা মনুষ্যের যে একটা প্রধান গুণ, গর্ব্বিত লোকেরা সেটি একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। লোকে যখন গর্ব্ব করিয়া এরূপ ভাবে, 'মরিলে ত আর দেখিতে আসিব না, বরং মরিব ইহাও স্বীকার, তথাচ শত্রুর নিকট নত হইব না।' কিন্তু বড় বড় গর্ব্বিত লোকেরাও অবস্থা বিশেষে শত্রুর নিকট নত হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের কলঙ্ক কীর্ত্তিত হয় নাই; বরং প্রশংসাই হইয়াছে। রাবণ যদি সীতা প্রত্যর্পণ করিয়া রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি করিতেন, তাহা হইলে, রাবণের সেই পূর্ব্ব দর্প বজায় থাকিত। পরম শত্রু বিভীষণের দুর্দ্দশার অবধি থাকিত না; কিন্তু দাম্ভিক লোকেরা এ সকল বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে পারে না। দর্প করিয়া তাহাদিগের আশা পূর্ণ হয় না। সমস্ত সংসারের উপর প্রভুত্ব করিলেও তাহাদিগের খেদ নিবৃত্তি হয় না।

যাঁহার যে বিষয়ে অসাধারণত্ব আছে, তিনি সেই বিষয়ের অহঙ্কার করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে আমার ন্যায় আর নাই, সেইটা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অকারণ পরের মনঃপীড়া উৎপাদনে প্রবৃত্ত হন। রাজা জরাসন্ধ আপন ভুজবলে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সসাগরা ধরার সমস্ত রাজাই তাঁহাকে কর দিয়া পূজা করিত, ইহাতেও তাঁহার পরিতোষ জন্মিল না। অবশেষে তাহার মনে এইরূপ দম্ভ উপস্থিত হইল যে, আমি পৃথিবীর রাজাগণকে যজ্ঞপশুর ন্যায় হত্যা করিতে পারি কি

B. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

না, এক বার দেখিতে হইবে। অবশেষে পুরোহিত ডাকাইয়া সঙ্কল্প করিলেন যে, আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত ত্রিলোচনের সম্মুখে এক লক্ষ রাজাকে নরবলি প্রদান করিব। ক্রমে আপনার অসীম ভুজবলে এক লক্ষ ভূপালকে পশুর ন্যায় বাঁধিয়া আনিয়া কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় ভীমহস্তে তাঁহার দর্পচূর্ণ হইল। ইহা দ্বারা শাস্ত্রকারেরা সজ্জনব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, অতিদর্পের শেষ রক্ষা হয় না।

দুর্য্যোধন অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন। সামান্য কথা তাঁহার গাত্রে সহ্য হইত না। অবশেষে যখন ভীমসেন তাঁহাকে সমরক্ষেত্রে পাতিত করিয়া মস্তকে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিয়াছিলেন, তখন অতিদম্ভের চরম দশা কি হইল, কুরুকুলপতি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহারা ভুজবলে আপনাদিগের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে চাহে, যাহারা অর্থ বলে অর্থহীন ব্যক্তিকে হীনবোধে অনায়াসে অপমান করে, তাহারা কখনও মর্য্যাদক নহে। মদ গর্ব্বে গর্ব্বিত লোকেরাই পরের মর্য্যাদা হরণ করিয়া আপনাকে মর্য্যাদক করিতে চাহে। যে পর্য্যন্ত তাহার দর্প সর্ব্বতোভাবে চূর্ণীকৃত না হয়, সেই পর্য্যন্তই হীনবলেরা ভয়প্রযুক্ত তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করে; কিন্তু সময় পাইলেই, সেই পরমর্য্যাদা হারকের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে ক্রটি করে না। সিরাজুদ্দৌলার ন্যায় মর্য্যাদাহারক লোক পৃথিবীতে আর জন্মিয়াছিল কি না সন্দেহ। লোকের ধন, প্রাণ, মান হরণ করিব এই তাহার প্রধান সঙ্কল্প ছিল। যখন সেই দুরাত্মার মদগর্ব্ব বঙ্গবাসীর অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তখন অন্যের কি কথা, সিরাজু-

দ্দৌলার পিতৃতুল্য শ্বশুরও ষড়যন্ত্রকারীদিগের দলভুক্ত হইয়া বঙ্গাধিপকে পশুর ন্যায় হত্যা করাইলেন। সিরাজুদ্দৌলার চরম ফল দেখিয়া অনেক জ্ঞানবান্ লোকে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মদগর্ব্বে গর্ব্বিত লোকেরা পরপীড়নে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না; বিশেষতঃ, মর্য্যাদাবান্ লোককেই তাহারা বিষনয়নে দর্শন করে, আমিই সকলের পূজ্য হইব, আমার পূজনীয় কেহই থাকিবে না, গর্ব্বিত লোকের এই মনের অভিলাষ। উৎপীড়নে ভয়ের সঞ্চার হয় এই মাত্র; কিন্তু স্নেহে ভক্তির সঞ্চার হয়। অধীন লোকের স্নেহ ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কে কোথায় নিস্তার পাইয়াছেন? বিনয়ে জগৎ বাধ্য হয় ও দর্পে সকলে শত্রু হয়; আমরা ইহার দৃষ্টান্ত পদে পদে দেখিতেছি। যে ব্যক্তির ধন আছে, মান আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অথচ বিনয়ী, সেই জগতের পূজ্য হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি ভুজবলে, কি ধনবলে, সংসারের লোককে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করে, তাহাকে সকলেই মনে মনে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে; এরূপ ব্যক্তির মৃত্যুর পর, জগতের সমস্ত লোক একৈক্য হইয়া তাহার কলঙ্ক কীর্ত্তন করিবেই করিবে। এক জন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি যথার্থ প্রশংসার পাত্র, জীবদ্দশায় তিনি সে প্রশংসা প্রাপ্ত হন না; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রশংসার অপাত্র, সে কেবল মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধন বলেই হউক বা ক্ষমতা বলেই হউক, জীবদ্দশাতেই প্রশংসার ভাজন হয়। ভয়প্রযুক্ত সজ্জনেরাও তাহার কখন কখন প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু তদ্রূপ ব্যক্তি নয়ন মুদ্রিত করিলেই দেশের আপদ দূর হইল, এই কথা বলিয়া
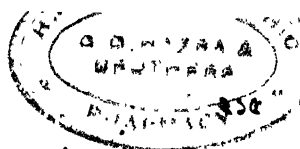
থাকলে আহ্লাদিত হয়। কেহ কেহ বলেন, মূর্খ ব্যক্তিরাই গর্ব্ব করিয়া থাকে; জ্ঞানবানের গর্ব্ব নাই, এ কথাই বা'কি রূপে স্বীকার করি।

কিছুকাল পূর্ব্বে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামে এক ব্যক্তি অসাধারণ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। তিনি এরূপ গর্ব্বিত ছিলেন যে, অন্য কোন পণ্ডিত তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিলে, "কে রে তুই, পণ্ডিতের বেটা পণ্ডিত! আমার কথার উপর কথা কহিতেছিস্! তুই কখানা সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিস্, বল্ দেখি?" এই রূপ গর্ব্বিত বচনে পণ্ডিতমণ্ডলীর অপমান করিতেন। সভাস্থলে বিচারে পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া আপন কিঙ্করকে কহিতেন, 'উহাদের মস্তকে আমার আসন ঝাড়িয়া দাও!' অবোধ কিঙ্কর অনেক স্থলে সত্য সত্যই তাহা করিয়াছিল; এই জন্য পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অসাধারণ বিদ্যা সত্ত্বেও লোকে তাঁহাকে অমর্য্যাদক ও গর্ব্বিত বলিয়া ঘৃণা করিত।

গ্রীসরাজ্যের মিলটাইডিস্ নরপতি অত্যন্ত গর্ব্বিত ছিলেন। তিনি একজন সমকক্ষ রাজার দুহিতাকে বিবাহ করিতে চাওয়ায়, কন্যার পিতা কহিয়াছিলেন, "অমর্য্যাদককে আমি কখনই কন্যাদান করিব না; কারণ অদ্য সে আমার কন্যার লাবণ্যে মোহিত হইয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছে, কল্য হয়ত, উহার অপেক্ষা আর একজন রূপবতীকে পাইলে, আমার দুহিতাকে তাহার দাস্য বৃত্তিতে নিযুক্ত করিতে পারে। যে মর্য্যাদক নহে, মর্য্যাদাবান্ লোক তাহার সহিত কুটুম্বিতা করেন না।" এই কথা দূতমুখে শুনিয়া মিলটাইডিস্ ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিলেন ও সভাসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "দেখিব, সে কেমন মর্য্যাদক! তাহাকে আনিয়া আমি

রাজসিংহাসনে উঠিবার সোপান করিতে পারি, তবেই আমি মর্য্যাদক, নতুবা সেইই মর্য্যাদক থাকিবেক।” এই কথার পর, সসৈন্যে ঐ রাজার রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং সম্মুখযুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্ধনাবস্থায় স্বরাজ্যে আনয়ন করিলেন। রাজকন্যাও সেই সঙ্গে বন্দিনী হইলেন।

মিলটাইডিস্ স্বরাজ্যে আসিয়া মদগর্ব্বে কিঙ্করদিগকে আদেশ করিলেন, “যে রাজাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছি, রজ্জুদ্বারা তাহাকে বন্ধন করিয়া আমার সিংহাসনের নিম্নে আনিয়া রাখ, আমি ঐ মর্য্যাদক রাজার মস্তকে পা দিয়া প্রতিদিবস সিংহাসনে উঠিব।” তিনি ঐ প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিয়া এক দিবস আপন মন্ত্রী সোলনকে কহিলেন—“কেমন সোলন! আমার ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজা পৃথিবীতে আর আছে?” সোলন কহিলেন, “শেষ রক্ষা না হইলে, ইহার প্রত্যুত্তর দিতে পারি না; এইরূপ করিতে করিতে যদি মরিতে পারেন তবেই মঙ্গল, নতুবা মানীর মর্য্যাদা হরণের ফল ভোগ করিতে হইবে।” সোলনের রুক্ষ কথা শুনিয়া মিলটাইডিস্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

এই ঘটনার কিছু কাল পরে গ্রীসের অন্য একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা মিলটাইডিসের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি সেনাপতিকে আদেশ করিলেন, ‘আপাততঃ দুর্গের দ্বাররুদ্ধ করিয়া রাখ, শত্রুর বলাবল না বুঝিয়া আমরা হঠাৎ সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না।’ যে ললনার পিতা প্রতিদিবস মিলটাইডিসের চরণে দলিত হইতেন, সেই পিতৃবৎসলা দুহিতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, “যে প্রকারে পারি, পিতৃ-

G D HAZRA & BROTHERS
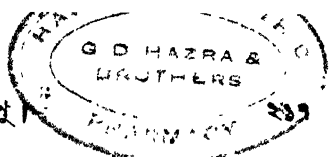
বৈরীর মদগর্ব্বের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।” শত্রু কর্ত্তৃক রাজধানী আক্রান্ত হইয়াছে, ঐ কামিনী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দ্বাররক্ষকগণকে অর্থদ্বারা বশ করিলেন এবং তাহাদিগের সম্মুখেই আপনি দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শত্রু শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজা ঐ পরমা সুন্দরীকে সহসা সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি কে?’ ললনা কহিলেন, “আমি আপাততঃ মিলটাইডিসের বন্দিনী—পিতৃবৈরীর প্রতিফল দিবার জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি; দুর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত আছে, এই সময় অকুতোভয়ে স্বসৈন্যে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হউন। মিলটাইডিস্ এক্ষণে সুরাপানে বিহ্বল হইয়া আছে; আপনি অক্লেশে উহাকে দমন করিতে পারিবেন।” আক্রমণকারী রাজা তাহাই করিলেন। মিলটাইডিস্ বিনা যুদ্ধে শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শত্রু শিবিরে নীত হইলেন। রজনী প্রভাতে সমরজয়ী রাজা কিঙ্করগণকে আদেশ করিলেন, “আমার শিবিরের সম্মুখে একটা চিতা প্রস্তুত কর; এ দুরাত্মা অনেকের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছে, ইহাকে অল্পে অল্পে চিতানলে দগ্ধ করিতে হইবে।”

রাজাজ্ঞা মাত্র সমস্ত কার্য্য সমাধা হইল। মিলটাইডিস্ চিতার উপর শয়ন করিবার আর কাল বিলম্ব নাই দেখিয়া ‘সোলন! সোলন!’ এই শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রাজা মিলটাইডিসের এই অলৌকিক আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘সোলন কে? কেন তুমি এই আসন্ন মৃত্যু কালে তাহার নাম স্মরণ করিতেছে?’ মিলটাইডিস্ কহিলেন, “তিনি আমার মন্ত্রী। কিছু কাল পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কেমন আমার ন্যায় দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত রাজা

আর আছে ?” মন্ত্রীবর কহিয়াছিলেন, ‘এই অবস্থার শেষ রক্ষা না হইলে, আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।’ আমি এই অপরাধে সেই দূরদর্শী মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। অদ্য আপনার হস্তে আমার দর্পচূর্ণ হইল, সেই জন্য মন্ত্রীবরকে স্মরণ করিলাম।” এই কথা শুনিয়া সমরজয়ী রাজার জ্ঞানোদয় হইল। তিনি কহিলেন, “তোমার মন্ত্রী যথার্থ জ্ঞানীর ন্যায় কথা কহিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহারই বা স্থিরতা কি ? তোমার বিজ্ঞ মন্ত্রীর কথায় তোমারও প্রাণ রক্ষা হইল, আমারও জ্ঞান লাভ হইল। মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া নিভান্ত পশুর কার্য্য। মনুষ্যের অদৃষ্টে কখন কি ঘটিবে, যখন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, তখন সম্পদ্ কালে শান্তি আচরণ করাই যুক্তি। অদ্য তোমাকে আমি অভয় দান দিলাম, স্বচ্ছন্দে আপনার রাজধানীতে গিয়া বিনয় নম্রতার সহিত রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন কর। যে রাজাকে আজ সপ্তাহ কাল চরণে দলিত করিতেছ, সমূহ মর্য্যাদার সহিত তাঁহাকে স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দাও। কেবল তোমার বিজ্ঞবর মন্ত্রীকে আমি নিজ রাজ্যে লইয়া যাইব—তিনি তোমার, আমার ও সেই কারারুদ্ধ রাজার ত্রাণকর্ত্তা।” মিলটাইডিস্ তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সোলনকে আনাইয়া তাঁহার করে অর্পণ করিলেন এবং যে রাজার মস্তকে চরণ দিয়া সিংহাসনে উঠিতেন, সমূহ মর্য্যাদার সহিত তাঁহাকে স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি স্বইচ্ছায় আপন দুহিতাকে জয়ী রাজার হস্তে অর্পণ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। *

* —এই গল্পটি এক জন মৌলবীর মুখে শুনিয়াছিলাম। যদিও গ্রীসের ইতিবৃত্তের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিতেছে না, তথাচ দম্ভের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া আদরের সহিত গৃহীত হইল।

এক্ষণে দম্ভ সম্বন্ধে একটি উপদেশের কথা বলিতে হইবে। ঈশপ্ লিখিয়াছেন, জ্ঞানবান্ লোকেরা যদি দম্ভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে, যেন সমানে সমানে করেন; হীনের উপর উন্নত জনের কোন কালে দম্ভ চলে না। উন্নত ব্যক্তিরা হীন-জনকে কোন ক্রমেই নত করিতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে দূরদর্শী ঈশপ লিখিয়াছেন—কোন নিবিড় অরণ্যে এক মহা-সিংহ বাস করিত। সে মধ্যে মধ্যে গর্জ্জন করিলে ঐ অরণ্যের সমস্ত পশুর হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। যে স্থলে সিংহ সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিত, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এক ক্রোশের মধ্যে কোন পশু বাস করিতে সাহস করিত না। কেবল এক জোড়া ইন্দুর সিংহের গহ্বরের মধ্যেই গর্ত্ত করিয়া পরমানন্দে উহার ভিতর থাকিত। সিংহ শিকার করিয়া আসিয়া ক্লান্ত শরীরে নিদ্রিত হইলে, ইন্দুর দুইটি অকুতোভয়ে আপন গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিয়া সিংহের কেশর কাটিয়া লইয়া তাহার দ্বারা শাবকদিগের জন্য বাসা প্রস্তুত করিত। এইরূপে ইন্দুরেরা প্রত্যহ কেশর কাটিয়া লইয়া সিংহকে হতশ্রী করিয়া দিয়া-ছিল। এক দিবস ইন্দুর দুইটি অন্য কোন খাদ্য না পাইয়া সিংহের কর্ণের কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া যায়; ইহাতে সিংহ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দুর মারিবার জন্য বিশেষ সতর্ক হইয়া রহিল এবং মধ্যে মধ্যে মহাদম্ভে গর্জ্জন করিয়া বনস্থলী কাঁপা-ইতে লাগিল; কিন্তু সে দিবস ইন্দুর দুইটা একবারও বিবরের বাহিরে আসিল না।

সিংহ মহা দুঃখিত হইয়া নিজ মন্ত্রী শৃগালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি প্রকারে ইন্দুরগুলাকে মারিয়া ফেলিব,

তাহার সৎপরামর্শ দাও। শৃগাল কহিল, মহারাজ! যদি নিতান্তই ইন্দুর মারিতে সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আপনাকে একটা বিড়াল পুষিতে হইবে; কারণ ক্ষুদ্র শত্রুকে দলন করিবার জন্য ক্ষুদ্র লোকের সাহায্যই প্রয়োজন। আপনি পশুরাজ, দর্প করিয়া হস্তীর মস্তকে উঠিতে পারেন; কিন্তু ইন্দুরের কিছুই করিতে পারিবেন না। অতএব মহারাজ! যদি আপনার মস্তকের অবশিষ্ট কেশরগুলি রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে, হয় একটি বিড়াল পালন করুন, না হয় এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্রে চলুন।

ঈশপ্ আখ্যায়িকা শেষ করিয়া বীর্য্যবান্ লোকদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন, তাঁহারা বীর্য্যবান্ লোকের উপরই যেন দম্ভের সহিত আপনাদিগের পরাক্রম প্রকাশ করিতে যান; মুষিকের উপর যেন দম্ভ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ না করেন। ব্রহ্মাস্ত্রে বীর্য্যবানেরই শিরচ্ছেদন হয়; কিন্তু মুষিকের লাঙ্গুল কর্ত্তন হয় না। মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ক্ষুদ্র লোকের উপর হস্তোত্তলন করিও না। ক্ষুদ্র লোকের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করা ও প্রস্তরে আঘাত করা দুইই সমান। সে যদি গর্ব্বিত হইয়া তোমার গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহা হইলে, এক আঘাতেই তোমাকে ভূতলশায়ী হইতে হইবে, তুমি সে অপমানের ক্ষতিপূরণ করিবার উপায় প্রাপ্ত হইবে না। নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট বীর দর্পে দর্পিত হইয়া ইয়ুরোপের সমস্ত সভ্য জাতিকে জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু সাইবিরিয়ার বন্যজাতির কিছুই করিতে পারেন নাই। যদি দম্ভকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে না পার, তাহা হইলে, সমানের উপর দম্ভ করিও, যাহাতে কিয়ৎ পরিমাণেও

সম্মান রক্ষা হইবে ; নীচলোকের উপর দম্ভ করিতে গেলে, পদে পদে অপমান সহ্য করিতে হয়।

পুরাকালে নীতিজ্ঞেরা দম্ভ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইল। বর্ত্তমান কালে দম্ভ মনুষ্য সমাজে কিরূপে খেলা করিতেছে, তাহাই নিম্নে লিখিত হইতেছে। দম্ভ ও অহঙ্কার এই দুইটি শব্দার্থে অতি অল্পমাত্র প্রভেদ আছে। অহঙ্কার মনোমধ্যে আবির্ভূত না হইলে, বাহ্যিকে দম্ভ প্রকাশ হয় না। এক্ষণকার কালে অহঙ্কার ও দম্ভ ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত লোকেরই সমভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। 'অহম্'—অর্থাৎ আমি, এই আমি শব্দ লইয়া তর্কশাস্ত্রবেত্তারা অনেক তর্ক করিয়াছেন। অনেকে কহিয়াছেন, মনুষ্যের অহং তত্ত্ব দূর হয় না কেন? তদুত্তরে আর এক সম্প্রদায় বলেন, বিষয় অনুরাগ অহং তত্ত্বের মূল কারণ। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই, যে ব্যক্তি দারিদ্র দশা বশতঃ দুরপণেয় দুর্দ্দশা ভোগ করে, তাহার অহং তত্ত্ব অনেকাংশে কমিয়া যায়। সে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে এই অনিত্য সংসারে কোন সুখই নাই। এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই বাঁচি। ধন জন পরিবার সকলই ছায়াবাজির ন্যায় জানিবে, নয়ন মুদ্রিত করিলে কেহই কাহারও হইবে না। ধন হীনেরাই আন্তরিক হউক বা না হউক, কিন্তু মৌখিকে মৃত্যু কামনা করে। যাহাদিগের ধন অধিক তাহারা সেই ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া একপ অহঙ্কারের কার্য্য আরম্ভ করে যে, স্পষ্টই অনুভব হয়, এক দিন মরিতে হইবে, এ কথা একেবারে তাহারা বিস্মরণ হইয়াছে! তাহা না হইলে, ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে একজন ধনী পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবে

কেন? যদি কোন সজ্জন তাহাকে সেই গর্হিত কার্য্য করিতে নিষেধ করেন, তবে ধন মদে মত্ত ব্যক্তি তাহার এই উত্তর দেয়—সময় বিবাহ করলে দোষ কি?' চক্ষু মুদ্‌লে স্ত্রী যার খেতে পাবে না, তারাই যেন পঞ্চাশ বৎসরের পর বিবাহ না করে; আমরা কর্‌ব না কেন? আমার এতটা বিষয়; কিন্তু একটি ছেলে। এত বড় বাড়ীখানার ভিতর দশ জন পরিবার না হলে কি থাকা যায়? আমার ইচ্ছা একেবারে দশটা বিবাহ করি। তারা গোলমাল করুক, হাসুক খেলুক, সংসারে ভরা-ভর হোক। যাদের হাঁড়ী ঠন্ ঠন্ করে, তাদেরি বাড়ীতে ঝকড়া হয়। বড়লোকেরা কোন্ কালে একটা বিবাহে ক্ষান্ত হয়েছেন? বিখ্যাত রাজা মান সিংহের দেড় হাজার রাণী ছিল। যবন রাজাদের অসংখ্য স্ত্রী থাকিত। এখনও পশ্চিমাঞ্চলের রাজারা আট দশটা বিবাহ করিয়া থাকেন। তাঁরা দশটাকে খেতে দিতে পারেন, আমি কি একটাকেও পার্‌ব না?"

ধনী ধনমদে মত্ত হইয়া বিবাহ সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা কহিল, এ সমস্ত কথাতেই অহঙ্কার মূর্ত্তিমান্ হইয়া রহিয়াছে। বিবাহ করিয়া আমি কি প্রতিপালন করিতে পারিব না,—পদে পদে এই কথারই আন্দোলন করিল। অধিক বয়সে বিবাহ করিলে পত্নীর যৌবনাবস্থায় পতির মৃত্যুই সম্ভব, এ কথার নামোল্লেখও করিল না। ইহার কারণ এই যে, লোকে ধনবান্ হইলে, মৃত্যু ভাবনা একেবারে ভুলিয়া যায়। এই উন্নত অট্টালিকা, এই সুসজ্জিত গৃহ, এই বহু মূল্যের পরিচ্ছদ, এই স্বর্ণ রৌপ্যের আভরণ, এই শকট, এই অশ্ব, এই উদ্যান, এ সমস্তই আমার; এ সকল সামান্য পুণ্যে প্রাপ্ত হই নাই। পূর্ব্ব

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY
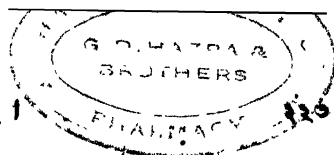
জন্মে কত তপস্যা করিয়াছিলাম, তাহাতেই এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমি যাহা করিতেছি, তাই শোভা পাইতেছে। আমি যাহা করি, যাহা বলি, সকলেই তাহা গ্রাহ্য করে। যদি অন্যায় বলিতাম কি অন্যায় করিতাম, তাহা হইলে অবশ্য লোকে তাহার প্রতিবাদ করিত। তবে আমার কথা ও আমার কার্য্য অবশ্যই লোকের অনুমোদিত। ধন হইতে এইরূপে অহঙ্কার উদয় হয়, সেই অহঙ্কার দম্ভকে প্রসব করে, দম্ভ হইতে মদ উৎপন্ন হয়। এই মদ শব্দ হইতে সুরার একটি নাম মদ হইয়াছে, অর্থাৎ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া লোকে যেমন হিতাহিত বিবেচনা বিহীন হইয়া কার্য্য করে, অহঙ্কার প্রসূত মদের কার্য্যও সেই রূপ।

কোন ব্যক্তি মদ্যপানে মাতাল হইয়া এক ব্যক্তিকে গুরুতর প্রহার করিল। যদি কেহ বলে, 'কেন এরূপ অন্যায় কার্য্য করিলে? নিরপরাধকে প্রহার করিলে কেন?' মাতাল কহিল—'খুব করেচি! আমি যে রাস্তা দিয়ে যাব, ও বেটাও সেই রাস্তা দিয়ে যাবে! বাবা! আমার নাম তরুগোবিন্দ সোম, আমাকে যম ভয় করে!' মাতাল সুরাপানে বিহ্বল হইয়া এইরূপ কথা কহিল; কিন্তু ধনমদে মত্ত ব্যক্তি সুরাপান ব্যতিরেকেও ইহা অপেক্ষাও অনেক জঘন্য কার্য্য করিয়া থাকে। বোধ কর, কোন দরিদ্রের গৃহে একটি পরমা সুন্দরী কামিনী আছে। তাহার পতি ঐ ধনবান্ ব্যক্তির বাটীতে কিঙ্করের কার্য্য করে। সে শান্ত শিষ্ট ও প্রভু ভক্ত। তথাচ প্রভু তাহাকে বিনা দোষে প্রহার করিয়া থাকেন। বাবুর মোসাহেব এক দিন জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়! ও ভাল মানুষকে আপনি অত মারেন কেন? আমরা ত

উঁহার কোন অপরাধ দেখিতে পাই না।’ বাবু ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলেন, “ও বেটার অপরাধ না ত কার অপরাধ আছে? বেটা নিজে লোহার কার্ত্তিক; কিন্তু ঘরে এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী! তারি জন্যে ওকে দেখ্‌লে আমার মাত্তে ইচ্ছে করে। পাকা আম দাঁড়কাকে ঠোক্‌রালে তাকে কি ইট মেরে তাড়াতে হবে না? যে যার পাত্র নয়, তার অধিকারে সে বস্তু থাক্‌লে বলবানেরা তাহা কেড়ে নিয়ে থাকে। সের আফগান সেলিমের কি অপরাধ করেছিল? কেবল নুরজিহানের জন্যেই তার প্রাণটা গেল। তেমনি ও বেটার স্ত্রীর জন্যেই কোন বাবুর হাতে প্রাণটা যাবে! কুঁড়ে ঘরে যদি কাহারও দশ কলসী মোহর থাকে, সে টাকা কি সেই হীন ব্যক্তির ভোগে আসে? সবলে তা কেড়ে নিয়ে যায়ই যায়। এই আমার ঘরে এত টাকা আছে, আমি তদুপযুক্ত রক্ষক রেখে নির্ব্বিঘ্নে তা ভোগ কচ্চি। প্রত্যক্ষ দেখ না কেন, সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মী উঠ্‌লেন, সেই অমূল্য রত্ন সর্ব্ব বলে বলবান্ বিষ্ণু নিয়ে গেলেন, সে রত্ন কি পঞ্চাননের ঘরে শোভা পেত? সেইরূপ সকল বিষয়েই জান্‌বে। পৃথিবীর যা কিছু ভাল ভাল আছে, তা সকলই বড় মানুষে ভোগ কোর্‌বে। আর যা অপকৃষ্ট তাই গরিব লোকে ভোগ কোর্‌বে। ভাল স্ত্রী দেখে তেজিয়ানেরা কোন্ কালে কে ছেড়েচে বল দেখি? শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ অবধারিত, মাঝে থেকে কৃষ্ণ গিয়ে কেড়ে নিয়ে এল। বিনা অপরাধে শিশুপালের মার খেয়ে হেড়ো ভেঙ্গে গেল! শিশুপাল যে অপরাধে কৃষ্ণের হাতে মার খেয়েছিল, সেই অপরাধে আমার চাকরটা আমার হাতে মার খায়। ও কেন বলুক না, ‘বাবু, এই অমূল্য রত্নটি তুমি নাও, আমাকে একটা কাল কুৎসিৎ

দেখিয়া বিবাহ দিয়ে দাও।' তাহা হইলে, আমি উহাকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দি। তোমরা পদে পদে বড় মানুষের দোষ দেখিয়া থাক। বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, যদি কেহ কোন খানে একটা নূতন সামগ্রী কি অন্য কোন প্রকার নূতন ফল পায়, তাহা হইলে, কি এক জন দীনদুঃখীর বাড়ী লইয়া যায়, না আমার বাড়ী আসিয়া থাকে?

আমাদের চরিত্র ও কার্য্য দেবেরও অগোচর। এই বসিয়া রহিয়াছি, এখনি মনে করিলে, এই বাটীর সম্মুখের রাস্তাটা গোলাবজল দিয়া ভিজাইয়া দিতে পারি। এই নূতন বাড়ী খানা ভাঙ্গিয়া আর এক রকমের বাড়ী করিতে পারি। যেমন আকাশ নির্ম্মল হইয়া রহিয়াছে, সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হয়, অহঙ্কারী বড় মানুষের চরিত্রও তদনুরূপ। এই স্থির ভাবে তোমাদের সহিত বসিয়া আছি, ক্ষণকালের মধ্যেই আর এক মুর্ত্তি ধারণ করিতে পারি; যে মূর্ত্তি দেখিলে অন্যের কি কথা, তোমাদেরই ভয় হইবে! আমাদের হাস্যবদন আকাশের পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়! আমাদের হর্ষোৎফুল্ল মুখ দেখিয়া আশ্রিত লোকেরা আপন আপন মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। যেমন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইলে, কুটীরবাসী লোকের ভয় উপস্থিত হয়, তেমনি আমাদিগের গম্ভীর মুখ দেখিলে, ভয়ে আশ্রিতগণের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। আমরা হাসিলে লোকে হাসে, আমরা কাঁদিলে লোকে কাঁদে। আমরা পৃথিবীর সামান্য মনুষ্য নহি—আমরা অন্য উপকরণে নির্ম্মিত; এই জন্য আমাদিগের রীতি নীতি, আহার ব্যবহার, পরিচ্ছদ সকলই

স্বতন্ত্র। আমরা যাহার মুখ পানে চাই, সে কৃতার্থ হইয়া যায়। কাহারও প্রতি একটা কার্য্যের ভার দিলে, সে যেন রাজ্য লাভ মনে করে। লোকের বাড়ী আহার করিতে গেলে, বড় বড় বিদ্বানদিগকে কলাপাত পেতে খাওয়ায়; কিন্তু আমাদের জন্যে নিদেন অপরের বাড়ী হইতে দুই খানি রূপার থাল ও দুইটা রূপার বাটী চাহিয়া আনে।

প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কলহ বিবাদ উপস্থিত হইলে, আমাকেই ডাকিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লয়। আমি যাহা বলিয়া আসিব, তাহাই তাহাদের বেদবাক্য জ্ঞান করিয়া লইতে হইবে। আমরা প্রকাশ্যে কত কি করিতেছি; কিন্তু আমাদের কেহ জাতি মারিতে পারে? তোমরা কাছে থাক বলিয়া তোমরাও কত জঘন্য কার্য্য করিয়া আমার দাপটে পার পাইতেছ। অন্য এক জন কিছু করুক দেখি, আমিই তার জাতি মারিব। আবার আমার পায়ে কাঁদিয়া পড়িলেই, আমিই তাহাকে জাতিতে তুলিয়া লইব। আমরা ভাঙ্গিতেও পারি, গড়িতেও পারি, বিধাতা আমাদের এত দূর ক্ষমতা দিয়াছেন; এই জেলাটা শুদ্ধ লোক আমার নামে হাড়ে কাঁপে কি না বল দেখি! কত জজ মাজিষ্ট্রেট আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকে। আমার সঙ্গে কেহ শত্রুতা করিলে, আমি তার ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া দিতে পারি! তোমরা আমার অনুগত বলিয়া সমাজে তোমাদেরই বা কত মান। বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, বিধাতা আমাদিগকে দম্ভ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, আমরা দম্ভ না করিয়া কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি। সাগরের জল কি স্থির থাকে? সিংহ কি সিংহনাদ না করিয়া থাকিতে পারে?

B. M. HATRA & BROTHERS

আমরা আপনার তেজে আপনারাই স্থির থাকিতে পারি না, কাজে কাজেই মধ্যে মধ্যে এক একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইতে হয়। ”

পাঠকগণ, যে কথাগুলি প্রকাশ করিয়া লেখা গেল, বড় মানুষের মন সর্ব্বদা ঐরূপ দম্ভেই পরিপূর্ণ থাকে। আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, এক জন দাম্ভিক ধনী আশ্রিতগণের মধ্যে দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন,—“বিশেষ বিবেচনা কোরে দেখ্‌তে গেলে, আজ কাল সহরের মধ্যে আমিই ধনী। সকলেরই ত সব টের পাওয়া গেল, ভাগ বাটরা হলে আর কার কি থাক্‌বে! বিশেষতঃ, বড় মানুষের ছেলে গুলো লিখ্‌তে পোড়্‌তে কেউ শিখ্‌লে না— একটা চাপাচাপি কাজ পোড়্‌লে সকলকেই আমার বাটীতে ছুট্‌তে হয়। এই পুরুত ঠাকুরের ভিটেটা তো আমিই রেখে দিলুম। কেমন গো বিষ্ণু বাবু, এমন ধারা নতুন ধরণের গাড়ী এ সহরে আর কেউ কখন এনেছে? কি বল্লে? কি বল্লে? ‘আর কাউকে আনাতে হয় না?’ শুধু গাড়ী খানির দাম ৬,৫০০ টাকা। সাজের দামও প্রায় আড়াইশ। গাড়ীর একটা ঘেরা টোপ তয়ের কত্তেই আমার অনেক টাকা পোড়ে গেছে। বিষ্ণুবাবু, টাকা থাক্‌লেই হয় না—এক খানা গাড়ীতে দশ হাজার টাকা খরচ করা ছাপ্তি চাই!”

অহঙ্কার যে কেবল ধনেই আছে, এরূপ নহে; বিদ্যাবান্ লোকেরাও ঘোর অহঙ্কারী হন। ভবভূতি মালতীমাধব নাটকের প্রারম্ভেই গর্ব্ব করিয়া লিখিয়াছেন—

“উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা।
কালো হ্যয়ং নিরবধির্ব্বিপুলা চ পৃথ্বী॥”

বায়রণও স্বরচিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে আপনার গর্ব্বের

পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণেও যে সকল কবি কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণের পূজ্য হইয়া উঠিয়াছেন, কিম্বা দুই এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অন্যান্য গ্রন্থকারকে গণ্ডমূর্খ দেখেন। যাঁহার কুলমর্য্যাদা আছে, তিনি সভাস্থলে বসিয়া নিজ মুখেই আপনার মান মর্য্যাদা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন—"আজ রামধনের কি সৌভাগ্য! আমি নিজে আসিয়া তাহার বাটীতে সভাস্থ হইয়াছি। আমি যাকে বামুণ করি সে বামুণ হয়।" বিখ্যাত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার কোন ধনীকে কহিয়াছিলেন, "আমাকে আবার শাল দেখাও! আমি আপনার বিদ্যাবলে এত শাল জড় কোরেচি যে, তোমার বাড়ীর উঠানটা শাল দিয়ে মুড়ে দিতে পারি!' ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের স্ত্রীও দম্ভ করিয়া কহিয়াছিলেন, "আমার হাতের খাড়ু যতক্ষণ, নবদ্বীপ ততক্ষণ।" যাঁহারা প্রাচীন ঘর, অথচ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা সেই পুরাতন মান সম্ভ্রমের গৌরবেই উন্মত্ত হন। কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, "কালস্য কুটিলা গতি! আঘাট ঘাট হোলো, অপথ পথ হোলো! ঠাকুরদাদা মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছি, বিষ্ণু বাঁড়ুজ্যের বাপ আমাদের বাড়ীর ফুলতোলা বামুণ ছিল। তার ছেলে কি না আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে গাড়ী চড়ে যায়! কালে কালে কতই হবে!"

ধনবান্, বিদ্যাবান্, বলবান্ প্রভৃতির দম্ভের কথা অনেক হইল। এক্ষণে যাঁহারা আপনাকে মহা পুণ্যবান্ ও ধাপক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগের দম্ভের কথা দুই একটা বলা যাইতেছে। বেশধারী পুণ্যবানেরা ধনীদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হাস্য করিয়া বলে, "পূর্ব্ব জন্মে কোন সুকৃতি ছিল, তাই এ
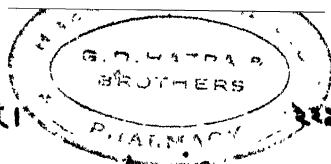
জন্মে কিঞ্চিৎ ভোগ হইবে; কিন্তু এবার যে প্রকার পাপ আচরণ করিতেছে, ইহাতে অবশ্যই ইহাদিগকে পরকালে নরকগামী হইতে হইবে। আমরা ইহ কালের সুখকে তৃণতুল্য জ্ঞান করি, এ সুখ ক দিনের জন্য? আজ চক্ষু মুদিলে সব পড়িয়া থাকিবে। পুণ্যাত্মারা অনন্ত সুখের প্রত্যাশী—যাঁহারা এই কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহারা সমস্ত দিন ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া যথাকালে হবিষ্যান্ন আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের অনন্তসুখ কে অন্যথা করিতে পারে? আমি আপনার অহঙ্কার করিতেছি না, আমি মহা পাতকী নরাধম।" এইরূপ বাক্যবিন্যাস করিতেছে, এমন সময় যদি কেহ তাহাকে কোনরূপ অপমানের কথা বলে, তখন ভাক্ত পুণ্যাত্মার দন্তের কথা বাহির হইয়া পড়ে। যথা—"তবে আমাকে তুই কটুকাটব্য বলিস্, জানিস্‌নে আমি কে? আমি নিশ্বেস ফেল্লে যে তোর বংশ শুদ্ধ ভস্ম হয়ে যাবে! আমাকে কি তুই তেম্নি ব্রাহ্মণ পেয়েছিস্? আমি কি মাতাল, না খানাখেগো বামুণ? আমার মুখে আগুণ জ্বলে জানিস্! ঐ রামা বেটা আমার সঙ্গে লেগেছিলো—এখন দেখ্, মহারোগে গোলে খোসে পড়্‌চে।" যদি কোন প্রাচীনা বিধবাকে বলা যায়, 'এই একাদশীর উপবাস কোরেচ, এবার আর শিব-রাত্রের উপবাস কাজ নেই, তা হলে বড় কষ্ট হবে।' তা হলে তিনি অমনি বোলে উঠেন—'বাবা, তোমার মাসী তেমন বাপের মেয়ে নয় যে, দুটো উপোসে কাতর হবে। তোমার যে মাসী কতবার ব্রত কোরে পার পেয়েছে? সে কি দুটো একটা উপোসে ডরায়?' এইরূপ কোন বৈষ্ণব কি সন্ন্যাসী কাহারও বাটীতে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইলে

গৃহস্থ যদি ব্যস্ততা বশতঃ ভিক্ষা দিতে না পারে, তাহা হইলে, উহারা অমনি বলিয়া উঠে, "আমাদের দিলে জলে পড়বে না— এ তোলা থাক্‌বে গো, তোলা থাকবে। সাধুসেবা কি সকলের অদৃষ্টে ঘটে? আমরা ভণ্ড বৈষ্ণব নই, বড় বড় আমীর ওমরারা আমাদের চরণ জড়িয়ে ধরে!"

এই সংসারের ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত লোকেই আপন আপন অবস্থা মত অহঙ্কার করিয়া থাকে। অন্য কি কথা, এক জন গাঁজাখোরও দম্ভ করিয়া নূতন গাঁজাখোরদিগকে বলিয়া থাকে, 'তোরা আবার আমার কাছে কল্কে ধত্তে এইচিস্? আমার গা চাট্‌লে তোদের নেসা হয়! আমি বার বছরের বেলা থেকে এই কর্ম্ম কচ্চি' ইত্যাদি। এইরূপ যে, যে প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া থাকে, তাহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে শিখিলেই শিক্ষানবিস-গণের নিকটে সে দম্ভ প্রকাশ করিয়া থাকে। যে গাঁজা খায় না এরূপ ব্যক্তিকে গাঁজাখোর বলিলে তাহার মহা অপমান হয়; কিন্তু সেই জঘন্য কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া কাহারও কাহা-রও দম্ভে মৃত্তিকায় পা পড়ে না!

হা দম্ভ! তুমি যে কেবল ধনীর স্কন্ধে বাস কর এমত নহে। তুমি উচ্চ নীচ সকল ব্যক্তিকেই কৃপা করিয়া থাক। যে আপন মুখে আপন অহঙ্কার প্রকাশ করে, তাহার ন্যায় অধম আর নাই। যিনি অদ্য বলের দম্ভ করিয়া গেলেন, তিনি হয় ত, কল্য মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, কতকগুলি দুর্ব্বল ব্যক্তি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। যাহার বীরদর্পে কল্য মেদিনী কম্পিত হইয়াছে, অদ্য সেই ব্যক্তিকে হীন লোকে চিতানলে দগ্ধ করিতেছে। একটি রূপবতী স্ত্রী

আপনার রূপ ও যৌবনের মদগর্ব্বে কতশত কামাতুর পুরুষের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছে, কিছু দিন পরে তাহাকেই দেখা গেল, ক্ষয়রোগে কঙ্কাল সার হইয়া প্রেতিনীর ন্যায় শয্যায় উপবিষ্ট আছে। যে সকল পুরুষ তাহাকে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত হইত, এক্ষণে তাহারাই ঐ স্ত্রীকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছে। যে ধনীর ধনগর্ব্বে পল্লীর লোকে কম্পিত হইত, শত সহস্র লোক যাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা স্তুতিবাদ করিত, তিনিই আবার নির্ধন হইয়া হীন জনের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন।

এই সংসারের সমস্ত বিষয়ই যখন পরিবর্ত্তনশীল, এক ভাবে চিরকাল কিছুই থাকে না। তখন আমরা কিসের দম্ভ করিব? অদ্য পদস্থ হইয়া হীন জনের প্রতি যখন দম্ভ প্রকাশ করিব, তখন কি এক বারও স্মরণ হইবে না যে, অদ্য সৌভাগ্য বশতঃ উচ্চপদারূঢ় হইয়াছি, গ্রহ বৈগুণ্য হইলে, কল্যই আবার 'পুনর্মূষিকো ভব' হইতে পারি। অদ্য রূপের গরিমায় এক জন কদাকার পুরুষকে বিদ্রূপ করিবার সময় যেন একথা স্মরণ থাকে যে, কল্য বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে, আমার এই রূপ মাধুরী বিকৃত হইয়া যাইতে পারে। কোন্ বিষয়ের দম্ভ করিব? মনুজ-কুল যে বিষয়ের আতিশয্যে দম্ভ করে, কিছু কালের মধ্যে তাহার সেই দম্ভ চূর্ণীকৃত হইতে পারে। এক দিবস ধৃতরাষ্ট্র, সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি মহাবল শত পুত্রের পিতা ছিলেন, তিনিই আবার কালক্রমে শবাচ্ছন্ন ভীষণ রণক্ষেত্রে "হা পুত্র! হা পুত্র! আমার এই বৃদ্ধ বয়সে কে অন্ন জল দিয়া জীবন রক্ষা করিবে?" এইরূপ কাতর স্বরে রোদন করিয়াছিলেন।

অতএব হে অবোধ দাম্ভিকগণ! তোমরা এই সংসারের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া যদি কখন সুদিন প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে, সেই সময় দিন কিনিয়া রাখিও। ' একেবারে উন্মত্ত হইয়া ভাবিও না যে, এমনি চিরদিন যাইবে। ভাবিয়া দেখ, পূর্ব্বে কি ছিলে, এখন কি হইয়াছ! আমার ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা এখনও অবশিষ্ট আছে। তোমার মৃত্যুর পর যেন কেহ না বলিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি দাম্ভিক ছিল, পদস্থ হইয়া হীনবলকে পীড়ন করিত—সে মরিয়াছে, উত্তম হইয়াছে!

পাঠক, এই সংসারে রাবণ মান্ধাতা, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সকলের নাম পরিত্যাগ করিয়া লোকে পুণ্যশ্লোক নল-রাজা ও যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির নামই উচ্চারণ করে কেন? ইহাঁদিগের দম্ভ ছিল না, আপনার ন্যায় জগৎকে দেখিতেন, এই জন্যই প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময় যখন বহু সংখ্যক রাজা যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, তখন দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! দেখুন ভারতের সমস্ত নরপতিই আপনার চরণ তলে অবনত!" তৎশ্রবণে যুধিষ্ঠিরের দুই চক্ষে দুইটি ধারা বিগলিত হইল এবং কম্পিত কলেবরে কহিলেন, "অকিঞ্চনে এত কৃপা কেন জগন্নাথ? এই সামান্য লোককে যে এত দূরে তুলিলেন, ইহাতে আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। প্রভো! আমার অদ্যকার আধিপত্য স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। সেই জতুগৃহ দাহনের রজনী ও একচক্রাদেশে কুম্ভকার গৃহে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত, আমি এখনও বিস্মরণ হই নাই। এক্ষণে তোমার চরণে এই প্রার্থনা করি,
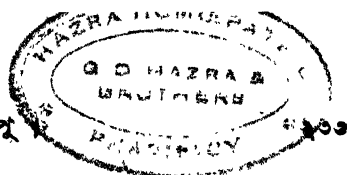
যেন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ততা না জন্মায়।” এই সকল গুণ থাকাতেই যুধিষ্ঠির প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। পাঠক, যেমন নানা রঙ্গে রঞ্জিত এক খানি উত্তম বস্ত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিলে, কেবল কৃষ্ণবর্ণের কতকগুলি ভস্ম হইয়া পড়ে, সেইরূপ অনলবৎ দম্ভে মনুষ্যের সর্ব্ব গুণ নষ্ট করিয়া থাকে।

মাৎসর্য্য—পরশ্রী কাতরতার নাম মাৎসর্য্য। পরের উন্নতি দেখিয়া যাহারা আন্তরিক দুঃখিত হয় ও সেই দুঃখ অসহ্য হইলে, গুণবান্ লোকের কতকগুলা কুৎসা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে আপনাদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিতে যায়, সেই বাক্য বিন্যাসকে মাৎসর্য্য কহে। অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদী লাভ করেন, সেই সময়ে হীনবল রাজগণ মাৎসর্য্য করিয়া কহিতে লাগিলেন—“ও বামুণ কি ভুজবলে লক্ষ্য বিঁধেছে? যোগবলে বিঁধ্‌লে। পরমা সুন্দরী দ্রৌপদী ঐ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হবেন কি কোরে? ওর গায়ের গন্ধে দ্রৌপদীর যে শিরঃপীড়া হবে! দ্রুপদ রাজাকেও অল্পে ছাড়া হবে না—সে যদি ঐ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের করে কন্যা সমর্পণ করে, তা হলে আমরা বলপূর্ব্বক কন্যাকে কেড়ে নিয়ে মহারাজ দুর্য্যোধনকে অর্পণ কর্‌ব। ব্রাহ্মণ বোলে এতক্ষণ অপেক্ষা কচ্চি, তা না হলে সমুচিত প্রতিফল দিতাম।”

রাজা দুর্য্যোধন যখন প্রভাস তীর্থে সপরিবারে স্নান করিতে গিয়া চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সহিত সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দী হন, তখন কর্ণ প্রভৃতি রাজার সমস্ত অনুবলই পলায়ন করেন। এই সংবাদ রাজা যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনের দ্বারা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করান। মহামানী দুর্য্যোধন

শত্রুকর্ত্তৃক মুক্তিলাভ করিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ও আত্মনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রিয়সখা কর্ণকে কহিলেন, তোমরা সকলে স্ত্রীগণ ও সৈন্যসামন্ত লইয়া স্বদেশে প্রস্থান কর, আমি আর দেশে গিয়া মুখ দেখাইব না। "চিত্ররথ হাতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণে। অযশ, উদ্ধার মম করিল অর্জ্জুনে!" কর্ণ সুযোগ পাইয়া মাৎসর্য্যের কথা কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি কি আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিতাম না? আমি যুদ্ধ-স্থলে নিরস্ত্র হইয়া পড়ায় শিবির হইতে অস্ত্র আনিতে গিয়া-ছিলাম, সেই সময়েই অর্জ্জুন আপনার সাহায্য করিতে আসিল। ইহাকে শত্রুভাব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? চিরকাল লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইবার একটা পথ করিয়া রাখিল; তাহা না হইলে, উহার ত ক্ষমতা ভারি! উহার যত বীরত্ব তা পাশা খেলার দিন প্রকাশ পাইয়াছে! রাজসভায় যখন দুঃশাসন আপনার আদেশানুসারে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন ও এমনি কাপুরুষ যে, সেই লাঞ্ছনা স্বচক্ষে বসিয়া দেখিল; কিন্তু তার কিছুই উপায় করিতে পারিল না!

রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য দেখিয়া শিশুপালের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়; কিন্তু মাৎসর্য্য প্রকাশের কোন পন্থা না পাইয়া নিস্তব্ধ হইয়াই ছিল। যখন ভীষ্মের অনুমতিক্রমে যুধিষ্ঠির উপস্থিত সমস্ত রাজগণকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণের করে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন, তখন শিশুপাল সেই সুযোগে আপন মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া ভীষ্মকে কহিল—

"রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রে পূজিবেক রাজা,
কোন্ রাজপুত্র কৃষ্ণ তারে কর পূজা?

HAZRA HOMŒOPATHIC PHARMACY
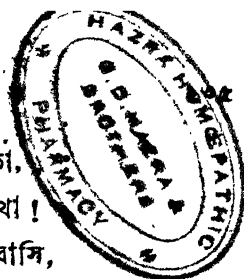
দুর্দ্দৈব ঘটিবে যার তুমি বুদ্ধিদাতা,
তব বুদ্ধে রাজসূয় যজ্ঞ হোলো বৃথা!
অর্থগর্ব্বে ভুজগর্ব্বে কৈলে হেন বাসি,
পাণ্ডবের ভয়ে যজ্ঞে মোরা নাহি আসি—
নিমন্ত্রণ করিয়া করিলে অপমান,
গোপসুতে কোরে দিলে সবার প্রধান।' "

ঐ রাজসূয় যজ্ঞকালে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে ধনের ভাণ্ডারী করিয়াছিলেন। রাজকোষে কিরূপ ধন সংগ্রহ হইল, দুর্য্যোধন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া হস্তিনায় গমন কালে আপন মাতুল শকুনিকে কহিলেন, মাতুল! তুমি গৃহে গমন কর, আমি আর পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য দেখিতে পারিব না। যাহারা বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই আমা অপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল! দুর্য্যোধনের এই মহা মাৎসর্য্যের কথা শুনিয়া দুষ্টবুদ্ধি শকুনি মিষ্টভাষে ভাগিনেয়কে কহিল—ঈশ্বর কোন্ অংশে তোমাকে হীন রাখিয়াছেন যে, পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তুমি এতদুর খিদ্যমান্ হইলে? পাণ্ডব যত কেন বর্দ্ধিত হউক না, তথাচ তোমার অপেক্ষা তাহারা কখনই গৌরবান্বিত হইতে পারিবে না। যেহেতু, জার-জাত পাণ্ডব ইহা সকলেই জানে। এস্থলে দুর্য্যোধন ও শকুনি উভয়েই পাণ্ডবদিগের প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশ করিলেন।

পরের উন্নতি দেখিয়া আমার এ রূপ হইল না কেন? এই বোধে লোকের মনে যে একটি অসামান্য আক্ষেপ উপস্থিত হয়, সে আক্ষেপ নিবারণের উপায়ান্তর নাই। সেই জন্য উন্নতিশীল ব্যক্তির মূলে যদি কোন কলঙ্কের কথা থাকে,

তাহা লইয়া মাৎসর্য্যকারীরা জনসমাজে কীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ তাহাদের মনের আক্ষেপ দূর হয় বটে ; কিন্তু সে কলঙ্ক কীর্ত্তনে উন্নতিশীল ব্যক্তির কোন অনিষ্টই হয় না—উন্নতির মুখে কোন বাধাই কার্য্যকর হয় না। যেমন বিপদের সহকারী বিপদ, তেমনি উন্নতির সহকারী উন্নতিই হয়। উন্নতির মুখে ধূলা-মুটা ধরিতে সোণামুটা হইয়া পড়ে, অবনতির সময়ে সোণমুটা ধরি-লেও ধূলামুটা হইয়া যায়। যাহারা নিতান্ত অজ্ঞান, তাহারাই উন্নতি-শীল ব্যক্তির প্রতি অকারণ মাৎসর্য্য প্রকাশ করে। তাহাদের সেই মাৎসর্য্য প্রকাশে যদি প্রতিপক্ষের কোন অনিষ্ট হইত, তাহা হইলেও মাৎসর্য্যের একটি বিশেষ হেতু দেখা যাইত। তবে উন্নতিশীল ব্যক্তির নিন্দাবাদ করিয়া আপনার মূঢ়তা প্রকাশের প্রয়োজন কি ? যাঁহাদিগের মার্জ্জিত মন, তাঁহারা পরশ্রীতে কখ-নই কাতর হন না। তাঁহারা মনে মনে এই সার কথা ভাবিয়া দেখেন যে, আমার প্রতিবেশীর যে দিন দিন উন্নতি হইতেছে, ইহা অবশ্যই উহাঁর কোন বিশেষ গুণের পুরস্কার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই গুণ আমাতে নাই বলিয়াই আমি নিঃস্ব হইয়া রহি-য়াছি। আমার প্রতিবেশী বাল্যকালে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিদ্যার ফললাভ হইতেছে। আমিও বাল্যকালে বিদ্যার্থী হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া-ছিলাম ; কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বিশিষ্ট বিদ্যা অর্জ্জন ক-রিতে পারি নাই, সেই জন্যই অর্থের মুখ দেখিতে পাইলাম না। বিদ্যা ও ধনের পথ সকলের পক্ষেই অবারিত হইয়া রহিয়াছে। পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যা উপার্জ্জন কর, তাহার পুরস্কার স্বরূপ ধন-গ্রহণ কর, সংসারের এই সুলভ নিয়ম অবধারিত আছে। আমি
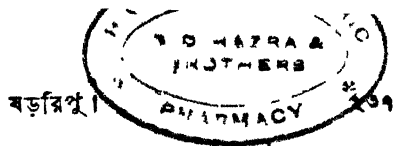
সে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলাম না, অথচ অপরকে কৃতকার্য্য দেখিয়া মাৎসর্য্য করিয়া বেড়াইব! তবে আমার প্রকৃত ইচ্ছা কি; জগৎ শুদ্ধ লোক নির্ধন হউক, জগৎ শুদ্ধ লোক মূর্খ হইয়া থাকুক, আমিও তাহাদিগের দলভুক্ত হইয়া কালযাপন করি? আমাদিগের আর্য্য শাস্ত্রের মতে চৌষট্টি প্রকার বিদ্যা আছে। এই চৌষট্টি প্রকার বিদ্যার এক বিদ্যাতেও যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পারদর্শিতা লাভ করে, তাহারও ধনের কষ্ট থাকে না। আমি এই চৌষট্টি প্রকার গুণের এক গুণেরও অর্চ্চনা করিলাম না, অথচ প্রতিবেশী-গণকে সেই সকল গুণে গুণবান্ দেখিয়া অকারণ ঈর্ষানলে দগ্ধ হইব কেন? ঈর্ষার আতিশয্য বশতঃ তাঁহাদিগের কলঙ্ক কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব কেন?

মাৎসর্য্য চিরকালই আত্মপীড়ক; কিন্তু কখন কখন পর-পীড়কও হয়। মাৎসর্য্যের দৃষ্টান্ত স্থলে একটি সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন নিঃস্বপল্লীতে একটি লোক বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ ব্যক্তির বাটীর দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি সুন্দর লণ্ঠনের মধ্যে আলোক জ্বলিত। ঐ পল্লীস্থ এক ব্যক্তি, অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া অধিক রজনীতে সেই দুইটি লণ্ঠন লোষ্ট্রা-ঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়া আসিয়াছিল। সম্পন্ন ব্যক্তি পর দিবস প্রাতঃকালে দেখিলেন যে, লণ্ঠন দুইটি কে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার বিশেষ কারণ অনুসন্ধান না করিয়া অন্য দুইটা নূতন লণ্ঠন সেই স্থানে ঝুলাইয়া দিলেন। পূর্ব্ব কথিত হিংসক ব্যক্তি দুই এক দিবস পরে সে দুইটি লণ্ঠনও ভাঙ্গিয়া দিল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হওয়ায় ঐ সম্পন্ন ব্যক্তি লণ্ঠন ভাঙ্গার কারণ অবগত হইবার জন্য নির্জ্জনে একজন

বলবান্ দ্বারবান্ রাখিয়া দিলেন। সেই রক্ষকের প্রতি এই রূপ আদেশ রহিল যে, যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার লণ্ঠন ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাকে ধরিতে পারিলে, প্রহারে অস্থি চূর্ণ করিয়া দিবে!

পূর্ব্ব কথিত হিংসক ব্যক্তি পুনর্ব্বার লণ্ঠন জ্বলিতেছে দেখিয়া এক খানি ইষ্টক মারিয়া একটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, অপরটি ভাঙ্গিবার জন্য আর এক খানি ইষ্টক যেমন তুলিতেছে, সেই সময় দ্বারবান্ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল ও মর্ম্মান্তিক ক্রোধে অধীর হইয়া করস্থিত যষ্টিদ্বারা বিলক্ষণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। উভয়ের চীৎকারে ঘটনাস্থলে দশজন লোক সমবেত হইয়া দেখিল যে, দলপতি বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারবানের যষ্টিপ্রহারে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছেন। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া পড়িয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধার সাধন করিল। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ! মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন বিজ্ঞ ও দলপতি হইয়া ঈর্ষা বশতঃ প্রত্যহ রজনীতে বাবুর লণ্ঠন ভাঙ্গিয়া যাইতেন, সেটি দোষের মধ্যেই হইল না; কিন্তু বাবুর দ্বারবান্ যে দলপতি মহাশয়কে মারিয়াছে, সেই জন্য চারিদিকে এই রূপ চীৎকার উঠিল, “ওর টাকা হয়েছে, বলে এতদূর স্পর্দ্ধা! ছোট লোকের ধন হলে গুরু লঘু জ্ঞান থাকে না। সে দিন ওর বাপ যজমান যজিয়ে খেয়েছে, আজ ও বৈঠকখানায় বসে আলবোলা টানে বলে এত অহঙ্কার! ব্রহ্মহত্যা কত্তে বসেছিল! হিন্দুমাত্রেই কেমন ওর বাড়ীতে জল খায় তা দেখা যাবে!” মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিংসা বশতঃ লণ্ঠন ভাঙ্গিয়াছিলেন; কিন্তু পল্লীর আর দশ জন, যাহাদিগের মনে মনে হিংসানল সর্ব্বদা জ্বলিত, কেবল

সুযোগ পাইত না বলিয়াই মাৎসর্য্য প্রকাশে বিরত ছিল। অদ্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপমানে সকলেই একেবারে মাতিয়া উঠিল।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপমান সম্বন্ধে বাবুর কোন অপরাধ নাই। তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষতি সহ্য করিয়া অবশেষে অত্যাচারীকে ধৃত করিবার জন্য নিভৃতে একজন লোক রাখিয়া দিয়াছিলেন। স্বপ্নেও জানিতেন না যে, সমাজের শিরোরত্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লণ্ঠন ভাঙ্গিয়া যান। নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন যে, এরূপ নিন্দিত কার্য্য মাতাল ব্যতীত আর কেহই করিবে না। এই জন্যই কিঙ্করকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, অত্যাচারীকে ধৃত করিতে পারিলে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া তাহার সমুচিত শাস্তি দিবে; কিন্তু এ কথা কেহই বিবেচনা করিল না ও মূলে কি হইয়াছিল তাহার কেহই অনুসন্ধান লইল না। কেবল দলপতিকে বাবুর লোকে মারিয়াছে, এই কথা লইয়াই তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেহ কেহ কহিল, 'উহার নামে পুলিসে মারপিটের নালিস উপস্থিত করা যাউক।' অন্য কতকগুলি বুদ্ধিমান্ পরামর্শ দিলেন, 'তাহাতে কিছু হইবে না, ও ব্যক্তি টাকাওলা লোক, টাকার জোরে সব মিটাইয়া ফেলিবে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই উহার পক্ষে উচিত দণ্ড। গ্রামের ছোট বড় কেহই আর উহার বাটীতে জল গ্রহণ করিবে না। ধোবা নাপিত, যদি উহার কার্য্য করে, তাহা হইলে, আমরা তাহাদিগকে কার্য্য দিব না। যে পুরোহিত ঐ ব্রহ্মহন্তার বাটীতে কার্য্য করিবেন, তিনি সমাজে আর নিমন্ত্রণ পাইবেন না।' এই পরামর্শই অবধারিত হইল।

দেখ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! মাৎসর্য্যের কতদূর দৌড়! বাবুর পর্য্যায়ক্রমে বিশ পঁচিশ টাকা ক্ষতি হওয়াতে, অনেক অনু-সন্ধানে অপরাধীকে ধৃত করিলেন বলিয়া গ্রামের মধ্যে তিনি একঘরে হইলেন। "দশচক্রে ভগবান্ ভূত" যে কথা শুনা গিয়াছিল, বাবুর পক্ষে তাহা যথার্থই হইল। সেই গ্রামে যদি আর দশঘর বড়মানুষ থাকিত, তাহা হইলে, সমাজের লোকেরা বাবুকে অতদূর কষ্ট দিতে পারিত না। সমূহ নিঃস্ব লোকের মধ্যে এক জন বড়মানুষ হইলে, সকলেই সেই ধনীর উপর ঈর্ষা করে এবং বিনা কারণে তাহার অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়।

একজন ধনী আপনার বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানে কতকগুলি নারিকেলের চারা রোপণ করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ হিংসক লোকেরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধকার রজনীতে সমস্ত চারা উপড়াইয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করিল, ইহা অপেক্ষা আত্ম ও পরপীড়ক মাৎসর্য্যের আর কি উত্তম উদা-হরণ আছে? কেবল প্রতিযোগীর উন্নতি দেখিয়া হিংসা বশতঃ দুই এক জন লোক সংসার ত্যাগ করিয়াছে। সতীনের বাটীতে বিষ্ঠা গুলিয়া পান করা, মাৎসর্য্যের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। তিনি বিষ্ঠা ভক্ষণ করিলেন, সে সামান্য কথা; কিন্তু সতী নের একটি বাটী নষ্ট হইল, এই আহ্লাদের বিষয়! হিংসার পরবশ হইয়া এ সংসারে লোক না করিয়াছে এমন কার্য্যই নাই। ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজ্ঞী এলিজাবেথ তাঁহার সহোদরা ভগ্নী রাজ্ঞী মেরীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া নানা কৌশলে তাঁহার শিরশ্ছেদন করান। রাজ্ঞী মেরী, এলিজাবেথ অপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন, এই তাঁহার অপরাধ। অন্য এক জন স্ত্রীলোক তাহার
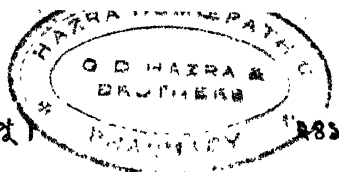
সহোদরা ভগ্নীর গাত্রে বসন্তের পুষ মাখাইয়া দিয়াছিল। যেহেতু, পূর্ব্ব বৎসরে বসন্ত রোগে তাহার মুখখানি ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায় কিন্তু; ভগ্নীর মুখখানি সুন্দর ছিল, এ সে সহ্য করিতে পারিল না। হিংসার কার্য্য সবিশেষ লিখিতে গেলে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাঁচখানি পুস্তক লিখিলেও শেষ হইবেক না।

মনুজকুল হিংসার পরতন্ত্র হইয়া প্রতিযোগীর অনিষ্ট চেষ্টায় রত হয় ও কি প্রকারে তাহার অনিষ্ট করিব, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নানা প্রকার দুর্ব্বুদ্ধির আবিষ্কার হয়। যদি সংসারের লোক পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষ না করিত, তাহা হইলে, অদ্ভুত দুর্ব্বুদ্ধির আবিষ্কার হইত না। বসন্ত রোগে এক জনের মুখ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার ভগ্নীর সুন্দর মুখখানি ক্ষত বিক্ষত করিবার মানসে বসন্তের পুয তাহার মুখে মাখাইয়া দিল, ইহা অপেক্ষা জঘন্য কার্য্য আর কি হইতে পারে! আমার সহোদরা ভগ্নীর সৌন্দর্য্য যখন আপন চক্ষে দেখিতে পারিলাম না, তখন প্রতিবেশীর উন্নতি দর্শনে অন্য প্রতিবেশীর কত দূর ঈর্ষা জন্মাইতে পারে, তাহা অনায়াসে ভাবিয়া লইতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেবল এক ঈর্ষার কারণে পৃথিবীর যত অনিষ্ট ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহার সারাংশ সঙ্কলন করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। ঈর্ষা প্রচ্ছন্ন ভাবে কাল ভুজঙ্গের ন্যায় মনুষ্যের পাপ হৃদয়ে অবস্থান করে, এই জন্যই মহাকবি কাউপর তাঁহার 'Task' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন, "Serpent error arround human heart." 'Error' শব্দের অর্থ ঈর্ষা বা মাৎসর্য্য নহে। 'Error' শব্দে ভ্রান্তি বুঝায়, তথাচ কবি

যে, 'Serpent error' এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহার ভাবার্থ এই যে, শয়তান এডাম ও ইভের স্বর্গ তুল্য ইডেন গার্ডেনে অবস্থান ও সুখ সম্ভোগ অসহ্য বোধ করিয়াছিল। সেই জন্য সর্পের রূপ ধারণ করিয়া আদি মাতা ইভকে কুপরামর্শ দিতে আরম্ভ করে। সেই শয়তানের কুহকে ভ্রমে পতিত হওন অপরাধে তাঁহারা (Paradise) স্বর্গ চ্যুত হন।

আদিকালে যাহা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে প্রত্যহ তাহা ঘটিতেছে, আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। যাহারা ঈর্ষা বশতঃ সকলকে কুপরামর্শ দিয়া বিপথগামী করে, তাহারাই মূর্ত্তিমান্ শয়তান। সেই শয়তানদিগের দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া অনেক সাধু ব্যক্তি তাহাদিগের মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হন ও পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের আদেশ মত কার্য্য করিতে যান। এইরূপে অসৎ কর্ত্তৃক বিপথগামী হইয়া তাঁহারা দুর্দ্দশা ভোগ করেন; কিন্তু শয়তান আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল ভাবিয়া মহা আনন্দ অনুভব করে। যাহারা এক জনের ভাল দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হয় ও কেবল তাহাকে নষ্ট করিবার জন্যই শঠতা জাল বিস্তার করে, আপনারা লাভের প্রত্যাশা রাখে না, তাহারাই শিক্ষিত শয়তান। আর যাহারা লাভের প্রত্যাশায় সজ্জনকে বিপথগামী করিয়া অর্থ শোষণ করে, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর শয়তান। আবার এই সংসারে কতকগুলি রাজনীতিজ্ঞ আছেন, তাঁহারা সম্মুখে প্রতিযোগী দেখিলেই, আপনার অসাধারণ বুদ্ধিবলে প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করিতে চাহেন; তাঁহারা কেবল যশ ও পৌরুষের প্রত্যাশী, ধনের প্রত্যাশী নহেন।

সমব্যবসায়ীরা পরস্পর পরস্পারের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ ভাব

প্রকাশ করিয়া থাকে। মাঞ্চেষ্টরের কাপড়ওলারা বোম্বাইয়ের কাপড়ওলাদিগের উন্নতি দেখিয়া তিন বৎসর কাল ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে ছিল। তাহাদিগের অনিষ্ট করিবার জন্য তিন বৎসর ধরিয়া কত প্রকার ষড়যন্ত্র ও কত অর্থ ব্যয় করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিন বৎসরের পর তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায়, বোম্বাইয়ের বস্ত্র ব্যবসায়ীরাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, আমরা অর্দ্ধমূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিব। বহুকালে ও বহুকষ্টে যে কিছু ধন সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা মাঞ্চেষ্টরের অনিষ্ট সাধনে যদি সমস্ত ব্যয় হইয়া যায়, তাহাও স্বীকার করিব। উভয় পক্ষের ঈর্ষার কিরূপ ফল ফলিতেছে, বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন, মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়দিগের ধনের অবধি নাই, আবার বোম্বাইয়ের পারসীরাও তাহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই উভয় দলের লোক যদি অর্জ্জনস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপন আপন ধনের উপস্বত্ব ভোগে রত হয়, তাহা হইলে, কোন পুরুষেও তাহাদিগের সে ধনের ক্ষয় হইবে না; কিন্তু এত ধন সত্ত্বেও উভয় দল ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া মরিতেছে! সুসভ্য ইংরাজ ও পারসী জাতির যখন এই দুর্দ্দশা, তখন অর্দ্ধশিক্ষিত অন্যান্য জাতির কথা আর কি বলিব।

হিংসা একেবারে পরিত্যাগ করা সামান্য ব্যাপার নহে। আমরা অনেক সময়ে মনে ভাবি, হিংসা করিব না, তথাচ হিংসা প্রচ্ছন্ন ভাবে আসিয়া আমাদিগের অন্তর কলুষিত করিতে থাকে। যদি বল গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিলেই ঈর্ষা দূর হইবে, তাহাই বা কিরূপে স্বীকার করি; কৌপীনধারী

যোগীরাও সময়ে সময়ে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের ধনে, মানে, বিষয় ও বৈভবে কিছুতেই প্রয়োজন নাই, এক ঈশ্বরারাধনাই যাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্য, তাঁহারাও সহযোগী সাধকগণের প্রতি সামান্য কারণে ঈর্ষা প্রকাশ করিয়া থাকেন! বশিষ্ঠের প্রতি বিশ্বামিত্রের পুনঃ পুনঃ অত্যাচারই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। তবেই কোন্ অধিকারের কোন্ ব্যক্তিকে ঈর্ষা ও মাৎসর্য্যহীন বলিব, তাহা স্থির করা কঠিন। যে, যে অবস্থাপন্ন লোক হউক না কেন, প্রতিযোগীর প্রতি সে ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করিবেই করিবে। তবে কি ঈর্ষাকে মন হইতে একেবারে দূর করিবার কোন উপায় নাই? সক্রেটিস বলিয়াছেন যে, "এ সংসারে উপায় বিহীন কার্য্য কিছুই দেখিতে পাই না। আন্তরিক চেষ্টা করিলে অসাধ্য সাধনও হইতে পারে। আত্মপরীক্ষা করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলেই ঈর্ষাকে মন হইতে দূর করিতে পারিবে। কেবল এক আত্মপরীক্ষায় হইবে না, কতক পরিমাণে আত্মশাসনেরও প্রয়োজন।"

কাহার প্রতি মনোমধ্যে ঈর্ষার আবির্ভাব হইলেই, সেই ঈর্ষা যাহাতে অধিক পরিমাণে স্পর্দ্ধা করিতে না পারে, সেই জন্য প্রথম উদ্রেকে আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন। অর্থাৎ মনে মনে এইরূপ ভাবা উচিত, আমি যাহার প্রতি ঈর্ষা করিতেছি, সে আমার কোন বিষয়ে কোন কালে কিছু অনিষ্ট করিয়াছে কি না, এবং ভবিষ্যতে তাহা দ্বারা আমার কোন অনিষ্ট সাধনের সম্ভাবনা আছে কি না। বিশিষ্ট বিধানে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে আমার কোন অনিষ্টকারী নহে। তবে কি জন্য

ঈর্ষার পরবশ হইয়া তাহার অমঙ্গল কামনা করিতেছি? সে আমা অপেক্ষা রূপবান্ ধনবান্ গুণবান্ ও ক্ষমতাবান্ হইয়াছে, এইমাত্র তাহার অপরাধ। পূর্ব্বে পল্লীস্থ লোক আমাকে যে রূপ ভয় ভক্তি করিত, এক্ষণে তাহাকেও সেইরূপ করিতেছে; কিন্তু সে আমার প্রতিযোগী হইয়াছে, এই তাহার অপরাধ।

হিংসাটা পদার্থ কি, অগ্রে তাহার সমালোচনা করিতে হইবে। হিংসা মনুষ্যের মনের একটা বেগ মাত্র। যেমন কিয়ৎকাল রৌদ্রে ভ্রমণ করিয়া আসিলে পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া উঠে; আমাকে কেহ কোন রূঢ় কথা বলিলে, যেমন ক্রোধের আবির্ভাবে শরীর কাঁপিতে থাকে; সেই রূপ হঠাৎ শুনিলাম, আমার এক জন সহাধ্যায়ী রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কথাটি কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই মনের শান্তি ও সন্তোষ একবারে অন্তর্হিত হইল, বিষাদে হৃদয় কলুষিত হইয়া উঠিল। তখনি মন কল্পনার সাগরে ঝাঁপ দিলেন, ভাবিলেন, রাজা হইয়াছে বটে; কিন্তু শীঘ্রই মরিয়া যাইবে। যখন আমরা এক শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন তাহার অপেক্ষা আমি সর্ব্ব বিষয়ে ভাল ছিলাম। সে একবারও পারিতোষিক পায় নাই, অথচ রাজা হইয়া গেল, আমি কিছুই করিতে পারিলাম না! এখন উহার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আমি এ হীন অবস্থায় কেমন করিয়া যাইব! সে যদি আমাকে দেখে, তা হইলে ত নিন্দার আর সীমা থাকিবে না। আবার ভাবিলাম, হয় ত, একটা মন্দ কার্য্য করিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে, উহার নাম কাটিয়া দিবে। এই রূপ চিন্তার পর, মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহা দ্বারা মনের স্বচ্ছন্দতা একেবারে দূর হইয়া গেল। শয়নে ভো-

জনে, ক্রীড়া-কৌতুকে কিছুতেই সুখবোধ হইল না; প্রতিক্ষণ সেই রাজোপাধিধারী সহযোগীকেই মনে পড়িতে লাগিল। এই-রূপ অবস্থায় অবস্থিত আছি, এমন সময় এক জন প্রতিবেশী আমাকে কহিল, “মহাশয়! শুনিয়াছেন, অমুক ব্যক্তি রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে? পূর্ব্বে সে আমাদিগের সহিত একত্রে পড়িত; দেখুন, এমন সে কতবড় বাহাদুর লোক!” এই কথা শুনিয়া বিষাদ হইতে ঈর্ষা ও ঈর্ষা হইতে মাৎসর্য্য উদয় হইল। বলিলাম, হাঁ, হাঁ, অমন ভূমি শূন্য রাজা অনেক দেখা আছে! গবর্ণমেন্ট আমাদের সঙ্গে এক কাব্বি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! তাতে আমাতে পূর্ব্বেও যা ছিলাম, এখনও তাই আছি। সে যদি একটা খুন করিয়া ফাঁসি না যাইত, তাহা হইলে, তাহাতে আমাতে প্রভেদ বুঝিতাম। হরে, নকা, রামকান্তেকে গবর্ণমেন্ট এমটি টাইটেল দিতে কিছুমাত্র কাতর নহেন। হয়ত আমিও এক দিন রাজা হইয়া যাইব! এইরূপে মাৎসর্য্য করিয়া প্রতিবেশীকে বিদায় করিলাম বটে; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা ঈর্ষানলে হৃদয় দ্বিগুণ জ্বলিতে লাগিল। কেন ঈর্ষা করিতেছি? কেন মনকে কষ্ট দিতেছি? তাহা একবারও ভাবিলাম না। মধ্যে মধ্যে যখন সেই রাজ-বেশধারী সহযোগীকে মনে পড়ে, তখনই মনে মনে তাহার অনিষ্ট কামনা করিতে ইচ্ছা হয়। কালে ঈর্ষা খর্ব্ব হইয়া আইসে। সহযোগীর উন্নতি হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে যত অন্তর্দাহ হইত, কিছু দিন গত হইয়া গেলে, মনে আর ততদূর কষ্ট থাকে না।

হিংসার কার্য্য এই, হিংসার ফল এই। এই আত্মপীড়ক হিংসাকে মন হইতে একেবারে দূর করাই সাধু ব্যক্তির নিতান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বভাব প্রসূত হিংসা মন হইতে একবারে দূর

করা সামান্য ব্যাপার নহে। আত্মশাসনই ইহার একমাত্র উপায়। আত্মশাসন কি? পুরাণে তাহার একটি মাত্র পরিষ্কার দৃষ্টান্ত আছে। শত অশ্বমেধের ফলে বজ্রধারী অর্থাৎ ইন্দ্র হয়। পৃথিবীর যে রাজরাজেশ্বর যতবার শত অশ্বমেধ সমাধার চেষ্টা করিয়াছেন, দেবরাজ ইন্দ্র ততবার তাঁহার প্রতি ঈর্যান্বিত হইয়া যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইয়াছিলেন। পাছে আমার ইন্দ্রত্ব লয়, এই ভয়ে বালক ধ্রুবের প্রতিও তিনি বজ্র ত্যাগ করিয়াছিলেন! কিন্তু যোগীবর মহাদেব ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া আপনার মহাযোগ সাধনেই সন্তুষ্ট হইয়া আছেন। পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমি কেন হিংসা করি। যাহার আজ ঐশ্বর্য্য দেখিতেছি, কাল তাহার কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, যখন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, তখন অজ্ঞ লোকেরাই লোকের ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের শরীর রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে পঞ্চভূত, অর্থাৎ ক্ষিতি অপ তেজ ইত্যাদিতে সকল ব্যক্তির সমান অধিকার। এই পঞ্চভূত যাঁহার যত ইচ্ছা তিনি তত গ্রহণ করুন, কেহই বারণ করিবে না; কিন্তু অকিঞ্চিৎকর ধনের প্রতি সকলের সমান অধিকার নাই বলিয়াই ঈর্ষা ও মাৎসর্য্যের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। যে রাজা উপাধি ধারণ করিল—তাহার আর মৃত্যু নাই, তাহার আর রোগ নাই, তাহার আর শোক দুঃখ কিছুই নাই; এরূপ হইলে, ঐ ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করিবার বিশেষ কারণ থাকিত। যখন লোক সংসার আবর্ত্তে পড়িয়া এক রজনীর মধ্যে ধনী হইতে পারে ও এক রজনীর মধ্যেই নিঃস্ব হইয়া যাইতে পারে, তখন কি জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই ক্ষণধ্বংসী ঐশ্বর্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করেন? এক-

জন নীতিজ্ঞ পণ্ডিত কহিয়াছিলেন, আমার সম্মুখে পাঁচটি লোক ঐশ্বর্য্যশালী হইল ও পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যে তাহারাই আবার দরিদ্র হইয়া গেল ; কিন্তু আমি সেই সমভাবেই আছি ; এখন তাহাদিগের অবস্থা অপেক্ষা আমার অবস্থা প্রার্থনীয় কি না? কোন দিবস রাজপথে গিয়া দেখিলাম, জনৈক উন্নত শ্রেণীর ধনবান্ পুত্রের সহিত বেগবান্ বাজী চতুষ্টয় যোজিত শকটে বসিয়া আছেন, একজন ইয়ুরোপীয় ঘোটক চালন করিতেছে। আমি সেই ধনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া আপনাকে অপদার্থ ভাবিলাম, মনে মনে কতই ঈর্ষাযুক্ত আক্ষেপ করিলাম, সর্ব্বশেষে তাহার ন্যায় হইবার অভিলাষ জন্মিল। কিছু দিন পরেই সেই ব্যক্তি উৎকট অপরাধের জন্য উচ্চ বিচারে দণ্ডিত হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হইল। তখন সেই ব্যক্তির দুর্দ্দশা দেখিয়া আপন অবস্থাকে উন্নত বলিয়া বোধ হইল। ধনীর পক্ষে সেই এক দিন, আর এই এক দিন ভাবিয়া মনোমধ্যে কত প্রকার নূতন-ভাবের আবির্ভাব হইল। অবশেষে ভাবিলাম, ইহার ন্যায় হতভাগা আর নাই। অদ্য আমার অবস্থা ঐ ধনীর প্রার্থনীয় তাহাতে আর সংশয় নাই। কখন নৌকার উপর গাড়ী উঠিতেছে ও গাড়ীর উপর নৌকা উঠিতেছে, সংসারের এই আশ্চর্য্য ভাব। ইহার গূঢ় অর্থ একাল পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিতে পারেন নাই, এই জন্য স্বাভাবিক কবি বেন্ জন্সন্ লিখিয়াছেন—

"You cannot discern another's mind,
Why it is thou envy ?—Envy is blind ;
Tell envy for which you annoy,
Thousands want what you enjoy."

G. D. HAZRA & BROTHERS
HAZRA ... HIC
PHARMACY
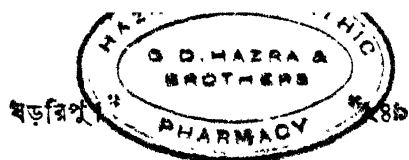
যখন তুমি মনুজকুলের মনের অভ্যন্তরে কি হইতেছে, তাহার কিছুই জান না, তখন অকারণ হিংসানলে দগ্ধ হও কেন? হিংসকেরা অন্ধ—হিংসককে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তাহারা যাহা ভোগ করিতেছে, লক্ষ লক্ষ লোকের সে সকল বিষয়ের অপ্রতুল আছে কি না? যদি হিংসাকে একেবারে মন হইতে দূরীভূত করিতে চাহ, তাহা হইলে, ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিও না; নিম্ন দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখ,—দেখিতে পাইবে, তোমার অবস্থা কোটি কোটি লোক অপেক্ষা কত উন্নত। নিম্ন দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর, আমি তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি—ঐ এক জন অন্ধ যষ্টির উপর ভর দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, সে তোমার দুইটি চক্ষু আছে বলিয়া কি ঈর্ষা করিবে? তুমি যতদূর ঈর্ষা কর, সে দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া তাহার মনে ততদূর ঈর্ষার আবির্ভাব হয় না। সে বিশিষ্ট বিধানে জানিয়াছে, আমি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী, এই জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি। আবার ঐ দেখ, এক ব্যক্তি কতকগুলা কাগজের তাড়া বগলে করিয়া এই প্রচণ্ড রৌদ্রে ছুটাছুটি করিতেছে, আর তুমি আপনার সুসজ্জিত শীতল গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া এক রাশি টাকা গণিতেছ—ঐ বিল্ সরকার কি তোমার অবস্থা দেখিয়া হিংসা করিতেছে? বলিতে পারি না। নিম্ন শ্রেণীর আর কত দৃষ্টান্ত দিব, আপনিই চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, কেবল এক মুষ্টি উদরান্নের জন্য কোটি কোটি লোক কি প্রকার কঠিন পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে তুমি ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতেছ।

নিম্ন শ্রেণীর লোক তোমার এই ঐশ্বর্য্যের প্রতি একবারও

দৃষ্টিপাত করে না। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার পর আপন আপন কুটীরে গিয়া উদর পূরিয়া অন্ন আহার করিয়াছে, তাহার পর কুটীরদ্বারে চেটাই পাতিয়া শয়ন করিয়া আনন্দ মনে সঙ্গীত করিতেছে। তোমা অপেক্ষা সংসারের অধিক লোকই অবনত, কেবল কয়েক ঘর উন্নত লোকের কিঞ্চিৎ আড়ম্বর দেখিয়া কি জন্য হিংসা দ্বেষ কর? আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হও, তবেই সংসারে সুখ অনুভব করিতে পারিবে যদি অদ্য হইতে কল্য, কল্য হইতে পরশ্ব কেবল উন্নতিরই চেষ্টা দেখিবে ও উন্নত ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া 'তাহার মত কবে হইব'—এই হিংসায় দগ্ধ হইতে থাকিবে, তাহা হইলে, কোন কালেই সুখী হইতে পারিবে না। হিংসককে জিজ্ঞাসা কর যে, সে লক্ষ মুদ্রার উপরে বসিয়াও বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আছে কেন? অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সে অপুত্রক; কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার একটি পুত্র হইয়াছে। রে অধম! তুমি কি জান না যে, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঐ পুত্রই হয়ত তাহার সমস্ত দুঃখের কারণ হইবে। তোমার পুত্র হইল না; কিন্তু তুমি যে অবস্থায় এক্ষণে আছ, এই অবস্থায় চিরকাল থাকিতে পারিবে। পূর্ব্বে কবি বেন্ জন্‌সনের যে বচন উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিও—হিংসার উপক্রমেই স্মরণ করিও; তাহা হইলে, অনেকাংশে সুস্থ থাকিতে পারিবে।

পরের উন্নতি দেখিয়া অকারণ জ্বলিয়া মরিও না। তুমি যাহার ভাল দেখিয়া জ্বলিয়া মরিতেছ, তাহার সেই ভালই হয় ত মন্দের কারণ হইতেছে। তুমি অবনত হইয়া পড়িতেছ বটে; ত সেই অবনতিই তোমার উন্নতির কারণ হইবে। সংসারের

বিচিত্র ভাব যখন কিছুই বুঝা যায় না, তখন আপন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাক, অনর্থক হিংসা করিও না। অনেকবার হিংসা করিয়া দেখিয়াছ ; কিন্তু যে জন্য হিংসা করিলে, তাহার কিছুই ত প্রতিকার করিতে পারিলে না। যদি হিংসার আধিক্য বশতঃ স্বয়ং বা অন্যের দ্বারা তাহার মন্দ করিতে যাও, তাহা হইলে, আপনিই মনঃকষ্ট পাইবে ও চিত্তের শান্তিভঙ্গ হইবে এবং জন সমাজে চিরকাল কলঙ্কী হইয়া থাকিবে।

মনের আরও বহু সংখ্যক বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে কার্য্য-গতিকে তৎসমুদয় বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হয়। যদি কেবল আমরা উৎকৃষ্ট বৃত্তির অনু-সরণ করি, নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলিকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যাই, তাহা হইলে, সংসারাশ্রমে থাকা কোন ক্রমেই চলে না। সংসারাশ্রমে থাকিয়া কার্য্যগতিকে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় বৃত্তিরই চালনা করিতে হইবেই হইবে। বোধ কর, উপচিকীর্ষা একটি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি; ইহা যে সর্ব্ববাদী সম্মত, তৎসম্বন্ধে কোন কালে কেহই তর্ক করেন নাই ও করিবেন না ; কিন্তু ইহার দানশীলতাও অনেক সময়ে অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। আত্মা ও আত্মজকে রাখিয়া ধর্ম্ম ; কিন্তু অনেকে সে কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়া মুক্তহস্তে দানযজ্ঞে' ব্রতী হইয়া-ছিলেন। তাহার পর, একেবারে নিঃস্ব হইয়া দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করেন।

আমাদিগের পৌরাণিক লোকেরা গল্পচ্ছলে বিষয়ী লোককে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ অনেকে বুঝিতে পারে না। কর্ণ যদিও দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস ছিলেন

ও তাঁহার প্রসাদেই অঙ্গ রাজ্যের অধিপতি হন; কিন্তু তিনি দানধর্ম্মে রাজাধিরাজ দুর্য্যোধন অপেক্ষা অধিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। কর্ণ একদা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র বৃষকেতুকে স্বহস্তে ছেদন করিয়া ব্রাহ্মণ সেবায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু এ দান কতদূর ন্যায় যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত তাহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারি না। পৌরাণিকেরা ক্ষত্রিয়ের এক প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মের উপরেই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া গিয়াছেন। পুত্র হত্যা করিয়া যাচককে সন্তুষ্ট করা কতদূর ন্যায় সঙ্গত হইয়াছিল, তাঁহারা স্বভাবানুযায়ী তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কর্ণের সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতী স্ত্রীলোক হইয়া কি প্রকারে পুত্রের মস্তকচ্ছেদনের জন্য করাত ধরিয়াছিলেন, এই অস্বভাবিক কার্য্য জননীর দ্বারা হইতে পারে কি না, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখেন নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, দাতাকর্ণের উপাখ্যানে আরও একটি আশ্চর্য্যের কথা লিখিত আছে,—'রাজা বলে একবার দেহ অনুমতি, 'দাতাকর্ণ' বলে নাম রাখ পদ্মাবতি।' তবেই বুঝা গেল, কর্ণ যদিও এই ভয়ানক দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাচ এ দান আমরা নিঃস্বার্থ দান বলিয়া ধরিতে পারিলাম না! কারণ উপরোক্ত দুই পংক্তি কবিতাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কর্ণ লোকানুরাগ-প্রিয়তাই দানের প্রধান উদ্দেশ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাছে দাতাকর্ণ নামে কলঙ্ক স্পর্শ হয়, এই জন্যই তিনি অস্বাভাবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা আমরা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া যাচকের যাচ্ঞা পূর্ণ করা অবশ্যই ধর্ম্ম

বিরুদ্ধ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অগ্রে আত্মা ও আত্মজকে রক্ষা করিয়া যাগ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবে। এস্থলে কর্ণ সে পথ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল লোকানুরাগ-প্রিয়তায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান-কল্প-লতিকা
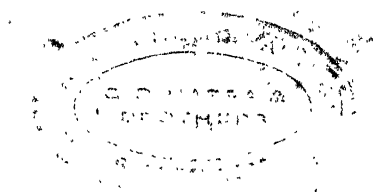
অর্থাৎ

ন্যায় ও যুক্তি সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয়

প্রস্তাব।

দ্বিতীয় ভাগ।
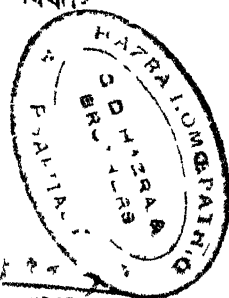
শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদ রায়
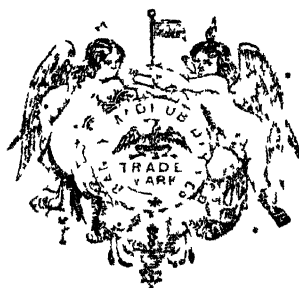
প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

রাজবাটী ২৫ নং দরমাহাট। ষ্ট্রীট।

শকাব্দাঃ ১৮০৪।

HAZRA HOMOEOPATHIC
O. D. HAZRA & BROTHERS
PHARMACY
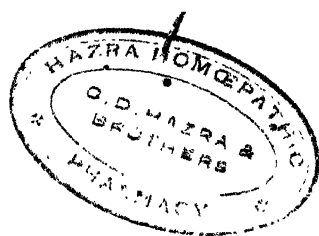
বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে, বিজ্ঞান-কল্প-লতিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আমি রীতিমত হোম অফিসে রেজেষ্টারি করিয়া লইলাম। ইহাতে আমার এবং আমার উত্তরাধিকারিগণের সম্পূর্ণ স্বত্ব রহিল। আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিগণের অনুমতি ব্যতিরেকে যদি কেহ এই পুস্তক মুদ্রিত কি প্রকাশিত কিম্বা ইহার কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া অন্য কোন পুস্তকে সংযোজিত করেন, তাহা হইলে, তিনি গ্রন্থস্বত্বের আইন অনুসারে দণ্ডার্হ এবং ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবেন। আমার নামাঙ্কিত মোহর ভিন্ন কেহই এই পুস্তক গ্রহণ করিবেন না।

রাজবাটী,
২৫নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়।
গ্রন্থকারস্য।

পূর্ব্বভাষ।

ঈশ্বরানুকম্পায় এবং আমার নিতান্ত শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে বিজ্ঞান-কল্প-লতিকার দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই ভাগেও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রস্তাব বিরচিত হইয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান সংসারে মনুষ্য প্রকৃতি সম্যক্ চিত্রিত করিবার জন্য সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। এক্ষণে বিজ্ঞান-কল্প-লতিকা বিদ্বজ্জন সমাজে আদরের সহিত পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৮০৪ শকঃ।

রাজবাটী,
২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়।
গ্রন্থকারস্য।

বিজ্ঞান-কল্প-লতিকা।

সাধারণ মনোবৃত্তি।

—oo—

মনের সমস্ত সাধারণ বৃত্তি ভন্ন ভন্ন করিয়া কেহই লিখিতে পারেন না। স্মরণ, ইচ্ছা, বিবেচনা ও চিন্তা এই চতুর্ব্বিধ শক্তিধর যে মন, তাঁহার ঐ চতুর্ব্বিধ শক্তির মধ্যে এক ইচ্ছাই অনেক মনোবৃত্তির উত্তর সাধক। ইচ্ছা হইতেই বহু সংখ্যক মনোবৃত্তির উৎপত্তি, তাহাতে আর সংশয় নাই। যেমন অর্জ্জন-স্পৃহা অর্থাৎ উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা, লোকানুরাগ-প্রিয়তা অর্থাৎ লোকের অনুরাগভাজন হইবার ইচ্ছা ইত্যাদি। তবে কতকগুলি মনোবৃত্তি স্বভাব-সম্ভূতও আছে। তৎ সমুদয়ের মনের চতুর্ব্বিধ শক্তির সহিত অধিক সংস্রব নাই, যেমন ভক্তি, শোক, হর্ষ, দয়া ইত্যাদি। অভিধানে বৃত্তি শব্দের নানা অর্থ। মনোবৃত্তি শব্দের অর্থ মনের এক একটি পৃথক্ কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হয় না; যেমন জিঘাংসা বৃত্তি। যে বৃত্তি দ্বারা মানবজাতি হিংসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করায়, তাহাকেই জিঘাংসা বৃত্তি কহে। সে বৃত্তির এক প্রাণিনাশ ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্যই নাই। তবেই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া আমরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকি, তাহার অধিকার ভেদ রাখিবার জন্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম রাখিয়াছেন; সেই নামের শেষে উপাধির ন্যায় বৃত্তি শব্দটি সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যদি বলি, অমুক ব্যক্তি ভিক্ষা বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে; তাহার এই অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে যে, সে ব্যক্তির ভিক্ষাই উপজীবিকা—এখানে বৃত্তি শব্দের উপজীবিকা অর্থ হইল। যদি একথা বলি, অমুক ব্যক্তির হিংসা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল; ইহার ভাবার্থ এই বুঝিয়া লইতে হয় যে, সে ব্যক্তি হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল কার্য্য করে, তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যদি কেহ নিয়মাতীত আহার করিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, আমরা হাস্য করিয়া এই কথা বলিয়া থাকি—'অতি লোভের কার্য্যই এই।' তবেই বৃত্তি শব্দে অর্থ কার্য্য ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। এক্ষণে সাধারণ মনোবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করা যাইতেছে, পাঠকগণ, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করিবেন। কেন না, আমাদিগের মনোবৃত্তির আভ্যন্তরিক লীলা কতদূর রহস্য-জনক তাহা তন্ন তন্ন করিয়া প্রকাশ করিতে সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র ভরসা আছে, সাধারণ মনোবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে মনে যেরূপ ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার স্বভাবানুযায়ী বর্ণন করিতে ত্রুটি করি নাই।

অর্জ্জনস্পৃহা।—মনের একটি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, ইহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। কারণ যাহারা উপার্জ্জন করিতে একেবারে মাতিয়া উঠে, তাহারা উপার্জ্জনের পথে হিতাহিত ন্যায় অন্যায় কিছুই লক্ষ্য করে না; উপার্জ্জনের জন্য তাহারা প্রবঞ্চনা চৌর্য্য প্রভৃতি জঘন্য কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়। যে ব্যক্তি অর্জ্জনস্পৃহার দাস হইয়া কেবল উপার্জ্জনের জন্যই সর্ব্বদা শশব্যস্ত

BROTHERS PHARMACY

থাকিয়া বিপুল ধন সংগ্রহ করিয়া যায়, অনুসন্ধান করিয়া দেখ, অর্জ্জন কালে এক দিনের জন্যও তাহার মনে শান্তি থাকে না। আকাশে মেঘ উঠিল, তদ্দৃষ্টে ব্যবসায়ী ধনী একেবারে ভাবনা সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনে মনে ভাবিল, 'আমার কয়েক খানি বোঝাই নৌকা জলপথে আসিতেছে, যদি হঠাৎ ঝটিকা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।' যদিও সে মেঘে ঝড় বৃষ্টি কিছুই হইল না, তথাচ ধনীর মনে শান্তি নাই। ভাবিল, 'এখানে হইল না বটে, কিন্তু লক্ষণে জানা যাইতেছে, অবশ্য অন্যত্র ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকিবে।' নৌকাগুলি কতদূরে আসিতেছে, তাহার সংবাদ আনাইবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র তরী পাঠাইয়া দিল। যতক্ষণ শুভসংবাদ কর্ম্মস্থানে উপস্থিত না হইল, ততক্ষণ ধনীর মনে সুখের লেশ মাত্র রহিল না; শয়নে স্বপনে সেই বোঝাই তরণী কয়েক খানিই দেখিতে লাগিল। কালে যখন সেই নৌকা কয়েক খানির শুভ সংবাদ আসিল, তখন ধনী কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইল ; কিন্তু পরক্ষণেই শুনিল যে, পূর্ব্বাপেক্ষা তণ্ডুলের মূল্য মণ করা দুই আনা কমিয়া গিয়াছে ও ভবিষ্যতে আরও কমিবার সম্ভাবনা আছে, এই অশুভ সম্বাদে ধনীকে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িতে হইল। যে দশহাজার মণ তণ্ডুল আসিতেছে, তাহাতে আমাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, এইরূপ চিন্তা ধনীর মনে সর্ব্বদাই বলবৎ রহিল।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, ঈশ্বর আমাদিগকে কি জন্য অর্জ্জন-স্পৃহা বৃত্তি দিয়াছেন—চির দিন এইরূপ অসুখে কালহরণ করিবার জন্য, না ইহার ভিতর অন্য কোন অভিপ্রায় আছে?

ঈশ্বর আমাদিগকে মঙ্গলের জন্যই এই বৃত্তি দিয়াছেন। মনুষ্য-সাধারণের মনে এই বৃত্তি না থাকিলে, সংসারের এই অসংখ্য মনুষ্য আহারাভাবে মরিয়া যাইত, কিম্বা লতা পাতা খাইয়া নিকৃষ্ট প্রাণীর ন্যায় কালহরণ করিয়া বেড়াইত। যাঁহারা কৃষি-কার্য্যের কষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, এতদ্দেশীয় মনুষ্যের প্রধান আহারোপযোগী তণ্ডুল কত কষ্টে প্রস্তুত হয়। গ্রীষ্মকালে যখন উন্নত শ্রেণীর লোকেরা গৃহের বাহির হইতে কষ্ট বোধ করেন, সেই দুই প্রহরের রৌদ্রে কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিতেছে, বীজবপন করিতেছে ও ক্ষেত্রে জলসেচন করিতেছে। এই সকল উৎকট পরিশ্রমে তাহারা কিছুমাত্র কাতর নহে, বরং হাস্যমুখে মনের আনন্দে ক্ষেত্রের কাজ কর্ম্ম করিয়া বেড়াইয়াছে। কি জন্য তাহারা এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতেছে? কেবল এক উপার্জ্জনের প্রত্যাশা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিলে, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারেরা এক বৎসরের জন্য পরম সুখে অন্নাহার করিতে পাইবে, ধান্যের কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া রাজার রাজস্ব দেওয়া ও মহাজনের ঋণ পরিশোধ করা হইবে। এই প্রত্যাশায় বর্ত্তমানের কষ্টকে তাহারা কষ্ট বলিয়াই ধরিতেছে না, দিন যামিনী কঠোর বৃত্তি দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। ঈশ্বর অর্জ্জনস্পৃহা মনুষ্যকে কি জন্য দিয়াছেন, তাহার প্রথম উদাহরণ এই।

দ্বিতীয়—কতকগুলি লোক কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বিদ্যা অর্থের আকর। আমরা অর্থের জন্যই প্রধানতঃ রাজভাষা ও

BROTHERS PHARMACY

মাতৃভাষা সমূহ পরিশ্রমের সহিত শিক্ষা করিতেছি। যদি অর্জ্জন-স্পৃহা না থাকিত, তাহা হইলে, কেবল এক জ্ঞানলাভের জন্য এত-দূর কষ্ট অনেকেই স্বীকার করিতেন না। এক একটি শিল্পশালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, কতশত লোক কেবল এক অর্জ্জনের জন্য কি প্রকার গুরুতর পরিশ্রম করিতেছে। শ্রমজীবী লোকেরা কেবল কিঞ্চিৎ অর্জ্জনের জন্যই পরিশ্রম করিয়া থাকে। সকলের পরিশ্রম সমষ্টি করিয়া দেখ, সেই শিল্পশালা হইতে সংসারের কত-দূর উপকার সাধিত হইতেছে। আবার বাণিজ্য সংসারে লক্ষ লক্ষ লোক জলে স্থলে কঠোরবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। যদি ব্যবসায়ী লোকদিগের অর্জ্জনস্পৃহা বলবতী না হইত, তাহা হইলে, সমুদ্র গর্ভ দিয়া পোতযোগে এক দেশের দ্রব্য অন্য দেশে কখ-নই চালিত হইত না; হিংস্রপশু পরিপূর্ণ দ্বীপ সকল কখনই মনুষ্যের আবাস ভূমি হইত না; এক দেশের তুলা, অন্য দেশের লৌহ ও অপর দেশের লোকের বুদ্ধি একত্র মিলিত হইয়া মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্র এত সুলভ মূল্যে কখ-নই বিক্রীত হইত না। অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, মনুষ্যের এক অর্জ্জনস্পৃহা থাকাতেই এক দেশের দ্রব্য অন্য দেশে গিয়া পড়িতেছে, এক দেশের মনুষ্য অন্য দেশে যাইতেছে ও এক দেশের বুদ্ধিমান্ লোকেরা অন্য দেশে গিয়া তদ্দেশীয় ব্যক্তি-বৃন্দকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আপনাদিগের সহকারী করিয়া লই-তেছে। অন্য কি কথা, কেবল এক উপার্জ্জনের জন্যই সর্ব্ব-বিধায় সংসারের উন্নতি হইতেছে। কি করিলে অধিক টাকা হইবে, বহুসংখ্যক চিন্তাশীল লোক এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় দিন দিন কত শত নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হইতেছে। কলি-

কাতার রাজপথে ট্রামওয়ের গাড়ী হইবে, ইহা পূর্ব্বে আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই; কেবল এক উপার্জ্জনের প্রত্যাশাতেই বহু সংখ্যক লোক এই নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, বাহ্যবস্তুর সহিত অর্জ্জনস্পৃহার কিছু সম্বন্ধ আছে কি না? কার্য্য গতিকে দেখা যাইতেছে, বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। আমি হল নির্ম্মাণ করিতেছি কেন? অর্জ্জনের জন্য। কেবল কর্ষণ করিলেই কি কার্য্য শেষ হইবে? না, কৃষিকার্য্যে জলেরও বিলক্ষণ প্রয়োজন। দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত কর্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিলাম, তাহার পর, মেঘ হইতে বারিবিন্দু বর্ষণ হইতেছে না দেখিয়া আবার জলসেচন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে একটি মাত্র জলাশয় ছিল, সেচনের দ্বারা তাহার সমস্ত জলশেষ করিয়া ফেলিলাম, উৎকট পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই অর্জ্জন স্পৃহা প্রবল থাকাতেই কৃষক দুইটি বিষয়ের সামঞ্জস্য রাখিতে পারিল না। উৎকট পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িল, পর দিন শয্যা হইতে উঠিয়া আর ক্ষেত্রের কার্য্য করিতে পারিল না। এক দিনের উৎকট পরিশ্রমে তিন দিনের কার্য্যের ক্ষতি হইল। বিশেষতঃ, বিস্তৃত ক্ষেত্র একেবারে জলশূন্য হওয়ায়, যে সকল বলদ হলে যোজিত হইত, তাহারা জল পান করিতে না পাইয়া কাতর হইয়া পড়িল। জলাভাবে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কেবল আমিই পরিশ্রম করিয়া জলসেচন দ্বারা শস্য উৎপাদন করিব, এই অনুমানে জলসেচনে প্রবৃত্ত হওয়ায় আরো দশজন তাহার অনুকরণ করিল। সুতরাং শস্যক্ষেত্রের মধ্যস্থিত জলাশয় একেবারে বারিশূন্য হইয়া যাওয়ায়, কৃষকেরা বুঝিতে না পারিয়া একটা ভয়ানক অনিষ্ট উৎপাদন

করিয়া রাখিল। গ্রাম হইতে জল আনিয়া হলচালক বলদগণকে পান করাইতে হইলে, আর তাহাদিগের দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয় না, কেবল কলস কলস জল বহিতেই তাহাদিগের সময় শেষ হইয়া যায়। আবার জল বহিয়া না আনিলেও বলদগুলি পিপাসায় মরিয়া যায়, এই উভয় সঙ্কট কৃষকেরা আপন বুদ্ধিতেই উপস্থিত করিল। সময়ে বীজবপন ও জলসেচন করিলে অধিক ধান্য হইবে, এই প্রত্যাশায় স্বভাবের প্রকৃত নিয়মগুলি একেবারে ভুলিয়া গেল, সুতরাং তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে বিষম ব্যাঘাত ঘটিল।

এস্থলে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্জ্জনস্পৃহার প্রাবল্য হেতু লোকে আপন মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারে না। প্রশস্ত ক্ষেত্র একেবারে বারিশূন্য হইয়া যাওয়ায় কৃষকেরা যার পর নাই ভীত হইল। কি প্রকারে দিবা দুই প্রহরের সময় বলদ গুলিকে জল পান করাইবে, এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিল। পর দিন তাহারা জলের কোন সদুপায় না করিয়াও দৈনিক কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু জলাভাবে দুই এক জন কৃষকের বলদ মরিয়া গেল। অর্জ্জনস্পৃহা প্রবল হওয়ায়, দুই এক দিবস কৃষি-কার্য্য বন্ধ করিয়া দৈব অনুকূল প্রতীক্ষা করিয়া কেহই থাকিতে পারিল না। কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিতে করিতে পিপাসায় কাতর হইলে, পূর্ব্ব কথিত জলাশয় হইতে জল পান করিয়া আসিত; কিন্তু এক্ষণে সে উপায় একেবারে গেল।

যাঁহারা পল্লীগ্রামস্থ কৃষীবল লোকের আচার ব্যবহার অবগত আছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, সামান্য অর্জ্জনের জন্য কৃষকগণ শারীরিক মানসিক ও কত প্রকার দৈব বিড়ম্বনা সহ্য

করে। পূর্ব্ব কথিত ক্ষেত্রে এক জন কৃষক হল চালনা করিতে করিতে পিপাসায় কাতর হইয়া উঠিল; কিন্তু ক্ষেত্রে জল-বিন্দু নাই—বার বার এই জন্য সতৃষ্ণনয়নে গ্রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেন না, দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কৃষক কন্যারা পানীয় জল ও জলপান লইয়া ক্ষেত্রে গিয়া থাকে। সে দিবস পিপাসায় কাতর হইয়া কৃষকের ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে—এমন সময়ে দেখিতে পাইল, অনেক দূরে তাহার কন্যা জল লইয়া আসিতেছে; কিন্তু সে কন্যার আগমন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ না করিয়া হল ছাড়িয়া দিয়া জলের জন্য তাহার দিকে দৌড়িতে লাগিল। ইহাতে কৃষক কন্যা ভাবিল, পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মারিতে আসিতেছে, এই ভয়ে সে গ্রামের দিকে ছুটিতে লাগিল। কৃষকও প্রাণপণে দৌড়াইয়া গিয়া যেমন সেই স্ত্রীলোক-টির হস্ত ধারণ করিল, অমনি সে ভয়প্রযুক্ত জলের কলসী মাটিতে ফেলিয়া দিল, তৃষিত কৃষকও সেই সিক্ত ভূমির উপর পড়িয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল! পদে পদে যে সকল স্থানে এইরূপ বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা, কৃষকেরা কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশায় সেই সকল মরুভূমে গিয়াও কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। যে সকল স্থান স্বভাব মনুষ্যগণের গমনাগমনের স্থল করেন নাই, যে সকল স্থানে ব্যাঘ্র ও সর্পের ভয় এবং জলের অভাব আছে, তথাচ কৃষকের অল্প রাজস্ব দিলেই চলিবে, এই জন্য সেই সকল ভয়া-নক স্থানের ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে তাহারা প্রাণ হাতে-করিয়া গিয়া থাকে। উপরোক্ত উদাহরণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল যে, কেবল এক অধিক অর্জ্জনের জন্য পূর্ব্ব কথিত কৃষক জল পিপা-সায় কয়েক ঘণ্টা যম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তাহার পর প্রাণ

পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল; কিন্তু মরিবার পূর্ব্ব রজনীতে সে আপন মৃত্যু একবারও ভাবে নাই। পাছে জলাভাবে গোরু দুইটি মারা যায়, তাহা হইলে, একেবারে চাসবাস বন্ধ হইয়া যাইবে, এই চিন্তায় তাহার একেবারে মনের শান্তি ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

উপার্জ্জন না করিলে সংসারের কোন সুখের সম্ভাবনা থাকে না। সকল কালে ও সকল দেশে গৃহীর পক্ষে ধনই সর্ব্ব সুখের আকর। যদি সুখের জন্যই ধন উপার্জ্জন করা প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। সেই অর্জ্জনস্পৃহা প্রবল হইয়া যখন আমাদিগকে নানা স্থানে ও নানা কারণে দূরপনেয় দুঃখ অনুভব করায়, তখন অর্জ্জন যে এক সুখের আকর, তাহা কি করিয়া বলিব। অর্জ্জনের যত দূর প্রয়োজন তাহা সঞ্চয় হইলেই যদি তাহার নিবৃত্তি পাইত, তাহা হইলে, অবশ্য বলিতাম যে, দুঃখ ও কষ্টে অমুক ব্যক্তি যে টাকা অর্জ্জন করিয়াছিল, এক্ষণে পরম সুখে তাহা ভোগ করিতেছে। যখন অর্জ্জন প্রবৃত্তির কোন কালেই নিবৃত্তি হয় না, তখন উপার্জ্জন করিয়া আমরা সুখানুভব কবে করিব? অর্জ্জন সম্বন্ধে আর এক আশ্চর্য্য মনুষ্য প্রকৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জনের নিশ্চিত উপায় উদ্ভাবন হইলে, আমরা পরম আহ্লাদের সহিত শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে পারি। অন্য কি কথা, অর্জ্জনের জন্য সময়ে সময়ে আমরা নীচজনের কটূক্তি পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া যাই। লাভের প্রত্যাশায় আমাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না; পথপর্য্যটন কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় না, কিন্তু যেখানে লাভের প্রত্যাশা নাই, তথাচ অনুরোধ বশতঃ একটা যদি শ্রমসাধ্য কার্য্যে অগ্রসর হইতে

হয়, তাহা হইলে, আমরা সামান্য পরিশ্রমে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়ি, আর উঠিবার শক্তি থাকে না। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে ও এক্ষণেও বলা যাইতেছে যে, অর্জ্জনস্পৃহা ঘোর প্রবল হইলে, কেবল এক অর্থের জন্য মরণ ভয় থাকে না, অসহ্য শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, সময়ে আহার নিদ্রা হইল না বলিয়াও মনের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। এইরূপ কিছুকাল করিতে করিতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে; সামান্য পীড়ায় প্রপীড়িত হইয়াও অনেকে অর্জ্জন করিতে সহজে ক্ষান্ত হয় না। তাহার পর, যখন একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়ে, তখন মনের ব্যগ্রতা সত্ত্বেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যে সামান্য কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন হয় না। তৎ সম্বন্ধে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শ্রমেরই প্রয়োজন। যখন শরীর শ্রমসহিষ্ণু ও সবল ছিল, তখন বর্ণনাতীত পরিশ্রম করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিলাম, কিঞ্চিৎ সঞ্চয় হইলেই, সঞ্চয়ের উপর সঞ্চয়ের অভিলাষ প্রবল হইয়া উঠিল। সেই অর্থের লালসায় বার্দ্ধক্যে যৌবন কালের মত পরিশ্রম করিতে গিয়া রুগ্ন হইয়া পড়িলাম। কিছু কাল কেবল ধনের চিন্তায় এক দিনের জন্যেও মনকে শান্তিরসে সিক্ত করিতে পারি নাই। তাহার পর, কেবল এক অর্জ্জনের জন্য কঠিন পরিশ্রম প্রযুক্ত রুগ্ন হইয়া দিন যামিনী রোগের যন্ত্রণায় জ্বালাতন হইতে লাগিলাম। কেবল পণ্ডিতেরাই সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপদেশ দেন নাই; এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরাও বলেন যে, যৌবন কালে মনুষ্যের সকল বৃত্তিই প্রবল থাকে এবং শরীরও

U. D. MADRA & BROTHERS PHARMACY

সুস্থ ও সবল থাকে; সেই সময়েই বিদ্যা অর্জ্জনের প্রকৃত সময়। মধ্য বয়সে অর্থাৎ ত্রিংশ বৎসরের পর, লোকের স্মরণ-শক্তির কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়; কিন্তু সেই পরিমাণে বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তি প্রবল হইয়া উঠে। এই জন্য ধনোপার্জ্জনের পক্ষে সেই সময়ই প্রশস্ত বলিয়া স্থির হইয়াছে; কারণ, উপার্জ্জনের পক্ষে স্মরণ অপেক্ষা বুদ্ধি ও বিবেচনারই অধিক প্রয়োজন। পঞ্চাশ ও পঞ্চান্ন বৎসর পর্য্যন্ত লোকে হাতে কলমে বিষয় কার্য্য করিতে পারে, তাহার পর, কেবল মুখে বলিবার ক্ষমতা থাকে, কাজে করিবার ক্ষমতা থাকে না। তাদৃশ লোককে কেবল এক মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত করাই যুক্তি। ঐ বয়সে মনুষ্য মাত্রেরই ক্রমে ক্রমে হিতাহিত জ্ঞান শক্তি কমিয়া আইসে, কিঞ্চিৎ অধিক পরিশ্রম করিলেই, ক্রোধরিপু প্রবল হয়। বিষয় কার্য্য অপেক্ষা অনর্থক গল্পে কাল হরণ করিতে ভাল বাসে। তৎকালে তাহারা কেবল এক উপদেশ দিবারই যোগ্য পাত্র, এতদ্ভিন্ন আর কোন কার্য্যেই হস্তার্পণ করা তাহাদিগের উচিত নহে। ষষ্টি বৎসরের পর, কেবল এক শান্তি ভোগ ও ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া কাল হরণ করিবে, সংসারের কোন বিষয়েই লিপ্ত থাকিবে না। এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই মনুজ-কুলকে সর্ব্ব বিধায় অসুখী হইতে হয়।

অর্জ্জন করিতে হইবে বলিয়া ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম বহির্ভূত অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলে, মনের শান্তি ভঙ্গ হইবেই হইবে। বোধ কর, এক জন বৃদ্ধ রাজকর্ম্মচারী বহুকালাবধি উচ্চ পদারূঢ় হইয়া উচ্চ বেতন ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কোন ব্যক্তি তাঁহা দ্বারা একটি গুরুতর কার্য্য করাইয়া লইবার জন্য দুই সহস্র মুদ্রা উৎ-

কোচ দিতে চাহিল, ইহাতে অধিক টাকার লোভে তিনি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইলেন। অনেক চিন্তার পর, তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সেই উৎকোচ গ্রহণ করিয়া উৎকোচদাতার দাস হইয়া ন্যায়-পরতা পরিত্যাগ করিলেন। টাকা লইবার সময় সকল দিক ভাবিয়া দেখেন নাই। তাহার পর, সেই উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধের গ্লানি তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইয়া মনকে কলুষিত করিতে লাগিল, আর মনের শান্তি রহিল না। একবার ভাবিতেছেন—'কি করিলাম, যদি এই গর্হিত কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, অপমানের শেষ হইতে হইবে।' পর-ক্ষণেই আবার সাহস আসিয়া অভয় দেওয়ায়, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমিত স্বহস্তে উৎকোচ গ্রহণ করি নাই, আমি ইহার কিছুই জানি না বলিলে, কে তাহার প্রমাণ করিয়া দিবে।' আবার ভাবিলেন, 'আইনেও যদি দোষী না হই, কিন্তু লোকের আমার উপর আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা থাকিবেক না।' এইরূপ ন্যায়পরতা বৃত্তির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নানা চিন্তায় যার পর নাই অসুখী হইলেন। অধিক ধন পাইলেন বলিয়া মুহূর্ত্ত কালের জন্যও সুখানুভব করিতে পারিলেন না।

একটা সামান্য কথায় বলিয়া থাকে, 'গো হত্যা করিয়া পাদুকা দানের প্রয়োজন নাই;' কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক উচ্চপদবীর লোকেরাও অধর্ম্মে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্ম করিতেছি, এই মাত্র ভাণে লোকানুরাগপ্রিয়তা প্রবৃত্তির দাস হইয়া অপব্যয় করিয়া থাকেন। এরূপ অর্জ্জন ও ব্যয় করিতে গেলে, কি প্রকারে সামঞ্জস্য থাকিতে পারে, কি প্রকারেই বা মনের শান্তি থাকিতে পারে।

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

অধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে গেলে, মনের শান্তি কখনই থাকে না। বোধ কর, দস্যুরা দস্যুবৃত্তি করিয়া বিপুল অর্থ অর্জ্জন ও সময়ে সময়ে বুদ্ধিবলে রাজদণ্ড হইতেও নিস্তার লাভ করে; কিন্তু তাহাদিগের মনে শান্তি কোথায়? দিবসে ধৃত হইবার ভয়ে নিবিড় অরণ্য মধ্যে বাস করে, দুই ঘণ্টা কাল এক স্থানে সাহস করিয়া থাকিতে পারে না। সঙ্গে অনেক অর্থ আছে বটে, কিন্তু সাহস করিয়া লোকালয়ে আসিয়া ইচ্ছামত সুখভোগ করিতে পারে না। এরূপ অর্থের প্রয়োজন কি? ইহা আমরা কিছুই অনুভব করিয়া উঠিতে পারি না। তবেই সার কথা হইতেছে, ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মানুযায়ী ব্যয়ের জন্য অর্জ্জনের প্রয়োজন। যদি কেবল উদরান্নের জন্য কেহ অধর্ম্মের দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্জ্জন করে, তাহাতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা মতে তাহা অন্যায় বলিয়া ধরিতে পারি না। কারণ, এক ব্যক্তি আহারাভাবে মরিয়া যায়, সেই জন্য কিঞ্চিৎ অন্ন চুরি করিয়াছে, এরূপ দোষীকে যুক্তি অনুসারে ক্ষমা করিতে পারা যায়। কিন্তু ইতি পূর্ব্বে দেখা গেল, কোন এক জন বিশিষ্ট সন্তান পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূকে হীরকাভরণে বিভূষিত করিবার জন্য এক জন রত্নবণিকের নিকট কতকগুলি আভরণ প্রতারণা দ্বারা লয়; সেই অপরাধে তাহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। এখানে সে ব্যক্তি নিতান্ত সামঞ্জস্য বিহীন হইয়া কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহার হীরকাভরণ দিবার ক্ষমতা নাই, তথাচ বৈবাহিকের নিকট আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিয়াছিল। অধর্ম্মে অর্জ্জন করিয়া সেই অভিলাষ সিদ্ধ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত

কার্য্যে সামঞ্জস্য ছিল না বলিয়া একেবারে ধন, মান ও প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে।

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম-বজায় রাখিয়া উপার্জ্জন কর। ভাবিও না যে, ধর্ম্মপথে অর্জ্জন করিতে গেলে, উপার্জ্জন কম হয়। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে যে, ধার্ম্মিকেরাই সর্ব্ব বিষয়ে জয়যুক্ত হন; কিন্তু অধার্ম্মিকেরা কোন না কোন বিষয়ে আজ না হয় কাল ক্ষয় প্রাপ্ত হইবেই হইবে। যেমন ন্যায়, যুক্তি ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া অর্জ্জন করিবে, তেমনই ব্যয় করিবার সময়েও ঐ তিনটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিও; তাহা হইলে, কোন কালেই অর্থের অনাটন ঘটিবে না, যদি ধর্ম্মপথে থাকিয়া বিংশতি মুদ্রা মাসিক অর্জ্জন কর, তাহা হইলেও সুখী হইতে পারিবে; কিন্তু দস্যুবৃত্তি দ্বারা বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিলেও সুখী হইতে পারিবে না।

লোকানুরাগপ্রিয়তা—সকলে আমাকে ভাল বলুক, আমার আশ্রিত হউক, আমাকে বড় বলিয়া সমাজ মধ্যে গণ্য করুক, ইহাকেই লোকানুরাগপ্রিয়তা কহে। লোকরঞ্জন ও লোকানু-রাগপ্রিয়তা এই দুইটি শব্দের কার্য্যগত প্রভেদ অতি সামান্য। কারণ, পুরাকালে কেবল এক প্রজারঞ্জনের জন্য লোকানুরাগ প্রিয় রামচন্দ্র শুদ্ধচারিণী ভার্য্যাকেও বনবাস দিয়াছিলেন। কেবল একমাত্র প্রজা রঞ্জনের জন্য লোকানুরাগপ্রিয় রাজা-ধিরাজগণকে অনেক সময়ে অনেক পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। বীর বিক্রমাদিত্য অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। রাজগণ অধীনস্থ লোককে সুখী করিবার জন্য আপন সমস্ত সুখ পরিত্যাগেও

প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহাদিগের মনে এই এক ধারণা ছিল, যদি ভূপতিকে প্রজারা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা না করে, তাহা হইলে, রাজার রাজ্যভার বহন করা বিড়ম্বনামাত্র। বিশেষতঃ, যাঁহার হস্তে অসংখ্য লোকের শুভাশুভের ভার অর্পিত রহিয়াছে, তিনি যদি অধীনস্থগণের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আত্মসুখে উন্মত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে নরাধম বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

যাঁহারা লোকরঞ্জনের জন্য ব্যগ্র, তাঁহাদিগকে স্বার্থপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সর্ব্বসাধারণকে সমভাবে তুষ্ট করিয়া রাখা সামান্য লোকের কার্য্য নহে; প্রজারঞ্জকে আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কিসে অধীনস্থগণ সুখী থাকিবে, এই চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। লোকানুরাগপ্রিয় ব্যক্তি সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনি সদ্‌গুণ না দেখাইয়া বলে ছলে ও কৌশলে লোকের প্রিয় হইবার চেষ্টা দেখেন। দশ জনের মধ্যে দুই জন যদি লোকানুরাগপ্রিয় ব্যক্তিকে সুখ্যাতি করে, তাহা হইলে, সেই সুখ্যাতি তিনি যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহারা স্বল্প মূল্যে সাধারণের নিকট সুখ্যাতি লাভের চেষ্টা দেখেন, কেন না, যশঃকুসুমের সৌরভ বহুদূর বিস্তার করিতে গেলে, হয় বহু অর্থ ব্যয়, না হয় সেই পরিমাণে আত্মত্যাগ স্বীকার না করিলে চলে না। আমরা রাণী ভবানীকে কখন চক্ষে দেখি নাই, তথাচ কেবল লোকের মুখে শুনিয়া চিরজীবন তাঁহার প্রসংশা করিয়া থাকি। হয়ত আমাদিগের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাণী ভবানীর গুণের পক্ষপাতী থাকিবে। আমরা কোন অংশে তাঁহার কোন সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই, তথাচ তাঁহার এত গৌরব করিয়া থাকি

কেন? ইহার কারণ, তিনি যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়া অসংখ্য লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ সাধারণের উপকার অতি অল্প লোকে করেন।

এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বিনা অর্থে বা সামান্য অর্থে, কেবল একাগ্রচিত্তে পরোপকারে ব্রতী হইয়া লোকের অনুরাগ ভাজন হইয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের চৈতন্য দেবকেই প্রথম দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করা যায়। তিনি বাল্যকালাবধি সুশীল ও শান্তস্বভাব ছিলেন, এই জন্য অতি অল্প বয়সেই কঠিন পরিশ্রম সহকারে বিশিষ্ট বিদ্যা লাভ করেন। তিনি যেরূপ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যদি অধ্যাপনেও প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলেও পণ্ডিত মণ্ডলীর অগ্রগণ্য হইয়া রাজ সমীপে প্রভূত সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে, কেবল পরোপকার করিয়া জন্ম সার্থক করিব, এই চিন্তা ব্যতিরেকে আর কোন চিন্তাই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কি প্রণালী অবলম্বন করিলে, সমভাবে সকল প্রাণীর উপকারে আসিব, কিছুকাল এই গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনিই দুর্ম্মতি ও দুরাচারগণের দুর্ব্বুদ্ধি দূরীকরণে এক মাত্র সহায় ছিলেন। যাহারা কেবল পরের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইত, মিষ্ট বাক্যে উপদেশ দিয়া তাহাদিগের কুবুদ্ধি শোধন করিয়াছিলেন, এবং আপনি অন্তরের সহিত সর্ব্বত্যাগী হইয়া অনেক বিষয়ী লোককেও লোকহিতব্রত-সাধনার্থ সর্ব্বত্যাগী করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই বিপুল বৈভবের দ্বারা দীনদরিদ্র লোকের বহুল পরিমাণে উপকার সাধিত হইয়াছিল।

BROTHERS PHARMACY

রামচন্দ্র, বিক্রমাদিত্য, রাণী ভবানী ও চৈতন্য দেব এই কয়েক জন নরনারী, কেহ বা অর্থদ্বারা, কেহবা আত্মত্যাগ স্বীকার দ্বারা, কেহবা শারীরিক কঠোরবৃত্তি দ্বারা অদ্যাপিও সর্ব্বসাধারণ লোকের অনুরাগভাজন হইয়া আছেন। ঈশ্বর লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি লোকের মনে মনুষ্য সাধারণের উপকারের জন্যই দিয়াছেন। উপরোক্ত নবনারীগণের দ্বারাই তাঁহার সে বৃত্তিদানের সার্থকতা হইয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা কাপট্য বিধানে লোকানুরাগপ্রিয় হইতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের ব্যবহার স্বতন্ত্র। তাঁহারা সামঞ্জস্যভাবে লোকানুরাগপ্রিয় হইতে চাহেন না। সংসারের উপকার সাধন করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে এবং স্বার্থ ত্যাগেও তাঁহারা কোন কালে স্বীকৃত নহেন। তথাচ, লোকে আমাকে ভাল বলিবে, এই অভিপ্রায়ে, যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে লোকের উপকার হইয়া থাকে। কোন কোন জমীদার অনিয়ম প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করেন, প্রজারা সেই পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার নাম করিতে চাহে না, মনের আক্ষেপে সর্ব্বদা তাঁহার অমঙ্গল চিন্তা করে। যদিও সেই জমীদার এক দিকে বিলক্ষণ অযশ সঞ্চয় করিতেছেন; কিন্তু সে দিক তিমিরময় ভাবিয়া, বড় ক্ষতি-বৃদ্ধি বিবেচনা করেন না, যে দিক সর্ব্বদা আলোকে উজ্জ্বল বিবেচনা করেন, সেই দিকে বিষয় বুঝিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রয়োগের দ্বারা লোকের অনুরাগ ভাজন হইবার চেষ্টা দেখেন। লোকের নিকট যশস্বী হওয়া যে সকলেরই প্রার্থনীয়, ইহা সেই নির্দ্দয় নিষ্ঠুর জমীদারেরাও অবগত আছেন; এই

জন্যই তাঁহারা গো বধ করিয়া মধ্যে মধ্যে পাদুকা দান করিয়া থাকেন।

আর কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা এক দল স্তাবক সংগ্রহ করিতে পারিলেই, মনে মনে ভাবেন যে, আমি সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছি। তাঁহাদের সম্মুখে বাহবা দিবার লোক থাকিলেই যথেষ্ট হইল; কিন্তু পশ্চাতে অসংখ্য লোক কলঙ্ক কীর্ত্তন করিতেছে, তদ্বিষয়ে ভ্রুক্ষেপও করেন না। স্তাবকেরা যখন তাঁহাকে 'গুণনিধি ও কৃপানিধি' বলিয়া স্তব করে, তখন তিনি তাহাদিগের সে স্তব সানন্দে গ্রাহ্য করিয়া লয়েন, বিদ্রূপ বলিয়া ধরেন না। তাঁহাদিগের মতে যাহারা তাঁহার স্তব করে, তাহারাই ভাল লোক এবং যাহারা তাঁহার নিন্দা করে, তাহারা মন্দ বলিয়া পরিগণিত হয়। এরূপ লোকের লোকানুরাগপ্রিয়তা অনিষ্টের মূল বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। কারণ তিনি ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম বহির্ভূত কার্য্য করিয়াও লোকের অনুরাগ লাভ করিতে চাহেন এবং শঠতা দ্বারা সুযোগ মত স্থানে সে অনুরাগ ক্রয় করিতে যান। ন্যায়ানুগত হইলে, তাঁহাদের কার্য্য স্বতন্ত্রভাব ধারণ করিত।

লোকে আমাকে ভাল বলুক, কি ধনী কি নির্ধন ইহা সকলেরই ইচ্ছা। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা অন্য এক পথে বিচরণ করিয়া লোকের নিকট ভাল হইতে চাহেন। লোকের নিকট সুখ্যাতি লাভ করা যে সকলের ইচ্ছা, ইহা ক্ষুদ্র ভদ্র সর্ব্বসাধারণেই জ্ঞাত আছেন; কিন্তু আপনার প্রচুর দোষের ভাগ গোপন করিয়া সামান্য গুণের ভাগ প্রকাশ করিব, ইহাই অনেকের ইচ্ছা। তাঁহারা লোকরঞ্জন করিবার জন্য আপনার অসৎ

চরিত্রকে সৎ করিতে চাহেন না ; কেবল অসৎ হইয়াও সৎ শব্দে বাচ্য হইতে চাহেন। দশ টাকা ব্যয় করিতে পারি, কিন্তু একটি অসৎবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারি না, তথাচ আমাকে তোমরা সজ্জন বল ও ভয় ভক্তি কর।

লোকানুরাগপ্রিয়তা মনুষ্যের একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। তাহা না হইলে, এক জন নিঃস্ব ব্যক্তি পাঁচশত মুদ্রা ঋণ করিয়া মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করে কেন, এরূপ কার্য্য কেবল লোকের অনুরাগভাজন হইবার জন্য ব্যতি-রেকে আর কিছুই নহে। যাহারা শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কিছু লাভ ক-রিয়া গেল, তাহারা দুই পাঁচ দিনের জন্য তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া বেড়াইল সত্য ; কিন্তু যাহারা ঐ শ্রাদ্ধে অর্থ দিয়াই হউক বা দ্রব্য সামগ্রী দিয়াই হউক, আনুকূল্য করিয়াছিল, তাহারা সময়ে এক কপর্দ্দকও না পাইয়া কেহ বা তিরস্কার, কেহ বা সাধারণের নি-কট কুযশ ঘোষণা ও কেহ কেহ বা বিচারালয়ে অভিযোগ উপ-স্থিত করিল। যিনি সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া সাধারণের অনুরাগভাজন হইতে গিয়াছিলেন, তিনিই আবার অর্থাভাবে শ-ঠতা ও প্রতারণা দ্বারা লোকের যথার্থ পাওনা উড়াইয়া দিয়া জুয়া-চোর ও বাটপাড় বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। এইরূপ লোকানু-রাগপ্রিয় লোক এক্ষণে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

আরও কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা যাচককে স্পষ্টবাক্যে বিদায় করেন না। নানা প্রকারের যাচক সর্ব্বদা তাঁহাদিগের নিকট গমনাগমন ও স্তুতিবাদ করিতেছে, কিঞ্চিৎ পাইবার আ-শায় বর্ণনাতীত তোষামোদ করিতেছে ; কালে তাহারা সে আশায় একেবারে নিরাশ হইয়া অভিশাপ পর্য্যন্ত দিয়া

গিয়া থাকে। আর কতকগুলি বাবু, লোকের অনুরাগভাজন হইবার জন্য আপনার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতেছেন। বাল্যকাল হইতেই পিতামাতা ও গুরুজনের অবাধ্য হইয়া পথে পথে ব্রহ্ম নাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, সমাজের নামগন্ধ পাইলেই তথায় গিয়া যোগ দিতেছেন ও মাতৃভূমির পঙ্ক উদ্ধার করিবার জন্য আর কিছু থাকুন বা না থাকুন একটি নীচবংশোদ্ভবা বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, কিম্বা ব্রাহ্মণ হইয়া যজ্ঞসূত্রটি পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। কালে সেই বিধবা নারীর গর্ভে দুই চারিটি কন্যাপুত্র জন্মিলে, তাহাদিগের লালনপালনের জন্য একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন, মনের কিছুমাত্র শান্তি থাকে না। পূর্ব্বে বহুকষ্টে যে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন, সময়ে তাহার প্রকৃত ব্যবহার না করায়, অসময়ে সে বিদ্যাতেও বিশেষ উপকার দর্শিল না। পূর্ব্বে লোকানুরাগপ্রিয়তার জন্য পিতামাতার দিকে দৃষ্টি করেন নাই, আপন অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তিকে চরিতার্থ করেন নাই; দশ জন লোকের সহিত মিত্রতা করেন নাই; কেবল এক লোকানুরাগপ্রিয়তাবশতঃ দোষাকর দেশাচারের মূলোৎপাটন করিতে গিয়া আপনি লাভেমূলে হারাইয়া বসিয়া আছেন। যৌবনতরঙ্গে গা ঢালিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, চির দিন এই প্রকারেই অতিবাহিত হইবে; কিন্তু তৎকালে বুঝিতে পারেন নাই যে, এ সংসারে সর্ব্ব বিষয়ে সামঞ্জস্য করিয়া না চলিলে, বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। অগ্রে আপনার দাঁড়াইবার স্থল ও অন্নজলের সংস্থান না করিয়া, যিনি নামপাগলা, অর্থাৎ লোকানুরাগভাজন হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহার উন্নতি কোন কালেই দেখা যায় না।

... BROTHERS PHARMACY

এই সংসারে সকলেরই লোকের অনুরাগভাজন হইবার ইচ্ছা; কিন্তু প্রকৃত পথ ধরিতে পারিলে, সে অনুরাগপ্রিয়তাই বিরাগভাজনের কারণ হইয়া উঠে। তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ, কোন কোন ধনিসন্তান বিশিষ্ট সমাজে বড় হইবার জন্য বিশিষ্ট বিদ্যা অর্জ্জনে পরাঙ্মুখ হইয়া সঙ্গীতবিদ্যা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অবশ্য প্রথমে তাঁহার লোকানুরাগপ্রিয়তাবৃত্তি প্রবল হইয়াছিল, অর্থাৎ গাহনা বাজনা দ্বারা লোকের চিত্ত রঞ্জন করিয়া যশস্বী হইব, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু সে বিদ্যা অর্জ্জনও অর্থ ও পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং উহা অধ্যবসায় ও পর্য্যবেক্ষণ সহকারে করিতে হয়। অনভিজ্ঞ যুবকের তাহা কিছুই ছিল না, কেবল এক দম্ভের উপর নির্ভর করিয়া গীতবাদ্যের আলোচনায় যতগুলি দোষ ঘটে, তাহাই অর্জ্জন করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট কুলাঙ্গার বলিয়া গণ্য হইলেন।

লোকানুরাগপ্রিয়তা ভাল মন্দ সকল কার্য্যেই আছে। কেবল যে সদনুরাগ লাভেই সকলে যত্নশীল, এমত নহে। যে স্বভাবতঃ যে বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াছে এবং যাহারা সেই বৃত্তির পোষকতা করিয়া থাকে, সেই সকল লোকের প্রিয়পাত্র হইতে পারিলেই সে যথেষ্ট বোধ করে। সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ীর নিকট আদর লাভ করা, সহস্র ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তিরও ঘটে না। এই জন্য এক এক জন এক এক সম্প্রদায়ীর অনুরাগের পাত্র হইবার চেষ্টা দেখে। অন্য কি কথা, যে সকল লোক সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইয়া একেবারে সাধুসমাজের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে, তাহারাও আপনাদিগের তুল্য কতকগুলি লোকের প্রশংসাপাত্র হইবার চেষ্টা

দেখে। এ সংসারে একেবারে কেহই সর্ব্ব সমাজ বর্জ্জিত হয় না; আপনাদের তুল্য কতকগুলি লোকের সঙ্গ লাভ করিতে পাইলে ঐ সকল লোকের মনে বড় একটা আক্ষেপ উপস্থিত হয় না। যদি অসৎসংসর্গে থাকিয়া অসৎ গুণের প্রাধান্য জন্মে, তাহা হইলে, সেই অসৎ লোকেরাই অসতের অনুরাগ করিতে আরম্ভ করে। সেই সমাজচ্যুত ব্যক্তি অসৎ সমাজের প্রাধান্য লাভ ও অনুরাগের ভাজন হইয়া আপনি যে সৎ সমাজচ্যুত হইয়াছে,তাহার কারণ আর অনুতাপ করে না। বোধ কর, এক জন গাঁজাখোর গাঁজার দলে প্রাধান্য লাভ করিল, সকলেই তাহাকে 'ওস্তাদজী' বলিয়া আদর করিতে লাগিল, এরূপ অবস্থায় সে কি আর ভাবিতে পারে যে, আমি গাঁজা খাইয়া একেবারে অধঃপাতে যাইতেছি? লোকানুরাগপ্রিয়তা একটি চমৎকার বৃত্তি। এ বৃত্তি ঈশ্বর ন্যূনাধিক সকলকেই দিয়াছেন। এই বৃত্তির সাফল্যলাভ ক্ষুদ্র ভদ্র সকল সমাজেই হইতেছে। কেহই নীচ, অধম, এবং নিষ্ঠুর বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে না। যে ব্যক্তি চির কাল চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা আপন অসৎ বৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতেছে, সেও স্থল বিশেষে দুই পয়সা ব্যয় করিয়া, এক জন নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তির সাহায্য করিতে যায়। কোন ব্যক্তির গাঁজা না খাইলে প্রাণ-বিয়োগ হয়, সে যদি এক জন সম্পন্ন গাঁজাখোরের সহায়তা চাহে, তাহা হইলে দুই এক দিনের জন্য তাহার গাঁজার অভাব মোচন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি দান করে, সে দশ জন গাঁজাখোরের মধ্যে সগর্ব্বে কহিতে আরম্ভ করে—এ কি কথা, এ ব্যক্তির একটা নেশা করা অভ্যাস হইয়াছে, এক্ষণে পয়সা নাই বলিয়া কি মারা পড়িবে। আমি লোকের কষ্ট দেখিতে পারি না। তাহার এই সকল কথা

শুনিয়া অনুগত দশ জন লোক অমনি বলিয়া উঠে—মহাশয়! আপনার মত উদারপ্রকৃতির লোক কি আর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কি উন্নত কি অবনত এক এক সমাজের অনুরাগ ভাজন হইতে গেলে, এক এক বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কাল যাপন করিতে হয়। যদি সর্ব্বপ্রিয় হইতে চাহ, তাহা হইলে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হও, সকলকে সমান চক্ষে দেখ। ক্ষুদ্র লোককে হেয় জ্ঞান ও বড় লোকের পূজা করিয়া ক্ষান্ত থাকিও না। কাহার নিকট দম্ভ করিও না। যত দূর সাধ্য মিষ্ট কথা কহিও। অবস্থামত পরের সাহায্য করিও। সাহায্যসম্বন্ধে উন্নত লোক অপেক্ষা নিঃসহায় লোকের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিও। নিষ্ফল নামের জন্য সঞ্চিত বিষয় নষ্ট করিও না; তাহা হইলে লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তির ইষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবে। নতুবা ঈশ্বরদত্ত এই বৃত্তি তোমার বিপত্তির কারণ হইবে। যদি একেবারে নামপাগলা হইয়া উঠ, তাহা হইলে কেবল এক নাম বাহির করিতে গিয়া আপনার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে, তথাচ প্রকৃত ফল লাভ হইবে না।

আত্মাদর—আত্মশাসন ও আত্মাদর এবং আপনার প্রতি যার পর নাই তাচ্ছীল্য প্রকাশ, এই তিনটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিলে, আত্মাদরবৃত্তির প্রকৃত পরিচয় দিতে পারা যায়। কতকগুলি লোক আছে, তাহারা আপনার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখে না, আপনাকে শাসনে রাখিতে চাহে না ও আপনাকে আদর করা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না, অবস্থাভেদে যখন যাহা ঘটে সেই ভাবেই কাল যাপন করে। আপনার শরীরের প্রতি তাচ্ছীল্য, বিষয়বৈভবের প্রতি তাচ্ছীল্য, ও মানসম্ভ্রমের প্রতি তা-

চছীল্য প্রকাশ করে। অনেকেরই অভাব আছে। এরূপ লোককে, অনভিজ্ঞ বলিয়া নামকরণ করা যায়। এই সংসারে সকল বিষয়েরই কতকগুলি নিয়ম আছে, কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকেরা স্বভাবদোষে ধন প্রাণ ও মানের উপর লক্ষ্য রাখে না, সেই জন্য তাহারা উদারপ্রকৃতির লোক বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে না। তাহাদিগের কোন কার্য্যেরই শৃঙ্খলা নাই। অকারণ বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে, যদি কেহ নিবারণ করিতে যায়, তাহা হইলে উপহাসের সহিত কহিয়া থাকে, 'কি হইবে? তোমাদের মত চিনির শরীর নহে।' যদি অকারণ বিষয় নষ্ট হইতেছে, এই কথা কেহ তাঁহাদিগকে বিশিষ্ট বিধানে বুঝাইয়া দেয়, তদুত্তরে কহিয়া থাকে "যত দিন আমার বরাত ভাল থাকিবে, তত দিন কেহই কিছু করিতে পারিবে না।" যদি নীচ সংসর্গ জন্য কেহ সদুপদেশ দেয়, তদুত্তরে কহিয়া থাকে, ঈশ্বরের কাছে সকলেই সমান, আমার দশ টাকা আছে বলিয়া আমি বড় হইয়াছি, এ কথা মনে করা অত্যন্ত অন্যায়। ভগবান রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিত্রতা করিয়াছিলেন। লোকে কথায় বলে জান না, "যদি বড় হতে চাও ত ছোট হও।" এরূপ প্রকৃতির লোক, ধন, মান এবং বলিষ্ঠ সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হইয়াও, নিজ বুদ্ধিতে সমস্ত নষ্ট করিয়া থাকে। বহু কষ্টে লোক ধর্ম্ম সঞ্চয় করে, অনেক যত্নে সম্মানিত হইয়া উঠে এবং অনেক সৌভাগ্যে বলিষ্ঠ সুন্দর শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কত শত লোক কেবল যত্ন দ্বারা ধন ও মান সঞ্চয় করে। অপটু শরীরকেও বলিষ্ঠ করিয়া তুলে। আবার দুর্ভাগ্য বশতঃ এমন লোকও আছে, যে উপরি উক্ত সমুদয় বিষয়

G. D. HAZRA & BROTHERS

অনায়াসে লাভ করিয়াও তাহা রক্ষা করিতে পারে না। আত্ম-শাসন সমস্ত মঙ্গলের আকর। যেমন অশাসিত রাজ্য অতি অল্প কালে ধ্বংস হইয়া যায়, তেমনি জীবাত্মা আত্মশাসন বর্জ্জিত দেহকে অতি সত্বর পরিত্যাগ করিয়া যান। যেমন ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন, তেমনি আত্মশাসনেরও ক্ষমতা দিয়াছেন। এই দুইটি বিষয়ের সামঞ্জস্য রাখিতে পারিলে আমরা পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রার বেগ ধারণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমরা কার্য্য গতিকে ক্ষুধাকেও ক্ষুধা জ্ঞান করি না, তৃষ্ণাকেও তৃষ্ণা জ্ঞান করি না ও নিদ্রাকেও বলপূর্ব্বক দূর করিয়া দিয়া থাকি। এ সকল বিষয়ে সক্ষম হইয়া কতকগুলি নীচ প্রবৃত্তির নিকট পরাস্ত হই; কিন্তু আত্মশাসনে অক্ষম হই না, এই আশ্চর্য্যের বিষয়।

আত্মাদর বিহীন লোকেরা আত্মশাসনে অক্ষম। তাহারা আত্মশাসন না করিতে পারিয়া অনায়াসে ধন, প্রাণ ও মান নষ্ট করিয়া থাকে, তথাচ মনের সামান্য বেগ সম্বরণ করিয়া সামান্য কষ্ট অনুভব করিতে চাহে না। পণ্ডিতেরা আপন মঙ্গল ইচ্ছাকে আত্মাদর কহেন। আত্মাদর থাকাতেই আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারি। আত্মাদর হইতেই যত্ন, শ্রম, জ্ঞানলিপ্সা, লোকা-নুরাগপ্রিয়তা প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তির চালনা হয়; কিন্তু আত্মাদর দূষিত হইলে, উহা হইতে অভিমান, দ্বেষ, হিংসা, দম্ভ প্রভৃতি অসৎ বৃত্তি সকল উৎপন্ন হয়। আদর দুই প্রকার— আমি যদি আমার পুত্রকে যথার্থ আদর করি, তাহা হইলে, তাহার ভাবী মঙ্গলের চেষ্টা অবশ্যই দেখিব। সেইরূপ আমি যদি আপ-

নাকে আদর করি, তাহা হইলে, যাহাতে আমি জগতের আদরের পাত্র হইতে পারি অবশ্য তাহার চেষ্টা করিব। যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা আপনাকে শাসনে রাখিতেন। দুর্য্যোধন আত্মাভিমানী ছিলেন, বলিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াও তাহার তৃপ্তি লাভ হয় নাই। যুধিষ্ঠির আত্মশাসনে সক্ষম ছিলেন বলিয়া অরণ্যবাসেও তাঁহার তৃপ্তি লাভ হইয়াছিল। আত্মাদরের লোকেরা স্বভাবতঃ অ-ত্যন্ত হিংসক হয়। তাহারা সমকক্ষ লোককে দেখিতে পারে না। সকলকেই আপনার পদানত করিতে ইচ্ছা করে। যাহারা আত্মা-দরের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়াছে, তাহারা সর্ব্বাগ্রে উপযুক্ত সম্মান লাভের যোগ্য পাত্র হইবার চেষ্টা করে; কিন্তু যাহারা আত্মা-দরের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ নহে, তাহারা পণ্ডিত না হইয়াও পণ্ডিত শব্দে বাচ্য হইতে চাহে। মর্য্যাদার যোগ্য পাত্র না হইয়াও সকলের নিকট পূজ্য হইতে চাহে। আপনি হীনবল হইয়াও সকলের প্রতি দম্ভ প্রকাশ করে। এই প্রকার আত্মাদরী লোক এক্ষণে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আমি ভাল কর্ম্ম করিলে, লোকে আমাকে ভাল বলিবে; আমি কঠিন পরিশ্রমের সহিত বিদ্যার্জ্জন করিলে, লোকে আমাকে পণ্ডিত বলিবে; আমি দীন-জনকে দয়া করিলে, লোকে আমাকে অনুরাগ করিবে; আমি মর্য্যাদার সহিত অর্থ উপার্জ্জন করিলে, সম্মান রক্ষা হইবে; যথার্থ আত্মাদরী লোকের এই সকল লক্ষণ। যেমন কালপ্রভাবে সমস্ত বিষয় দূষিত হইয়া পড়িতেছে, তেমনি যথার্থ আত্মাদরী লোক এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি মহৎকুলসম্ভূত হইয়া কি প্রকারে নীচ সংসর্গ করিব; আমি পিতৃপিতাম-হের চিরকীর্ত্তি সকল কি প্রকারে লোপ করিব; আমার পূর্ব্ব-

পুরুষেরা বহুকষ্টে অর্জ্জন করিয়া সেই অর্থে অনেক কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন ; আমিও যদি অর্জ্জনের দ্বারা তাঁহাদিগের সেই সকল কীর্ত্তি রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে, লোকে আমাকে কেবল মাত্র পিতৃ নামে পরিচিত বলিয়া মধ্যশ্রেণী মধ্যে গণ্য করিবে। আমি যাহাতে "স্বনাম ধন্য" পুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারি, অবশ্য তাহার চেষ্টা দেখিব। যাঁহার মনে এইরূপ সঙ্কল্প হয়, তিনিই যথার্থ আত্মাদরী ; সুতরাং পূর্ব্ব কথিত আত্মাদরের প্রথম লক্ষণগুলি তাঁহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

আত্মাদর ঈশ্বর মনুষ্যকে মঙ্গলের জন্য দিয়াছেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মাদরী হইতে চাহ, তাহা হইলে, আপন মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখ ; কদাচ নীচ সংসর্গ করিও না। আপনা আপনিই কতকগুলি নিয়ম করিয়া তাহা প্রতিপালন কর। যদি সংসার আবর্ত্তনে পড়িয়া আত্মরক্ষা ও আপন গৌরব বৃদ্ধি করিতে পার, তবেই তুমি যথার্থ আত্মাদরী। উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য, যদি আপনি আপনার ভাল করিতে চাহ, তাহা হইলে, আত্মশাসন শিক্ষা কর। যদি আত্মাদর শব্দের অর্থ আপন মঙ্গল চেষ্টাই হয়, তাহা হইলে, মঙ্গলজনক পথেই পরিভ্রমণ কর। অপকর্ম্মের জন্য মনের মত্তভা জন্মিলে, আপনা আপনি চেষ্টা করিয়া মনকে নিয়মিত কর। যদি আপনি আপনার মঙ্গল চেষ্টা কর, তাহা হইলে, স্বয়ং ঈশ্বর তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। ঈশ্বর কৃপা করিয়া এক ব্যক্তিকে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করাইয়াছেন, রূপ দিয়াছেন, ধন দিয়াছেন ও সুস্থ শরীর দিয়াছেন ; কিন্তু সে নিজ বুদ্ধির দোষে তৎ-

সমুদয় বিনষ্ট করিয়া যার পর নাই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। তবেই আত্ম বিষয়ে যে আপনি যত্ন না করে, সে আবার কি প্রকারে আত্মাদরী হইবে? যে মনুজকুলের আশার উপযুক্ত সমস্ত পাইয়াও ভোগ করিবার ক্ষমতা ধারণ না করে, সে আবার আত্মাদরের কথা উত্থাপন করিবে কেন? আপনার মঙ্গল আপনার হস্তে।

আসঙ্গলিপ্সা—একত্রে থাকিবার ইচ্ছাকে আসঙ্গলিপ্সা কহে। এই বৃত্তি হইতেই জগতের প্রাণিমাত্রেই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিয়াছে। মহাত্মা ডার্বিন্ লিখিয়াছেন যে, এই বৃত্তি থাকাতেই আমরা স্ত্রী পুত্রগণকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতে ভালবাসি। তাহারা চক্ষের অন্তরালে গমন করিলেই আমাদিগের কষ্ট উপস্থিত হয়। আবার তাহারা সম্মুখে আসিলে, মনোমধ্যে মহা আনন্দ অনুভূত হয়; নয়ন পথের পথিক্ হইলেও কখন কখন মনের তৃপ্তি লাভ হয় না, হৃদয়ে ধারণ করি; তাহাতেও তৃপ্তি বোধ না হইলে, দুই হস্তে হৃদয়ে চাপিয়া ধরি। যখন সুন্দর এবং নিতান্ত শিশু সন্তান গুলিকে আমরা বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরি, তখন মনোমধ্যে যে চমৎকার তৃপ্তিলাভ হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কেহই বর্ণন করিতে পারেন না। ভীষণ মূর্ত্তি কাফ্রিগণ যাহারা আফ্রিকার মরুভূমিতে বাস করে, তাহারাও অসভ্য স্বজাতি ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া সুসভ্য বৃটস রাজ্যেও বাস করিতে চাহে না। স্বজাতির সহিত একত্র, তাহার পর স্বদেশের লোকের সহিত, তৎপরে জ্ঞাতিগণের সহিত, অবশেষে স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত বাস করিতে লোকে যে এত

অনুরাগী, ইহা কেবল ঈশ্বরদত্ত আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তির ফল ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তি হইতেই স্ত্রী পুত্র পরিবারের ও বন্ধুগণের প্রয়োজন হইয়াছে; এতদূর প্রয়োজন হইয়াছে যে, তাঁহাদিগের সঙ্গ বিনা আমাদিগের এই সংসার অরণ্য বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীপুত্রের সহিত একত্র বাসের অভিলাষ হয়। তাহাদিগের প্রতিপালনে সক্ষম হইলে, অমনি দশ জন বন্ধু বান্ধবকে নিকটে রাখিবার অভিলাষ প্রবল হইয়া উঠে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে স্ত্রী পুত্র পরিবার, আত্মীয় বন্ধু, অবশেষে প্রতিবেশিগণের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিবার অভিলাষ জন্মে। যদি আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তি মনুষ্যের না থাকিত, তাহা হইলে, পরের জন্য কেহ ভাবিত না, আপনার হইলেই যথেষ্ট বিবেচনা করিত। আমি কোন কার্য্যানুরোধে দূর দেশে গমন করিতেছি, তথায় একাকী যাইবারই প্রয়োজন, তথাচ আমি দুই জন আত্মীয়কে সমভিব্যাহারে লইলাম; তাঁহাদিগের দূরদেশ গমনের সমস্ত ব্যয় দিতে স্বীকৃত হইলাম। অকারণ, বহুব্যয়ে স্বীকৃত হইলাম কেন? এক আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য। ঐ দুই জন আত্মীয় আমার সমভিব্যাহারে থাকিলে, বিদেশ ভ্রমণে অধিক কষ্ট হইবে না, তাঁহাদিগের সহিত কথা বার্ত্তায় আনন্দে কাল কাটাইতে পারিব, এই অভিপ্রায়েই দুই জন আত্মীয়কে আহ্লাদ পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে লইলাম। যে সকল ব্যক্তির আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তির প্রাবল্য নাই, তাহারা সেই বিদেশ ভ্রমণে একাকীই গমন করিয়া থাকে, অন্য কাহাকে সমভিব্যাহারে লয় না। ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মনে আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তির তারতম্য আছে, ইহা কার্য্য-

গতিকে বিলক্ষণ জানিতে পারা যায়। এক ব্যক্তির বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বহু লোকের সমাগম হয়, তিনি দশ জনের সঙ্গ ভাল বাসেন বলিয়াই দশ জন লোককে যত্ন করিয়া থাকেন; সেই যত্নে বাধ্য হইয়া অনেকে প্রত্যহ তাঁহার বাটীতে গিয়া আমোদ আহ্লাদ করে। অন্য এক ব্যক্তির আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তি অতি যৎসামান্য, সে সন্ধ্যার পর আপনার নির্জ্জন গৃহে বসিয়া অলীক চিন্তায় অনায়াসে কালহরণ করে, তথাচ দশ জন লোকের সহবাস সুখের ইচ্ছা রাখে না।

আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তি ঈশ্বর যাঁহাকে অধিক পরিমাণে দিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা কোন না কোন প্রকারে দশ জনের উপকার হইবেই হইবে। কেবল আসঙ্গলিপ্সার জন্যই আমরা দূর দেশে গিয়া স্বদেশীয় লোকের আশ্রয় প্রাপ্ত [হইয়া থাকি]। তাঁহারা বহু দিনের পর, দেশীয় লোকের মুখ দেখিয়া পরম আনন্দ অনুভব করেন, এই জন্যই তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া সমূহ যত্ন করিতে বাধ্য হন। যাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের রীতি নীতি ব্যবহার ও মনের ঐক্য হয়, আমরা তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবারই অধিক অভিলাষ করি। বোধ কর, দিবা দশ ঘটিকার সময় আহারাদি করিয়া অনেকেই কর্ম্ম স্থানে গমন করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের অনেক গুলি করিয়া সহযোগী মিলিয়াছে, তথাচ তাহাদিগের সহবাসে অধিক তৃপ্তি না জন্মিবায় বৈকালে আপিস বন্ধ হইলে, সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ভবনাভিমুখে ছুটিতেছেন, কেননা বাটী আসিয়া যিনি যে প্রকার লোক ভাল বাসেন, যাঁহার সহিত যাঁহার

মনের ঐক্য হয়, সেই প্রকার লোকের সহিত মিলিত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিবেন।

আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তির সহিত অন্যান্য বৃত্তির সামঞ্জস্য আছে বলিয়া যাহার যে বৃত্তি প্রবল সে সেই প্রকার লোকের সহিত মিলিত হইতে চাহে। যে অত্যন্ত কামুক কি সুরাপায়ী সে সমস্ত দিবস উদরান্নের জন্য পরিশ্রম করিয়া যথাকালে সেই কামুক ও সুরাপায়ী লোকের সহিত মিলিত হইবে; তাহা না হইলে, ঐ প্রকার ব্যক্তির আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তির সামঞ্জস্য থাকিবে না। কারণ সে ব্যক্তি বরং একাকী থাকিতে স্বীকৃত হইবে, তথাচ সজ্জন ও সাধু ব্যক্তির সহিত মিলিত হইবে না। তাহাদিগের রীতি নীতি ব্যবহারের সহিত সাধু ব্যক্তির প্রভেদ আছে বলিয়া সৎসঙ্গ তাহার সুখের বলিয়া বোধ হইবে না।

আসঙ্গলিপ্সা যদিও স্বভাবদত্ত বৃত্তি, তথাচ এই আসঙ্গলিপ্সা, দেশভেদে, কালভেদে ও অবস্থাভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব ধারণ করে। বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোকেরা যেখানে বণিক্ লোক বসবাস করে ও যেখানে ব্যবসা কার্য্যের কথা বার্ত্তা চলে, সেই সকল লোকের সহিত বাস করিতে যত্নবান্ হয়। বাণিজ্য ব্যবসায়ীর সহিত আইন ব্যবসায়ী লোকের কখন মিল হইবে না বলিয়া উকীলপাড়ায় একজনও সওদাগর ইংরাজ বাস করে না। যে যাহা ভাল বাসে, যাহার সহিত যাহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, যাহার উপর যাহার বিশেষ লাভের প্রত্যাশা আছে, সে সেই সকল লোকের সহিত মিলন করিতে চাহে। এই পদ্ধতিগুলি সামাজিক পদ্ধতি, স্বাভাবিক নহে। মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের মিলন, ইহাই স্বভাবের পদ্ধতি; মানুষ একলা থাকিতে ভাল

বাসে না, এই জন্য দশ জনে একত্র হইয়া বসবাস করে। মনুষ্যের একাকী বাস কষ্টকর বলিয়াই রাজনিয়মে উৎকট অপরাধীর ‘নির্জ্জন কারাবাস’ গুরুদণ্ড বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। মনুষ্য, গো, মেষ, মহিষ, প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করে। তবে সকল প্রাণীর অপেক্ষা মানবজাতি শ্রেষ্ঠ ও হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়াই মনুষ্য সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়।

উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, স্বভাবদত্ত আসঙ্গলিপ্সা-বৃত্তি আমাদিগের মঙ্গলের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে; সেই আসঙ্গ-লিপ্সা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্য দোষে অত্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠে। আমি যদি সজ্জন ও সাধু হইয়া কোন একটি মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অসতের সহিত মিলিত হই, তাহা হইলে, সেই অসৎ সংসর্গ প্রযুক্ত আমার সমস্ত সৎস্বভাব কলুষিত হইয়া উঠিবে। তবেই আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তি যাহাতে কলুষিত না হয়, তজ্জন্য সৎসঙ্গ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সতের সহিত সহবাসে মনের অসৎ প্রবৃত্তিও কালক্রমে বর্জ্জিত হইয়া যায়। সঙ্গ-দোষ সকল কষ্টের মূল কারণ। যেরূপ সঙ্গ করিবে, প্রকৃ-তিও সেইরূপ হইবে। আসঙ্গলিপ্সার বলে আমি, দশ জন লোক লইয়া সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ করিবার ইচ্ছা করি, কিন্তু সেই দশ জন লোকের মধ্যে একজনও মন্দ লোক না থাকে, তদ্বিষয়ে সমূহ সতর্কতার সহিত কার্য্য করা উচিত। মনুষ্যের মনোবৃত্তির নিবৃত্তি হওয়া দুষ্কর। সেই মনোবৃত্তির দ্বারা আমাদিগের অনিষ্ট না হয়, এই জন্য নীতিজ্ঞেরা এক একটি বৃত্তির উপর শত শত নীতিগর্ভ মহাবাক্য লিখিয়া গিয়াছেন।

এই আসঙ্গলিপ্সা সম্বন্ধে দুইটি মহাবাক্যের চতুর্থ চরণ স্মরণ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" "কর্ত্তব্যো মহতাশ্রয়ঃ।"

বিবৎসা—বাস করিবার ইচ্ছাকে বিবৎসা কহে। সুখে, স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে বাস করিতে পারি, প্রাণিমাত্রেরই এই রূপ বাসের ইচ্ছা আছে। এই বাসস্থান সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। বাসস্থানকে বিশ্রামের স্থান কহিয়া থাকি। সকল প্রাণীই এক একটা বিশ্রামের স্থান স্থিরী-কৃত করিয়া রাখে। যদি প্রাণিমাত্রেরই নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান না থাকিত, তাহা হইলে, পদে পদে তাহাদিগকে বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করিতে হইত, তাহাতে আর সংশয় নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পল্লীর কোন উন্নত অট্টালিকার উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত কর, প্রাণিমাত্রেই কি প্রকার বিবৎসা বৃত্তির পরিচয় দিতেছে। আকাশপথে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখ, কতপ্রকার বিহগকুল কলরব করিতে করিতে আপনাপন বাস-স্থানে ঊর্দ্ধশ্বাসে উড়িয়া যাইতেছে। রাজপথে দৃষ্টিক্ষেপ কর, ক্ষুদ্র ভদ্র কত প্রকার কর্ম্মচারী দিবসীয় কার্য্য সমাপন করিয়া স্ত্রী পুত্রপ্রভৃতি পরিবারের সহিত বিশ্রাম সুখ সম্ভোগের জন্য মনের আনন্দে আবাসাভিমুখে ছুটিয়াছে। এই বিবৎসা বৃত্তির জন্যই আমরা এক একটি বাসস্থান নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছি ; সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যায়ক্রমে আমাদিগকে সুখ দুঃখ ভোগ করায়। বাসস্থানের প্রতি আমাদের মমতাই কত! যদি কোন ধনবানের সুরম্য অট্টালিকাতেও বসিয়া থাকি, তথাপি বাটী গমনের সময় উপস্থিত হইলে, স্বীয় পর্ণশালায় যাইবার জন্য আমাদিগের মন

একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠে। আপনার পর্ণশালায় প্রবেশ করিলে, বোধ হয়, যেন স্বর্গসুখের আকরস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিহঙ্গকুল গর্ভধারণ করিলে, অগ্রে একটি বাসা প্রস্তুত করিয়া রাখে। সময়ে প্রসব বেদনায় কাতর হইলে, সেই নীড় মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। যত দিন শাবকগুলি উড়িতে ও আপনার আহারান্বেষণ করিতে না শিখে, ততদিন সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানটি পক্ষিণীর পরম আদরের স্থান হইয়া উঠে। যদিও সকল সময়ে তাহারা নীড় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে না, কিন্তু রজনী যাপনের জন্য তাহাদিগের এক একটি নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ আছে। বহুদূরে আহারান্বেষণ করিতে যায়, কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষে উপস্থিত হইবেই হইবে। নিত্য নুতন বৃক্ষে কোন পক্ষীই থাকিতে চাহে না। যদি মৃগযূথ তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে বহুদূরে গিয়া পড়ে, কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে দলবদ্ধ হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে আসিয়া শয়ন করিবে, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে কখনই রজনী যাপন করিবে না। আহা! বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, স্বভাবদত্ত এই বিবৎসাবৃত্তি প্রাণিমাত্রেরই পক্ষে পরম শুভকরী হইয়াছে। এই বৃত্তি হইতে সকল প্রাণীই আপনার মনোমত স্থানে বসবাস করিতে শিখিয়াছে। এই বৃত্তির বিপর্য্যয় ঘটিলে, সকল প্রাণীরই অনিষ্ট উৎপাদন করে। প্রাণিমাত্রেই যে যেখানে বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছে, পূর্ব্ব হইতেই তাহার সুবিধা অসুবিধা অনুসন্ধান করিয়া রাখিয়াছে। বাস সম্বন্ধে হঠাৎ কোন বিঘ্ন না ঘটে, পূর্ব্ব হইতেই তাহার সুপথ কুপথ আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। যদি বিবৎসাবৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে, প্রাণিমাত্রেই স্বেচ্ছাচারী

B. R. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

হইয়া কে কোথায় পড়িত ও কে কাহার হস্তে প্রাণ হারাইত, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই বিবৎসাবৃত্তি হইতেই নির্ম্মিৎসাবৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে।

নির্ম্মিৎসা—নির্ম্মিৎসা লইয়া আমরা অবনীতে আবির্ভূত হইয়াছি। দুই তিন বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই, আমরা যাহা চক্ষে দেখি, তাহাই নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা পাই। কখন ইষ্টক দিয়া খেলার ঘর বাঁধি, দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া মিথ্যা পূজা অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হই; অন্য কি কথা, বাল্যকালে যাহা চক্ষে দেখিতাম, প্রকৃত প্রস্তাবে হউক বা না হউক, তাহাই স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা পাইতাম। আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে যে অবস্থার লোক, তাহার নির্ম্মিৎসাও সেইরূপ হয়; ঢুলির ছেলে ঢোল প্রস্তুত করে, সূত্রধরের ছেলে, কাষ্ঠের দ্রব্য প্রস্তুত করে, কুম্ভকারের ছেলে ঘটাদি প্রস্তুত করে এবং বড়লোকের ছেলে পাঁচটা গাছের ডাল পুতিয়া স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিতে যায়। নির্ম্মিৎসাবৃত্তি স্বভাব সিদ্ধ সকলেরই আছে, তবে অন্য অন্য বৃত্তির ন্যায় সেই ইচ্ছা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠে। আমরাও বাল্যকালে অনেক মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি স্বহস্তে গড়িয়াছি; কিন্তু যাহারা ঐ বৃত্তির বিলক্ষণ চালনা করিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে দেব দেবীর মনোহর প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে এবং সেই বৃত্তি দ্বারাই আপনাদিগের অন্নের সংস্থান করিয়া লইয়াছে। নির্ম্মিৎসা সকলেরই আছে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, আমরা পাঁচখানা ছেঁড়া কাগজ যোজনা করিয়া কোন একটা এমন জীবজন্তু প্রস্তুত করিতে যাই যে, তৎপরে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেও আপনা আপনি হাস্য

সম্বরণ করিতে পারি না। আমরা বাল্যকালে সন্দেশ খাইতে খাইতে সেই সন্দেশে হংস গড়িয়াছি, মন্দির আদি গড়িয়াছি; কিন্তু এক্ষণে অনেক কার্য্যান্তরে মনোনিয়োগ করায় বাল্যকালের সে সকল নির্ম্মিৎসাবৃত্তির অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। তথাপি বাল্যকালে যাহারা সন্দেশের হংস গড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এক্ষণে প্রস্তর কাটিয়া হংস গড়িতেছে ও নানাবিধ প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া আপনাদিগের উদরান্নের সংস্থান করিয়া লইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাস ইচ্ছার সহযোগী নির্ম্মিৎসাবৃত্তি। এই দুই বৃত্তির পরস্পরের বিলক্ষণ সহায়তা দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের ত কথাই নাই; স্বভাব যে পশুপক্ষী ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতিরও নির্ম্মিৎসাবৃত্তি কি রূপ প্রবল করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। মধুমক্ষিকারা কত যত্নে ও কত পরিশ্রমে আপনাদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, তাহা অনেকেই চক্ষে দেখিয়াছেন। সেই চক্র মধ্যে তাহারা যে কত শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে, আমরা বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হই। সেই রূপ উইঢীপি, বাবুইয়ের ও দুর্গাটুনটুনি পক্ষীর বাসা উৎকৃষ্ট ও সমধিক বিস্ময়জনক। যদি একটা উইঢীপির মস্তক কর্ত্তন করিয়া ফেল, তাহা হইলে, অভ্যন্তর দৃষ্টে একেবারে আশ্চর্য্য হইতে হইবে। বোধ হইবে, যেন একটি প্রকাণ্ড নগরে নানাজাতীয় লোক নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। সেই সকল কীটের গমনাগমনের পথ ও বিশ্রামের স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে, বিশ্বপতির আশ্চর্য্য ক্রিয়া দর্শনে ভক্তিরসে হৃদয় আর্দ্র হইয়া পড়ে। গল্প শুনা গিয়াছে,

এক জন সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র স্বহস্তে একটি বাবুই পক্ষীর বাসা প্রস্তুত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কিছু-তেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাস ইচ্ছা হইতেই সকল প্রাণীর মধ্যে নির্ম্মিৎসাবৃত্তি প্রবল হইয়াছে। যদি একটা ভগ্ন বাটীর উপর খুঁড়িয়া তাহার অভ্যন্তর দৃষ্টি কর, তাহা হইলে, ইন্দুরের চলাচলের পথ দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইবে। তাহারা যে এত পরিশ্রম করিয়া এরূপ চলাচলের পথ, এরূপ সঞ্চয় করি-বার ভাণ্ডার ও এরূপ শাবক রাখিবার স্থান কেমন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারা যায় না; কে বলে যে, পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গাদির ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই ? তাহারা যে প্রকার সুপ্রণালীতে আপনাদিগের বাসস্থান ও গমনাগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, তাহারা যেন বহুকাল উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে নিকৃষ্ট প্রা-ণীর নির্ম্মিৎসার অধিক পরিচয় দিতে পারা গেল না। এক্ষণে সর্ব্বপ্রাণীর উপর যাঁহারা একাধিপত্য করিয়া থাকেন, তাঁহা-দিগেরই নির্ম্মিৎসার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

এক্ষণে দিনে দিনে সংসারের যে উন্নতি দেখা যাইতেছে, সেই উন্নতির এক প্রধান সহায় নির্ম্মিৎসাবৃত্তি। যত মনুজকুলের নির্ম্মিৎসাবৃত্তি প্রবল হইতেছে, ততই দিন দিন জগতের উন্নতি হইতেছে। এই নির্ম্মিৎসাবৃত্তি প্রবল না থাকিলে সংসার অর-ণ্যের ন্যায় হইয়া থাকিত। মনুষ্যের অনেক বৃত্তি সময়ে কলুষিত হইয়া অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে ; কিন্তু নির্ম্মিৎসা মনুষ্যের মনে যত কেন প্রবল হউক না, তদ্দারা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবে

না। প্রথমে কোন কোন বিষয়ে নির্ম্মাণ কর্ত্তার অনিষ্ট হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নির্ম্মাতার অভিপ্রায়ানুযায়ী নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে, জগতের মঙ্গল সাধন হইবেই হইবে। এক ব্যোমযান নির্ম্মাণ কার্য্যের প্রারম্ভে অনেকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সেই ব্যোমযান যদি সময়ে কার্য্যকর না হইত, তাহা হইলে, পারিস নগর কোন ক্রমেই শত্রুহস্তে নিস্তার লাভ করিতে পারিত না। এক্ষণে ব্যোমযান সভ্যজাতির অনেক বিষয়ে ইষ্টসাধন করিতেছে। এক ষ্টীম্ এঞ্জিন প্রকৃত প্রস্তাবে আবিষ্কার করণ কালে কত শত লোকের প্রাণান্ত হইয়াছে; তাহার এক একটি কলের প্রক্রিয়া স্থির করিতে এক একটি লোকের জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই ষ্টীম্ এঞ্জিন সভ্য জাতির উন্নতি পথের প্রধান সহায়। সভ্যদেশের কৃষকেরাও সেই ষ্টীম্ এঞ্জিন ভূমিকর্ষণ ও শস্যকর্ত্তনেও প্রয়োগ করিতেছে। আজকাল ষ্টীম্ এঞ্জিনে না হইতেছে এমন কার্য্যই নাই। যদি ঈশ্বর আমাদিগকে নির্ম্মিৎসা-বৃত্তি না দিতেন, তাহা হইলে, এরূপ ইষ্টকর যন্ত্রের আবিষ্কার কোন কালেই হইত না।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, এই নির্ম্মিৎসাবৃত্তি দ্বারা ঈশ্বর জগতের অসংখ্য লোকের অন্নের সংস্থানের উপায় করিয়া দিতেছেন। কেবল উদরান্ন ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য সংসারের অসংখ্য লোক শত সহস্র প্রকার সামান্য দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতেছে। ইহাতে কেবল সেই নির্ম্মাতার অন্নের সংস্থান ব্যতিরেকে জগতের আর কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। পর্ব্বাদিতে রাজপথে দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি লোক কাগজ কাটিয়া বালকের দৃষ্টিমনোহর নানা প্রকার খেলনা

প্রস্তুত করিয়া আনে এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই খেলনা গুলি বিক্রয় করিয়া ফেলে। প্রতি পার্ব্বণেই অনেক নূতন খেলনার রচনা দেখিতে পাওয়া যায়; কেন না, নূতন হইলেই লোকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে। পাঠক, ইংরাজ টোলার একটি প্রশস্ত বিপণি মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখুন যে, মনুজকুল স্বভাবদত্ত নির্ম্মিৎসা বৃত্তির কতদূর পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐরূপ একটি বিপণি মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি তাহার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে, নূতন নূতন দ্রব্য সামগ্রী দর্শনে আমাদিগের নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। সেই খানে দাঁড়াইয়া যদি স্থিরভাবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করি, তাহা হইলে, অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে, ঈশ্বর নির্ম্মিৎসাবৃত্তি মনুষ্যকে প্রদান করায়, কত নূতন নূতন দ্রব্য সামগ্রী সংসারে দিন দিন প্রস্তুত হইতেছে, আবার এক এক বৃত্তির সহিত অন্যান্য বৃত্তির কতদূর সংস্রব রহিয়াছে। যদি আমাদিগের আহারের প্রয়োজন না থাকিত, যদি আমাদিগের পরিবার ভরণ পোষণের প্রয়োজন না থাকিত এবং বাস করিবার ইচ্ছা না থাকিত, তাহা হইলে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের নিকট বসিয়া কেহই ঝাড় লণ্ঠন ও গ্লাস প্রস্তুত করিতে যাইত না। গুরু পরিশ্রমের সহিত প্রস্তর কাটিয়া কে এই সকল দৃষ্টিমনোহর দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করিত? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই যে, সংসারের প্রায় সমস্ত লোকেই নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি রজনী কি দিবা, মনুষ্যের প্রয়োজন উপযোগী নানা দ্রব্য নির্ম্মিত হইতেছে। মুহূর্ত্ত কাল নির্ম্মাণ কার্য্যের বিরাম নাই। সৃষ্টিকর্ত্তার কি চমৎকার কৌশল! তাঁহার নিজের নির্ম্মাণ কার্য্য

এক প্রকার শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার সৃষ্টবস্তু ভাঙ্গিয়া চূরিয়া মনুজকুল যে নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তাহা কোন কালে শেষ হইবে না।

অনুচিকীর্ষা—অনুচিকীর্ষাবৃত্তির সহিত বাস ইচ্ছা ও নির্ম্মিৎসা বৃত্তির বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে এবং এই বৃত্তির বিশেষ কার্য্য গতিকে দোষ গুণ দুই আছে। পূর্ব্ব কথিত দুই বৃত্তির সহিত অনুচিকীর্ষা বৃত্তির কিরূপ সম্বন্ধ সংক্ষেপে তাহার বর্ণন করিয়া অগ্রে অনুকরণ বৃত্তির গুণের ভাগ বর্ণন করিব, পরিশিষ্টাংশে দোষের ভাগ উল্লেখ করা যাইবে। বাস ইচ্ছা হইতে নির্ম্মিৎসাবৃত্তি, এটি স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য। একটি পক্ষিণী গর্ভিণী হইয়া শাবক প্রসবের জন্য একটি বৃক্ষ মনোনীত করিল; পূর্ব্বেও সেই বৃক্ষে রজনীতে বাস করিত, এক্ষণে শাবকগুলির বাসের জন্য একটি বাসা নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইল, সুতরাং বাসের জন্য নির্ম্মিৎসাবৃত্তি সামান্য বিহঙ্গকুলের মধ্যেও স্পষ্ট ঈক্ষণ হইতেছে। আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীপুরে বাস করিব, কার্য্য গতিকে আমার এই ইচ্ছা প্রবল হইল; বাসস্থান নির্ণয় করিয়াই, আপনার ক্ষমতানুরূপ একটি গৃহ নির্ম্মাণের ইচ্ছা হইল। কিরূপ বাটী নির্ম্মাণ করিব মনে মনে ভাবিতেছি, এমন সময়ে মাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি ভবানীপুর গিয়া নূতন বাস করিয়াছেন। আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নূতন বাটী প্রস্তুতে কত ব্যয় হইয়াছে এবং ঘর দ্বারই বা কি প্রকার করিয়াছেন? ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, 'আমার সমভিব্যাহারে আসুন।' ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম ও মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, আমিও ঠিক এই

প্রণালীর একটি বাটী প্রস্তুত করিব; কিন্তু সদর দরজার ভাব ঠিক কলিকাতার বাটীর মত রাখিতে হইবে; আর বিধু বাবুর মত নীচেকার ঘরের সমস্ত মেজেতে বিলাতী মাটী দিতে হইবে। দরজা জানালাগুলি এক্ষণকার নূতন ধরণে করিতে হইবে ইত্যাদি। বাস ইচ্ছা হইতে নির্ম্মিৎসা, নির্ম্মিৎসার সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ বৃত্তির প্রয়োজন হইল। এক বাটী প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে কত জনের অনুকরণ করিলাম।

যদি ঈশ্বর আমাদিগকে অনুকরণবৃত্তি না দিতেন, তাহা হইলে, এ সংসারের কিছুই উন্নতি হইত না। আপন আপন প্রয়োজনসাধন করিয়াই মনুজকুল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি এক অনুকরণ বৃত্তির জন্যই সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে। বাইবেলে বর্ণিত আছে, ইজ্‌রাএল্ জাতি দৈববিড়ম্বনা বশতঃ বহুকালাবধি ঈজিপ্ট রাজ্যে বাস করিয়াছিল। তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার সময় অরণ্য মধ্যে পদে পদে ঈজিপ্ট রাজ্যের রীতিনীতি ব্যবহারের অনুকরণ আরম্ভ করে। ঈজিপ্‌শনেরা ঘোর পৌত্তলিক এবং ইজ্‌রাএল্ জাতি জগদ্বিখ্যাত এক ঈশ্বরবাদী ছিল; কিন্তু বহুকাল ঈজিপ্শন্ দিগের সহিত একত্র বাস করায় পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল; কেবল তাহাদিগের সমাজাধ্যক্ষ মোজেস ও এরণের ভয়ে ঈজিপ্ট দেশে বাসকালে পৌত্তলিক ধর্ম্মে যোগ দিতে পারিত না। বনমধ্যে মোজেস ও এরণের মৃত্যু হইলে, তাহারা এক স্বর্ণের গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়। ইজ্‌রাএল্ বংশীয়েরা ইজিপ্ট হইতে তদ্দেশের যে সকল রীতিনীতি ব্যবহার লইয়া

স্বদেশে আগত হয়, বহুকালাবধি তাহা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কথিত আছে যে, এ দেশের পৌত্তলিক ব্যবহার ঈজিপ্ট দেশ হইতেই প্রচার হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, অনুচিকীর্ষাবৃত্তির বিষয় পুরাবৃত্তের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই; সম্মুখে যাহা দেখিতেছি ও যাহা শুনিতেছি, তাহাই যথেষ্ট। ব্রিটনেরা জলযুদ্ধে ইয়ুরোপের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন; জলযুদ্ধের প্রধান অঙ্গ রণতরী—সেই রণতরী নির্ম্মাণে ইংরাজেরা যেরূপ পারদর্শী হইয়াছেন, সেরূপ ইয়ুরোপখণ্ডের আর কোন জাতি হইতে পারেন নাই। সেই জন্য রুসিয়ান সম্রাট্ পিটর স্বয়ং ইংলণ্ডে আসিয়া রণতরী নির্ম্মাণের কৌশল শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর, স্বয়ং শিক্ষক হইয়া স্বজাতিকে রণপোত নির্ম্মাণের কৌশল শিখাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়া ইয়ুরোপের অনেক জাতি জলযুদ্ধের আয়োজন বৃদ্ধি করেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। ইংরাজেরাও সেইরূপ স্পানিয়ার্ড ও পর্টুগিজদিগের বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি দর্শনে সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হন। ফরাসিস্ স্ত্রীগণের পরিচ্ছদ ইয়ুরোপের সমস্ত স্ত্রীজাতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন ও পদে পদে তাহার অনুকরণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সহিত আজকাল ইংরাজ জাতির বিশেষ সংস্রব ও সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তজ্জন্য এতদ্দেশের অনেক ব্যবহারের অনুকরণ ইংরাজ নরনারীগণ বিলক্ষণ করিতে শিখিয়াছেন। ইংরাজ স্ত্রীগণের কণ্ঠে মণিহার, কর্ণে দুল, হস্তে চুড়ি ও বলয় পরিধান, এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের অনুকরণ ভিন্ন আর কি বলিব?

ইংরাজেরা পূর্ব্বে শুষ্ক তাম্রকূটে প্রস্তুত চুরট টানিয়া কণ্ঠ তালু শুষ্ক করিতেন, এক্ষণে আলবোলা ও শট্‌কাতে গুড় মিশ্রিত তামাকুর ধূম পান করিতে শিখিয়াছেন। অনেকে তাম্বুল চর্ব্বণ করেন। ছোট ছোট সন্তান সন্ততিরা খানার মেজের গ্লাস ও প্লেট ভাঙ্গিয়া ফেলে বলিয়া অনেক ইংরাজ টেবিলের উপর এতদ্দেশীয় কাঁশার গ্লাস, চুমকী ঘটী ও কাঞ্চন থাল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন। এতভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে তাঁহারা ভারতবর্ষীয়গণের অনুকরণ করিয়া থাকেন।

অনুকরণবৃত্তি দুই প্রকার, সদনুকরণ ও অসদনুকরণ। অন্য দেশের, অন্য জাতির ও অন্য ব্যক্তি বিশেষের যদি আমরা সদনুকরণ করি, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের মঙ্গল হইবে, এই জন্য অনুকরণবৃত্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরাজ জাতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কষ্টসহিষ্ণু, স্বদেশ অনুরাগী এবং সাহসী; আমরা যদি এই সকল সদ্‌গুণের অনুকরণ করি, তাহা হইলে, যথেষ্ট মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। ইংরাজ জাতির শিল্পনৈপুণ্য পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাঁহারা অতি উৎকৃষ্ট সামগ্রী সকল সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। আমরা যদি কায়মনোযত্নে তাঁহাদিগের সেই সকল উৎকৃষ্ট গুণের অনুকরণ করি, তাহা হইলে, আর আমাদিগের কিছুরই অভাব থাকে না। জেতৃ জাতির সদ্‌গুণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অস্মদ্দেশীয় সুশিক্ষিত যুবকেরা কেবল তাঁহাদিগের সাধারণ ও অসৎ আচরণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—অর্থাৎ তাঁহাদিগের ন্যায় স্ত্রীবাধ্য ও সুরাপায়ী হন এবং তাঁহাদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ইংরাজ জাতির সমতুল্য হইতে চাহেন। আক্ষেপের বিষয়

এই যে, ইংরাজ জাতির দোষের ভাগ এদেশের যুবকবৃন্দ প্রায় সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু গুণের ভাগ প্রায় কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

পরস্পরের অনুকরণ করা মনুষ্য জাতির একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি; কিন্তু সেই অনুকরণ যদি সদনুকরণ হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা এক অনুকরণবৃত্তিই মহা অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। পৃথিবীতে যত প্রকার জাতি আছে, ইহারা চিরকালই পরস্পর পরস্পরের অনুকরণ করিয়া আসিতেছে। ইংরাজ জাতি সমস্ত ভূমণ্ডল বাসীর উৎকৃষ্ট বৃত্তির অনুকরণ করিয়া পৃথিবীতে আপনাদিগের উন্নতি করিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালীরা সকল জাতির নিকৃষ্ট বৃত্তির অনুকরণ করিয়া স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের নাম লোপ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। বাঙ্গালীর ন্যায় অসদনুকরণ প্রিয় জাতি বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই। যদি আমরা কোন বৃহৎ সাধারণ সভায় গমন করি, তাহা হইলে, তদন্তর্গত বাঙ্গালী জাতির ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। কেহ ইংরাজ সাজিয়াছেন, কেহ মগ সাজিয়াছেন, কেহ য়িহুদি সাজিয়াছেন, কেহ মোগল সাজিয়াছেন, কেহ বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাজিয়াছেন ইত্যাদি। সবলের অনুকরণ হীনবলেরা চিরকালই করিয়া থাকে; সে অনুকরণ ভালই হউক বা মন্দই হউক, সে বিষয় কেহই বিবেচনা করে না। রণজিৎ সিংহের বামচক্ষু কাণা ছিল বলিয়া তিনি ঐ চক্ষুর অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়া উষ্ণীষ বন্ধন করিতেন, সেই প্রথা অদ্যাপি পঞ্জাব প্রদেশে প্রচলিত আছে। যবন অধিকারে যবনের আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ বাঙ্গালীরা সর্ব্ব বিধায় গ্রহণ করিয়াছিলেন,

আবার ইংরাজাধিকারে সর্ব্বতোভাবে ইংরাজ হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গবাসিগণ যাহা নূতন দেখিবেন, তাহারই অনুকরণ করিবেন, তাহার ভাল মন্দ কিছুরই বিবেচনা করিবেন না। বেশ্যাগমন সুরাপান এই দুইটা কুপ্রথাও অনুকরণ বশতঃ হইয়া উঠিয়াছে। এই কলিকাতা মহানগরীতে কিছুকাল পূর্ব্বে পিরালী বাবুরা যেরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন, ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত লোকেই তাহার অনুকরণ করিত। এক্ষণে বড়মানুষেরা যে রূপ পরিচ্ছদ পরিধারণ করেন, যেরূপ পাদুকা ব্যবহার করেন এবং বাবুগিরি সম্বন্ধে অন্য অন্য কুৎসিত বিষয়ে যেরূপ অপব্যয় করেন, যে সকল সামান্য লোকের মাসিক বিংশতি মুদ্রা আয় নাই—তাহারাও সেই ধনি সন্তানগণের অনুকরণ করিতে যায়।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, লোক অসৎ অনুকরণেই প্রবৃত্ত হয় কেন? এবং সৎ অনুকরণেই বা বিশেষ মনোযোগী না হইবার কারণ কি? তদুত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজের দোষ গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে, এক গ্লাস সুরাপান করা সহজেই হইতে পারে; কিন্তু শৌর্য্যে বীর্য্যে তাঁহাদিগের সমতুল্য হওয়া সহজ ব্যাপার নহে বলিয়া কেহই তদ্বিষয়ে অগ্রসর হয় না। গঙ্গাস্নান করিলে পুণ্য হয় ও তুলা করিলে তদপেক্ষা অধিক পুণ্য হয়; কিন্তু গঙ্গাস্নান সহজ কার্য্য বলিয়া তিথি মাহাত্ম্যে গঙ্গাতীর লোকারণ্য হইয়া পড়ে— তুলার অনুকরণ করিতে প্রায় কেহই অগ্রসর হয় না। সহজ কার্য্যের অনুকরণে সকলেই অগ্রসর হয়, দুরূহ অথচ হিতকর কার্য্যের অনুকরণ কেহই করিতে যায় না। অনুকরণবৃত্তি হিতকরী বটে, কিন্তু কেবল সদনুকরণই হিতকর, অসদনুকরণ নহে।

যখন যে বিষয়ের অনুকরণ করিবে, সেটা কতদূর প্রয়োজন, কত-দূর হিতকর ও কতদূর ব্যয়সাধ্য, তাহা বিবেচনা করিয়া তদনুকরণে প্রবর্ত্ত হইবে। শীতকালের প্রত্যুষে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান স্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে; যাহাদিগের শীত নিবারণের উপযুক্ত পরিচ্ছদের অপ্রতুল নাই, তাহাদি-গেরই প্রাতঃসমীরণ সেবনে বহির্গত হওয়া উচিত; কিন্তু আজ কাল ধনি সন্তানদিগের অনুকরণ করিয়া নিঃস্ব লোকের সন্তা-নেরাও এক একখানি মোটা চাদরে অঙ্গ আবৃত করিয়া প্রভাত-সমীর সেবনে বহির্গত হয়।

অনুকরণ সম্বন্ধে যদি সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া লেখা যায়, তাহা হইলে, এই প্রস্তাবের উপর একখানি পুস্তক লিখিলেও আক্ষেপ দূর হয় না; কিন্তু আমরা মনোবৃত্তি সকল সংক্ষেপে বর্ণন করিব, ইহাই সঙ্কল্প করিয়াছি, এই জন্য উপসংহারে আর কয়েকটি কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। স্বভাব বশতঃ বাল্যকাল হইতেই আমরা অনুকরণ প্রিয় হই। জ্ঞানোদ্রেক হইতে হইতেই আমরা সমবয়স্ক শিশুগণের অনুকরণ আরম্ভ করি, অধিক কি, তাহাদিগের হস্তে একখানা ঘুড়ী ও একটা লাটাই দেখিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুড়ী ও লাটাই নিজে না করিতে পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অসুখের সীমা থাকে না। এইরূপে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমবয়স্কদিগের অনুকরণ করিয়া চলি, তাহার পর, বিষয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বাহুল্য অনুকরণ আরম্ভ হয়। অমুক ব্যক্তি এক খানি নূতন ধরণের গাড়ী প্রস্তুত করিল, তদ্দৃষ্টে আমি নিতান্ত পক্ষে পুরাতন গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিয়াও তদ-নুরূপ গাড়ী ঘোড়া ক্রয় করিতে অগ্রসর হই। বিলাসের

B D HAZRA & BROTHERS PHARMACY

অনুকরণ আরম্ভ হইলে, লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। অমুক ধনবান্ বাদ্যযন্ত্রের রূপার কড়া করিয়াছেন, মখমলের ঘেরাটোপ করিয়াছেন এবং সেতার ও তম্বুরার কাণগুলি রজতে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। যদিও আমার তাঁহার তুল্য বিষয় বৈভব নাই, তথাচ সেইরূপ অনুকরণ করিবার ইচ্ছা হয়; যদি সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে পারি, তবেই মঙ্গল, নতুবা দায়গ্রস্ত হইয়াও তদনুকরণে প্রবৃত্ত হইব, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না।

যদি এস্থলে আমরা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে, অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, কেবল এক অনুকরণ-বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা ন্যায্য ব্যয় অপেক্ষা ত্রিগুণ অপব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছি। কেবল এক অনুকরণের জন্যই ধনবান্ লোকেরা স্ত্রীবাধ্য হইয়া বৎসর বৎসর আভরণ নির্ম্মাণের কত টাকা মজুরী দিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। উৎসব উপলক্ষে দশজন স্ত্রীলোক একত্র সমবেত হয় যিনি যাঁহার নূতন প্রকারের বসন ভূষণ দেখেন, বাটী গিয়া তাহার অনুকরণের জন্য স্বামীকে একেবারে শশব্যস্ত করিয়া তুলিবেন। কল্য পঞ্চাশ টাকা মজুরী দিয়া একখানি আভরণ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই নামের নূতন ধরণের অন্য আভরণ দৃষ্টি করিলেই, নূতন প্রস্তুত আভরণ ভাঙ্গিয়া সেই রূপ গঠন করাইবেন; এ ব্যবহার যে কেবল বঙ্গ-দেশে প্রচলিত হইয়াছে এরূপ নহে। কেবল এক অনুকরণের জন্যই ইয়ুরোপীয় বিলাসিনী মহিলাগণ দুই এক বৎসরের মধ্যেই স্বামীকে দায়গ্রস্ত করিয়া ফেলেন। গল্প শুনা গিয়াছে, পারিস নগরের সুবিখ্যাত পার্কের মধ্যে বৈকালে বহু সংখ্যক বিলাসী

নর নারী বায়ু সেবনার্থে একত্র সমবেত হন ; সেই পার্কের মধ্যে নূতন নূতন ধরণের দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করিতে যায়। এক দিবস কোন ধনাঢ্যের স্ত্রী একটি উৎকৃষ্ট চর্ম্ম নির্ম্মিত কটীবন্ধ ক্রয় করিয়া আপন কটীতে সংলগ্ন করিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে সেই কটীবন্ধ নির্ম্মাতাকে কথিত পার্কের সমাগত তিন শত রমণী বায়না দিয়া কহিলেন, আমাদিগের নিমিত্ত এইরূপ কটীবন্ধ দুই তিন দিবসের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া এখানে আনিবে; ক্রমে সেই কটীবন্ধ পারিসের ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত স্ত্রীলোকেই ক্রয় করিয়াছিলেন। এই জন্য সুবিখ্যাত রহস্য লেখক রেণল্ড লিখিয়াছেন যে, 'অনুকরণ করা সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ।' বিলাসী লোকেরা পরস্পর পরস্পরের অনুকরণ করে বলিয়াই পারিস নগরের শিল্পিগণ ধনাঢ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হে পাঠকগণ! আমি বিনয় পূর্ব্বক আপনাদিগকে বলিতেছি, অসৎ প্রবৃত্তির অনুকরণে কখনই প্রবৃত্ত হইবেন না, তাহা হইলে, পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। অসদনুকরণ প্রবৃত্তি বলবতী হওয়ায় অনেক ধনি সন্তান একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে।

পরিহাস প্রবৃত্তি—পরিহাস প্রবৃত্তি লিখিবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, স্বভাবদত্ত আমাদিগের সমস্ত প্রবৃত্তি কার্য্য বিশেষে ও সময় বিশেষে মহা মঙ্গলময় বলিয়া বোধ হয়। এই সম্বন্ধে এক জন পণ্ডিত অন্য পণ্ডিতকে কহিয়াছিলেন যে, পরিহাস প্রবৃত্তি মহা অনিষ্টের কারণ। যেহেতু, পরিহাস করিতে করিতে কখন কখন ভয়ানক কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে; পরিহাস করিতে গিয়া অনেকে আত্মীয় স্বজনের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট

করিয়া ফেলিয়াছে। পুরাণে কথিত আছে, কোন মুনিপুত্র এক রাজপুত্রকে তালপত্রের সর্প দেখাইয়া পরিহাস করিয়াছিলেন, রাজকুমার সেই সর্প দৃষ্টে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়েন তিনি রাজার এক মাত্র পুত্র, নরপতি পুত্রের মূর্চ্ছা যাইবার কারণ অবগত হইয়া মুনিপুত্রকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণতনয় ক্রোধে অন্ধ হইয়া রাজপুত্রকে কহিলেন, তুই ক্ষত্রিয় পুত্র হইয়া একটা তালপত্রের সর্প দেখিয়া ভয় করিলি! এই হেতু, তুই কোন কালেই রাজসিংহাসনের যোগ্যপাত্র হইবি না। তুই সামান্য অপরাধে আমাকে নৃপতির ভর্ৎসনার ভাজন করিলি, এই পাপে তুই হীনবীর্য্য সর্প হইয়া দীর্ঘকাল বিবর মধ্যে বাস কর্। দেখ, এক পরিহাস করিতে গিয়া কিরূপ দ্বন্দ্ব ঘটিল ও অবশেষে রাজ নন্দন কিরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইলেন। কেবল এক পরিহাসের জন্য সময়ে সময়ে অনেক লোক অনেক বিপদ ভোগ করিয়াছে।

সবলকে হীনবলেরা কোন কালে পরিহাস না করে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্বে, ধৌম্য পুরোহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"অন্তঃপুর-নারী সহ না কবে বচন, নৃপ সহ না কহিবে রহস্য কথন।" যে রহস্য সহ্য করিতে পারে, তাহার সহিত রহস্যের কথা কহিও। যদি রহস্যপ্রিয় হইতে চাহ, তাহা হইলে, রহস্যের সময় নির্ণয় করিয়া লইও; কেন না, সকল সময় রহস্য ভাল লাগে না। রহস্য বিকৃত করিয়া লইলে, তাহার বিকৃত ফল অবশ্যই ফলিবে। একেবারে উচ্চ রহস্যে প্রবৃত্ত হইও না; যদি কৌশল করিয়া রহস্য করিতে

পার, তাহা হইলে; পুত্রশোকাতুর ব্যক্তিরও চিত্তবিনোদন করিতে পারিবে। রহস্য সময়ে সময়ে মধুর বলিয়া বোধ হয়, এই জন্য, পূর্ব্বকালের নৃপতিরা আপনাদিগের রাজসভায় এক এক জন পরিহাসপ্রিয় বিদূষক নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন ; সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালের বিদূষকেরা সময়ে সময়ে আশ্রয়দাতা রাজগণের বিস্তর উপকার করিত; তাহাদিগের রহস্য জনক কথোপকথন শুনিয়া নৃপতিরাও সময়ে সময়ে পরম উল্লাসিত হইতেন। রাজগণ কখনও কোন বিষয়ে ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিষন্ন বদনে বসিয়া থাকিলে, বিদূষকেরা তাঁহাদিগের সেই নিরানন্দ মনকে সদানন্দের ন্যায় করিয়া তুলিত।

পরিহাস প্রবৃত্তি শৈশব হইতেই আমাদিগের জন্মিয়া থাকে, যখন একটি নির্ভান্ত শিশু সন্তান মনের অসন্তোষ বশতঃ রোদন করিতে থাকে, সেই সময়ে তাহার সম্মুখে তৎকালোচিত পাঁচটা পরিহাসের কথা কহিলে, তাহার সেই বিরস বদন সরস হইয়া উঠে। লোকে সামান্য কথায় বলিয়া থাকে—'আজ বিষয় কার্য্যে বড় বিরক্ত হইয়াছি, চল কিয়ৎক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করা যাউক।' তবেই দিন রাত্রি ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ হাস্য পরিহাস করা নর নারীর পক্ষে প্রয়োজন বলিয়া ধরিতে হয়। যে পরিহাস বুঝে না, পরিহাস করিতে জানে না ও পরিহাসের স্থুল অনুভব করিতে পারে না, তাহাকে প্রকৃত মনুষ্য বলিয়াই গণ্য করা উচিত নহে। মনুজকুল সর্ব্বদা এক রস আস্বাদন করিয়া পরিতুষ্ট হয় না; পর্য্যায় ক্রমে কটু তিক্ত অম্ল মধুর রসও আস্বাদন করিতে হয়, সর্ব্বদা মধুপান করিতে ভাল লাগে না;

তেমনি সর্ব্বদা গম্ভীর ভাবে থাকা নিতান্ত অযুক্তি, বলিয়া বোধ হয়; এ জন্যে মধ্যে মধ্যে যত্ন করিয়া আমাদিগের সঙ্গত পরিহাস শিক্ষা করা উচিত। ইয়ুরোপ খণ্ডে বিশুদ্ধ পরিহাস শিক্ষা করিবার অনেক উত্তম উত্তম পুস্তক আছে; কিন্তু আমাদিগের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেমন সকল বিষয়ের বিকৃতি জন্মিয়াছে, সেই রূপ এদেশে প্রচলিত রহস্যোদ্দীপক পুস্তক পাঠেও গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। এক্ষণে প্রকৃত ও সুসঙ্গত পরিহাসের কথা কয়জন কহিতে পারে? সুসঙ্গত পরিহাস কে না শুনিতে ভাল বাসে?

পরিহাস ও বিদ্রূপ এ দুইটি স্বতন্ত্র কথা। লোকের মনে আঘাত দিয়া কথা কহার নাম বিদ্রূপ; আর নীতিগর্ভ অথচ হৃদয়গ্রাহী ব্যঙ্গোক্তির নাম পরিহাস। যে পরিহাসের কথা কহিতে জানে, ক্ষুদ্র ভদ্র সকলেই তাহাকে ভাল বাসে। এই জন্যই দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি "রসরাজ" হইয়াছিল; তিনি পরিহাস যুক্ত কথা কহিয়া মৃত মনুষ্যকেও হাসাইতে পারিতেন। বলিতে কি, তাঁহার সরস কথা শুনিয়া নিতান্ত ভগ্নান্তঃকরণ লোকেরও কিঞ্চিৎ সন্তোষ জন্মিত। বিদ্রূপ যুক্ত কথা শুনিলে লোকের অন্তর্দাহ হয়; মৌখিকে অনেকে হাস্য করেন সত্য, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বিদ্রূপবাদীর প্রতি শত্রুভাবের আবির্ভাব হয়। বিদ্রূপ করা সহজ, কিন্তু পরিহাস জনক কথা কহিয়া বিরস মনকে সরস করা বড় কঠিন ব্যাপার! এই জন্য পাঠকগণ, পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, কেহ কখনও কাহার উপর বিদ্রূপের কথা কহিবেন না। বিদ্রূপ ও পরিহাসে প্রভেদ কি, নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির সূত্রপাত সময়ে, গ্রহণে তুলা করিবার জন্য জয়পুরাধিপতি রাজা জয়সিংহ কাশীতে আসিয়াছিলেন এবং বাজীরাও পাশা তাঁহার আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বারাণসীতে উপস্থিত হন। উভয় রাজাই কাশীর পৃথক্ পৃথক্ ঘাটে তুলদাঁড়ী ঝুলাইয়া শাস্ত্রানুসারে তুলা করিতেছিলেন। বাজীরাও পাশা তুলার এক পাল্লায় উপবেশন করিয়াছেন, অন্য পাল্লায় কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। ভূপালের শরীর অত্যন্ত স্থূল ছিল, এই জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার যে কয়েকটি তোড়া সুরধুনী তীরে আনা হইয়াছিল, তাহাতে রাজার শরীর তোলিত না হওয়াতে তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার তোড়া আনিতে বাসায় লোক ছুটিল; এই জন্য রাজাকে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল সেই ভাবেই তুলায় বসিয়া থাকিতে হইল। জয়পুরের রাজা জয়সিংহ তোষামোদকারীদিগের মুখে এই কথা শুনিলেন যে, 'বাজীরাও পাশার টাকার তোড়া ফুরাইয়া গিয়াছে, সেই জন্য কাশীর এক মহাজনের নিকট টাকা ধার করিয়া আনিতে লোক ছুটিয়াছে।' এই কথা শুনিয়া গর্ব্বিত জয়সিংহ দুই চারি জন চাটুকার সমভিব্যাহারে যেন দেখিতে আসিয়াছি এই ভাবে, তুলার কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া দাঁড়াইলেন ও বাজীরাওকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য বদনে কহিলেন—'ভ্রাতঃ! মুদ্রার কি অভাব হইতেছে? আচ্ছা, গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা ঐ অভাব মোচন করিলে ত হয়?' সেই স্থলে কাশীর রাজা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, তিনি জয়পুরাধিপতির বিদ্রূপ যুক্ত কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'যখন শ্রীকৃষ্ণকে সত্যভামা তুলায় ওজন করিয়া তাঁহার শরীরের

সমতুল স্বর্ণ নারদ মুনিকে দান করিবার অভিলাষ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষিকে অধিক পরিমাণে স্বুবর্ণ দেওয়াইবার জন্য আপন শরীরের ভার সুমেরুর তুল্য করিয়াছিলেন। মহাত্মা বাজীরাও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, তুলায় যে টাকা মোহর উঠিয়াছে, ইহা সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না বলিয়া আপনার দেহের ভার বৃদ্ধি করিয়াছেন।' কাশীরাজের এই কথা শুনিয়া বাজীরাও ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'ধর্ম্মাত্মা বারাণসী অধিপতির কথাই সত্য হউক'—এই কথা বলিয়া আপনার পুত্রকে তুলার এক পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। যেহেতু শাস্ত্রে কথিত আছে, পুত্রের শরীরের সহিত পিতার শরীরের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, সঙ্কেতে ইহাই জানান হইল। তৎপরে কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিলেন, 'টাকার তোড়া নামাইয়া সমস্ত মোহরের তোড়া উঠাইয়া দাও।' তদ্দৃষ্টে জয়পুরাধিপতি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি বাজীরাওয়ের দেখা দেখি তুলা করিবার সময় সস্ত্রীক ও সপুত্র স্বুবর্ণ দিয়া তৌল হইলেন। পাঠক, এই এক বিদ্রূপের কথায় উভয় পক্ষের কতদূর অনিষ্ট হইল, বিবেচনা করুন।

পূর্ব্বে আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে যে, পুরাকালের প্রত্যেক রাজসভায় এক একজন বিদূষক থাকিত; সেই বিদূষকগণকে রাজারা 'বয়স্য' বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও যথেষ্ট মান রাখিয়া কথা কহিতেন। যে রাজা উচ্চদরের বিদূষক পাইতেন, তিনি আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এক দিবস মহারাজ দশরথ এক জন বিদূষক লইয়া নির্জ্জন গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় বশিষ্ঠ মুনিকে আহ্বান করিবার বিশেষ

প্রয়োজন হওয়াতে বিদূষককে কোন কথা না বলিয়া রাজা স্বয়ং মুনিবরকে আহ্বান করিতে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে বিদূষক কহিল, 'একি! গঙ্গা আনিতে ভগীরথ নিজেই চলিলেন নাকি?' তাহা শুনিয়া মহারাজ হাস্য করতঃ আর স্বয়ং গমন করিলেন না, কঞ্চুকী দ্বারা বশিষ্ঠের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। যে ব্যক্তি প্রকৃত পরিহাসচ্ছলে কথা কহিতে পারে, রসজ্ঞ ব্যক্তিরা আদর করিয়া তাহাকে নিকটে রাখেন। প্রমোদ কানন, বিলাসগৃহ, মৃগয়া-শিবির ও দ্যূতস্থলে বিদূষকেরাই রাজগণের চিত্তবিনোদন করিত। পূর্ব্বকালের রাজারা কোন বিষয়ে ভগ্নোদ্যম হইলে, উপবন অভ্যন্তরস্থ নিভৃত লতামণ্ডপে শয়ন করিয়া থাকিতেন, সে স্থলে এক বিদূষক ব্যতীত আর কাহারও যাইবার ক্ষমতা ছিল না; বিদূষকগণ হাস্য পরিহাস করিয়া সেই সময় বিমর্ষ রাজগণের চিত্ত বিনোদন করিত। বিলাসগৃহ শব্দের অর্থই কিয়ৎক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করিবার স্থল। সমস্ত দিবস রাজ-কার্য্যে কি বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সকলেরই মন বিরক্ত হইয়া উঠে; এই জন্য, যে যে রূপ অবস্থাপন্ন, সে তদনুরূপ একটি গৃহে পাঁচ জন বন্ধু বান্ধব লইয়া নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদ করে। সেই আমোদের স্থলে যদি সকলেই পরিহাসপ্রিয় লোক হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করায় অবশেষে একটা ভয়ানক কলহ উপস্থিত হইয়া পড়ে।

এক্ষণকার ধনবানদিগের বিলাসগৃহে প্রকৃত আমোদ মুহূর্ত্ত কালের জন্য স্থানপ্রাপ্ত হয় না; তদ্বিনিময়ে অনর্থক তর্ক, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা ও মধ্যে মধ্যে ঘোর চীৎকার হইয়া থাকে

এই মাত্র। অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত ধনিগণ ইঁহাকেই প্রকৃত আমোদ কহিয়া থাকে। ভগ্ন মনকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য লোকে আমোদ স্থলে বসিয়া থাকে ও সেই অভিপ্রায়েই ঈশ্বর মনুষ্যকে আমোদ প্রবৃত্তি দিয়াছেন। যেমন গুড় ও তণ্ডুল হইতে সুমিষ্ট মোদক প্রস্তুত হয়, আবার সেই গুড় ও তণ্ডুল সংযোগে ঘোর অনিষ্টকরী সুরাও প্রস্তুত হইয়া থাকে ; সেইরূপ চিত্ত বিনোদনের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে আমোদ প্রবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, যাঁহারা যথার্থ আমোদ করিতে জানেন, এরূপ সজ্জনের সহিত কিয়ৎক্ষণ সদালাপে কাল হরণ করিলে, দিবসের সমস্ত কষ্ট দূর হইয়া যায় এবং শরীর ও মন বিশিষ্ট রূপে প্রকৃতিস্থ হয়। আবার যাহারা প্রকৃত আমোদের পথ চিনিতে না পারিয়া অসভের সহিত অসৎ আলাপে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের প্রকৃতিস্থ হওয়া দূরে থাকুক, সেই আনন্দই সর্ব্বতোভাবে নিরানন্দের কারণ হইয়া উঠে। আমোদ করিব বলিয়াই পাঁচ জন একত্রে সুরাপান করিতে বসে ; সে আমোদের ভিতর যদি কিছুমাত্র সুখ থাকে, তাহা হইলে, সেই অসৎ আচরণের উদ্যোগেই আমোদের কাল বলিয়া ধরিতে হয়। তাহার পর, পাত্র ত্রয় গলাধঃকরণ করিলেই সুরাপায়ীরা কিরূপ আমোদে কাল হরণ করে, তাহা অনেকেই দর্শন করিয়া থাকিবেন। ঐ সুরা সভার সভ্যগণ যে দিবস অক্ষত শরীরে গৃহে গমন করিতে পারে, সেই দিনই তাহাদিগের শুভদিন বলিয়া ধর্ত্তব্য করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের আমোদের মীমাংসা বিচারালয়ে গিয়া হইয়া থাকে ; কিন্তু যাঁহারা পবিত্র আমোদে রত থাকেন, তাঁহারা সেই আমোদের কাল প্রতীক্ষা করিয়া সমস্ত

দিবস হই মনে বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাহার পর, কিয়ৎক্ষণ নির্দ্দোষ আমোদে রত থাকিয়া পুনর্ব্বার সংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হন।

কিয়ৎকাল আমোদ করা সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। পুরাণাদিতে জানা যায়, দেবগণ বহু কষ্টে অসুর বধ ও পৃথিবীস্থ রাজগণ নানা উপায়ে শত্রুদলন করিয়া কিছু কাল আমোদ আহ্লাদে রত থাকিতেন, তাহার কারণ এই যে, বহু কষ্টসাধ্য কোন কার্য্য উদ্ধার করিয়া যদি আমরা নির্জ্জন স্থানে কেবল অবস্থান দ্বারা শরীর সুস্থ করিতে যাই, তাহা হইলে, পুনঃ পুনঃ সেই সকল গত কষ্ট স্মরণ করিয়া মন আকুল হইয়া উঠে; এইজন্য দশ জনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া কিছু কাল পবিত্র আমোদে রত হইলে, পূর্ব্বের সমুদয় কষ্ট বিস্মৃত হওয়া যায়। মনোদুঃখ ভুলিবার কারণেই সভ্য সংসারের শিল্পিগণ নানা প্রকার আমোদের বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রকাশ্যে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে যে সকল আমোদ করা যায়, সেই সকল আমোদই প্রকৃত আমোদ; সঙ্কুচিত চিত্তে ও সঙ্গোপনে বারাঙ্গনা বিহার ও সুরাপান প্রভৃতি আমোদে কখনই চিত্ত প্রসন্ন হয় না। যে সকল আমোদে চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেই আমোদই প্রকৃত আমোদ।

শোভানুভাবকতা—পরম রমণীয় বস্তু দর্শনে মনের যে প্রীতি জন্মে, তাহাকেই শোভানুভাবকতা কহে। শোভানুভাবকতা-বৃত্তি অনেকের মনে কিছুমাত্র নাই, যাহা যৎকিঞ্চিৎ থাকে, তাহা না থাকার মধ্যেই ধরিতে হইবে। নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়াছে, তজ্জন্য চন্দ্ররশ্মিতে প্রকৃতি সতী যে এক অত্যাশ্চর্য্য

শোভা ধারণ করিয়াছেন ; এই একটি ভাবের উপর ভাবুক কবিকুল যে সকল চিত্ত মনোহর ভাবের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিবার সময় আমরা একেবারে ভাবে গদগদ হইয়া যাই। কবির বর্ণনা পাঠ করিয়া আবার আমরা যখন সেইরূপ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখি, তখন আমাদিগের মনেও নানা ভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে ; কিন্তু কৃষিজীবী লোকেরা কি বন্য জাতিরা সুনীল গগনে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া কবিকুলের ন্যায় কি নব নব ভাবের সঙ্কলন করিতে পারে? কখনই পারে না। কারণ তাহাদিগের যে শোভানুভাবকতাবৃত্তি যৎসামান্য আছে, শিক্ষার অভাবে আবার তাহাদিগের সে বৃত্তিরও স্ফুর্ত্তি পায় না, এই জন্যই স্বভাবের শোভা দেখিয়া শিক্ষিত ব্যক্তির মত তাহারা বিশেষ হর্ষোৎফুল্ল হয় না। একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে দুই চারিটি রক্তপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, কৃষকেরা সেই পুষ্করিণীর ধার দিয়া ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য প্রত্যহ গমনাগমন করিয়া থাকে ; সেই প্রস্ফুটিত কোকনদের প্রতি তাহারা ভ্রূক্ষেপও করে না। যদি সেই পথ দিয়া একজন ভাবুক কবি গমন করেন, তাহা হইলে সেই রক্তপদ্মকে তিনি নানা ভাবে বর্ণন করিয়া আপনার চিত্ত সন্তোষ করিবেন। বিকশিত পদ্মের উপর একটি ভ্রমর বসিয়াছে এবং সেই পদ্মটি বাতাসে দুলিতেছে—এই ভাব টুকু লইয়া অস্মদ্দেশীয় কবিগণ কত সুমধুর কবিতাই রচনা করিয়াছেন।

ভাবুকেরাই স্বভাবের শোভা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন, যাহারা অজ্ঞান ও অশিক্ষিত স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় শোভা তাহাদিগের চিত্তরঞ্জক হয় না। অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে নভোমণ্ডলে দীপ্যমান হীরক খণ্ড সদৃশ কোটি কোটি নক্ষত্র শোভা পাইতেছে,

উদ্দৃষ্টে ভাবুকের মন একেবারে গলিয়া যায় ও ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিতে থাকে; কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা কি সেই মহান্ ভাবের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে? না সতৃষ্ণ নয়নে সেই নক্ষত্র খচিত অন্তরীক্ষে দৃষ্টিপাত করে? তাহাদিগের দেখা না দেখা উভয়ই সমান।

শোভানুভাবকতাবৃত্তি দ্বারাই সভ্য জগতের দিন দিন শোভা বৃদ্ধি হইতেছে। স্বভাবপ্রসূত প্রায় সমস্ত দ্রব্যই শিল্পকারেরা আপন আপন অসাধারণ শিল্প বিদ্যার প্রভাবে প্রস্তরে, কাষ্টে, লোষ্ট্রে ও মৃত্তিকা প্রভৃতিতে প্রস্তুত করিতেছে। এরূপ কৃত্রিম বস্তু দেখা গিয়াছে, যাহা প্রথম দৃষ্টিতে স্বভাবজাত বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। যাঁহাদিগের অসাধারণ শোভানুভাবকতাবৃত্তি আছে, তাঁহারা গৃহসজ্জা করিতে ও সভা সাজাইতে যে রূপ পারেন, অন্য লোকে (অর্থাৎ যাহাদিগের শোভানুভাবকতাবৃত্তির বিশেষ উদ্দীপন হয় নাই তাহারা) সেরূপ কখনই পারে না। প্রাচীন কালাবধি ইষ্টক ও প্রস্তরে বাসোপযোগী ভবন প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু সেই ইষ্টক ও প্রস্তরে তৎকালে গৃহাদি প্রস্তুত হইয়াছে ও এক্ষণেও হইতেছে—সভ্যজগতে শোভানুভাবকতাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠায়, এক্ষণে কত পরিমাণে তাহার তারতম্য দৃষ্ট হয়, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। কেবল এক শোভানুভাবকতাবৃত্তির হেতুই আমরা প্রত্যহ কত প্রকার মনোরম অভিনব বস্তু নয়ন গোচর করিতেছি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কি বস্ত্র, কি আভরণ, কি গৃহসজ্জা, কি শয্যা স্থানে স্থানে এই সমস্ত বস্তু যখন এককালে সজ্জিত দেখা যায়, তখন সেই গৃহের শোভা দেখিলে কাহার না মনে প্রফুল্লতা জন্মে?

স্বভাবপ্রসূতই হউক, আর মনুষ্যের হস্ত নির্ম্মিতই হউক, রমণীয় বস্তু দর্শনে আমাদিগের মনের তৃপ্তি সাধন হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। সেই তৃপ্তি সাধনোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া অসংখ্য লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে। এই জন্যই ঈশ্বর শোভানুভাবকতা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন ; কেন না, এই বৃত্তির দ্বারাও সংসারের মঙ্গল বিধান হইবে। যদি আমরা এই শোভানুভাবকতা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নিজ গৃহের, নিজ পরিবারবর্গের ও নিজের শোভা সম্পাদনে এবং কেবল মাত্র স্বাভাবিক শোভা দর্শনে কাল হরণ করি, তাহা হইলে, এই ইষ্টকর বৃত্তিও অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিবে। পুরাণ ও ইতিহাসে পাঠ করা গিয়াছে এবং এক্ষণেও দেখা যাইতেছে, এক এক ব্যক্তির শোভানুভাবকতা বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠাতে, কেবল নব নব শোভা দর্শনের মানসে আপনি অপদস্থ ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। কেবল স্বভাবের শোভাদর্শনাভিপ্রায়ে উন্মত্ত হইয়া কেহ বা বন্য পশুর উদরস্থ হইয়াছেন, কেহ বা জলমগ্ন হইয়াছেন, কেহ বা হিমের তাড়নায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব শোভানুভাবকতা বৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া চলিলে, মানবকুলের মঙ্গল। অতিরিক্ত হইলে, অমঙ্গল ঘটিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। যাহার শোভানুভাবকতা বৃত্তি ঘোর প্রবল। সে যে কিছু মনোহর বস্তু দর্শন করে, তাহাই আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, এই অপরাধে পুরাকালের অনেক ভূপালবৃন্দ দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছেন। সীতার এক স্বর্ণমৃগ পাইবার অভিলাষই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

আশ্চর্য্য—শোভানুভাবকতা ও আশ্চর্য্য বৃত্তি অনেক অংশে সমান হইয়া পড়ে। অদ্ভুত বস্তু দর্শনে বিস্ময়ের সহিত মনের যে প্রফুল্লতা জন্মে তাহার নাম আশ্চর্য্য। আমরা কখন পূর্ব্বে পর্ব্বত দেখি নাই, জন্মাবচ্ছিন্নে যাহা কখন নয়নগোচর করি নাই, তাহার প্রথম দর্শন লাভে মন বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়, কোন কোন সময়ে তাহার সহিত প্রফুল্লতার সংযোগ থাকে। পর্ব্বত দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও প্রফুল্ল হই; কিন্তু যদি সমর-ক্ষেত্রের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া সমরতরঙ্গ দর্শন করি, কিম্বা তীরে দাঁড়াইয়া সাগরের তুফান দেখি, তাহা হইলে, বিস্ম-য়ের সহিত ভয়ের সঞ্চার হয়। যদি কোন অসভ্য জাতি ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় শ্মশান ভূমিতে আসিয়া গলিত শব ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে, বিস্ময়ের সহিত ঘৃণার উদ্রেক হয়। এইরূপ এক আশ্চর্য্য দর্শনের সহিত অবস্থাভেদে অনেক বৃত্তির সংযোগ হইয়া থাকে। যাহা কখন দেখি নাই ও মনেও কখন ভাবি নাই, সেইরূপ কোন অভাবনীয় বস্তু দর্শন করিলেই আমরা আশ্চর্য্য হই। আমরা পর্ব্বত দেখিয়া আসিয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট গল্প করিতেছি, তন্মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিলেন, পর্ব্বত দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইয়াছ! যদি সমুদ্রপথে পরিভ্রমণ কর, তাহা হইলে, সমুদ্রের তরঙ্গ তুফান ও স্থিরভাব এবং চন্দ্রালোকে সমু-দ্রের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হয়, তৎসমুদয় দর্শন করিলে, পর্ব্বত দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর বিস্মিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এক জন ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জলে স্থলে অনেক দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া কহিয়াছেন যে, আমি যে সকল নৈসর্গিক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে

HAZRA HOMŒOPATHIC
G D HAZRA &
BROTHERS
PHARMACY

নায়েগেরার জলপ্রপাত ও এট্‌নার অগ্ন্যুদ্গীরণ অপেক্ষা বিস্ময়-জনক ব্যাপার আর দেখি নাই। ঐ দুই বিষয়ের বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকে বহু অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক নায়েগেরার জলপ্রপাত দেখিতে যান; কিন্তু এট্‌নার অগ্ন্যুদ্গীরণ দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

পৃথিবীতে অনেকানেক অত্যাশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ব্যাপার আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক ও কতকগুলি মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। চীনদেশের প্রাচীর, তাজমহল, ঈজিপ্টের পিরা-মিড প্রভৃতি যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার মনুষ্য কর্ত্তৃক সম্পা-দিত হইয়াছে, জলপ্রপাতদর্শন অপেক্ষাও উপরোক্ত কয়ে-কটি মনুষ্য নির্ম্মিত কাণ্ড দেখিয়া আমরা বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হই। যাঁহারা উন্নতমনা হইয়াছেন, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা ঐ সকল অত্যাশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়া মনে মনে এরূপ অনুমান করেন যে, যখন মনুষ্য কর্ত্তৃক এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড সম্পাদিত হই-য়াছে, তখন উৎসাহ ও অর্থ পাইলে, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষাও অধিক হইতে পারে। জলদগর্জ্জন শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই না, আকাশে পূর্ণ চন্দ্র দর্শনেও আমরা আশ্চর্য্য হই না; কিন্তু গঙ্গার উপর যখন ভাসমান সেতু দর্শন করিলাম, তখন একেবারে বি-স্মিত হইয়াছিলাম। তবেই স্বভাবপ্রসূত অদ্ভুত বস্তু দর্শন অপেক্ষা মনুষ্য নির্ম্মিত অদ্ভুত বিষয়ের প্রতি আমরা অধিক লক্ষ্য করি ও নির্ম্মাতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকি। স্বভাবের সমস্ত বিষয় আমরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখি না; সেই জন্যই স্বভাবজাত বস্তু দর্শনে আমরা তত দূর বিস্মিত হই না; কিন্তু তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা একটি বৃক্ষপত্র কিম্বা একটি পুষ্প হস্তে করিয়া পরম

শিল্পী পরমেশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টি কৌশল সেই সামান্য পদার্থের ভিতর দর্শন করিয়া থাকেন এবং সেই বিস্ময়জনক ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাদিগের ঈশ্বর ভক্তি প্রবল হইয়া উঠে। এ প্রস্তাবের উপর আর অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই, কারণ সংসারের সমস্ত ব্যাপারই বিস্ময়জনক! যাঁহারা তদ্বিষয় সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন, তাঁহারাই বিস্মিত হন ও মনে মনে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করেন। আশ্চর্য্যদর্শন বৃত্তি দ্বারা আমাদিগের কি পর্য্যন্ত উপকার হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। অনুমান দ্বারা ইহাই প্রতীত হয়।

আশা—সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব স্থলে ও সর্ব্বাবস্থায় আশাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র বন্ধু। এই মহামঙ্গলকরী বৃত্তি ঈশ্বর যদি আমাদিগকে না দিতেন, তাহা হইলে,সংসারের লোক অঙ্গ চালনা করিতেও ক্ষান্ত হইয়া বসিয়া থাকিত। আহা! আশাযুক্ত কথাটি কি সুমধুর! জননীকে অনেক ক্ষণ না দেখিয়া বালক রোদন করিতেছে। বালকটিকে শান্ত করিবার জন্য আর একটি স্ত্রীলোক কহিতেছে—'তোমার মা তোমার জন্য পুতুল আনতে গেছে, এই এলো বলে, এসে তোমাকে দুধ দেবে, কোলে নেবে' ইত্যাদি। এই আশাযুক্ত কথা শুনিয়া বালক কথঞ্চিৎ ক্ষান্ত হইল; যে সময় ঐ বালক কাঁদিতেছিল এবং স্ত্রীলোকটি তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল, তাহার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বালকের জননী কুটুম্বগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা হেতু গমন করিয়াছেন, সন্ধ্যার সময় বাটী আসিবেন।—এই সবিশেষ বৃত্তান্ত যদি বালককে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে, তাহার রোদন ধ্বনিতে বাটীতে পরিজনের তিষ্ঠান ভার হইত। কিন্তু 'মা পুতুল আনিতে গিয়াছেন,' এই এক আশা-

যুক্ত কথা শুনিয়া বালক সর্ব্ববিধায় ক্ষান্ত হইয়া বসিল। একটি স্ত্রীলোক ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিধবা হইল। তৎকালে সেই হতভাগিনী গর্ভিণী ছিল। পতির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই পতিপ্রাণা কামিনী ধরাতলশায়িনী হইয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিতেছে; তাহার পতি বিয়োগ হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণে প্রতিবেশিনী কামিনীগণ দলে দলে তাহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিকবয়স্কা মিষ্টভাষিণী বৃদ্ধারা সেই কামিনীকে বুঝাইতে লাগিলেন—'মা, তোমায় অমন করিয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না; তোমার উদরে যে একটি সন্তান রহিয়াছে, তাহার কল্যাণ দেখিতে হইবে। যদি তুমি এরূপ অবস্থায় ধরাশয্যায় পতিত থাক, সময়ে স্নান ভোজন না কর, তাহা হইলে, তোমার গর্ভস্থ সন্তানের অকল্যাণ হইবে। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে; আর ফিরিবে না। এক্ষণে দেবতার ইচ্ছায় ঐ গর্ভে যদি একটি পুত্র সন্তান জন্মে, তাহা হইলেই, তোমার সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া যাইবে; মনোরমারও ত তোমার মত অবস্থা হইয়াছিল। যখন দশ মাসে সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিল, তখন আমাদের আর দুঃখের অবধি রহিল না। এখন সেই মেয়ে হইতে মনোরমার না হইয়াছে কি, মা, দেখ দেখি। আমরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার এই গর্ভে পুত্র সন্তান হইবে, কালে তুমি রাজার মা হইবে, বাপমরা ছেলে চিরকালই বড় লোক হইয়া থাকে।'' পতিবিয়োগসংবাদে কামিনী একেবারে নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্না হইয়াছিলেন। পতিশোক সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন, ইহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধাদিগের কথা শুনিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ আশা

জন্মিল। মনে মনে ভাবিলেন, যদি এই গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মে, তাহা হইলে, অনেকাংশে শোকের শমতা হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে ঐ কামিনীর আশা যে পরিমাণে প্রবল হইয়া উঠিল, সেই পরিমাণে শোকের শমতা হইতে লাগিল। পরে এই গর্ভে পুত্র সন্তান হইবে, সেই আশাতেই কাল হরণ করিতে লাগিলেন। কালে যথার্থই পুত্র সন্তান হইল। পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে সুখী হইলেন এবং মনে মনে এই আশা প্রবল হইয়া উঠিল যে, কালে এই শিশু বর্দ্ধিত হইয়া আমাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবে।

পাঠকগণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, আশার কি মোহিনী শক্তি! আশা এই ভূমণ্ডলের কত দূর উপযুক্ত ও উপকারী! যদি এই সংসারে মনুষ্য মনে আশা বৃত্তি প্রবল না থাকিত, তবে ভয়ানক দৈববিড়ম্বনা উপস্থিত হইলে, কেহই তাহার কষ্ট সহ্য করিতে পারিত না।

আমরা বাল্যকাল হইতে কঠোর পরিশ্রমের সহিত বিদ্যা শিক্ষা করিবার প্রয়াস পাই কেন? বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভবিষ্যতে সুখী হইব, এই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। যদি আশা ভবিষ্যতে ধন লাভের প্রত্যাশা না দেখাইত, তাহা হইলে, কেহই এ কঠোর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইত না। কৃতবিদ্য হইয়া আমি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব, আশা এ কথা কখনই বলে না। আশা কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া আমরা কেবল অনুকূল চিন্তাই করি, প্রতিকূল চিন্তা তৎকালে আমাদিগের মনোমধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। মনের যেমন সর্ব্বত্র গতি বিধি আছে, আশারও সেইরূপ পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তিতে অধিকার আছে।
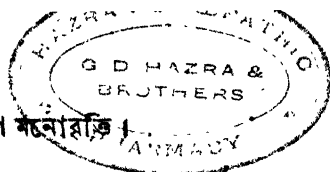
আশা যখন আবার কল্পনার সহিত একত্র মিলিত হয়, তখন আমরা পর্ণকুটীরে শয়ন করিয়া ইন্দ্রত্ব ভোগ করি। আশার নিকট সমস্ত বিষয়ই সুলভ ও অনায়াস লভ্য। আমরা যৌবন কালে কোন্ বিষয়ের আশা না করিয়াছি? তৎকালে কি আশা কোন বিষয়ের আশা দিতে বঞ্চিত করিয়াছিল? আশা এই ভয়ানক সংসার সাগরের একমাত্র তরণী। যখন আমরা উৎকট পীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী থাকি, তখন আশা সুমধুর স্বরে কর্ণকুহরে বলিতে থাকে, 'ভয় নাই, আরোগ্য হইবে, আবার সবল ও সুস্থ শরীরে সংসারের সমস্ত বিষয়ই ভোগ করিতে পাইবে। ধৈর্য্যের সহিত কিছু দিবস রোগের তাড়না সহ্য কর, ভয় করিও না।' অনেকে ব্যবসায় কার্য্য করিতে করিতে দৈববিপাকে একেবারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া যায়, সে সময় অনেক বন্ধু বান্ধবও তাহাকে পরিত্যাগ করে; কিন্তু ঐ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেবল আশাই আশা দিয়া বাঁচাইয়া রাখে। আশা প্রতিক্ষণ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিয়া থাকে, 'হতাশ হইও না, হতাশ হইও না, পুনরায় ব্যবসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, ঈশ্বরানুকম্পায় আবার সম্পদশালী হইয়া উঠিবে।'

সমুদ্রপথে কত আপদ বিপদ আছে, তাহা বণিকেরা বিশেষরূপে অবগত, তথাচ তাহারা লক্ষ মুদ্রার বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া কোন্ সাহসে পোতারোহণ করে? এই লক্ষ মুদ্রার দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া আর এক লক্ষ মুদ্রা লাভ করিব, এই আশাই তাহাদিগের কার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়। যদি সাগর মধ্যে বাণিজ্য পোত তরঙ্গ তুফানে পড়িয়া বিনষ্ট প্রায় হইবার উপক্রম হয়, সেই মহাবিপদেও বণিকদিগের মন হইতে মুহূর্ত্ত কালের

জন্যও আশা অন্তর্হিত হয় না। তরঙ্গ তুফান নিবারিত হইবে, জলপথে এরূপ বিপদ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, ভয়প্রযুক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুখ হইব না, আইস, আমরা সকলে একত্র হইয়া যাহাতে জাহাজ রক্ষা করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা দেখি,—আশা এইরূপে সেই বিপদ সময়ে তাহাদিগের ভগ্ন মনকে উত্তেজিত করিয়া রাখে। যদি সেই বাণিজ্য পোতখানি যথার্থই জলমগ্ন হইয়া যায় এবং ঐ পোতস্থ দুই এক জন বণিক্ বহু কষ্টে সন্তরণ দ্বারা সমুদ্রতীরস্থ কোন জনশূন্য প্রান্তরে উঠিতে পারে, সে সময়েও একমাত্র আশাই তাহাদিগকে নানা কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই উপন্যাসগুলি স্মরণ হওয়াতেই সেই জন শূন্য প্রান্তরে দাঁড়াইয়াও আশাকে ধ্যান করিতে থাকে। আশা তৎক্ষণাৎ তাহার মনোমন্দিরে উদয় হইয়া আত্ম রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেয়। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্য আশাযুক্ত হইলেই বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করে। যখন মনে বুদ্ধি ও বিবেচনার উদয় হয়, তখন আসন্ন বিপদেও একটা না একটা উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে।

এই সংসারে আমরা যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, আশাই তাহার প্রধান উত্তর সাধক। ভবিষ্যৎ গর্ভে কি আছে, তদন্বেষণে আশাই আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করিলে, আমাদিগের বিলক্ষণ লাভ হইবে, এইরূপ আশাযুক্ত হইয়া কতকগুলি ধনাঢ্য বণিক্ ভারতে রেলরোড নির্ম্মাণ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে কত আপদ বিপদ আছে, সে সকল বিষয় যখন চিন্তা করিতে বসিয়াছিলেন, আশা তৎকালে অনুকুল পক্ষেই

তাঁহাদিগকে পদে পদে উৎসাহ দিত। 'তাঁহারা একবারও ভাবেন নাই যে, কি সাহসে আমরা কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তাহা হইলে, অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। আশা তাঁহাদিগকে এরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইতে একেবারেই বিরত করিয়াছিল। 'কার্য্যারম্ভ কর, অবশ্যই এতদ্দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, ভয় করিলে গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কাহার বিশ্বাস ছিল যে, টেম্‌স নদীর নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গ কাটা যাইবে? যখন ইয়ুরোপ খণ্ডে রেলওয়ে প্রস্তুত করণের প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত হয়, তখন অনেক কৃতবিদ্য ও বুদ্ধিমান লোকেরাও ঐ প্রস্তাবের প্রতিকূলে কথা কহিয়াছিলেন। আজ কাল দেখ, এক ব্রিটীশ দ্বীপেই রেলওয়ে কোম্পানির কত টাকা উপার্জ্জন হইতেছে, তোমাদেরও সেইরূপ হইবে'—আশা পুনঃ পুনঃ এইরূপে সাহস দিয়া উত্তেজনা করাতেই ভারতবর্ষে রেলওয়ে কোম্পানি লৌহপথ প্রস্তুত করণের আর কোন বাধাই মানেন নাই।

কেবল মনুষ্য নয়, জগতের প্রাণিমাত্রেই আশার দাস হইয়া নানা স্থানে বিচরণ করিতেছে। একটি কুক্কুর কোন গৃহস্থের দ্বারদেশে উপবিষ্ট আছে, পাত্রাবশিষ্ট অন্নগুলি দ্বারে নিক্ষেপ করিবে, তাহাই ভক্ষণ করিব, এই আশাতেই তথায় উপবিষ্ট। একটি চিল সতৃষ্ণ নয়নে দ্বিতল অট্টালিকার উপর উপবিষ্ট আছে, পণ্যবীথিকা হইতে লোকে মৎস্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে, সুযোগ পাইলেই ছোঁ মারিয়া হরণ করিব, এই তাহার আশা। যে বন্য পথ দিয়া গো এবং মনুষ্য গমনাগমন করে, শার্দ্দূল

তাহার অনতিদূরস্থ জঙ্গলের ভিতর লুক্কায়িত ভাবে উপবিষ্ট আছে, কখন একটি গো কি মনুষ্য যাইবে, এই আশায় কাল হরণ করিতেছে। এইরূপ কত স্থানে কত শত পশু পক্ষী আহারের জন্য আশার উপর নির্ভর করিয়া উপবিষ্ট থাকে। যদি আশাবৃত্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইত, তাহা হইলে, সংসার অরণ্য প্রায় হইয়া উঠিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিঞ্চিৎ অর্থ অর্জ্জন করিব, এই আশায় অনেক লোক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া আনে। এইরূপে অর্থের আশায় মনুজকুল যে সকল স্থানে পশু পক্ষীরাও যাইতে সঙ্কুচিত হয়, সেই সকল দুর্গম স্থানে গিয়া রত্নাদির অনুসন্ধান করে। যদি কতকগুলি মূল্যবান্ বস্তু প্রাপ্ত হই, সেই গুলি বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ পাইব ; সেই অর্থের দ্বারা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবার লইয়া কাল হরণ করিতে পারিব, এই আশাতেই তাহারা অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সুখের জন্য লোকে যে কঠোর বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে পর জন্মের সুখের আশায় ইহ জন্মে কঠোর তপস্যা করিতেছে, অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছে এবং প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম স্থানের তীর্থ সকল দর্শন করিয়া বেড়াইতেছে। বলিতে কি, যাঁহারা নিতান্ত প্রয়োজন পক্ষে এক কপর্দ্দকও অধিক ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহারাও ভাবী স্বর্গ লাভের প্রত্যাশায় যাগ যজ্ঞে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। এক স্বর্গ লাভের আশায় সংসারের নর নারী না করিতেছে, এমত কার্য্যই নাই। কিছু কাল পূর্ব্বে

এদেশের স্ত্রীলোকেরা মৃত পতির সহিত চিতানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিত, ইচ্ছা পূর্ব্বক জগন্নাথের রথচক্রে পড়িয়া আত্মনাশ করিত। ভবিষ্যতে স্বর্গ লাভের আশা না থাকিলে, এরূপ কঠোর ও গর্হিত কার্য্যে তাহারা কখনই প্রবর্ত্ত হইত না। পুরাকালের সুচতুর শাস্ত্রকারেরা এই প্রলোভন দেখাইয়া দুরন্ত ক্ষত্রিয়কুলকে সমরাঙ্গণে নির্ম্মূল করিয়াছেন, সসাগরা ধরাপতিগণকে বৃদ্ধাবস্থায় কৌপীন পরিধান করাইয়া বনে বসাইয়াছেন এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞে প্রবৃত্তি দিয়া রাজাধিরাজগণের অর্থ শোষণ করিয়াছেন। ইহ জন্মেই হউক বা পর জন্মেই হউক, ভাবী সুখের আশা না থাকিলে, আমরা কখনই কঠোর বৃত্তির অনুবর্ত্তী হই না। দুরন্ত মাঘ মাসের শীতে অতি প্রত্যূষে এ দেশের নর নারীগণ গঙ্গাস্নান করিয়া শীতে কম্পিত কলেবরে বাটী প্রত্যাগমন করেন। ভাবী স্বর্গভোগের আশা প্রযুক্ত সে কষ্ট তাঁহাদিগের কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় না। এক নির্ব্বাণ মুক্তির আশাতেই পুরাকালে মুনি ঋষিগণ চিরকাল অরণ্যবাস করিয়া হরীতকী ও আমলকী ভক্ষণে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহারা স্বর্গের অতুল সুখের আশায়, আশার দাস হইয়া ইহ লোকের সুখকে ক্ষণিক বোধে ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন। অন্য কথা কি, মৃত্যুকালেও আশা আমাদিগের কর্ণ কুহরে বলিতে থাকে, 'মরিতে ভয় করিও না। মরণ ব্যতিরেকে স্বর্গ লাভ হয় না।'

এক আশা লইয়াই আমরা জীবিত থাকি, যখন সেই আশার কিছু মাত্র আশা থাকে না, তখন লোকে আত্মঘাতী হইয়া থাকে, সংসার ত্যাগ করে ও অনেকে উন্মাদ পর্য্যন্ত হইয়া যায়। যাহারা দুরাশার দাস তাহাদিগেরই উপ-

রোক্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। কেটো রোমের স্বাধীনতা রক্ষার আশা নাই, দেখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। নেপোলিয়ন আশা মত ইয়ুরোপ খণ্ডের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করিবার আশা নাই, দেখিয়া শেষ দশায় ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া গেলেন। যবন করে আর নিস্তার লাভের আশা নাই, এইরূপ স্থির করিয়াই বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণ সেন, রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইলেন। আশাই আমাদিগের ভাল মন্দ সকল প্রবৃত্তিরই আশ্রয়স্থল। আমরা যখন যে অবস্থায় নিপাতিত হই, কেবল এক আশাই ভবিষ্যৎ দেখাইয়া আমাদিগকে সেই অবস্থায় স্থির করিয়া রাখে। আশা বৃত্তি কোন কালেই নিবৃত্তি পাইবার নহে।

অধ্যবসায়—অধ্যবসায় বৃত্তি আমাদিগের পরম হিতকরী। এই বৃত্তির চালনায় সংসারের সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। কোন গুরুতর কার্য্যের প্রারম্ভে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অন্য কথা কি, আপনার মনই সর্ব্বতোভাবে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। কোন একটি মহৎ কার্য্যের কল্পনা করিবা মাত্রই মনোমধ্যে নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। সে তর্ক অনুকূল পক্ষে যত হউক বা না হউক, প্রতিকূল পক্ষে হইতে থাকে। সে সময় যদি আমরা এক অধ্যবসায়ের আশ্রয় লই, তবেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। বোধ কর, কোন ব্যক্তি বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিশিষ্ট রূপ বিদ্যা অর্জ্জনের সঙ্কল্প করিল। মনই তাহাকে সেই সঙ্কল্প করাইল। পর ক্ষণই আবার সেই মন ঐ সঙ্কল্পের প্রতিকূলতাচরণ করিতে লাগিল ;—এত বয়সে কি আবার লেখা পড়া হইবে ? সময়ে যে কার্য্য করি নাই, তাহা অসময়ে কখনই হইতে পারে

না। পূর্ব্বাপেক্ষা শরীর এক্ষণে অনেক পরিমাণে অলস হইয়া পড়িয়াছে। স্মরণ শক্তির হ্রাস হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত বিলাস প্রিয় হইয়াছি, বলিয়া কঠিন পরিশ্রমে কষ্ট বোধ হয়। সংসারের ভার মস্তকে পড়িয়াছে, বলিয়া পূর্ব্বের মত মনে আর স্ফূর্ত্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে কখনই পারিব না।—মনে মনে এই রূপ প্রতিকূল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় উইল্‌সন সাহেবের অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ হইল। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়াই তাঁহার দুরূহ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার অভিলাষ জন্মিল। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যাপক ছিলেন। দিবা দশ ঘটিকা অবধি সাড়ে চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতে হইত। এতদ্ভিন্ন কালেজ সম্পর্কীয় আরও অনেকানেক কার্য্যের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। এই সমস্ত কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পন্ন করিতে তাঁহার নূতন বিদ্যার্জ্জনের সময় অতি অল্পই থাকিত। এই সমস্ত বাধা সত্ত্বেও এক জন উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে, বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে আট বৎসর কাল সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং 'খ্রীষ্ট সংহিতা' নামক এক খানি সংস্কৃত পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া এতদ্দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। যদি উইল্‌সন সাহেব অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমিই বা না পারিব কেন? তবে যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম, এই কয়েকটি আবশ্যক

করে। এই রূপ চিন্তা করিয়া পূর্ব্ব কথিত যুবক বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত হন ও এক অধ্যবসায়ের গুণেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া অতি অল্প কালমধ্যেই বিশিষ্ট বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

ইংরাজ জাতির অধ্যবসায় বৃত্তি বিলক্ষণ প্রবল। তাঁহারা কোন কার্য্যের উদ্যম ভঙ্গে একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন না। টেম্‌স নদীর তলবর্ত্ম প্রস্তুত করণ কালে প্রথম বার বহু সংখ্যক লোকের প্রাণ নষ্ট এবং বহু অর্থ অপব্যয় হইয়াছিল। এক বার উদ্যম ভঙ্গে অনেকে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অসাধ্য সাধনে প্রয়াস পাওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে, এই প্রস্তাব লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিয়াছিল। যাঁহাদিগের অধ্যবসায় বৃত্তি বিলক্ষণ প্রবল, তাঁহারা উপরোক্ত কার্য্যে একেবারে বিরত হইলেন না। ভাল, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, অনেকের এই মত হইল। দ্বিতীয় বারের চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইল না; কিন্তু যেরূপ তলবর্ত্ম প্রস্তুত হইল, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিলেন না। কি জন্য স্থায়ী হইবে না এবং কি করিলেই বা এই তলবর্ত্ম সুদৃঢ় হইতে পারে, এই প্রস্তাব লইয়া অসারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন, অবশেষে তলবর্ত্মের মধ্যে মধ্যে প্রস্তরের স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর খিলান্ গাঁথাই সুপরামর্শ বলিয়া বোধ হইল। তৎপরে ঐ স্তম্ভের উপর ঐরূপ খিলান প্রস্তুত করা হইল, যাহাতে উপরের গুরু ভার অনায়াসে বহন করিতে পারে। আজ কাল সেই তলবর্ত্মে সামান্য লোকেরা বাস করিতেছে ও সেই পথ দিয়া বহু সংখ্যক লোক গমনাগমন

করে বলিয়া তাহার দুই পার্শ্বে ফেরিওয়ালারা নানা দ্রব্যের দোকান সাজাইয়া বসিয়া থাকে। খিলান পড়িয়া মৃত্যু হইবে, এরূপ শঙ্কা আর কাহারও মনে উদয় হয় না।

তাতারদিগের দৌরাত্ম্যে চীন দেশের রাজা প্রজা জর্জ্জরীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। কি প্রকারে ঐ দুর্বৃত্তগণের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিব, চীন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা বহুকালাবধি ইহার কিছুই উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। অবশেষে কতকগুলি অসাধারণ বুদ্ধিমান লোকে প্রস্তাব করিলেন—আইস, বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে আমাদিগের রাজ্যের উত্তর দিক উন্নত ও সুদৃঢ় প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টন করি। এই অসম্ভাবিত প্রস্তাব অনেকে হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন। যাঁহাদিগের অধ্যবসায় বৃত্তি ঘোর প্রবল, তাঁহারা মনোমধ্যে যে গুরুতর কার্য্যের কল্পনা করেন, তাহা নিদান পক্ষে এক বারও কার্য্যে পরিণত না করিয়া ক্ষান্ত হন না। কয়েক জন ধনবান লোক সম্রাটের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিলেন যে, আমরা আপাততঃ এই উপস্থিত কার্য্য নিজ ব্যয়ে সমাধা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। যদি সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে, গবর্ণমেন্টকে সমস্ত ব্যয় ধরিয়া দিতে হইবে। যদি অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই কার্য্য পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে, সম্পূর্ণ রূপে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব। সম্রাট্ এরূপ সঙ্গত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে সেই ধনবান লোকেরা অতি অল্প কাল মধ্যে এই অসামান্য ব্যাপার অধ্যবসায়ের গুণে সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন করিয়া শত্রুহস্ত হইতে চির কালের জন্য আপনাদিগের দেশ রক্ষা করিলেন।

অধ্যবসায়ের গুণে এই ধরাধামের যত অদ্ভুত কীর্ত্তি সমাধা হইয়াছে। যদি ঐ সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তকেরা সামান্য বিঘ্নে হতাশ হইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে, কোন কালেই এ জগতে কোন অদ্ভুত কার্য্যই সমাধা হইত না। সংসারের ব্যবহারই এই, কোন দেশের একটি অদ্ভুত কীর্ত্তি সম্পন্ন হইল, দেখিয়া আপন আপন দেশে তদপেক্ষা আরও গুরুতর কার্য্যের সূত্রপাত করিতে যায়। যদি বহু ব্যয়সাধ্য কোন অদ্ভুত কীর্ত্তি সুসম্পন্ন না হইত, তাহা হইলে, আর একটিরও সূত্রপাতে কেহই সাহস করিয়া অগ্রসর হইত না।

সুয়েজ যোজক বিয়োগ করিয়া দেওয়া একটি মহৎ অধ্যবসায়ের কার্য্য। পূর্ব্ব কালে ইয়ুরোপীয়েরা প্রায় সমস্ত আফ্রিকাখণ্ড পরিবেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষে আসিতেন। তিন চারি মাসে একখানি জাহাজ কলিকাতার বন্দরে আসিয়া পৌঁছিত। ক্রমে অনেক অনুসন্ধানের পর অবধারিত হইল যে, লোহিত সাগরের মধ্যে বাষ্পীয় পোত রাখিয়া সুয়েজ যোজক অতিক্রম করিতে পারিলে, একেবারে ভূমধ্য সাগরের উপকূলে যাইতে পারা যায়। তথা হইতে অন্য বাষ্পীয় পোত সংযোগে অতি অল্প দিনে ইংলণ্ডে যাওয়া অসম্ভব নহে। কাল ক্রমে ইয়ুরোপীয়গণ এই সুগম পথেই গমনাগমন করিতে আরম্ভ করেন। লোহিত সাগরের উপকূল হইতে ভূমধ্য সাগরের উপকূল পঞ্চাশ মাইলের ন্যূন নহে। এই স্থলপথ বালুকাময় মরুভূমি; তথাচ ইয়ুরোপীয়গণ বহুকষ্টে সেই মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যসাগরে পোতারোহণ করিতেন। কিছু কাল পরে কতকগুলি ইয়ুরোপীয় বণিক্ একত্র হইয়া সুয়েজ যোজকের

উপর লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত করণের প্রস্তাব করেন; কিন্তু বালুকা-ময় মরুভূমিতে রেল্‌রোড প্রস্তুত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে খাল কাটিয়া লোহিত সাগরের সহিত ভূমধ্য সাগরের সংযোগ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত হয়; কিন্তু পঞ্চাশ মাইল বালি কাটিয়া খাল প্রস্তুত করা এক প্রকার দুঃসাধ্য বলিয়াই অবধারিত হইয়াছিল। দুই তিন বার কয়েক জন বণিক্ ঐ দুঃসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দিবসে বহু কষ্টে যে কিয়দংশ খাল কাটিতেন, রজনীতে প্রবল বাতাসে বালি উড়িয়া পুনর্ব্বার সেই স্থান সমভূমি হইয়া থাকিত; কোথায় খাল কাটা হইয়াছিল, তাহার চিহ্নও থাকিত না। এইরূপে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার পর, সুয়েজ যোজকে খাল কাটা অসম্ভব বলিয়া পূর্ব্ব কথিত বণিকেরা এক প্রকার ক্ষান্ত হইয়া বসিয়াছিলেন; কিন্তু ইয়ুরোপীয়গণের অধ্যবসায় বৃত্তি সহজে নিবৃত্তি হইবার নহে। অবশেষে দুই তিনটি ইয়ুরোপীয় জাতি একত্র মিলিত হইয়া দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে পুনর্ব্বার ঐ বালুকাময় মরুভূমিতে খাল কাটিতে আরম্ভ করেন। যদিও সেই কার্য্যে বহু বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, তথাচ, তাঁহারা অধ্যবসায়ের গুণে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লোহিত সাগরের সহিত ভূমধ্য সাগরের সংযোগকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সংসারের মধ্যে মনুষ্য কর্ত্তৃক যে কয়েকটি অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সুয়েজের খাল কর্ত্তন তাহার সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া ধরিতে হয়। ইয়ুরোপীয় জাতির কেবল এক অধ্যবসায়ের গুণেই এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

অধ্যবসায় সহকারে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রায়ই তাহা সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। যাহা দ্বারা জগতের উপকার, আত্মীয়

বন্ধুর উপকার এবং নিজের উপকার হয়, অধ্যবসায় সহকারে সেই কার্য্যেই হস্তবিস্তার করা যুক্তি সিদ্ধ। অনেকে অধ্যবসায়ের প্রকৃতার্থ না বুঝিয়া গোঁয়ারের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কলিকাতা মহানগরীর বিংশতি ক্রোশ অন্তরস্থ কোন ধনাঢ্য যুবক দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া জ্ঞাতি বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি ভাষায় বিলক্ষণ বোধাধিকার ছিল, অধ্যবসায়ের গুণে অসাধ্য সাধন হইতে পারে, ইহাও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন; কিন্তু বিবেচনার দোষে সেই অধ্যবসায়ের যে বিপরীত ফল ফলে, তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। সেই জন্যই যৌবন সুলভ ক্রোধে অন্ধ হইয়া বান্ধবমণ্ডলীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে প্রকারে পারি, জ্ঞাতিদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিব। ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিলে, কি না হইতে পারে? সেই যুবক জ্ঞাতিগণের সহিত অনর্থক ছল করিয়া প্রধানতম ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। যাহার আদি অন্ত মিথ্যা, তাহা কখনই প্রতিপন্ন করিয়া তুলিতে পারা যায় না; এই জন্য যুবক পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে পরাস্ত হইতে লাগিলেন, আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সেই কার্য্যে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না। তাঁহার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলে যে কেহ কথা কহিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে কহিতেন, 'যে পুরুষের দৃঢ়তা (Resolution) নাই, যে অধ্যবসায়ের প্রকৃতার্থ বুঝে না, সে কি আবার মনুষ্য? দারিদ্র্যে পতিত হইব, সেও স্বীকার, তথাচ শত্রুর নিকট নত হইব না।' এই সকল কথা শুনিয়া এক জন বুদ্ধিমান্ বর্ষীয়ান্ কহিলেন, তুমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহাকে

G D HAZRA & BROTHERS PHARMACY

অধ্যবসায় বলে না ; এইরূপ জিদ বজায় রাখিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। মনের একাগ্রতার নাম অধ্যবসায় ; কিন্তু সে অধ্যবসায় সকল সময় সকল কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারা যায় না। দুইটি বালক পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমরা সন্তরণ দ্বারা গঙ্গা পার হইব। প্রথম দিন তাহারা গঙ্গার তিন ভাগের এক ভাগ গিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইল ; তদ্দৃষ্টে দর্শকগণ উপহাস করিয়া কহিল, 'গঙ্গা পার হওয়া কি সহজ ব্যাপার!' বালক দ্বয় অপ্রতিভ হইয়া কহিল, 'আচ্ছা, কল্য দেখা যাইবে।' পরদিবস তাহারা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সন্তরণ আরম্ভ করিল। গঙ্গার অর্দ্ধাংশেরও অধিক অতিক্রম করার পর, বালক দ্বয় একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, আর হস্তপদ সঞ্চালন করিতে পারে না,—তদ্দৃষ্টে দুইখানি ক্ষুদ্র তরী প্রাণপণে দাঁড় বাহিয়া তাহাদিগের নিকটস্থ হইল ; কিন্তু সেই সময়ে বালক দ্বয়ের তরী আরোহণেরও ক্ষমতা ছিল না। ঐ ক্ষুদ্র নৌকা দুই খানির মাল্লারা বহু কষ্টে বালক দ্বয়কে তরীতে তুলিয়া তীরে লইয়া আসিল। পরে মৃতকল্প বালকদ্বয়ের আত্মীয়েরা অনেক যত্নের দ্বারা তাহাদিগকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিল। এরূপ প্রাণনাশক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াকে অধ্যবসায়ের কার্য্য বলে না।

কথিত আছে, কৃষ্ণনগর কালেজের জনৈক ছাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি সমস্ত কালেজের ছাত্রগণের অগ্রগণ্য হইব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘোর অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। ছাত্রটি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিল সত্য ; কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এরূপ অধ্যবসায় সহকারে দুষ্কর কার্য্য করা কাহারও

পক্ষে বিবেচনা সিদ্ধ নহে। একটি বৈধ কার্য্যে অধ্যবসায় সহকারে একাকী প্রবর্ত্ত হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। তবে বহু সংখ্যক লোক একত্র হইয়া ঘোর অধ্যবসায় সহকারে দেশ-হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক; কিন্তু একাকী নিতান্ত অসম্ভাবিত কি প্রাণনাশক, কি ধননাশক কার্য্যে অধ্যবসায় সহকারে প্রবৃত্ত হইলে, সকল সময়ে তাহাতে সুমঙ্গল হয় না। অধ্যবসায় বৃত্তি আমাদের পরম হিতকরী, তাহাতে সংশয় কি; তাই বলিয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত কার্য্যে অধ্যবসায় সহকারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদিগের মতে নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। ব্যক্তি বিশেষের ঘোর অধ্যবসায় বৃত্তি সময়ে সময়ে যার পর নাই অনিষ্টকর হইয়া উঠে; কিন্তু জাতি বিশেষের অধ্যবসায় বৃত্তির দ্বারা সংসারের অনেক হিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিবিধিৎসা—প্রতিবিধানের ইচ্ছাকে প্রতিবিধিৎসা কহে। বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বিশিষ্টরূপে উপায় উদ্ভাবন করিলে, সে বিপদ হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারা যায়; সেই উপায় উদ্ভাবনের ইচ্ছাকে প্রতিবিধিৎসা কহে। কখন কখন একমাত্র প্রতিহিংসাকেও প্রতিবিধিৎসা বলা যায়। আমি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইতেছি, সেই জন্যই ছলে বলে কিম্বা কৌশলে তাহার অনিষ্ট সাধন করিবার ইচ্ছাকে প্রতি-বিধিৎসা কহে। প্রতিবিধানের ইচ্ছা নানা স্থলে নানা প্রকার ভাব ধারণ করে, পর্য্যায় ক্রমে তাহার ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে;—

বন্যার জলে প্রায় প্রতি বৎসরই বর্দ্ধমান জেলার কিয়দংশ

একেবারে প্লাবিত হইয়া যাইত। পূর্ব্বে দামোদর নদের জল বৃদ্ধি হইলে, কৃষিজীবী লোকেরা হাহাকার করিত। কেন না, তাহারা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াও দামোদরের উভয় পার্শ্বস্থ ধান্যক্ষেত্রের প্রস্তুত ধান্য রক্ষা করিতে পারিত না; বন্যার জলে তাহার সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইত। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হওয়ায় আমাদিগের দয়াবান্ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই অনিষ্টকর ব্যাপারের প্রতিবিধানের ইচ্ছা করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর, অবধারিত হইল যে, দামোদরের উভয় পারে উচ্চ বাঁধ বাঁধিয়া দিলে, বন্যার জলে আর শস্যাদি নষ্ট হইবে না। এই পরামর্শ মত কার্য্য হওয়ায় দামোদর নদের নিকটস্থ কৃষিজীবী লোকেরা নিরাপদে বাস করিতেছে: বন্যার জলে আর তাহাদিগের শস্য নষ্ট হয় না। গবর্ণমেণ্টের বাঁধ বাঁধিবার এই ইচ্ছাটিকে প্রতিবিধিৎসা কহা যায়।

এক সময়ে নবাব সিরাজুদ্দৌলার অত্যাচারে বঙ্গভূমির ক্ষুদ্র ভদ্র প্রজামাত্রেই যৎপরোনাস্তি প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। যখন নবাবের দৌরাত্ম্য এতদ্দেশীয় জনগণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন বঙ্গের প্রধান প্রধান লোকেরা কিসে দুর্বৃত্ত নবাবের হস্ত হইতে ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা হইবে, তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সেই প্রতিকার চেষ্টার ইচ্ছাকেই প্রতিবিধিৎসা কহা যায়। ইহা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট উদাহরণ, পুরাণাদিতে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঠকগণের অবিদিত নাই, কুরুবংশাবতংস অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, যখন লোকপরম্পরায় শুনিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের সমস্ত প্রজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের যার পর নাই অনুরাগী হইয়াছে এবং মুক্ত কণ্ঠে বলিতে

আরম্ভ করিয়াছে যে, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরই ভবিষ্যতে হস্তিনার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন। তিনি মহারাজ পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে যুধিষ্ঠিরই হস্তিনার রাজসিংহাসনের যথার্থ অধিকারী। প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরের অনুরক্ত হইতেছে, এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে বিজাতীয় ঈর্ষার আবির্ভাব হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এই সময়ে যদি কোনরূপ প্রতিবিধানের চেষ্টা না করি, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণ রাজ্যধনে বঞ্চিত হইবে। মনে মনে অনেক চিন্তার পর, ধৃতরাষ্ট্র একজন বিশ্বস্ত প্রাচীন মন্ত্রীকে সঙ্গোপনে নিকটে আনাইয়া আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধন যাহাতে হস্তিনার সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমূলে নিপাত হন, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে বসিলেন। অবশেষে বারণাবতে জতুগৃহ প্রস্তুত করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ সহোদরকে পোড়াইয়া মারিবার পরামর্শ স্থির করেন। পাণ্ডবেরা এখনও সবল হয় নাই, রাজ্যধন এবং সৈন্য সামন্ত এখনও আমার হস্তে রহিয়াছে, যদি এই সময়ে জ্ঞাতিহননের উপায় উদ্ভাবন না করি, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে পাণ্ডবেরা বল পূর্ব্বক তাহাদিগের পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিবেক; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ধৃতারষ্ট্র, পাণ্ডবগণকে নিধন করিবার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই ইচ্ছার নাম প্রতিবিধিৎসা। ধৃতরাষ্ট্রের কুচক্রে পড়িয়া পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হয়, দুত মুখে বিদুর এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এক আমি ভিন্ন হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদিগের আর দ্বিতীয় বন্ধু নাই,

তাহারা জতুগৃহে যাহাতে ভস্মসাৎ না হয়, ইহার প্রতিবিধানের চিন্তা আমি ভিন্ন আর কে করিবে? পাণ্ডবদিগের বিপদ ঘটিবার সমূহ সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের এই প্রকৃত সময়। অতএব যাহাতে পাণ্ডুপুত্রেরা উপস্থিত চক্রান্তে নিহত না হয়; ইহার উপায় উদ্ভাবন এখনই করিতেছি। বিদুরের সেই উপায় উদ্ভাবনের ইচ্ছার নাম প্রতিবিধিৎসা।

ঈশ্বর কি জন্য আমাদিগকে প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন? এই বৃত্তির অভাবে আমাদের কি কি অনিষ্ট ঘটিত? ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা অবশ্য এই কথা বলিতে পারি, যেমন আশা বৃত্তি মানবজাতির মহৎ উপকারী, অন্য কি কথা, আসন্ন মৃত্যুকালেও আমরা আশাকে একবারে পরিত্যাগ করি না; প্রতিবিধিৎসা বৃত্তিও তদস্বরূপ। এই বৃত্তি সকল অবস্থাতেই আমাদিগের সহায়তা করিয়া থাকে; যখন বিপদ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া আমাদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তখন এই বৃত্তি থাকাতেই আমরা বিপদ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখি। বিপদ জাল কর্ত্তন করিয়া কি রূপে পলায়ন করিব, শত্রু পক্ষকে দমন করিয়া কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিব, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার হইব, কেবল এক প্রতিবিবিৎসা বৃত্তিই তাহার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তায় রত থাকে।

এই প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তিরই একটি প্রধান অংশ মাত্র, কেবল কার্য্য ভেদেই তাহার স্বতন্ত্র নাম হইয়াছে। যেমন এক খণ্ড প্রস্তর কর্ত্তন করিয়া ভাস্করেরা নানা-বিধ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করে এবং অধিকার ভেদে সেই সকল প্রতিমূর্ত্তির এক একটি স্বতন্ত্র নাম দিয়া থাকে, কোন কোন মনো-

বৃত্তি সম্বন্ধেও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সেইরূপ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধিই আমাদিগের সকল বৃত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বুদ্ধি ব্যতিরেকে কোন বৃত্তিরই চালনা হয় না। বিবেক ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আমরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকি, সেই সকল কার্য্যের বিষয় ভেদ রাখিবার জন্য বুদ্ধি বৃত্তির আংশিক শক্তির এক একটি স্বতন্ত্র নাম হইয়াছে। যাহার প্রখর বুদ্ধি আছে, সেই ঘোরতর বিপদ কালে বিপদ উদ্ধারের নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে। সেই উপায় উদ্ভাবন করণ ইচ্ছাকে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা প্রতিবিধিৎসা কহিয়া থাকেন।

জিঘাংসা—এক ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অংশের মনুজ কুলই জীব হননের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গ্রীনলণ্ড বাসীরা কেবল মৎস্য খাইয়াই জীবিত আছে। বন্য জাতিরা হরিণ ও বরাহ প্রভৃতি পশু হনন করিয়া আপনাদিগের উদর পূর্ণ করে। যেমন জীব ব্যতিরেকে অনেক নিকৃষ্ট জীবের জীবন রক্ষা হয় না, এক জীব অন্য জীবকে বল পূর্ব্বক হনন করিয়া উদরস্থ করে, সেইরূপ জীবের অগ্রগণ্য মনুজকুলও অনেকানেক হিংস্র জীবের আহার দ্রব্য হইয়া থাকে। আহারের জন্য, ব্যবসায়ের জন্য, বিলাসের জন্য ও আত্মরক্ষার জন্য আমরা জীব হনন করিয়া থাকি। উপরোক্ত কয়েকটি কার্য্যই আমাদিগের প্রয়োজনীয়, এই জন্যই করুণাময় ঈশ্বর মানবজাতিকে সর্ব্বোতভাবে সুখী করিবার মানসে আমাদিগকে এই বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। বাহ্য জগতের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য প্রত্যেক জীবকেই ঈশ্বর জিঘাংসা বৃত্তি দিয়াছেন। জীব মাত্রের কেবল আহারের জন্য প্রতি দিবস এই পৃথিবীতে যে কত জীবের জীবনান্ত হইতেছে, তাহা আমরা চিন্তা করিয়াও মনে

জানিতে পারি না। যদি সংসারের লোক মৎস্য আহার না করিত, তাহা হইলে, এক মৎস্যের দ্বারা পৃথিবীর জলাংশ এত দিন পরিপূর্ণ হইয়া পড়িত। শূকরীরা এক কালে আট দশটা শাবক প্রসব করে, এই শূকর যদি মনুষ্যে আহার না করিত, তাহা হইলে, শূকরের সংখ্যা এতদূর বৃদ্ধি পাইত যে, তাহারা মনুষ্যের মহা অপকারী হইয়া উঠিত। হংস, কুক্কুট, পারাবত, ছাগ, মেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণিগণ এককালে বহু সংখ্যক অণ্ড ও শাবক প্রসব করে। মনুষ্য এবং অন্যান্য মাংসভোজী পশুপক্ষীরা যদি ঐ সকল প্রাণিগণকে হনন করিয়া আহার না করিত, তাহা হইলে, নিকৃষ্ট জীবের উৎপাতে আমাদিগের স্বচ্ছন্দ বাসের ব্যাঘাত ঘটিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সিংহ ব্যাঘ্র ও ভল্লুক প্রভৃতির মাংস মনুষ্য জাতির আহারোপযোগী নহে; বোধ হয়, এই কারণেই তাহাদিগের সংখ্যা অন্য নিকৃষ্ট প্রাণীর ন্যায় সমধিক বৃদ্ধি পায় না। যাহারা মনুজকুলের অপকারী, আমরা সেই সকল হিংস্রক পশুর সন্ধান পাইলেই, তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিয়া থাকি। তাহাদিগের নখর, চর্ম্ম, দন্ত এবং লোম প্রভৃতি প্রধান পণ্যদ্রব্য মধ্যে গণ্য হয় বলিয়া শীকারীরা সর্ব্বদাই বহু কষ্টে ঐ সকল হিংস্রক পশুর প্রাণ বিনষ্ট করিয়া থাকে। যদি মধ্যে মধ্যে এক জাতির সহিত অপর জাতির তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত না হইত এবং সেই যুদ্ধে ও মহামারীতে অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণ বিনষ্ট না হইত, তাহা হইলে, প্রাণিগণের অগ্রগণ্য মনুষ্যের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়া উঠিত যে, ভূতধাত্রী ধরিত্রী তাহাদিগের আহারোপযোগী শস্য প্রসবে অক্ষম হইয়া পড়িতেন। কতকগুলি মনোবৃত্তি ঈশ্বর কেবল মনুষ্যকেই দিয়াছেন, অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণীকে দেন নাই; কিন্তু জিঘাংসা

বৃত্তি সংসারের প্রাণিমাত্রকেই সমভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাণি-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, এ সংসারে অকারণ কোন প্রাণীই সৃষ্ট হয় নাই; প্রাণিমাত্রেই কোন না কোন প্রকারে প্রাণিগণের উপকার সাধন করিতেছে। আমরা যে সকল জীবের মাংস অখাদ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, অন্য জীবে তাহাদিগেরই মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

জিঘাংসা বৃত্তির প্রধান সহকারী ক্রোধ। ক্রোধের উত্তেজনা ভিন্ন জিঘাংসা বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে না। আমরা যখন আহার করিবার জন্য পশু হননে প্রবৃত্ত হই, হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করিবা মাত্রেই সহসা ক্রোধের আবির্ভাব হয়। বিনা ক্রোধে কেহই কখন জীব হনন করিতে পারে না। যে সকল শীকারীরা নিবিড় বন মধ্যে হিংস্রক জন্তু শীকার করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগের নিকট গল্প শুনা গিয়াছে যে, নিবিড় অরণ্যবাসী শার্দ্দূলগণ কখন কখন চার পাঁচ দিন আহার করিতে পায় না বলিয়া তাহা-দিগের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যদি সে সময় তাহারা সম্মুখে একটা শীকার দেখিতে পায়, তাহা হইলে, সেই দুর্ব্বল শরীরও ক্রোধে স্ফীত হইয়া উঠে; চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নি কণা বাহির হইতে থাকে। শীকার করিবার জন্য যখন তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন বোধ হয় যে, একটি শার্দ্দূল প্রকাণ্ডকায় হস্তী-কেও অক্লেশে নিধন করিতে পারে। আমরা গৃহে বসিয়া বিড়ালের ইন্দুর ধরার প্রক্রিয়া সমস্তই দেখিয়াছি, যখন তাহারা লম্ফ দিয়া শীকারের উপর পতিত হয়, তখন তাহাদিগের চক্ষুর্দ্বয় যেন দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে, গাত্রের লোম সকল স্ফীত হইতে থাকে,

ক্রোধে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে আরম্ভ করে; সে সময় তাহাদিগের ভীষণ ভাব দেখিলে, আমাদিগেরও ভয়ের সঞ্চার হয়। শার্দ্দুল ও বিড়ালের মত শীকার কালে প্রায় সমস্ত নিকৃষ্ট প্রাণীরই ক্রোধের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়। তবেই ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল যে, জিঘাংসা বৃত্তির সহিত ক্রোধের মিলন না হইলে, প্রাণিমাত্রেরই প্রাণিহননে প্রবৃত্তি জন্মে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, জিঘাংসা বৃত্তির দ্বারা প্রাণিসমূহের অপকার কি উপকার হইতেছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সর্ব্ব বিধায়ে সংসারের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্যই ঈশ্বর প্রাণীদিগকে জিঘাংসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। শত্রু দলনের পক্ষে ঐ বৃত্তি প্রাণিমাত্রের এক মাত্র সহায়। পেচকগণ কাকের মাংস আহার করে না; কিন্তু কাকে ও পেচকে চিরকাল শত্রুভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দিবসে যদি একটি পেচক বৃক্ষের কোটর হইতে বাহির হয়, তাহা হইলে, শত শত বায়স একত্র হইয়া ঐ পেচককে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। তাহাদিগের সেই উৎপীড়নে কখন কখন পেচকগণের প্রাণান্ত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সেই বৈরনির্যাতনের জন্য পেচকেরা রাত্রে কাকের বাসায় গিয়া তাহাদিগের ডিম্ব ভাঙ্গিয়া দেয় এবং সুতীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা বায়সগণের মস্তক কর্ত্তন করিয়া ফেলে। বিষধর সর্পগণ যদিও সর্ব্বদা মনুষ্যের অপকার করে না, তথাচ দর্শন মাত্রেই মনুষ্যেরা তাহাদিকে মারিয়া ফেলে। কি জন্য আমরা সর্পকুলকে হনন করিয়া থাকি, কি জন্যই বা সর্পদর্শনে আমাদিগের ক্রোধের আবির্ভাব হয় এবং কি জন্যই সেই ক্রোধ জিঘাংসা বৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তুলে? তাহার কারণ এই—

বিষধর সর্পকুল মনুষ্যের পরম শত্রু, যে সর্পটি হঠাৎ কোন মনুষ্যের নয়নপথে উপস্থিত হয়, সে তাহার কোন অপকার করুক বা না করুক, কোন কালে অন্য কোন মনুষ্যের অপকার করিতে পারে, এই আশঙ্কায় সেই মনুষ্য তাহাকে হনন করিয়া ফেলে; সুতরাং ভাবী অনিষ্ট নিবারণের জন্য আমরা অনেক অপকারী জীবের বিনা দোষে প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকি।

যদি আমাদিগের জিঘাংসা বৃত্তি না থাকিত, যদি ক্রোধ সেই বৃত্তিকে উত্তেজিত না করিত, তাহা হইলে, মনুষ্যের অপকারী প্রাণিগণের নিধন সাধন হইত না। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, জিঘাংসা বৃত্তি অনেকাংশে আমাদিগের উপকার করিয়া থাকে।

জিঘাংসা বৃত্তি যে নিকৃষ্ট বৃত্তি তাহাতে আর সংশয় কি। যেমন জিঘাংসা বৃত্তি দ্বারা আমরা প্রাণিহনন করিয়া থাকি, তেমন ঈশ্বর আমাদিগের মনে আর একটি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার নাম দয়া। এই উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া চলাই ঈশ্বরাভিপ্রেত। আমরা আহারোপযোগী প্রাণিহনন করণের সময় জিঘাংসা বৃত্তির সাহায্য গ্রহণ করিব; কিন্তু অনর্থক প্রাণিহননে যখন আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে, তখন দয়া সুমধুর স্বরে আমাদিগকে সেই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিবৃত্তি হইবার উপদেশ দিয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন আমরা হিংস্রক পশু হনন করিতে অগ্রসর হই, তখন দয়া আমাদিগের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন কি না, তাহা অনুভব করিয়া উঠিতে পারি না; কিন্তু যদি আমরা কেবল এক আমোদের জন্য একটি জীবিত ছাগশিশুকে পিঞ্জরা-

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

বদ্ধ শার্দ্দূলের মুখে নিক্ষেপ করিতে যাই, তখন দয়া আমাদিগের হৃদয় মন্দিরে মূর্ত্তিমতী হইয়া বলেন, আহা! এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য করিও না। শার্দ্দূলকে অন্য কোন আহার দেও, ছাগশিশুকে পরিত্যাগ কর। শার্দ্দূল কি প্রকারে ছাগশিশুর প্রাণান্ত করিবে, তুমি সেই দর্শন লালসায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য দ্বারা তোমার অন্য কোন প্রকার উপকারের সম্ভাবনা নাই, কেবল অন্তরে দাঁড়াইয়া নির্দ্দয়ের ন্যায় ছাগশিশুর মৃত্যু দর্শন করিবে এইমাত্র। যে কার্য্যে তোমার আমোদ ও অন্যের জীবনান্ত, এরূপ কার্য্য কখন করিও না।

নানা দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তারা যজ্ঞে পশু বধের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। যে সকল পশুর মাংস মনুষ্যের আহারোপযোগী, যজ্ঞে কেবল সেই সকল পশুকেই হনন করা হয়, এরূপ নহে। অশ্ব ও মহিষ পর্য্যন্ত যজ্ঞস্থলে হনন করার বিধি আছে। যজ্ঞে পশুহত্যার ব্যবস্থা দিবার অভিপ্রায় কি? চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে মনুষ্যের পক্ষে মাংস ভোজন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যদি মনুজকুল দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া আহারের জন্য পশু হননে বিরত হয়, শাস্ত্র কর্ত্তারা সেই কারণে দেবতার তুষ্টির জন্য পশু হননের বিধি দিয়াছেন। প্রসাদী মাংস গ্রহণ না করিলে, দুরদৃষ্ট ঘটিতে পারে, এই ভয়েই দেবভক্তগণ প্রসাদী মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মিসর দেশের যাজকেরা বেদীর উপর যে সকল পশু হনন করিতেন, সেই নিহত পশুর মাংস পবিত্র বোধে তদঞ্চলের আবাল বৃদ্ধ বনিতা উহা আগ্রহ সহকারে ভক্ষণ করিত। আমাদিগের দেশের যে সকল লোক নিতান্ত দয়ার্দ্র চিত্ত, তাঁহারাও দেব দেবীর সম্মুখে মহিষ, মেষ ও

ছাগ বলিদান দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। তবে যে দেশের যে পশু দ্বারা কৃষিকার্য্যের ও বাণিজ্যকার্য্যের বিশেষ উপকার হয়, সেই সকল পশুর প্রাণ রক্ষার জন্য শাস্ত্রকারেরা অনেক কৌশল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এদেশে পূর্ব্বকালে গোমেধযজ্ঞ প্রচলিত ছিল; কিন্তু কলির প্রারম্ভ অবধি গোহত্যা উৎকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আরব দেশের লোক উষ্ট্রের প্রতি ও গ্রীন্‌লণ্ড প্রভৃতি দ্বীপের লোক রেন্‌-ডিয়ারের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ করিয়া থাকে। যদি কেহ অকারণে ঐ সকল পশুকে উৎপীড়ন করে, কিম্বা প্রাণে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে, তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়।

আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা প্রয়োজন বুঝিয়া পশু ও পক্ষিহননের বিধান করিয়া দিয়াছেন। হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রে ছাগ ও কুক্কুটমাংস রোগীর পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। রোগীর পক্ষে ঐ মাংস বিধান আছে বলিয়া প্রায় সকল রোগীই আগ্রহ পূর্ব্বক কুক্কুট মাংস আহার করিয়া থাকে। অন্যান্য প্রাণীর মাংস অপেক্ষা কুক্কুট মাংসই উপাদেয় ও পুষ্টিকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কুক্কুট, ছাগ ও মেষ মাংস পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোকই আহার করিয়া থাকে, সেই জন্য পৃথিবীতে প্রত্যহ ক্রোটি কোটি পরিমাণে উক্ত তিন প্রকার জীবের প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে; তথাচ, কোন অংশে তাহাদিগের সংখ্যা হ্রাস হয় না। যদি ঐ সকল প্রাণিহননে মনুষ্য মাত্রেই বিরত থাকিত, তাহা হইলে, ছাগ মেষ ও কুক্কুট প্রভৃতিতে পৃথিবী পূরিয়া যাইত।

সংসারের সামঞ্জস্যের জন্যই ঈশ্বর প্রাণিমাত্রকেই জিঘাংসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। দেখ,

জলচর কুম্ভীরগণ স্থলে উঠিয়া এক কালে বহু সংখ্যক ডিম্ব প্রসব করে; সেই সকল ডিম্ব হইতে যদি শাবক নির্গত হইত এবং তাহারা নিরাপদে যদি জলমধ্যে আশ্রয় পাইত, তাহা হইলে, জলচর মৎস্যগণ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইত। সুতরাং আহারের অপ্রতুল জন্য, কুম্ভীরেরা স্থলে উঠিয়া স্থলচরদিগের প্রাণবধ করিয়া বেড়াইত; কিন্তু ঈশ্বরের কি চমৎকার কৌশল! কুম্ভীরেরা স্থলে ডিম্ব প্রসব করিয়া জলে প্রবেশ করিলে পর, বেজীরা সেই সকল ডিম্ব উপাদেয় জ্ঞানে আহার করিয়া থাকে; সেই সকল ডিম্বের একটি মাত্র থাকিতে তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করে না। যদি কুম্ভীরেরা এমন কোন স্থানে ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়, যেখানে বেজীর গতিবিধি অসম্ভব, তাহা হইলে, ডিম্বগুলি শাবকে পরিণত হইলেই, বহুসংখ্যক চিল পড়িয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে থাকে। শৃগাল ও বন্য বিড়ালেরাও কুম্ভীরশাবক হননে বিলক্ষণ পটু, ইহা স্বচক্ষে ঈক্ষণ করা গিয়াছে। কুম্ভীরশাবকগণ এই চারি প্রকার শত্রুর হস্ত হইতে দুই একটি নিস্তার লাভ করে মাত্র। পরে তাহারাই ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে ও মীনকুলের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। হীনবল জীবকে সবল জীবেরা হনন করিয়া ভক্ষণ করিবে, সেই জন্যই তাহাদিগকে ঈশ্বর জিঘাংসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কার্য্যগতিকে বন্যপথ দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে শার্দ্দূলের ভীষণ গর্জ্জন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি প্রাণভয়ে একটি নিবিড় পল্লবাবৃত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আত্ম

গোপন করিলেন। সেই অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিতেছেন, হঠাৎ দৃষ্ট হইল যে, বৃক্ষতলে একটি ভেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ধরিয়া ভক্ষণ করিতেছে। সেই ভেকের প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া মনোমধ্যে কতরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, ভেক হইতে দশ হস্ত অন্তরে একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে ভেককে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ আবার দেখিলেন যে, কিয়দ্দূরে একটি ময়ূর ক্রোধে স্ফীত হইয়া ঐ সর্পকে সংহার করিতে আসিতেছে। ময়ূরের পশ্চাতে একটি শৃগাল বিড়ালের ন্যায় ঘুটি মারিয়া উপবিষ্ট আছে। তৎপরে দেখিলেন যে, যে শার্দ্দূলের গর্জ্জন ধ্বনি শুনিয়া বৃক্ষে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া আছেন, সেই শার্দ্দূল শৃগালের উপর লম্ফ প্রদান করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এই শ্রেণীবদ্ধ জীবগণ আপন আপন আহারের উদ্যোগে আছে। দৃষ্টি করিয়া পণ্ডিতবর একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং ব্যাঘ্রের ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মৃতবৎ বসিয়া আছেন ; এমন সময়ে দুই জন শীকারী বন্দুকের গুলি মারিয়া শার্দ্দূলের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। অন্যান্য প্রাণিগণ যাহারা শীকারোন্মুখ হইয়া বসিয়াছিল, তাহারা বন্দুকের শব্দে কে কোথায় পলায়ন করিল। কেবল বন্দুকের শব্দে ভেকটি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না, পূর্ব্বের ন্যায় ঐ বৃক্ষতলে কীট ভক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি শীকারীদিগের সাহসে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কি ব্যাঘ্রের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাক ?' তাহারা কহিল. 'না' আমরা ইহার মাংস ভক্ষণ করি না ; এই পশুর চর্ম্ম, নখ ও দন্ত বিক্রয় করিয়া স্ত্রীপুত্রপরিবার-

G. D. HAZRA & BRUTHERS
PHARMACY
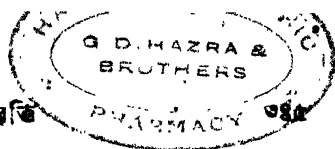
বর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করি।' এই কথা বলিয়া তাহারা ব্যাঘ্রের পশ্চাতের দুই পদে রজ্জু বন্ধন করিল এবং বন্য পথ দিয়া আপনাদিগের কুটীরাভিমুখে টানিয়া লইয়া চলিল, নিরুদ্বেগে আমিও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। গমনকালে মনে মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে, ঈশ্বর প্রাণি-মাত্রকেই জিঘাংসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। অদ্য বনস্থলীতে ইহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইলাম। ভেক হইতে শিকারিদ্বয় পর্য্যন্ত শিকারোন্মুখ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শিকারিদ্বয়ই কৃতকার্য্য হইল। ইহারা শার্দ্দূল হনন করিয়া দুইটি মহৎ কার্য্য সমাধা করিয়াছে। প্রথমতঃ, দুর্দ্দান্ত হিংস্র পশুর প্রাণ বধ করিয়া এই বন্য পথের পথিকগণের উপকার সাধন, দ্বিতীয়তঃ, এই শার্দ্দূলের চর্ম্ম নখাদি বিক্রয় করিয়া আপনার ও আত্মপরিবার-গণের অন্নের সংস্থান করিয়া লইল। আরও দেখ, যাহাদিগের শার্দ্দূলের চর্ম্ম কিম্বা নখ দন্তের প্রয়োজন, তাহারাও গৃহে বসিয়া কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে ঐ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য অনায়াসে প্রাপ্ত হইল। তবে উৎকৃষ্টই হউক বা অপ-কৃষ্টই হউক, ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যদি আমরা সামঞ্জস্য রাখিয়া সেই সকল বৃত্তির চালনা করি, তাহা হইলে, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট সকল বৃত্তি হইতে বিশিষ্ট বিধানে উপকার প্রাপ্ত হই, তাহাতে আর সংশয় নাই।

এই জিঘাংসা বৃত্তি দ্বারা অনেক স্থলে সংসারের অপকার ঘটিতেছে, এটিও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কতকগুলি লোকের জিঘাংসা বৃত্তির প্রাবল্য হেতু নির্দ্দয় লোকেরা সামান্য ধনের

জন্য অনায়াসে নর নারীর প্রাণ বধ করিয়া থাকে। তাহাদিগের ঐ বৃত্তি এত দূর প্রবল যে, সামান্য ধনের জন্য অনায়াসে এক জনের কণ্ঠদেশে ছুরি বসাইতে পারে, তাহাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। কেহ বলিতে পারেন, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহারা এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; যখন আমরা পীড়িত ব্যক্তির সুপথ্য বিধানের জন্য অনায়াসে একটা হৃষ্ট পুষ্ট ছাগ শাবকের কণ্ঠচ্ছেদন করিতে পারি, তখন তাহারা আত্মীয় পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য এক জিঘাংসা বৃত্তির সহায়তায় নরহত্যা না করিবে কেন? যদি জীব হননে দুরদৃষ্ট ঘটে, তাহা হইলে, ঐ নরহন্তা ও ছাগ শাবকহন্তা এই উভয়েরই সমান দুরদৃষ্ট না ঘটিবে কেন? আপনার সন্তান সন্ততির মঙ্গল কামনায় পুরাকালের হিন্দুরাজগণ দেব দেবীর মন্দিরে নরবলি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। রাজ্যলোভে ও ধনলোভে মত্ত হইয়া রাজ্যেশ্বরেরা অদ্যাপিও শত সহস্র লোকের প্রাণ বধ করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা কি দস্যুগণ অপেক্ষা অধিক পাপী নহেন? যুদ্ধস্থলে নরহত্যা করিলে, সে অপরাধ অপরাধের মধ্যেই গণ্য হয় না। যদি এক জন তস্কর নিতান্ত অর্থের প্রয়োজন জন্য একটি মাত্র মনুষ্যের প্রাণ বিনষ্ট করে, তাহা হইলে, তাহাকে প্রাণিবধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য আপনার প্রাণ দিতে হয়; কিন্তু রাজ্যেশ্বরেরা আপন লোভ রিপুকে চরিতার্থ করিবার জন্য সহস্র সহস্র প্রাণীর প্রাণ বধ করিয়া যদি সমরে জয়ী হইতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার সুখ্যাতির আর পরিসীমা থাকে না। এরূপ মহাপ্রাণিহত্যা করিয়াও ধর্ম্মশাস্ত্র মতে কোন অংশে নৃপতিরা দোষী নহেন; কারণ সম্মুখ সংগ্রামে দেহত্যাগ করা অনেকে শ্লাঘা বলিয়া গণ্য

করিয়া থাকেন। যুদ্ধবিগ্রহে বহু সংখ্যক লোক মৃত হয়, অনেকে এইটি ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করেন। যদি সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি একাল পর্য্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহে লোক না মরিত, তাহা হইলে, সংসারে মনুষ্যের স্থান হওয়া ভার হইয়া উঠিত; এই জন্য যুদ্ধে প্রাণিহত্যা অপরাধের মধ্যে গণ্য হয় না। যাহারা রাজনিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া লোভের বশবর্ত্তী হইয়া লোকের প্রাণ বধ করে, সকল দেশের রাজনিয়মে তাহাদিগকে নরহন্তা বলিয়া দণ্ডিত হইতে হয়।

উপসংহারে বলা যাইতেছে যে, সবল প্রাণীরা দুর্ব্বল প্রাণীকে হত্যা করিয়া আহার করিবে ও প্রাণিগণের অগ্রগণ্য মনুজকুল ভুজবলে দুর্ব্বল জাতির উপর প্রভুত্ব করিবে, এ সমস্তই ঈশ্বরাভিপ্রেত। যদি প্রাণিমাত্রেরই জিঘাংসা বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে, আহারাভাবে কাহারও প্রাণ থাকিত না। স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, ক্ষুধায় কাতর হইয়া বিড়ালী আপন শাবকগুলিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। যে সময় জর্ম্মন সৈন্য পারিসের চতুষ্পার্শ্ব অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল, সে সময় ফরাসিরা অন্য কিছু খাদ্য দ্রব্য না পাইয়া বহুমূল্যের ঘোটকগুলির প্রাণসংহার করিয়া তাহাদিগের মাংস ভোজন করিয়াছিল। সেই বিপদের সময় পারিসের সামান্য লোকেরা ইন্দুরের মাংস পর্য্যন্ত উপাদেয় খাদ্য জ্ঞান করিত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ শ্রেণীর ঘোর অসভ্য জাতিরা নরমাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে। তবেই জীবের জীবন রক্ষার জন্যই সংসারে অসংখ্য জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জীবকে হনন করিয়া যাহারা আত্মজীবন রক্ষা করিতেছে, তাহারা কেন মোক্ষই

ঈশ্বরের নিকট অপরাধী নহে। ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে জীব ভক্ষণ করাইয়া জীবের জীবন রক্ষা করেন, এ প্রশ্নের উত্তর তিনি ভিন্ন আর কেহই দিতে পারে না। জিঘাংসাবৃত্তি জীবমাত্রেরই জীবন-রক্ষার প্রধান উপায়। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাণী প্রাণীহনন করে না, উদ্ভিদাদি খাইয়া জীবন রক্ষা করে; তথাপি যখন জল ব্যতিরেকে জীবন রক্ষা হয় না, তখন সেই জলই জীবে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

জুগোপিষা—এই বৃত্তি আমাদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। সকল মনোবৃত্তিরই দুই একটি সহচর বা উত্তেজক আছে। যেমন জিঘাংসাবৃত্তির উত্তেজক ক্রোধ, সেইরূপ জুগোপিষা বৃত্তির প্রধান সহচর লজ্জা ও ভয়। এক্ষণে দেখিতে হইবে, জুগোপিষা বৃত্তির প্রকৃত পরিভাষা কি হইতে পারে? লজ্জা ও ভয়প্রযুক্ত আমরা অন্যের নিকট কোন বিষয় গোপন করিতে যে ইচ্ছা করি, তাহাকেই জুগোপিষা কহে। যদি সংসারের লোকের এই বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে, সমস্ত সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত। গোপন করিবার ইচ্ছা যে কেবল মনুষ্যের আছে, এরূপ নহে, স্বয়ং ঈশ্বরও কতকগুলি বিষয় আমা-দিগের নিকট চিরকালের জন্য গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। অন্য কথা কি, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সর্ব্ব বিধায় স্বয়ং গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কে? তাঁহার কিরূপ আকার? তিনি স্ত্রী কি পুরুষ? তিনি কোথায় অবস্থান করেন? এই সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য তার্কিক পণ্ডিতেরা নানা তর্কবিতর্ক করিতেছেন; কিন্তু একাল পর্যন্ত সেই গুপ্ত ঈশ্বরকে কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। স্বর্গ ও নরক এই দুইটি

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

স্থানও সর্ব্ব বিধায় আমাদিগের নিকট গোপন করা রহিয়াছে। কোথায় নরক, কোথায় স্বর্গ, তাহা একাল পর্য্যন্ত মনুজকুল নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তথাচ স্বর্গলাভের জন্য ক্ষুদ্র ভদ্র মনুষ্যমাত্রেই পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে। দুর্জ্জনেরা নরকের ভয়ে কখন না কখন অবশ্যই সঙ্কুচিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঈশ্বর গুপ্ত এবং স্বর্গ ও নরক গুপ্ত, ইহার তাৎপর্য্য কি? ঈশ্বর যদি প্রকাশ্য ভাবে কোন স্থানে অবস্থান করিতেন ও আমরা যদি অক্লেশে তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতে পারিতাম এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপন আপন প্রার্থনা তাঁহার জ্ঞান গোচর করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, মনুজকুলের দৌরাত্ম্যে ঈশ্বরকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। আমাদিগের আবেদন শুনিতে শুনিতেই তাঁহার কাল কাটিয়া যাইত। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইতেন না। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে আছেন, অথচ সৃষ্টিকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বদা আমাদিগের প্রার্থনা শুনিতেছেন এবং যাহার প্রতি যেরূপ কৃপা ও দণ্ড বিধান করা উচিত, তাহাও করিতেছেন; কিন্তু কোন অংশে বিরক্ত হইতেছেন না। ভবেই ঈশ্বর প্রকাশ্য ভাবে না থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকাতে জগতের বিশেষ উপকার সাধন হইতেছে।

যদি নরক ও স্বর্গ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত, তাহা হইলে, স্বর্গের সুখ দেখিয়া সকলেই সেই সুখ লাভের জন্য একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত, ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধনে কেহই মনোনিবেশ করিত না। আমরা যদি স্বচক্ষে ভ্রষ্টমতি দুরাচারগণের নরকভোগ দৃষ্টি করিতে পাইতাম, তাহা

হইলে, এই মায়াময় সংসারে পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণের জন্য কখনই শশব্যস্ত হইয়া বেড়াইতাম না। কিসে নরক-ভোগ না হয়, সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতাম; কিন্তু স্বর্গ ও নরক আমাদিগের দৃষ্টির অগোচর বলিয়া আমরা অকুতোভয়ে সাংসারিক কার্য্যে বিব্রত হইয়াছি, সর্ব্বদা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য করিতেছি, ধন অর্জ্জনের সময় ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছি না। আবার কিঞ্চিৎ অর্থবল হইলে, পুণ্য-কার্য্যেও ত্রুটি করিতেছি না। যাহাতে নরকভোগ না হয়, তাহারও পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। তবেই ঈশ্বর এবং স্বর্গ ও নরক গোপন থাকাতে আমরা স্বাধীনভাবে ও স্বভাবদত্ত বুদ্ধি অনুসারে সাংসারিক কার্য্য সমাধা করিয়া বেড়াইতেছি; ইহাতেই সংসারের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ঈশ্বর এবং স্বর্গ ও নরক প্রত্যক্ষ থাকিলে কখনই এরূপ হইত না।

ভবিষ্যৎও সর্ব্ব বিধায় আমাদিগের নিকট গোপন রহিয়াছে। যদি ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে, মনুজকুলের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকিত না। বোধ কর, কোন ব্যক্তি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইবে, তাহার জনক জননী ও সে স্বয়ং এই ভবিষ্যদ্বিষয় অবগত হইল। যখন মাতা পিতা আপন আপন সন্তানগণের আশীর্ব্বাদকালে দুই শত বর্ষ পরমায়ু উল্লেখ করিয়াও সন্তুষ্ট হন না; যখন পুত্র পঁয়ত্রিশ বর্ষ বয়ঃ-ক্রমকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে, ভবিষ্যৎ পুস্তকে ইহা দৃঢ় করিয়া লিখিত হইয়াছে, জানিতে পারিলেন, তখন ঐ পঁয়-ত্রিশ বৎসর কাল কি অবস্থায় তাঁহারা যাপন করিবেন, ইহা এক

বার ভাবিয়া দেখা উচিত। তাঁহাদিগের পুত্রটি যখন জানিতে পারিল যে, আমি অতি অল্প কালের জন্য এই জগতে অবস্থান করিতে আসিয়াছি, তখন কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জ্জনের প্রয়োজন কি? পঞ্চবিংশতি বর্ষ উৎকট পরিশ্রম না করিলে, বিশিষ্টরূপে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারিব না; তাহার পর দশ বৎসরমাত্র তাহার ফলভোগী হইব। এই অল্প কালের জন্য গুরু পরিশ্রমের প্রয়োজন কি। বিশেষতঃ, মৃত্যুকাল যত নিকট বোধ হইবে, ততই মৃত্যুভয়ে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে; বিষয়-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিব না; কেবল দিন গণিয়াই কাল হরণ করিতে হইবে। মৃত্যুর দুই এক বৎসর অবশিষ্ট থাকিতে পরকাল ভাবিয়া ভাবিয়া হয়ত উন্মত্ত হইয়া উঠিব, এইরূপ চিন্তার উদয় হইত। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মহাত্মা দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় অতি অল্প বয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি যদি জানিতে পারিতেন যে, চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই আমাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে, হাইকোর্টের উচ্চ আসন আমি অধিক কাল ভোগ করিতে পাইব না, তাহা হইলে, বাল্যকালে তিনি বিদ্যার্জ্জনে মনোযোগী হইতেন না এবং যৌবনে প্রধানতম ধর্ম্মাধিকরণে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোর অধ্যবসায় সহকারে আপন উচিত কার্য্য নির্ব্বাহে যত্নবান্ হইতেন না। যে দিবস তিনি হাইকোর্টের উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলেন, সে দিন তাঁহার মনে কত আনন্দ, কত আশা ভরসা হইয়াছিল। যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন যে, এ আসনে আমি দুই বৎসরের অধিক কাল বসিতে পাইব না, অতি ত্বরায় উৎকট পীড়ায় প্রপী-

পতিত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তাহা হইলে, তিনি ঐ উচ্চ পদের জন্য কখনই চেষ্টা পাইতেন না এবং দুই বৎসর বিচার কার্য্য করিয়া আপন বিদ্যাবুদ্ধির যে অসামান্য পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশও পারিতেন না। কেন না মরণচিন্তা করিতে করিতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতেন।

এই গ্রন্থের কোন প্রস্তাবে এক জন ফাঁসির অপরাধী দণ্ড পাইবার পূর্ব্ব রজনীতে কিরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, তাহা বাহুল্য রূপে বিবৃত করা গিয়াছে। যদি লোকে নিশ্চয় জানিতে পারিত যে, অমুক দিনে এত ক্ষণের সময় আমার মৃত্যু হইবে, তাহা হইলে, ঐ ফাঁসির অপরাধী এক রজনী যেরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিল, আসন্ন মৃত্যু প্রতীক্ষাকারী ব্যক্তি-বৃন্দ হয় ত সেইরূপ কষ্ট বৎসরাবধি ভোগ করিতে বাধ্য হইত।

যখন স্বভাবের নিয়মে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অনেক বিষয় আমাদিগের চক্ষে গুপ্ত থাকাতে, সংসারের উপকার সাধিত হইতেছে ও সংসার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া চলিতেছে, তখন মনুজকুলের স্বভাবসম্ভূত জুগোপিষা কি জন্য না থাকিবে? শাস্ত্রকারেরাও আমাদিগকে অনেক বিষয় গোপন করিতে পদে পদে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। নীতিজ্ঞেরা লিখিয়াছেন—সংসারে এমন বন্ধু কেহ নাই, যাহার নিকট সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিতে পারা যায়। যদি প্রাণসদৃশ সুহৃদ্ হয়, তথাচ কোন না কোন বিষয় তাহার নিকট সঙ্গোপিত থাকিবেই থাকিবে; তজ্জন্য তাহাকে আমাদি-গের অবিশ্বাস করা হয় না; কারণ কতকগুলি বিষয় আমরা লজ্জা প্রযুক্ত বলিতে পারি না এবং কতকগুলি বিষয় ভয়প্রযুক্ত বলিতে

G. D. HAZRA & BROTHERS
PHARMACY

পারিব না। আর সময়ে সময়ে প্রাণসদৃশ বন্ধুরাও কিয়ৎ কালের জন্য আমাদিগের নিকট অনেক বিষয় গোপন করিয়া রাখিতে বাধ্য হন। বোধ কর, কাহারও সহধর্ম্মিণী পিত্রালয়ে প্রসব করিতে গমন করিয়াছেন। প্রসবকালীন উৎকট যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। এই সংবাদ তাঁহার বন্ধু সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু বন্ধুর নিকটে এই অশুভ সংবাদ সহসা কোন ক্রমেই প্রকাশ করিতে পারিলেন না; কারণ তিনি জানিতেন, তাঁহার বন্ধু আপন সহধর্ম্মিণীকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন; তাহার উপর আবার অচিরকাল মধ্যে পুত্রবতী হইবেন বলিয়া তিনি আনন্দ সাগরে ভাসিতেছিলেন; এমন সময় বজ্রাঘাত তুল্য অশুভ কথা আমি কোন ক্রমেই তাঁহাকে শুনাইতে পারিব না; কারণ একেবারে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইলে, বন্ধুর অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

চিরকাল এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, আপন ধন সকলেই সকলের নিকট গোপন করে। অনেকের বয়ঃক্রম গোপন করার স্বভাব বিলক্ষণ প্রবল। ধন গোপন করিবার বিশেষ কারণ আছে। ধনের প্রতি চিরকাল রাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। অমুকের গৃহে অধিক ধন সঞ্চয় হইয়াছে শুনিলে, দস্যুদল তাহা হরণ করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ধন হরণে আত্মবন্ধুরাও নানা কৌশলজাল বিস্তার করে। অন্য কথা কি, ধনের জন্য স্ত্রী পুত্র পরিবারেরাও ধনস্বামীকে সর্ব্বদা বিরক্ত করিয়া থাকে। যাহার ধন সম্পত্তি থাকে, তাহার প্রতি অকারণ প্রতিবেশীরা বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ

করে। গুরু পুরোহিত অল্পে সন্তুষ্ট হন না; যাচকেরা আসিয়া সর্ব্বদা বিরক্ত করে; সর্ব্বদা ক্রিয়াকাণ্ড না করিলে, সমাজে কৃপণ বলিয়া অপযশের সীমা থাকে না; এই সকল হেতুতে লোকে ধনের প্রকৃত পরিচয় কাহাকেও না দিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহা ভোগ করিতে থাকে। যাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে ধন সঞ্চয় হয়, ধনের সঙ্গে সঙ্গেই জুগোপিষাবৃত্তি প্রবল হইতে থাকে। এই বৃত্তি ধনাঢ্য পরিবারের ভিতর অধিক প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীদিগের গৃহে পিতা মাতা পুত্রের নিকট ধন গোপন করিতেছেন, পুত্র পিতার নিকট ধন গোপন করিতেছেন, ভগ্নী ভ্রাতার নিকট ধন গোপন করিতেছেন। কাহার কি পরিমাণে ধন আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কেহ কাহার নিকট প্রকাশ করেন না।

রাজার রাজ্যশাসন সম্বন্ধে অধিকাংশ বিষয় গোপন রাখিতে হয়। কাবুল যুদ্ধে কি হইতেছে, তাহা সাধারণ প্রজাগণ সর্ব্ব বিধায় যাহাতে জানিতে না পারে, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করেন। কোন দিবসের যুদ্ধে বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হইল। যে পরিমাণে সৈন্য হত হইল, তাহার দশ অংশের একাংশও দূরস্থ শিবিরের সৈন্যগণকে জানিতে দেন না; যেহেতু, অধিক সেনা নাশের সংবাদ পাইলে, শত্রুপক্ষকে বলবান্ বিবেচনায় শিবিরস্থ সৈন্যেরা ভগ্নোৎসাহ হইতে পারে। রাজবর্গের খর্ব্বতা বোধে অনেকে পলায়নপর হইতেও পারে। এই সকল কারণ বশতঃ যুদ্ধক্ষেত্রের অমঙ্গল সমাচার গোপন করিয়া রাখিতে হয়। রাজপ্রতিকূলে কোন ষড়যন্ত্র উপস্থিত হইলে, চক্রান্তকারীরা কত

সাবধানের সহিত কার্য্য করে। যদি ঐ সকল কুচক্র সঙ্গোপন করিবার প্রবৃত্তি না থাকিত, অর্থাৎ লোকের জুগোপিষা বৃত্তি স্বভাব কর্তৃক প্রদত্ত না হইত, তাহা হইলে, দুর্বৃত্ত সিরাজুদ্দৌলার বিনাশ সাধন কখনই হইত না। রোমীয় সিনেটের সদস্যেরা মহাবল পরাক্রান্ত জুলিয়স্ সীজরকে কখনই গুপ্তাঘাতে মারিতে পারিতেন না। সকলে যদি নিজ নিজ মনের কথা প্রকাশ করিয়া বেড়াইত, কোন কথা সঙ্গোপন না রাখিত, তাহা হইলে, প্রত্যহ প্রতি সমাজেই মনোভঙ্গ, দ্বন্দ্ব, কলহ ও হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি হইতে থাকিত। আমি কল্য প্রত্যূষে এক জনের বাটীতে সিল ওয়ারেন্ট করিতে যাইব, সন্ধ্যার পূর্ব্বেও সে বিষয়টি সর্ব্বতোভাবে গোপন করিয়া রাখিলাম। এরূপ গোপন করিবার কারণ কি? যদি প্রতিপক্ষেরা জানিতে পারিয়া তাহাদিগের বিষয় স্থানান্তর করিয়া ফেলে, এই ভয়ে আত্মপরিবারগণের নিকটেও নিতান্ত গুপ্ত বিষয় কেহ অসময়ে প্রকাশ করিতে চাহে না।

এই জুগোপিষা বৃত্তি থাকাতেই আমরা অনেক সময়ে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারি। কোন সময়ে রাজদরবারে একটা উচ্চ পদ শূন্য হইয়াছে, সেই সংবাদটি কেহ না জানিবার পূর্ব্বে আমি জানিতে পারিলাম। আমি যদি মনের কথা সঙ্গোপনে রাখিয়া গোপনে গোপনে উক্ত পদ প্রাপ্তির চেষ্টা পাই, তাহা হইলে, অনেকাংশে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবার উপায় থাকে। যদি পল্লীস্থ সমস্ত লোককে সে সংবাদ অবগত করাইয়া পরে সেই পদ প্রাপ্তির চেষ্টা করি, তাহা হইলে, সেই উচ্চপদ লাভের জন্য নানা লোকে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। আমি যে উপায়ে উক্ত পদ লাভের চেষ্টা

করিতেছিলাম, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনি কৃতকার্য্য হইতে পারে। গোপন ইচ্ছাই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির অমোঘ অস্ত্র।

কেবল মনুষ্যকুল নহে, পশু পক্ষীরাও শত্রুভয়ে আপনাদিগের শাবকগুলিকে সঙ্গোপনে রাখিয়া বর্দ্ধিত করিয়া লয়। সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভূতধাত্রী ধরিত্রী আপন উদর মধ্যে সঙ্গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যেরা ঐ সকল আকরাদির অনুসন্ধান এককালে পাইলে, তাহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা পাইত। কেবল আকরের বিষয় বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। যদি কেহ কোন দুর্ল্লভ বন্য ঔষধ আবিষ্কার করে, তাহার প্রকৃত গুণাগুণ প্রাণসত্ত্বে কেহ কাহাকেও বলিয়া দেয় না। এই সঙ্গোপন করিবার ইচ্ছা মনুষ্য সমাজে প্রবল থাকাতেই অনেকানেক দেশে হিতকর ব্যাপার একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে। তবেই স্বভাব দত্ত জুগোপিষা বৃত্তি থাকাতে ব্যক্তি বিশেষের, পরিবার বিশেষের এবং জাতিবিশেষের উপকার হইতে পারে; কিন্তু জগৎ শুদ্ধ লোকের সমভাবে উপকার হয় না। সত্য ও মূল্যবান্ দ্রব্য আবহমান কাল গোপন করা আছে। বহু কষ্টে ও বহু যত্নে অসত্য হইতে সত্য এবং সামান্য দ্রব্য হইতে বহুমূল্য রত্নের আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সকল বিষয় গোপন করা সভ্য সংসারের বর্ত্তমান কালের অমোঘ অস্ত্র হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্র পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি পুরাকালের লোকের এক্ষণকার লোকের ন্যায় এতদূর গোপন করিবার ইচ্ছা প্রবল ছিল না। দাম্ভিক লোকেরা আপন ঐশ্বর্য্য শত্রু মিত্র সকলকে

দেখাইতে চাহে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, রাজা দুর্য্যোধন আপন সমস্ত বিভব লইয়া দ্বৈত কাননে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে দেখাইতে গিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, যাহারা নির্লজ্জ, গুরুজনের ভয়, সমাজের ভয় এবং রাজশাসনভয় ও পরকালের ভয়—এই সকল ভয়ে ভীত হয় না। আমরা যে সকল বিষয়ের সর্ব্বদা গোপন করিবার চেষ্টা করি, তাহারা অকুতোভয়ে তৎসমুদয় ব্যক্ত করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। মনুজকুলের মধ্যে যাহারা হিতাহিত জ্ঞানহীন, তাহারা প্রায় কোন বিষয় কাহার নিকট গোপন রাখে না; কিন্তু যাহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকে, লজ্জাপ্রযুক্ত হউক, ভয় প্রযুক্ত হউক আর স্বার্থ সাধনের জন্যই হউক, তাহাদিগের কোন কোন বিষয় গোপন করিয়া না রাখিলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা ভার হইয়া উঠে।

দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন রোগী চিকিৎসকের নিকট আপন রোগের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া যায়, তাহাতে তাহার পদে পদে অনিষ্ট ঘটিতে থাকে; কারণ রোগের প্রকৃত অবস্থা না জানিলে চিকিৎসক কি প্রকারে রোগ শান্তি করিবেন। কোন কোন মনুষ্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় গর্হিত কার্য্য করিয়া তাহা মিথ্যাদ্বারা এতদ্দূর আবৃত করিয়া রাখে যে, সেই কারণে অপরাপর লোকের ঘোর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উপকারী বন্ধুর বা উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট আপন দোষ সঙ্গোপন করে, তাহার কুপ্রবৃত্তি কি প্রকারে সংশোধিত হইতে পারে? এক্ষণে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল যে, ইহসংসারে থাকিয়া কোন কোন বিষয় গোপন করিবার নিতান্ত প্রয়োজন; তাহা না হইলে, সংসারে শৃঙ্খলা থাকে না। তবে

যে বিষয় গোপন করিলে আপন বা সাধারণের অনিষ্ট ঘটে, তাহা গোপন করা উচিত নহে।

জিজীবিষা—জীবিত থাকিবার ইচ্ছাকে জিজীবিষা কহে। এই ইচ্ছা মনুষ্যের মনে এত প্রবল কেন, পণ্ডিতেরা তাহার অনেক গুলি কারণ দর্শাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পরকাল অপ্রত্যক্ষ; মরণের পর কোথায় যাইব, কিসে পরিণত হইব, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই; এই জন্য আমরা প্রত্যক্ষ সুখ দুঃখের অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ স্থানে যাইতে ভয় করিয়া থাকি। সেই নিমিত্তই লোক জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে; মরিতে চাহে না। ইহা ভিন্ন আরও একটি চমৎকার উদাহরণ এই—আমরা যদি একটা কদর্য্য স্থানে স্থিত পর্ণকুটীরে দীর্ঘকাল বাস করি: তথাপি অবস্থার উন্নতি বশতঃ উত্তম বাটী প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে গমন করিবার সময় সেই পর্ণ কুটীর পরিত্যাগ করিতেও মনে মহাক্লেশ উপস্থিত হয়। অনেকে পূর্ব্ব আবাস পরিত্যাগ করিবার সময় নয়নাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে নূতন ভবনে প্রবেশ করেন। যখন সামান্য পর্ণকুটীর ত্যাগ করিতে আমাদিগের কষ্ট উপস্থিত হয়, তখন এই দুর্ল্লভ মনুষ্য শরীর দীর্ঘকাল ভোগ করিয়া সহজে পরিত্যাগ করিতে চাহি না। এতদ্ভিন্ন স্ত্রী পুত্র পরিবার, আত্মীয় বন্ধু এবং স্বজাতীয়গণের সহিত বহু কাল একত্র বাসে মনোমধ্যে মহামায়ার আবির্ভাব হয়, সে মায়া পরিত্যাগ করিয়া কেহ মরিতে চাহে না।

সংসারকে সব্যাপার রাখিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগের জীবিত থাকিবার ইচ্ছা দিয়াছেন। যদি আমাদিগের জীবিত থাকিবার ইচ্ছা প্রবল না থাকিত, তাহা হইলে, ভয়ানক পীড়ায় প্রপীড়িত

হইয়া কে কটু, তিক্ত ও কষায় ঔষধ সকল ব্যগ্র হইয়া সেবন করিত? কে একখানা হস্ত কর্ত্তন করিয়াও অবশিষ্ট শরীর রক্ষার জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইত? কে উপযুক্ত প্রিয় পুত্রের বিয়োগে উদরে অন্ন জল দিত? কুষ্ঠরোগে সর্ব্ব শরীর গলিয়া পড়িতেছে, তথাচ গৃহমধ্যে একটি সর্প দেখিলে সে কি প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইত? জন্মান্ধ হইয়াও কেবল জীবন ধারণের জন্য কে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত? মানবজাতির বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা কত দূর প্রবল, অপূর্ব্ব ইতিহাস মহাভারত হইতে তাহার একটি উদাহরণ সঙ্কলন করা যাইতেছে;— গান্ধারীর পুত্রগণ পর্য্যায়ক্রমে ভীমের গদাঘাতে সমরাঙ্গনে শয়ন করিল। অন্ধরাজমহিষী সঞ্জয়মুখে এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শ্রবণে অন্ধ ভর্ত্তা ও বিধবা পুত্রবধূগণে পরিবৃত হইয়া কুরুক্ষেত্রস্থ পাণ্ডবশিবিরে আসিয়া উপস্থিত হন। কোথায় দুর্য্যোধন, কোথায় দুঃশাসন, কোথায় বিকর্ণ, এইরূপ ক্রমান্বয়ে পুত্রগণের নাম করিতে করিতে চীৎকার শব্দে দুর্য্যোধনের মৃত শরীরের পার্শ্বে গিয়া মৃতবৎ পতিত হইয়া রহিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ সহোদর যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুত্রশোকাতুরা গান্ধারীর বদনে সলিল সেচন করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ যোগ শাস্ত্রের কথা কহিয়া গান্ধারীর দিব্য জ্ঞান উদ্রেকের যথোচিত চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি প্রবোধ মানিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন, আমি আর এ পাপ জীবন ক্ষণকাল রাখিতে চাহি না। অনশনে এই দুর্য্যোধনের পার্শ্বে পতিত থাকিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যাবসানে যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয় ও মহাবিজ্ঞ

সঞ্জয় প্রভৃতি সুবলনন্দিনীকে বিস্তর বুঝাইলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে শিবিরে আনিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, আইস, আমরা কিয়ৎ ক্ষণের জন্য শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করি, গান্ধারী দেবী আপাততঃ মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া এই খানে অবস্থিতি করুন; একাকিনী এই শবাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রে কখনই থাকিতে পারিবেন না। মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইলে আপনা আপনিই শিবিরে আসিবেন। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া অবিহিত বোধে যুধিষ্ঠির বিষণ্ণবদনে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রুক্মিণীকান্ত হাস্যবদনে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তুমি এই গবাক্ষের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া গান্ধারীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাক। দেখিও, যেন কোন প্রকারে আত্মঘাতিনী না হন।

এদিকে অন্ধরাজমহিষী দুর্য্যোধনের চিবুক ধরিয়া চীৎকার শব্দে বহু ক্ষণ আর্ত্তনাদ করিলেন। চীৎকার করিতে করিতে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া আসিল। জল পানের জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রের একটি আড়কাটার উপর এক কলস জল রহিয়াছে। সেই জল পান করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু হস্ত বাড়াইয়া পাইলেন না। সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্য্যোধনের মৃত শরীর সেই আড়কাটার নিকট টানিয়া আনিলেন এবং মৃত পুত্রের বক্ষঃস্থলে দাঁড়াইয়া জলের কলস নামাইতে গেলেন; কিন্তু তাহাতে সুবিধা না হওয়ায় দুঃশাসনের মৃত শরীর টানিয়া

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

আনিয়া দুর্য্যোধনের মৃত শরীরের উপর তুলিলেন এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া কলস নামাইতে গেলেন; দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে বিকর্ণের দুই চরণ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আর আপনাকে কষ্ট পাইতে হইবে না, আমি জলের কলস পাড়িয়া দিতেছি। গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে সহসা সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, দেবি! এ বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র লজ্জা করিতে হইবে না, স্বচ্ছন্দে জলপান করিয়া প্রাণ রক্ষা করুন। আত্মার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। সমূহ বিপদে পড়িলে, লোক অগ্রে আপনাকে রক্ষা করিয়া তাহার পর আত্মজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা দেখে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বচক্ষে ঈক্ষণ করুন। এই বলিয়া যদুপতি উত্তপ্ত লৌহ পিঞ্জরের মধ্যে সশাবক একটি বানরীকে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। বানরী উহার মধ্যে কোন খানেই পদ রাখিতে না পারিয়া অবশেষে ক্রোড়স্থ শাবককে নিম্নে ফেলিল ও তাহার উপর বসিয়া স্থিরভাব অবলম্বন করিল। শাবকটি জ্বালায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু বানরী তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও না করিয়া সেই মৃতপ্রায় শাবকের উপরই বসিয়া রহিল। গান্ধারী তদ্দৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, দেবি! আত্মার প্রতি দেহধারীর কতদুর আদর তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। এক্ষণে শোক সম্বরণ করিয়া আমার সহিত শিবিরে চলুন, তথায় স্নানাহার করিলে কিয়ৎ পরিমাণেও শোকের শমতা হইবে। যতক্ষণ আত্মাকে কষ্ট দিবেন, ততক্ষণ পুত্রশোকে আরও কাতর হইবেন। গান্ধারী

শ্রীকৃষ্ণের এই সার কথা শুনিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া শিবিরে উপস্থিত হইলেন। *

জীবন ধারণের ইচ্ছা আমাদিগের সকল অবস্থাতেই থাকে। কেহ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন যে, কেবল ধনবানেরাই ঐশ্বর্য্য ভোগের জন্য দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন। যাহারা নিতান্ত নিঃস্ব—কঠোর পরিশ্রমদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের ইচ্ছা সেরূপ নহে, এ কথা কখনই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কোন সময়ে আমরা একখানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে গমন করিয়াছিলাম, সেই গ্রামের দক্ষিণ ভাগে কতকগুলি দুলে ও বাগ্দি বসবাস করিত। বিলে মৎস্য ধরিয়া, লালফুল ও পদ্মফুল তুলিয়া এবং অন্যান্য শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা বহু কষ্টে তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সেই নীচ জাতীয় কোন ব্যক্তির ক্রোড়ে একটি শিশু সন্তান দেখিলাম। শিশুটি হৃষ্টপুষ্ট ও সবল শরীর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "অহে, এটি কি তোমার পুত্র? ইহাকে কি পরিমাণে দুগ্ধ পান করাইয়া থাক?" সে ব্যক্তি কহিল, "মহাশয়! দুগ্ধ কোথায় পাইব? এ কেবল মাত্র জননীর স্তন্যপান করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি শিশুটি আপনাদিগের সন্তানের ন্যায় গব্যদুগ্ধ পান করিতে পাইত, তাহা হইলে, করভের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার পুত্রটি যেন তেন প্রকারে বাঁচিয়া থাকুক। ইহার পূর্ব্বে আমার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে।"

* বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে, এই বৃত্তান্তটি মহাভারতের মূলে নাই; কিন্তু সুবিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের মুখে শুনা গিয়াছিল বলিয়া উদাহরণ স্থলে গৃহীত হইল।

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

পাঠকগণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, সেই নিঃস্ব ব্যক্তি ভগ্ন-কুটীরে বাস করে এবং বহু কষ্টে উদরান্নের সংস্থান করিয়া লয়। তথাচ, সে আপন সন্তানের দীর্ঘ জীবনের কামনা করিয়া থাকে এবং আপনিও সেই অবস্থায় পরম পরিতুষ্ট আছে। সে যদি এই কথা কহিত, 'মহাশয়! আমাদিগের মরা বাঁচা দুই সমান। যাহারা গুগ্‌লি ও শম্বুক তুলিয়া উদর পোষণ করে, তাহাদিগের এই পাপ জীবনে প্রয়োজন কি?' তাহা হইলে, বুঝিতাম যে, ধনবান্ লোকেরাই বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন, দরিদ্রগণের সে কামনা নাই। অনেকেই কেবল মাত্র মুখে বলিয়া থাকেন—'আর এ পাপ-জীবনের প্রয়োজন নাই, এখন মৃত্যু হইলেই বাঁচি'—এ কথা কেবল কথা মাত্র। ইহার একটি চমৎকার উদাহরণ নিম্নে সঙ্কলন করা গেল।

কোন সময়ে একটি অশীতি বর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা প্রত্যহ নিবিড় অরণ্য মধ্যে কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইত এবং সেই শুষ্ক কাষ্ঠ আঁটি বাঁধিয়া বাজারে বিক্রয় করিত। তদ্দ্বারা বহু কষ্টে তাহার জীবন ধারণোপযোগী অন্নের সংস্থান হইত। এক দিবস বৃদ্ধা অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাষ্ঠ আহরণ করিয়াছে এবং সেইগুলি ক্রমে ক্রমে বনস্থলীর মধ্যবর্ত্তী একটি পরিষ্কার স্থানে আনিয়া আঁটি বাঁধিয়াছে; কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও মস্তকে তুলিতে পারিতেছে না। এই প্রকারে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সেই স্থানে বসিয়া এই প্রকার আর্ত্তনাদ করিতেছিল—"হা বিধাতঃ! আমাকে কি জন্য জীবিত রাখিয়াছ? যম! তুমি আমাকে কি জন্য ভুলিয়া আছ? অদ্যই আমাকে গ্রহণ কর, আর বিলম্ব করিও না।" বৃদ্ধার কাতরোক্তিতে যম মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন—'আমি যম উপস্থিত হইয়াছি, এখন কি করিতে হইবে বল ?' বৃদ্ধা যমের বিকট মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, 'না বাবা, আর কিছুই করিতে হইবে না, আমার এই কাঠের বোঝাটি আমার মাথায় তুলিয়া দাও।' যম তাহাই করিয়া হাস্য করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

ঈশ্বর আমাদিগকে জিজীবিসা বৃত্তি না দিলে, এ সংসারের লোক কখনই এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিত না। যাহাদিগের সুখের লেশ মাত্র নাই, তাহারা হয় ত আত্মনাশ করিয়া ফেলিত; কিন্তু ঈশ্বরের এমনই চমৎকার কৌশল যে, জীব মাত্রেই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার অভিলাষ করে। এক জীবন রক্ষার নিমিত্ত প্রাণি-মাত্রেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে। এমন কি, যাহাতে শত্রুকর্ত্তৃক বিনষ্ট না হয়, এই জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু পক্ষীরাও মনুষ্যের অগম্য স্থানে গিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে; শত্রুর ঘ্রাণ মাত্র পাইলেই স্থানান্তরে পলাইয়া যায়। যে সকল পশু পক্ষী লোকালয়ে বাস করে, তাহারাও প্রাণের ভয়ে নিরাপদ স্থানে থাকিতে সর্ব্বদা অভিলাষ করে। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, জীবের জীবনের প্রতি এরূপ যত্ন না থাকিলে, সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় প্রদত্ত হইত না; যে হেতু, এক মৃত্যু ভয়ই সকল ভয়ের মূলীভূত কারণ। যদি জীব মাত্রেরই সে ভয় না থাকিত, তাহা হইলে, সকল প্রাণীই অকুতোভয়ে পরস্পরের প্রতি প্রতিক্ষণ আক্রমণ করিয়া এই সংসার একে-বারে সুখশূন্য করিয়া ফেলিত।

বুভুক্ষা—এই বৃত্তির সহিত জিজীবিসা বৃত্তির অনেক নৈকট্য সম্বন্ধ আছে; সেই জন্য এক বৃত্তি অন্য বৃত্তিকে সর্ব্বক্ষণ পোষ-

ক্ষতা করিয়া থাকে। এই দুই বৃত্তিই আত্মপোষক, পরপোষক নহে, এই সকল কথার হেতুবাদ স্থানান্তরে হইবেক। এক্ষণে দেখা যাউক, বুভুক্ষা কাহাকে বলে এবং এই বৃত্তি প্রবল থাকাতে আমাদের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইতেছে? আহার করিবার ইচ্ছার নাম বুভুক্ষা। আহার ব্যতিরেকে জীবন ধারণের আর অন্য উপায় অবধারিত হয় নাই। আমরা যদি অহোরাত্রের মধ্যে কিছুমাত্র আহার না করি, তাহা হইলে, সর্ব্ব শরীর একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, হস্তপদাদির কার্য্য করিবার ক্ষমতা একেবারে কিছুই থাকে না। অন্য কি কথা, যে নিদ্রা আমাদিগের সমূহ দুঃখের সময় বিশেষ সহায়তা করে, অর্থাৎ আমরা নিদ্রাবেশে হৃদয় বিদারক দুঃখ কিছুই অনুভব করিতে পারি না, সেই সর্ব্ব দুঃখহরা নিদ্রাও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ব্যক্তির নয়নে আবির্ভূত হয় না। আমি শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমীর উপবাস করিয়া ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। যদিও অনেকে কহিয়া থাকেন যে, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে আমরা নিদ্রায় বিহ্বল হইয়া পড়ি, এ কথা আমি কখনই বিশ্বাস করি না। ব্রত উপবাস অপেক্ষা আরও একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় যে, রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে যখন অনশন ব্যবস্থা হইয়া থাকে, সেই রুগ্ন ব্যক্তি কি ক্ষুৎপিপাসার জন্য রজনীতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে? তবেই এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উদরে অন্নজল না পড়িলে, আমাদিগের শরীরে সুখের লেশমাত্রও থাকে না। চারি পাঁচ দিবস অনশনে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এই জন্যই স্বভাব আহার করিবার ইচ্ছা জীবদেহে প্রবল করিয়া রাখিয়াছেন। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে, নিশ্চিন্ত ভাবে কেহই বসিয়া থাকিতে পারে না। যে, যে অবস্থার লোক,

সে অগ্রে তদনুরূপ আহারের অনুসন্ধান করে। মনোমত আহারোপযোগী সামগ্রী সংযোগ করিতে না পারিলে, ক্ষুধার আধিক্য বশতঃ কদর্য্য সামগ্রীও রাজা এবং রাজপুত্রেরা আহার করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন্ বীরপুরুষ না চণক চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুধার শান্তি করিয়াছেন ? মৃগয়ার ইচ্ছায় রাজগণ বন প্রবেশ করিলে পর, মৃগয়া পরিশ্রমের সহিত ক্ষুৎপিপাসার সংযোগ হইলে, পদ্মের মৃণাল ভক্ষণ ও নির্ঝরের জল পান করিয়া সমস্ত পরিশ্রমের উপসংহার করেন। রাজপ্রাসাদে বসবাস কালে উপাদেয় আহার সামগ্রীও যাঁহাদিগের রসনায় তিক্ত বলিয়া বোধ হইত, মৃগয়া কালে তাঁহারাও পদ্মের মৃণাল উপাদেয় খাদ্য জ্ঞানে ভোজন করেন।

পাঠকগণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, কেবল এক আহার সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সূর্য্যোদয় হইবা মাত্রই সংসারের প্রাণিপুঞ্জ কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে। পক্ষিগণ সমস্ত রাত্রি নীরবে বৃক্ষশাখায় বসিয়াছিল, অরুণোদয়ের উপক্রমেই আপন আপন কুলায় পরিত্যাগ করিয়া দিগ্দিগন্তে উড়িয়া যাইতেছে। শৃগাল, কুক্কুর, মহিষ, মেষ ও গবাদি পশু রজনী প্রভাত হইবা মাত্র আহার করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। কেহ বা স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ আহারান্বেষণ করিতেছে, আর যাহারা রজ্জুবদ্ধ, তাহারা আপন আপন রবে প্রভুর নিকট আহার প্রার্থনা করিতেছে। রাত্রিচর ব্যতিরেকে জগতের সমস্ত প্রাণীই কতক জলে, কতক স্থলে, কতক নভোমণ্ডলে কেবল একমাত্র আহারের জন্য শশব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে। এতদ্ভিন্ন কি ধনী, কি নির্ধন মানবমণ্ডলই রজনী প্রভাতে সর্ব্বাগ্রেই আহারের আয়োজন করিতেছে।
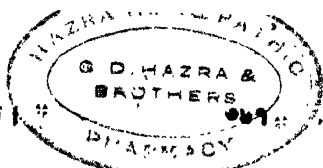
যে, যে অবস্থার লোক, সে সেইরূপে আহারের সংযোগ করিয়া লইতেছে; এই জন্য ঘাটে, মাঠে, বিপণিতে ও পণ্য-বীথিকাতে লোক গতায়াতের পরিসীমা রহিতেছে না। রজনী প্রভাতে প্রাণিগণ এরূপ শশব্যস্ত কেন?—আহারের জন্য। আহারের প্রয়োজন?—আহার না করিলে জীবন রক্ষা হয় না। ভাল, অদ্য না হয়, কল্য আহারের সংযোগ করিয়া লইব, তজ্জন্য এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি?—তাহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। নিয়মিত সময়ে আহার করিতে না পাইলে, কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না; সংসারের অন্যান্য সুখের দিকে নয়ন ফিরিয়াও চাহিবে না; বেশ বিন্যাশ করিতে ইচ্ছা থাকিবেক না; বৈকালে সুসজ্জিত হইয়া শকটারোহণে বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইবার জন্য মন উত্তেজনা করিবে না। কেবল কোথায় অন্ন, কোথায় জল, এই দুই সামগ্রীর জন্য মন প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিবে।

আহা! ঈশ্বরের কি চমৎকার নিয়ম! আমরা জীবন রক্ষার জন্য আহার সংগ্রহার্থে পাছে শৈথিল্য প্রকাশ করি, এই কারণে স্বভাব নিয়ন্তা আমাদিগের শরীরে বুভুক্ষা বৃত্তি এতদূর প্রবল করিয়া দিয়াছেন যে, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে, আমাদিগের হিতাহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। বিগত দুর্ভিক্ষের সময় আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, কেবল এক উদরের জন্য গর্ভ-ধারিণী জননী ক্রোড়স্থ শিশু সন্তান বিক্রয় করিয়াছে; কুল-কামিনীরা নীচ জাতির অন্ন ভোজন করিয়াছে। যদি উদ-রের জ্বালা সহ্য করিতে পারিত, তাহা হইলে, সেই ভয়ানক দুর্ভিক্ষ কালে কেহই গৃহ ত্যাগ করিত না এবং একেবারে স্নেহ মমতা

বহীন হইয়া আপনাদিগের সন্তান সন্ততি বিক্রয় করিত না; সকলেই গৃহে বসিয়া শুভকালের প্রতীক্ষা করিত; কিন্তু উদরের জ্বালা ধরিলে, কাহারও স্থির হইয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই—যে প্রকারেই হউক, আহারান্বেষণ করিতে হইবেই হইবে।

যদি বুভুক্ষা বৃত্তি এতদূর প্রবল না হইত, তাহা হইলে, দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত নরনারীগণ লজ্জা, ভয়, অপমান ও স্নেহমমতা বিহীন হইয়া কেবল জীবন রক্ষার জন্য দীন বেশে দেশে দেশে বেড়াইয়া আত্মরক্ষা করিত না। বুভুক্ষা বৃত্তি প্রবল না থাকিলে, কে কাহার আরাধনা করিত? কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিত? কে লাঞ্ছনার সহিত পরান্ন ভোজন করিয়া জীবন রক্ষায় যত্নশীল হইত? কে পোতারোহণে অগাধ জলধি জলে ভাসিয়া বাণিজ্যার্থে এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন করিত? অতি স্বল্প বেতনের জন্য সম্মুখ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া কে সমরাঙ্গনে শয়ন করিত? এক উদরই আমাদিগকে নানা পথের পথিক করে। আমরা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যে পথের পথিক হই না কেন, কোন পথেই বুভুক্ষা বৃত্তির হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারিব না। যাঁহারা নিবিড় অরণ্যে গিয়া অবিরত ধ্যান ধরিয়া বসিয়া আছেন—লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধাদি সমস্ত রিপুকেই আয়ত্তে আনিয়া সংসারের সমস্ত সুখেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তাঁহারাও যথা কালে একবার বুভুক্ষা বৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়া থাকেন।

আমাদিগকে যদি আহার করিতে না হইত, তাহা হইলে, অর্জ্জনের জন্য কেহই এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইত না। পাছে ভবিষ্যতে উদারন্নের ব্যাঘাত ঘটে, এই জন্যই আমরা

ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকি; পাছে কর্ম্মচ্যুত হইয়া অন্নকষ্ট পাই, সেই কারণেই প্রভুর তাড়না সহ্য করি। এক বুভুক্ষা বৃত্তিই আবার আমাদিগের অনেক মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া রাখিয়াছে। উদরের ভয়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা অনেক বিষয়ে বিরত হইয়া থাকি। যাহাদিগের আয় অল্প, তাহারা উদরের জন্যই বিলাসী হইতে পারে না। অপব্যয়ে বিরত হইয়া থাকে, প্রভু তাড়না করিলে ক্রোধের আবির্ভাব হয়; কিন্তু উদরের জন্য সে তাড়না সহ্য করিয়া থাকে। মনুষ্যের মনে যত চিন্তার আবির্ভাব হয়, তন্মধ্যে অন্ন চিন্তাই সর্ব্বোপরি। যদি অন্নের ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে, সংসারের লোক সর্ব্ব বিধায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িত, কেহ কাহারও সহিত এক্ষণকার মত বাধ্য বাধকতা রাখিত না।

এই বুভুক্ষা বৃত্তি সর্ব্ব বিধায় আমাদিগের ইষ্টকর; কিন্তু মনুষ্য দুর্ব্বুদ্ধির দোষে সেই ইষ্টকর বৃত্তিকেও অনিষ্টের কারণ করিয়া তুলে। সিদ্ধান্ন আহার করিলেই জীবন রক্ষা হয়, কদলী পত্রে সেই অন্ন পরিবেশন করিয়া লইলেও চলিতে পারে। সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন ও দধি দুগ্ধ ভোজন করিলেই শরীর রক্ষা হয়, অথাচ আমরা এক আহার সম্বন্ধে কতদুর অপব্যয়ী হইয়াছি, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। কদলী পত্রের বিনিময়ে অনেক লোক স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে ভোজন করিয়া থাকে। এক সের তণ্ডুলের পলান্ন প্রস্তুত করিতে দশ মুদ্রা ব্যয় হয়। যে সকল দ্রব্য সামগ্রী উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়, অনভিজ্ঞতা বশতঃ উপাদেয় জ্ঞানে আমরা তাহাই ক্রয় করিতে যাই। এদেশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী আহার করিতে নিষেধ আছে, জেতৃ

জাতিরা সেই সকল সামগ্রী আহার করেন বলিয়া আমরা শাস্ত্রের কথা অগ্রাহ্য করি এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া সেই সকল দ্রব্য ভোজনে রুগ্ন হইয়া পড়ি। সুরা জীবন রক্ষার উপযোগী সামগ্রী নহে, পান করিলে কিয়ৎক্ষণ মনের তৃপ্তি হয় এই মাত্র; সেই জন্য আমরা উচ্চ মূল্যে সুরা ক্রয় করিয়া অজস্র পান করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় ও দেহক্ষেত্র নানা রোগের আবাস ভূমি হইয়া উঠে। ক্ষুধা হইলেই আহারের ইচ্ছা জন্মে, তাহা বলিয়া সে আহার অভক্ষ্য ভক্ষণ বা অপেয় পান নহে। পরিমিত রূপে অন্ন ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলেই জীবন রক্ষা হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আহার সামগ্রী নিরূপিত আছে, যে দেশের লোকের যে দ্রব্য আহার করা প্রয়োজন, স্বভাব পরিমিতাচারে সেই দ্রব্য সেই স্থানেই উৎপাদন করান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও ভারতবর্ষের আধুনিক সভ্য সম্প্রদায়ীরা বিদেশীয়গণের আহারোপযোগী দ্রব্যে লালসা করিয়া থাকেন। এ সকল প্রবৃত্তি বুভুক্ষা বৃত্তি হইতে উদয় হয় না, স্বভাব-দোষ ও সঙ্গদোষই তাহার মূল কারণ।

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই দেশের রীতি অনুসারে পরিমিত ভোজনে পরিতুষ্ট হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, এই জন্যই ঈশ্বর আমাদিগকে বুভুক্ষা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যে বৃত্তি প্রাণ রক্ষার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই যেন প্রাণনাশ, ধননাশ, মাননাশ ও পরিশেষে সর্ব্বনাশের কারণ না হইয়া উঠে।

অপত্যস্নেহ—সন্তানাদির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের নাম

G. D. HAZRA &
BROTHERS
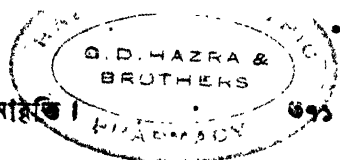
অপত্যস্নেহ। অভিধানে স্নেহ শব্দের অর্থ তৈল; কিম্বা তৈলের ন্যায় তরল পদার্থ। তরল পদার্থ যেমন মৃত্তিকার উপর ঢালিয়া দিলে, যে দিকে নিম্নতল পায়, সেই দিকে ধাবিত হয়, আন্তরিক স্নেহও সেইরূপ। আমরা ঈশ্বরকে স্নেহ করিতে পারি না, অন্যান্য গুরুজনও স্নেহের পাত্র নহে, তাঁহাদিগের প্রতি যে অকৃত্রিম মনের অনুরাগ প্রকাশ করি, তাহার নাম ভক্তি। সন্তান সন্ততির প্রতি যে অনুরাগ তাহার নাম স্নেহ। কেবল ঔরসজাত বা গর্ভজাত সন্তান সন্ততির প্রতি নর নারীরা স্নেহ করে, এমত নহে, যাহাকে দীর্ঘকাল প্রতিপালন করা যায়, তাহার প্রতিও অকৃত্রিম স্নেহের সঞ্চার হয়। কেবল মনুষ্যের প্রতি কেন, যদি কোন পশু পক্ষীকে দীর্ঘকাল প্রতিপালন করি, তাহা হইলে, তাহাদিগকেও স্নেহ বশতঃ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তবে জননীর মুখে গল্প শুনিয়াছি যে, গর্ভজ সন্তান সন্ততির প্রতি নারীগণের যতদূর স্নেহ হয়, পরের সন্তান লইয়া লালন পালন করিলে, তাহাদিগের প্রতি ততদূর হইবার সম্ভাবনা নাই। পৌষ্যপুত্রের বিয়োগজনিত শোক সহ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু গর্ভজ সন্তান সন্ততির বিয়োগে মজ্জার ভিতর পর্য্যন্ত জ্বলিতে থাকে।

এক্ষণে আমাদিগের অপত্যস্নেহের প্রস্তাব হইতেছে; সেই জন্য স্নেহ শব্দের হেতুবাদ পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক অপত্যস্নেহের উপরেই প্রস্তাব লিখিতেছি। অপত্যের উপর অকৃত্রিম স্নেহ আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি। যখন সন্তান গর্ভে থাকে, তখন গর্ভধারিণী আপন গর্ভের প্রতি বিশেষ স্নেহ মমতা প্রকাশ করেন না, তবে যাহাতে গর্ভ নষ্ট না হয়, সেই জন্য আপন শরীরকে সর্ব্বতোভাবে সাবধানে রাখেন। গর্ভস্থ সন্তানের পিতা গর্ভিণী

স্ত্রীর প্রতি গর্ভাবস্থায় বিশেষ যত্ন করেন। সেই গর্ভে সন্তান আছে বলিয়া সন্তানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ কে করিয়া থাকে ? কিন্তু পুত্র বা কন্যা গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই তাহাদিগের বদন দর্শন করিয়া জননীর মন স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠে। সন্তানের প্রতি যত মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করেন, ততই স্নেহের সাগর উথলিয়া উঠে। আবার ভূমিষ্ঠ সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলে, সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ হয় ; দৃষ্টিসুখের পর স্পর্শসুখ অনুভূত হইয়া জননীর মন পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। ক্রোড়স্থ শিশুকে আর ভূতলে নামাইবার ইচ্ছা করে না। আহা! করুণাময় ঈশ্বরের কি চমৎকার সৃষ্টি কৌশল! তিনি যদি জননীর মনে এত দূর স্নেহের সঞ্চার করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে, হয়ত প্রসূতি আপনা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইতেন, প্রসব বেদনায় বর্ণনাতীত কষ্টভোগ করিয়াছি বলিয়া কিয়ৎক্ষণ শয্যায় পড়িয়া শরীরকে সুস্থ করিতেন ; কিন্তু জননীর মন সেরূপ নহে। যদিও সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, শরীর পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইবে এরূপ আশাও ছিল না ; কিন্তু গর্ভজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই সূতিকাগারে রমণীকুল যদি একবার উলুধ্বনি দিল, কি শঙ্খধ্বনি করিল, সেই সুমধুর ধ্বনি প্রসূতির কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই সুসন্তান হইয়াছে, এই অনুমানে সমস্ত যন্ত্রণা এককালে বিস্মৃত হইয়া যান। আবার পুত্রের বদন নিরীক্ষণ করিলে, সেই ভগ্ন শরীরও দ্বিগুণ বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। অনেক প্রসূতির মুখে গল্প শুনা গিয়াছে যে, প্রসবের পর প্রসূতির কর্ণে কন্যা সন্তান হইল,

এই শব্দ প্রবেশ করিবা মাত্র ক্ষণকালের জন্য মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়; কিন্তু কন্যার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সে বিষাদ ক্ষণপ্রভার ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায়। কন্যাই হউক বা পুত্রই হউক, প্রসবের পর প্রসূতি যখন আপন গর্ভজ সন্তান সন্ততিকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন, তখন কন্যা পুত্রের প্রভেদ কিছুই থাকে না। অন্য কি কথা, যদি বিকৃতাঙ্গ কি অন্ধ সন্তান কোন প্রসূতি প্রসব করেন, তাহাদিগের প্রতিও জননীয় স্নেহ কিছু অংশে ন্যূন বোধ হয় না। জননীর মনে যদি করুণাময় ঈশ্বর এরূপ স্নেহের সঞ্চার না করিয়া দিতেন, তাহা হইলে, অন্ধ খঞ্জ ও বিকৃতাঙ্গ সন্তান সন্ততি কোন কালেই বর্দ্ধিত হইত না। প্রসূতির অযত্নে সূতিকাগারেই তাহারা কালের করাল কবল-শায়ী হইত।

কেহ কেহ এরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন যে, সন্তান সন্ততির উপর পিতা অপেক্ষা জননীর স্নেহ অধিক, কারণ জননী দশ মাস দশ দিন তাহাদিগকে বহু কষ্টে উদরে বহন করেন, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রসব করেন এবং আপন শরীরের প্রতি উপেক্ষা করিয়া গর্ভধারিণীরা সন্তানগণকে শৈশবাবস্থায় লালন পালন করেন। আমরা যখন দোলনার উপর শয়ন করিয়া থাকিতাম, ক্ষুধা পাইলে, কেবল এক রোদনের দ্বারা মনের অভিপ্রায় জননীকে বিজ্ঞাপিত করিতাম, জননীর ক্রোড়ে মল মূত্র পরিত্যাগ করিতাম, কোন আন্তরিক কষ্ট উপস্থিত হইলে, কেবল রোদন করিতাম, কথা দ্বারা মনের বেদনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতাম না, তৎকালে জড়-পিণ্ডের সহিত আমাদিগের অতি অল্প মাত্র প্রভেদ ছিল।

যখন এই রূপে সর্ব্ব বিধায় আমরা অক্ষম ছিলাম, আপনার কার্য্য আপনি কিছুই করিতে পারিতাম না, সেই অক্ষম অবস্থায় কেবল স্নেহময়ী জননীই সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যদি অকৃত্রিম স্নেহের সঞ্চার না থাকিত, তাহা হইলে, কোন ক্রমেই আমরা বর্দ্ধিত হইতে পারিতাম না। শৈশবে পিতা সন্তান সন্ততিকে অর্থের দ্বারা সাহায্য করেন সত্য; কিন্তু জননী যেরূপ কষ্ট ভোগ করেন, তাঁহাকে তাহার শতাংশের একাংশও ভোগ করিতে হয় না। আমি পীড়িত হইলে, জননীকে উপবাস করিতে হইত; কেন না, আমি তাঁহার যে স্তনদুগ্ধ পান করি, যদি তিনি অন্নাহার করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সেই স্তনদুগ্ধ পানে আমার অপকার হইবে, এই জন্য আমি রুগ্ন হইলে, জননীকে ঔষধ খাইতে হইত এবং পথ্যাপথ্য বিবেচনা করিয়া লঘু আহারে প্রাণ ধারণ করিতে হইত। জননীই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিন যামিনী আমার শয্যার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিতেন। আমার রোগের বৃদ্ধি হইলে, তাঁহার আন্তরিক কষ্টের পরিসীমা থাকিত না আমি কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইলে, তিনি আনন্দিত হইতেন। জননীর মনে যিনি এইরূপ স্নেহের সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিলে কাহার মনে ভক্তিরসের আবির্ভাব না হয়?

প্রসূতির হৃদয়ে যে দেবভাব আছে, যে অবিরত প্রবাহী স্নেহ আছে, যে অনির্ব্বচনীয় সহিষ্ণুতা গুণ আছে, যে এক অনুপম আত্মবিসর্জ্জন আছে, তাহা এক সন্তান লালন পালনেই প্রকাশ পায়। স্নেহময়ী জননী একটি সন্তান লালন পালনে যেরূপ সহিষ্ণুতা গুণের পরিচয় দেন, পিতা তাহার শতাংশের

একাংশও সহ্য করিতে পারেন না। যখন সন্তানের হাস্য বদন দেখেন, তখনই পিতা একবার সন্তান ক্রোড়ে করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য আনন্দ অনুভব করেন ; কিন্তু সন্তানটি যদি রোদন করিতে আরম্ভ করে, কিম্বা ক্রোড়ে মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া দেয়, তাহা হইলে, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রসূতির নিকট পাঠাইয়া দেন। সন্তানের পক্ষে পিতা মাতায় কি প্রভেদ, তাহা বিশেষ রূপে বুঝিবার একটি মাত্র স্থল আছে। বোধ কর, কোন প্রসূতি একটি কিম্বা দুইটি সন্তান রাখিয়া লোকান্তরিত হইলেন, সেই সন্তান দ্বয়ের পিতা একটা সামান্য ভাণ করিয়া যদি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করেন এবং সেই নব দারার গর্ভে দুই একটি সন্তান সন্ততি হয়, তাহা হইলে, সেই পরলোক গত স্ত্রীর গর্ভজ সন্তানগণের প্রতি তত্দূর স্নেহ মমতা করেন না। অন্য কি কথা, যুবতী স্ত্রীর অনুরোধে তাহাদিগকে পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য নানা কৌশলজাল বিস্তার করিতে থাকেন। কেহ কেহ বা সেই সন্তানগণের চরিত্রের প্রতি দোষ দেখাইয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দেন। পক্ষান্তরে যদি সন্তানগণের অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়, তাহা হইলে, প্রসূতির স্নেহ আপন গর্ভজ সন্তান সন্ততির প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। কিসে তাহাদিগের লালন পালন হইবে, কিসে তাহাদিগের বিশিষ্ট বিদ্যালাভ হইবে, এই সকল চিন্তানলে তিনি দিন যামিনী দগ্ধ হইতে থাকেন। প্রসূতির হস্তে যদি পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থ থাকে, কিম্বা কতকগুলি আভরণ থাকে, সন্তান পালনের জন্য তৎসমুদয় একেবারে নিঃশেষ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন না। তবেই জননীর অন্তরে যে দেবভাব লক্ষিত

হয়, পিতার মনে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্তান সম্বন্ধে পিতা ঘোর স্বার্থপর—জননী তাহা নহেন। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই, পিতা উপার্জ্জনক্ষম সন্তানের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জননী অক্ষম পুত্রকে সক্ষম পুত্র অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন। ইহা অপেক্ষা জননীর স্বার্থশূন্য হৃদয়ের আর কি পরিচয় দিতে পারি।

পশু পক্ষীর শাবকগণের পিতার সহিত কোন সংস্রব থাকে না, কেবল একমাত্র জননীর স্নেহতেই তাহারা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। বোধ কর, একটি বিড়ালীর তিন চারিটি শাবক হইয়াছে, সেই সকল শাবকগণের প্রতি কোন কালেই তাহাদিগের পিতা কটাক্ষপাত করে না। কেবল একমাত্র জননীই শাবকগণকে লালন পালন করে। প্রায় এক পক্ষ কাল তাহারা সেই শাবকগুলির জন্য কিরূপ কষ্টভোগ করে, তাহা অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। যদি কোন কারণে সেই শাবকগুলি মরিয়া যায়, তাহা হইলে, সেই বিড়ালী করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে চারিদিকে তাহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। শাবক মরিয়া গেলেও অনেক পশু যতক্ষণ সেই মৃত শাবকের দেহ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগের নিকট বসিয়া থাকে। শুনা গিয়াছে, অনেক জলচর, ভুচর বা খেচরের শাবকগণকে শিকারীরা নিহত করিলে, তাহারা সাধ্যানুসারে আততায়ীর অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে। ইহা চির প্রসিদ্ধ কথা যে, শাবকগণের শত্রু সংহারের জন্য জলহস্তী ও সিন্ধুঘোটকেরা শিকারীর হস্তে নিহত হইয়া থাকে। তাহারা দুই এক বার আহত হইয়াও সন্তান ঘাতক শিকারিগণকে সহজে পরিত্যাগ করে না।

ব্যাঘ্র কিম্বা সিংহের শাবক হরণ করিলে, তাঁহারা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া বহু জনাকীর্ণ নগরের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করে।

প্রসূতির মনে এইরূপ অকৃত্রিম স্নেহের সঞ্চার করিয়া না রাখিলে, জীব মাত্রেই বর্দ্ধিত হইতে পারিত না। করুণাময় ঈশ্বর এই জন্যই জননীর হৃদয়ে স্নেহরসের সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। যদি কোন কালে সাগরের জল শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাও সম্ভব, তথাচ সন্তানের পক্ষে জননীর হৃদয়স্থ স্নেহকূপ কোন কালেই শুষ্ক হইবার নহে। অনেকে অনেকের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন; কিন্তু সে স্নেহের ন্যূনাধিক্য আছে। জননীর হৃদয়ই স্নেহের আকর ভূমি, তাহাতে আর সংশয় নাই। কুসন্তানের প্রতিও কোন কালে প্রসূতি একবারে স্নেহ বিহীন হন না।

স্নেহের আধিক্য বশতঃ পিতা মাতা দ্বারা কখন কখন সন্তানগণের ঘোর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বোধ কর, কোন দম্পতী বহু কাল অপত্য বিহীন হইয়া ছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদিগের একটি পুত্র সন্তান হইল। সেই সন্তানের প্রতি তাঁহারা অতিরেক স্নেহ মমতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পাছে শিক্ষাগুরু প্রহার করেন, এই ভয়ে পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে চাহেন না। একটা ঘোর অনিষ্টকর কার্য্য সাধনের জন্য যদি ছেলেটি আবদার লইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে, পাছে সে অসুস্থ হয়, এই আশঙ্কায় বালকের ইচ্ছানুগত কার্য্য সাধনে কাল বিলম্ব করেন না। জনক জননীর নিকট এইরূপে নিয়মাতীত প্রশ্রয় পাইয়া বালকটি ক্রমে ক্রমে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়

কালে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে, সেই বালক সর্ব্বতোভাবে জনক জননীকে অসুখী করিতে আরম্ভ করে; তথাচ স্নেহের আধিক্য বশতঃ তাঁহারা সন্তানের কুকার্য্যের প্রতিকূলে কোন কথা কহিতে সাহস করেন না। এই জন্যই বলিতেছি যে, কেবল একমাত্র আন্তরিক স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ সন্তানগণের প্রতি নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে কেহ যেন ব্যাঘাত না ঘটান। যদি তাহা করেন, তবে আমরা যে জন্য সন্তান কামনা করিয়া থাকি, তাহার ফল কিছুই হইবে না; কেবল দুগ্ধ দিয়া কালসর্প বর্দ্ধিত করা হইবে মাত্র। কারণ কুপুত্রের অত্যাচার পিতা মাতার পক্ষে কালসর্পের দংশন অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

সাবধানতা—ভাবী অনিষ্ট নিবারণের জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে যে বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার নাম সাবধানতা। এই সংসারে সমূহ সতর্কের সহিত না চলিলে, আমাদিগের পদে পদে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্য, সাবধানতা বৃত্তিকে ঈশ্বর আমাদিগের বিপদ্ নিবারণের বর্ম্ম স্বরূপ করিয়া দিয়াছেন। এই বৃত্তিকে যিনি তাচ্ছল্য করিয়া চলেন, তাঁহার ধন প্রাণ রক্ষা হওয়া দুষ্কর। ভবিষ্যতে আক্ষেপ করিতে না হয়, এই জন্য সকল বিষয়ই সমূহ সাবধানের সহিত সম্পন্ন করা উচিত। যখন সংসার বিপদে পরিপূর্ণ, প্রতি পাদ বিক্ষেপেই বিপদের আশঙ্কা আছে, তখন সতর্ক হইয়া সকল বিষয়েই অগ্রসর হইতে হইবে। অন্য কি কথা, বিপদ্‌পূর্ণ রণক্ষেত্রেও উপযুক্ত সেনা নায়কেরা সমূহ সাবধানতার সহিত সৈন্য চালনা করেন। প্রতিবিধিৎসা বৃত্তির সহিত সাবধানতা বৃত্তির অনেক নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। তবে প্রতিবিধানে ও সাবধানে প্রভেদ এই যে, বিপদে পতিত হইলে,

G. D. MATRA & BROTHERS
PHARMACY

তাহা হইতে উদ্ধারের চেষ্টা দেখা, যে আর অধিক পরিমাণে সে বিপদ্ অগ্রসর হইতে না পারে; কিন্তু যাহাতে একেবারে বিপদ্ উপস্থিত না হয়, পূর্ব্ব হইতে তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখাই সাবধানতার কার্য্য।

আমার জমিদারীর কাছারি বাটীতে অগ্নি লাগিয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই আমার মনে প্রতিবিধিৎসা বৃত্তির সঞ্চার হইল। দ্রুত পদে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, অনল নির্ব্বাণ করিবার আর উপায় নাই। এ সময় কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় দলিলগুলি বাহির করিতে পারিলে, অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। অতএব অনর্থক অনল নির্ব্বাণের চেষ্টায় কোন প্রয়োজন নাই, যাহাতে কাগজ পত্র ও তহবিলাদি বাহির করিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। এই জন্য নিষ্ফল কার্য্যে লোক নিযুক্ত না করিয়া জমিদার মহাশয় যাহাতে কাগজ ও তহবিল বাহির করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা দেখিলেন। বিপদ্ পূর্ণ মাত্রায় দাঁড়াইলে, এইরূপ প্রতিবিধান করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কাছারি বাটীতে কোন কালে অগ্ন্যুৎপাত না ঘটিতে পারে, এই জন্য জমিদার যদি পূর্ব্ব হইতে ঐ কাছারি বাটীটি ইষ্টকে নির্ম্মাণ করিতেন এবং তাহার সম্মুখে কি পশ্চাতে একটি জলাশয় খনন করাইয়া রাখিতেন, তাহা হইলে, সেরূপ কার্য্যকে আমরা পূর্ব্ব সাবধানের কার্য্য বলিয়া ধরিতাম। প্রতিবিধিৎসা অপেক্ষা সাবধানতা দ্বারা আমাদিগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কলিকাতার রাজপথে প্রতিক্ষণ ট্রাম শকট গমনাগমন করিতেছে। পাছে তাহার সম্মুখে পড়িয়া প্রাণে বিনষ্ট হই, এই ভাবিয়া যে ব্যক্তি ফুটপাথ ভিন্ন নিম্নপথে না

চলে, সেই যথার্থ সাবধানী ; কিন্তু যাহার সম্মুখে ট্রাম আসিয়া পড়িয়াছে, আর পলায়নের সময় নাই, এরূপ অবস্থায় যে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া এক লম্ফে শকটে উঠিয়া পড়িল, কিম্বা ঘোটকের গল দেশ জড়াইয়া ধরিল, সে যদিও তৎকালে প্রতিবিধিৎসা বৃত্তির পরিচয় দিল ; তথাচ অবশ্যই সে ব্যক্তি সাধারণের তিরস্কার ভাজন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজপথের লোক মাত্রেই তাহাকে অসাবধান বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকিবে। প্রতিবিধিৎসা ও সাবধানতায় এই মাত্র প্রভেদ দেখা যায়।

এক্ষণে প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক সাবধানতা বৃত্তি কার্য্য কালে আমাদিগের কতদূর প্রয়োজন, নিম্নে তাহাই বর্ণন করিতেছি। কার্য্য গতিকে আমাকে সুন্দর বনের মধ্যবর্ত্তী খাল দিয়া কোন স্থানে যাইতে হইবে। ঐ খালের উভয় পার্শ্ব জঙ্গলে আবৃত বলিয়া ব্যাঘ্রভয় ও দস্যুভয় উভয়ই আছে। অতএব যাহাতে দস্যু কর্ত্তৃক আমার তরণী লুণ্ঠিত না হয় এবং ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক মাল্লা ও মাঝিদিগের প্রাণ বিনষ্ট না হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমার তরী আরোহণ করা উচিত। প্রথমতঃ, দস্যুভয় নিবারণের জন্য. এই উপায় উদ্ভাবন করিলাম যে, কোন জনাকীর্ণ স্থানে যদি দুই এক দিন বসিয়া থাকিতে হয়, তথাচ পাঁচ সাত খানি নৌকা একত্র না হইলে, আমি কখনই ঐ দুর্গম পথের পথিক হইব না। ব্যাঘ্রভয় নিবারণের জন্য দুই এক জন শিকারীকে সমভিব্যাহারে লইব এবং আপনি নৌকার চারি দিক বন্ধ করিয়া ভিতরে বসিয়া থাকিব ; তাহা হইলে, আর কোন বিপদেরই সম্ভাবনা থাকিবে না।

এরূপ পূর্ব্ব সাবধান হইয়া চলিলে, সুন্দর বনের অভ্যন্তরস্থ খালের ভিতর দিয়া গমনাগমন করিবার সময় কাহারও কোন বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। কোন ব্যক্তি কলিকাতায় নূতন আসিয়াছে; রাজধানীর পথ যে বিপদ্পূর্ণ, সে তাহা জানে না। পল্লীগ্রামের রাস্তায় যেরূপ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া চলিত, কলিকাতাতেও সেই ভাবে চলিয়াছে; এমন সময় তাহার সম্মুখে একখানি শকট আসিয়া পড়ায়, ভয়ে কম্পিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। শকট চালক সমূহ সতর্কতার সহিত অশ্বের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিলে, ভূতলশায়ী ব্যক্তি প্রাণে বিনষ্ট হইত। সে প্রাণে বিনষ্ট হইল না সত্য; কিন্তু অসাবধান হইয়া রাজপথে চলিয়া যাওয়ার ফল বিলক্ষণ ফলিয়াছিল। প্রথমতঃ, ভয় প্রযুক্ত ভূতলে পতন; দ্বিতীয়তঃ, শকট চালকের কশাঘাত; তৃতীয়তঃ, রাজপথ বাহী লোকের বিদ্রূপ; এই সকল কারণে সেই অসাবধান লোকের মনে কতদূর কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনায়াসে অনুভব করিতে পারা যায়। স্বভাব দত্ত সাবধানতা বৃত্তিকে অবহেলা করিলে, সময়ে সময়ে আমাদিগকে এতদূর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় যে, তাহা বর্ণনাতীত। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দুর্গা পূজার পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের বহু সংখ্যক লোক কলিকাতায় তৎকালোচিত দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে আসিয়া থাকে। অসাবধানতা বশতঃ গাঁইট কাটার হস্তে তাহাদিগের অনেককেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিয়া গৃহে গমন করিতে হয়। কেহ কেহ একেবারে হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করে। যাহারা নিতান্ত অসাবধানী লোক,

তাহারা বিদেশে গমন করিলে, অপরিচিত লোকের সহিত পথে কথা কহিতে চাহে না, অজানিত বাটীতে সহসা প্রবেশ কিম্বা অপরিচিত দোকানদারের নিকট দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে না। যদি কেহ একেবারে বান্ধব বিহীন দেশে গমন করে, তাহা হইলে, অগ্রে দেশের রীতি নীতি ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিয়া লইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, সহসা তাহার বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

সাবধানতা বৃত্তির সহিত যদি ভীরুতার সংযোগ হয়, তাহা হইলে, মহা অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। কলিকাতার বড়বাজারে গাঁইট কাটার ভয় আছে, সেই জন্য ভীরু সাবধানী ভাবিলেন, কোন কালেই বড়বাজারে প্রবেশ করিব না; রাজপথে শকটাদির ভয় আছে বলিয়া রাজপথে চলিব না; জলে হাঙ্গর কুম্ভীর আছে বলিয়া গঙ্গাস্নান করিব না; উন্নত অট্টালিকায় বাস করিলে, বজ্র-পাতের ভয় আছে বলিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিব; বাণিজ্য কার্য্যে অর্থনাশের ভয় আছে বলিয়া সঞ্চিতার্থ বুকে করিয়া থাকিব; এরূপ সাবধানীকে সাবধানী বলা যায় না, কেবল এক ভীরু বলিয়া তাঁহার নাম করণ হইতে পারে। সংসারে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে বলিয়া কি আমরা একেবারে সমস্ত কার্য্যে বিরত হইব? মরিবার ভয়ে কি বীরপুরুষেরা সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন না? জলমগ্ন হইবার ভয়ে কি তরী আরোহণ করিব না? প্রতারিত হইবার ভয়ে কি পণ্যবীথিকায় গিয়া দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিব না? এরূপ করিলে চলিবে কেন? সাহস ও সাবধানতায় সামঞ্জস্য রাখিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছে,

G. D. HAZRA & BROTHERS PHARMACY

তাহা দেখিয়া কি সকলেই একেবারে ঘোটকারোহণে বিরত হইবে ? না, ঘোটক পৃষ্ঠে আরোহণ করিবে ; কিন্তু সাবধানের সহিত ঘোটক চালনা করা উচিত। দুষ্ট বাজী পৃষ্ঠে কখন আরোহণ না করিলেই, সাবধানের কার্য্য করা হইবে।

সংসারের সকল কার্য্যেই সাবধানের প্রয়োজন আছে ; কিন্তু সে সাবধানতা সম্বন্ধে অবশ্য সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করিয়া লওয়া উচিত। গৃহাভ্যন্তরে সর্প থাকিলেও থাকিতে পারে ; কিন্তু পরিষ্কার দ্বিতল গৃহে সর্প না থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি সাবধানের জন্য লৌহ পিঞ্জরে শয়ন করিয়া থাকে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ ; তাহার দ্বারা বিষয় কার্য্য চলিতে পারে না। কেবল এক সাবধান হইয়াই সর্ব্বদা শশব্যস্ত আছেন, এরূপ লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অম্বালায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ; তজ্জন্য তিনি কলিকাতায় সন্তান সন্ততিগণকে এরারুট খাওয়াইয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন ; এরূপ সাবধান হওয়া আবার নিতান্ত অনভিজ্ঞের কার্য্য। নীতিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন, 'সাবধানের বিনাশ নাই'—এ কথার উপর কাহারও কথা চলে না সত্য ; কিন্তু ন্যায় ও যুক্তি বিহীন হইয়া যিনি সাবধানতা বৃত্তির চালনা করেন, তাঁহাকেও সময়ে সময়ে দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইতে হয়। যাহাতে কোনরূপে স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য পদে পদে আমাদিগের সাবধান হইয়া চলা উচিত। শরীরে শীতল বায়ু না লাগে, এই জন্য আমরা অঙ্গরাখায় অঙ্গ আবরণ করিয়া রাখি। বৃষ্টির জলে ভিজিলে আশু অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সেই জন্য জল শিক্ত পাদুকা বা আর্দ্র বস্ত্র সত্বর পরিত্যাগ করা উচিত। অধিক আর কি লিখিব, শরীর

সম্বন্ধে সমূহ সাবধানের সহিত থাকা কর্ত্তব্য, এই কথা সর্ব্ববাদী সম্মত।

সহানুভূতি—এই মনোবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বরের স্বত্বা বিরাজমান। এই বৃত্তি যে মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থান করে, তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন। মনুষ্যের কি কথা, অনেক দেব চরিত্রেও সহানুভূতির লক্ষণ সকল সময়ে ঈক্ষণ হয় না। পরের সুখ ও দুঃখ দেখিয়া আপন হৃদয়ে সেইরূপ সুখ দুঃখ অনুভব করা সহানুভূতির কার্য্য। এরূপ প্রকৃতির লোক বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার দুর্লভ বলিলেই হয়, তবে প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে, দুই চারিটি পাইতে পারা যায়।

এই বৃত্তি হইতেই দয়ার আবির্ভাব হয়। পুণ্যশ্লোক নল রাজা কলি কর্ত্তৃক কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। কলি যে তাঁহাকে বর্ণনাতীত ক্লেশ দিয়াছিল, মহাভারতান্তর্গত বনপর্ব্বে ও মহা কবি শ্রীহর্ষ প্রণীত নৈষধ চরিতে তাহার সবিশেষ বর্ণন আছে। দীর্ঘকাল পরে ঋতুপর্ণ রাজার মন্ত্র প্রভাবে নলের শরীর হইতে কলি ত্যাগ হয়। নৈষধাধিপতি কলিকে তাঁহার সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শিরশ্ছেদনার্থে খড়্গোত্তলন করিতেছেন, এমন সময়ে কলি সকরুণ স্বরে কহিল, মহারাজ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমার প্রাণ দান করুন। পুণ্যাত্মা নল রাজা তাহাকে প্রাণভয়ে কাতর দেখিয়া ও তাহার করুণা শ্রবণ করিয়া তরবারি কোষ মধ্যে রাখিলেন এবং কহিলেন, আর তোর ভয় নাই, আমি কাতর ব্যক্তিকে কখন বিনষ্ট করিব না, এই কথা বলিয়া কলিকে ছাড়িয়া দিলেন। ইহা অপেক্ষা সহানুভূতির পরিচয় আর

কোথায় পাইব? যে কলির কুটিল মন্ত্রণায় তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া-ছিলেন, যে তাঁহাকে বুদ্ধি হারা করিয়া অনশনে বনে বনে লইয়া বেড়াইয়াছিল, যাহার মায়া প্রভাবে প্রিয়তমা পত্নী দময়ন্তীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, অবশেষে যাহা দ্বারা উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়া ঋতুপর্ণ রাজার সূতকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল, সেই মহা অনিষ্টকারী কলিকেও প্রাণভয়ে কাতর দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। কলির দুঃখে অন্তরের সহিত কাতর হইয়া তাহার প্রাণ দান করিতে বাধ্য হইলেন।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কেবল এক সহানুভূতির প্রকৃত পরিচয় দিতে গিয়া দারা পুত্রের সহিত দীর্ঘকাল বর্ণাতীত দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি যদি বিশ্বামিত্রের তপোবনস্থ বদ্ধকরা দেবকন্যাগণকে নিজ পুণ্য দানে উদ্ধার করিতে না যাইতেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে বারাণসী ধামে শূকর চরাইয়া কাল হরণ করিতে হইত না। পর দুঃখ দর্শনে যে সকল মহাত্মাগণের হৃদয় একেবারে আর্দ্র হইয়া যায়, তাঁহারা আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াও পরোপকারে প্রবৃত্ত হন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের প্রতি দুর্য্যোধন কি না করিয়াছিলেন, তথাচ তিনি দুর্য্যোধনের বনিতাগণের করুণাযুক্ত আবেদন শুনিয়া চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের হস্ত হইতে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে মুক্ত করাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন স্মৃতির বিধানানুসারে শূদ্রগণের প্রতি ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। শূদ্রগণকে তাঁহারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বোধ করিতেন। কোন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের আজ্ঞা অবহেলা করিত, তাহা হইলে, উৎকট পীড়ন করিয়া তাহাদিগের দণ্ডবিধান করিতেন।

শূদ্রের অর্থ হইলে, ব্রাহ্মণেরা ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইতেন। শূদ্রগণের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারের কথা সবিশেষ বর্ণন করিতে গেলে, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়, এই জন্য সে বিষয়ে বিরত হইলাম। শূদ্রগণের অসহ্য যন্ত্রণা দর্শনে বুদ্ধদেবের হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার মানসে রাজ্য দারা পরিত্যাগ করিলেন এবং সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে বেড়াইয়া সত্য ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। কিছুকালের মধ্যেই বুদ্ধদেবের ন্যায় যুক্তি ও ধর্ম্ম সঙ্গত কথা দ্বারা ভাক্ত ব্রাহ্মণেরা একেবারে পরাস্ত হইয়া গেলেন। শূদ্রেরাও তাঁহাকে পরম গুরু জ্ঞান করিয়া তাঁহারই আদেশ মত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। বলিতে কি, বুদ্ধদেবের যত্ন ও চেষ্টায় কিছুকালের জন্য হিন্দুসমাজ একেবারে ক্রিয়াকাণ্ড বর্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র আর কেহই মানিত না। এক পরদুঃখে কাতর হইয়া বুদ্ধদেব আপনার সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যখন শূদ্রেরা ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার হইতে একেবারে নিস্তার লাভ করিল, তখন আর তাঁহার আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

পরদুঃখ কাতর হইয়া দীন দরিদ্রের সাহায্যার্থে এখনও অনেকে অগ্রসর হন; কিন্তু তাঁহাদিগের মনে কোন না কোন নিগূঢ় স্বার্থের অভিপ্রায় থাকে। দীন দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে অনেক ধনবান্ বিরত নহেন; কিন্তু সে কেবল এক নামের জন্য। তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জন আপন হৃদয়ে সেই দীন দরিদ্রগণের দুঃখ অনুভব করিতে পারেন?

G. C. HAZRA & BROTHERS
PHARMACY

এই জন্যই বলিতেছি যে, প্রকৃত সহানুভূতি বিশিষ্ট লোক অতি বিরল। অনেকেই কিঞ্চিৎ দান করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিতে পারেন ; কিন্তু পরের দুঃখ দেখিয়া কয় জন অশ্রুপাত করিয়া থাকেন ও প্রতিবেশী বা জ্ঞাতি বন্ধুর উন্নতি দেখিয়া আন্তরিক হর্ষ প্রকাশ করেন ? এই বৃত্তি যাঁহার মনে বিরাজমান আছে, তাঁহার হৃদয় কি এক অনির্ব্বচনীয় দেব-ভাবে পূর্ণ! তিনিই সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখিতে পারেন। কোন মনুষ্য হঠাৎ পতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে, আমরা আহা! আহা! বলিয়া থাকি, কারণ তাহার সেই আঘাত জনিত কষ্ট আমাদিগের মনে অনুভূত হইলে, কিঞ্চিৎ কষ্ট অনুভব করি। যাঁহাদিগের মনে এই সহানুভূতি বৃত্তি অবস্থান করে, তাঁহারা কখন অপরকে উৎপীড়ন করেন না, কিম্বা পরের যাহাতে কষ্ট হইবে, এরূপ কার্য্য করিতে কখন অগ্র-সর হন না। যদি প্রকৃত সাধু হইতে চাহ, তাহা হইলে, ঈশ্বর প্রদত্ত সহানুভূতি বৃত্তির উদ্দীপন কর। ঐ বৃত্তি সকলের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে ; কেবল এক হিংসা, দ্বেষ, ও স্বার্থ-পরতা বৃত্তি দ্বারা পূর্ব্ব কথিত দেবভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরের দুঃখ নিবা-রণের জন্য অনায়াসে দশ টাকা ব্যয় করিতে পারেন ; কিন্তু কোন কালেই পরশ্রী দেখিতে পারেন না। এই জন্যই একণ-কার লোকের দয়া মায়া সত্ত্বেও কেবল এক পরশ্রী কাতর বলিয়া প্রকৃত সহানুভূতির পরিচয় দিতে পারেন না।

উপচিকীর্ষা—বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাবে এই সংসারের লোক অর্থ সঞ্চয় করেন। সেই সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশেই তাঁহার নিজ

প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। অর্থের এমত প্রভাব যে, অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইলে, সৎ পথেই হউক বা অসৎ পথেই হউক, মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু ব্যয় না করিয়া স্থির ভাবে প্রায় কেহই থাকিতে পারেন না। তবে কৃপণের কথা স্বতন্ত্র। এ দিকে আবার এই ধরাধামের কতকগুলি লোক অর্থের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। উৎকট পরিশ্রম করিয়াও সকল সময়ে তাহারা নিতান্ত প্রয়োজন মত অর্থ অর্জ্জন করিয়া উঠিতে পারে না। আবার কতকগুলি লোক কার্য্যে অক্ষম বলিয়া তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া ভার হইয়া উঠে; কিন্তু করুণাময় ঈশ্বরের কি চমৎকার নিয়ম! যাহাতে নিঃসহায় লোকদিগের উপকার হয়, এই জন্যই তিনি মনুষ্যের মনে উপচিকীর্ষা বৃত্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। আবার জগৎপাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া অসাধারণ ধীশক্তিমান্ পণ্ডিতেরা সর্ব্ব সাধারণকে পরোপকারে রত করাইবার কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে অশেষ প্রকার প্রবৃত্তি দিয়া গিয়াছেন। একে পরোপকারের ইচ্ছা আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি, তাহার উপর আবার ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তারা বিশিষ্ট বিধানে পরোপকারের ফলশ্রুতি দেখাইয়া যাওয়ায় ক্ষুদ্র ভদ্র সকলের মনেই পরোপকার করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া আছে। যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেই প্রকারে পরোপকার করিয়া থাকেন। কেহ বা শত মুদ্রা দান করিয়া পরোপকার করিতেছেন, কেহ বা মুষ্টি ভিক্ষা দানে সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছেন। আবার যাঁহার এরূপ দানেরও ক্ষমতা নাই, তিনি শারীরিক পরিশ্রম করিয়া পরোপকার করিয়া থাকেন।

এই সংসারে কারণ ব্যতিরেকে কেহই কোন কার্য্য করেন

না। বিশিষ্ট রূপ প্রলোভন না থাকিলে, প্রায় কেহই অর্থ ব্যয় করিতে চাহেন না। দান সম্বন্ধে বিশিষ্ট রূপ কারণও দেখিতে পাওয়া যায় ও তদ্বিষয়ের অনেক প্রলোভনও আছে। এক সহানুভূতি হইতে দয়া উৎপন্ন হয়, সেই দয়াই দান করিবার ইচ্ছার প্রধান উত্তেজক। দানের প্রলোভনও অনেক আছে, তন্মধ্যে যশোলিপ্সা ও স্বর্গ লাভই প্রধান। বোধ কর, দুরন্ত শীতের সময় কোন ধনবান্ গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, কতকগুলি দরিদ্র লোক শীতবস্ত্রের অভাবে স্থানে স্থানে অনল জ্বালিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছে; অনলের উত্তাপে তাহাদিগের শীত সর্ব্বতোভাবে নিবারণ হইতেছে না। তিনি যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গাতীর ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন নানাবিধ শীতবস্ত্রে তাঁহার সর্ব্বশরীর আবৃত ছিল; তথাচ উত্তর দিকের শীতল বায়ুতে মধ্যে মধ্যে শীতের তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই জন্য ধনবান্ লোকটি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি নানাবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্রে সর্ব্ব শরীর আবরিত করিয়াছি, তথাচ সর্ব্বতোভাবে শীত নিবারণ হইতেছে না; কিন্তু এই সকল দীন দরিদ্র লোকেরা কেবল এক অনলের উত্তাপে কি প্রকারে এই দুরন্ত শীত অতিক্রম করিতেছে? আহা! কি কষ্ট! যাহা হউক, আমি কল্যই কতকগুলি বনাত কিনিয়া ইহাদিগকে দান করিব। ইহাতে ধর্ম্মও হইবে ও যশও হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এস্থলে দয়া এবং লোকানুরাগ প্রিয়তা একত্র হইয়া উপচীকির্ষাকে প্রবল করিয়া দিল।

যেমন কটু, তিক্ত, কষায় ও মিষ্টরসাশ্রিত নানা দ্রব্য একত্র করিয়া একটি মহৌষধ প্রস্তুত হয়, সেই ঔষধ উৎকট উৎকট

রোগ নিবারণের শক্তি ধারণ করে, সেইরূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট নানা মনোবৃত্তি একত্রীভূত হইয়া একটি সাধারণের মহৎ কল্যাণ-কর বৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। কোন কোন ব্যক্তি কেবল সাধারণের নিকট সুখ্যাতি লাভের জন্য লোকের উপকার করিয়া থাকেন। তথাচ সেই দানে বহু সংখ্যক লোকের উপকার সাধিত হইল, তাহাতে আর সংশয় কি? যাহার যে ভাবে দান করিবার ইচ্ছা হউক না কেন, ঈশ্বর যে অভিপ্রায়ে মনু-ষ্যের মনে উপচিকীর্ষা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে সম্পাদিত হইবেই হইবে।

দয়ার অপেক্ষা ধর্ম্ম আর নাই। সেই দয়াই উপচিকীর্ষাকে উত্তেজিত করে। কেবল অর্থদান করিলেই দান করা হয়, এরূপ নহে। ঔষধদান, জলদান, বিদ্যাদান ও সৎপরামর্শ দান, সময়ে সময়ে লোকের মহৎ উপকার সাধন করে। কেহ যেন মনে এরূপ না করেন যে, অর্থ ব্যতিরেকে পরোপকার করা হয় না, এ কথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আবার কতকগুলি দানের সহিত অর্থের বিলক্ষণ সংস্রব আছে; যেমন অন্নদান, বস্ত্রদান, ভূমিদান ইত্যাদি। দানে কৃতীর মনে পর্য্যায় ক্রমে অহঙ্কার ও দম্ভ আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু দান করিয়া যাঁহার মনে অহঙ্কার বা আত্মশ্লাঘার উদয় না হয়, তিনিই যথার্থ মনুষ্য।

যে, যে অবস্থার লোক, শাস্ত্রকারেরা তাহার পক্ষে সেইরূপ দান করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যেশ্বরেরা গো-দান, ভূমিদান, স্বর্ণদান প্রভৃতি দান করিবেন। সামান্য গৃহস্থেরা মুষ্টিভিক্ষা দান করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। যাহার এক মুষ্টি

B. D. MATRA & BROTHERS
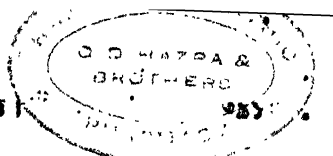
তণ্ডুল দানেরও ক্ষমতা নাই, সে যদি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জল দান করে, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, দানের অপেক্ষা পুণ্য আর নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন কোন কালে অপাত্রে দান না করেন। দান করিবার পাত্র কে, তাহাও আমাদিগের শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যথা—অভুক্ত, উচ্চ বংশোদ্ভব, কুলীন, মিতব্যয়ী, ধর্ম্মপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিই দানের পাত্র। এই রূপ ব্যক্তিকে দান করিলে তাহার প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয়; কিন্তু অপাত্রে দান করিলে, পদে পদে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পাত্র ও অপাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার উপকার করিলে, কি রূপ ফল লাভ হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

একটি দুগ্ধবতী গাভী পিপাসায় কাতর হইয়া কোন পঙ্কিল পুষ্করিণীতে জল পান করিতে নামিয়াছিল। ইচ্ছামত জল পান করিয়া উঠিয়া আসিবার সময় তাহার পদ পঙ্কে বসিয়া গেল। গাভীটি আত্মোদ্ধারের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই পঙ্ক হইতে আত্মোদ্ধার করিতে পারিল না, অবশেষে তদবস্থাতেই পতিত রহিল। গাভীটি যখন পঙ্কে পতিত হইয়া ছটফট করিতেছিল, দূর হইতে দুই জন বলবান্ ব্রাহ্মণ গো-হত্যার উপক্রম দেখিয়া ক্রুতপদে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বহু যত্নে ও বহু কষ্টে গাভীটিকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে আনিয়া তুলিলেন, ঐ দুই জন ব্রাহ্মণ পথ পর্য্যটন কষ্টে পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন, তাহার উপর আবার গাভী উদ্ধারের জন্য উৎকট পরিশ্রম করায় ক্ষুধায় অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল। ঐ দুই জন ব্রাহ্মণের মধ্যে এক জন

দেখিলেন যে, গাভীটি দুগ্ধ ভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ আপন ঘটি লইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দুগ্ধ পানে উভয়েই ক্ষুধা শান্তি করিয়া আপনাদিগের অভিপ্রেত স্থানে প্রস্থান করিলেন। পক্ষান্তরে একটি ব্যাঘ্র জল পান করিতে গিয়া পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিল। তদ্দর্শনে চারি জন কাঠুরিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া বহু কষ্টে শার্দ্দূলকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিল। তাহারা ঐ মৃতপ্রায় ব্যাঘ্রকে ধরাধরি করিয়া যেমন উপরে তুলিয়া আনিল, সে অমনি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণদাতাগণের মধ্যে দুই জনের প্রাণ বিনষ্ট করিল, আর দুই জন পলায়নপর হইল। সৎ ও অসতের প্রতি সাহায্য দান করিলে. কি রূপ ফলাফল হয়, গাভী ও শার্দ্দূলের বিবরণ পাঠে তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।

নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে, যদিও পরোপকারের ন্যায় ধর্ম্ম আর নাই, তথাচ আত্ম রাখিয়া সে ধর্ম্ম অর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। একেবারে দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়া ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, গৃহীর পক্ষে পরিমিত দানই প্রসংশনীয়। পূর্ব্বে আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে যে, বিপুল বৈভব লইয়া কেহ নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিতে পারেন না। ধনের কিঞ্চিৎ অংশ যে কোন প্রকারে হউক ব্যয় করিতে ইচ্ছা হইবেই হইবে। পাছে সেই অর্থ অসৎ কার্য্যে ব্যয় করিয়া লোকে পদে পদে আপনার অপকার ঘটায়, এই জন্য শাস্ত্রকারেরা ফলশ্রুতি দেখাইয়া নানা দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদিগের ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত আনন্দ হয়, তাঁহারা সেই সকল কার্য্য করিয়াই সর্ব্বতোভাবে পরিতুষ্ট থাকেন, অথচ তদ্দ্বারা দশ জন

লোকেরও উপকার সাধিত হয় এবং কৃতী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিব্রত থাকায় অসৎ চিন্তা মনে আনিবার সময় প্রাপ্ত হন না; কিন্তু সেই জন্য যিনি আপন ক্ষমতা না বুঝিয়া ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তাঁহার পক্ষে কখনই মঙ্গল ঘটে না।

লোকে পরোপকারে প্রবৃত্ত হইবে, এই অভিপ্রায়েই ঈশ্বর আমাদিগের মনে উপচিকীর্ষা বৃত্তির সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। সেই করুণাময়ই আবার আমাদিগকে বিবেচনা শক্তি দিয়াছেন। বিবেচনা দ্বারা আমরা আপন আপন ক্ষমতা ও পাত্রাপাত্র স্থির করিতে পারি। অতএব যখন যশোলিপ্সা এবং দয়া আমাদিগের উপচিকীর্ষা বৃত্তিকে উৎসাহিত করে, তখন অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া পরোপকারে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য, নতুবা ইহার বিপর্য্যয় করিলেই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

উপকার করিবার ইচ্ছাকে উপচিকীর্ষা কহে। যদি দয়াবান্ ঈশ্বর এই বৃত্তি মনুষ্য হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে, দীন দরিদ্রেরা কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত? কে এই ধরাধামের অসৎ পথাবলম্বীদিগকে সৎ পরামর্শ দানে সুপথে আনিত? মনুষ্য বিপদে পতিত হইলে, সদুপায় করিয়া বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার কে চেষ্টা দেখিত? আহা! ঈশ্বরের কি অপার করুণা! তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের কি অদ্ভুত কৌশল! যিনি পরোপকারে প্রবৃত্ত হন, তিনি আপন হৃদয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন এবং যাঁহার উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহারও কষ্ট দুরীভূত হইয়া থাকে। হে করুণাময় ঈশ্বর! তুমি মনুষ্যের মনে এই বৃত্তি

দিয়া সৃষ্টি কৌশলের অসাধারণ পরিচয় প্রদান করিতেছ, তোমার করুণা ও সৃষ্টি কৌশল আলোচনা করিলে, ভক্তিরসে কাহার হৃদয় আর্দ্র না হয় ?

ভক্তি—কোন ব্যক্তির অসাধারণ গুণের কথা শ্রবণ কিম্বা অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখিয়া এবং তাঁহার সদভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া মনোমধ্যে যে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি যে একটি আন্তরিক অনুরাগ জন্মে, তাহাকেই ভক্তি কহে। এক্ষণে দেখিতে হইবে প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ কি ? শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির নয়টি লক্ষণ বিস্তারে বর্ণিত আছে যথা—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

এই নয় প্রকার লক্ষণ যে মানবে বিদ্যমান আছে, তাঁহাকেই প্রকৃত ভক্ত কহা যায়। প্রহ্লাদ গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি গুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অসাধারণ ভক্ত হইয়া উঠিলেন। তৎপরে সর্ব্বদা হরি কথা শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন, স্বর তান ও লয় সংযুক্ত করিয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেন, সর্ব্বদা হরিকে স্মরণ করিতেন, মনে মনে তাঁহার চরণ সেবা করিতেন, পুষ্প দিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন, দাসের ন্যায় হরিমন্দির মার্জ্জন করিতেন এবং সখ্য ভাবে তাঁহার নিকট আপনার মনের প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিতেন। ধ্রুব ও চৈতন্য প্রভৃতি যাঁহারা ভগবানের অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহারা উপরোক্ত নয় প্রকার ভক্তির লক্ষণ দেখাইয়া সাধারণের নিকট পরম ভক্ত বলিয়া

G D HAZRA & BROTHERS
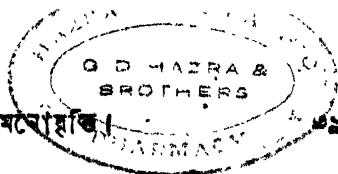
প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। পুরাণাদি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পূর্ব্ব কথিত নবধা ভক্তির লক্ষণ একাধার হইতে এককালে সম-ভাবে প্রকাশ পায় না। রাজা পরীক্ষিৎ হরিগুণ শ্রবণে, শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পাদসেবনে, ধ্রুব অর্চ্চনে, বিভীষণ বন্দনে, হনুমান্ দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে এবং ব্রজাঙ্গনাগণ আত্ম নিবেদনে ভক্ত ছিলেন।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্নেহ, প্রেম ও ভক্তির লক্ষণগুলি প্রায় এক প্রকার বলিয়া বোধ হয়। যাহাকে আমরা অত্যন্ত স্নেহ করি, কিম্বা যাহাকে আমরা অন্তরের সহিত ভালবাসি, তাহার প্রশংসা শুনিলে, আমরা পুলকিত হই ; তাহার গুণ লোকের নিকট বলিতে থাকি। আমাদিগের স্মরণ পথ হইতে সে প্রায় অপসৃত হয় না। তাহার কোন পীড়া হইলে, তাহার নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করি, সে যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহা করিতে ত্রুটি করি না এবং তাহার নিকট মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হই না। যেমন ভক্তিমান্ ব্যক্তিরা আপন ভক্তি পাত্রের গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তির আবেশে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে থাকেন ; প্রেমে কণ্টকিত হন, কখন কখন বা অবশাঙ্গ হইয়া কম্পান করিতে থাকেন, স্নেহ ও প্রেমবিহ্বল ব্যক্তিরাও কখন কখন সেইরূপ করিয়া থাকেন। এই জন্যই বোধ হইতেছে, আমাদিগের এই ভক্তি বিষয়ক অনুমান নিতান্ত অলীক নহে।

আন্তরিক অনুরাগকেই ভক্তি কহে। যাঁহার যে বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি জন্মে, তাঁহাকে সাধারণ কথায় সেই বিষয়ের ভক্ত কহিয়া থাকে। যেমন, যিনি অত্যন্ত মাংস খাইতে ভাল

খাসেন, তাঁহাকে মাংসভক্ত কহে। সাধারণ কথায় কহে যে, ‘অমুক বড় স্ত্রীভক্ত।’ তাহার কারণ যে, তিনি আপন স্ত্রী যাহা বলেন, তাহাই করেন, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা পান এবং সর্ব্বদা স্ত্রীর নিকট আপন মনের কথা ব্যক্ত করেন।

যেযত কেন নীচাশয় হউক না, যথার্থ গুণবান্ ও মহানুভব ব্যক্তি দেখিলে, তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তির উদয় হইবেই হইবে। আমরা সেই ভক্তি বশতই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে থাকি। যাহারা অজ্ঞান বশতঃ অপকর্ম্মে রত হইয়া আছে, তাহারাও কখন কখন সৎ কথা শুনিয়া সজ্জনের প্রতি ভক্তিমান্ হয়; কিন্তু তাহাদিগের সে ভক্তি ক্ষণধ্বংসী। যদি সেই ভক্তি স্থায়ী হইত, তাহা হইলে, তাহাদিগের পরম মঙ্গল হইত সন্দেহ নাই।

একবার যাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়া যায়, তাঁহাকেই সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা করে এবং তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও অর্চ্চনা বা বন্দনা করিতে ইচ্ছা হয় না। রাম পরায়ণ বিভীষণ কহিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আর কাহারও নিকট আমি শির অবনত করিব না। যদি রামচন্দ্রের তুল্য গুণ অন্য আধারে দেখিতে পাই, তাহা হইলে, তাঁহাকে সীতাপতি জ্ঞানেই অর্চ্চনা ও বন্দনা করিব। যে যাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভক্তি করে, সে সেই ভক্তির আধারকেই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠাধার বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। এই কারণেই আমাদিগের দেশে পঞ্চ উপাসক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। শিব মন্ত্র দীক্ষিত ব্যক্তিকে সাধারণে শৈব কহিয়া থাকে। শিব পূজা করিতে করিতে শৈবের শিবের প্রতি এতদূর প্রগাঢ় ভক্তি হয়

যে, সে সমস্ত সংসারকে শিবময় দেখিতে থাকে, শিব ভিন্ন আর কোন দেবতার চরণে শির অবনত করিতে চাহে না।

পাঠকগণ, ভক্তি স্থির রাখা অত্যন্ত কঠিন। যে একবার উৎকৃষ্ট গুণের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, সে আর নিকৃষ্ট জনকে অর্চ্চনা বা বন্দনা করিতে পারে না। অষ্টাদশ পুরাণ কর্ত্তা বেদ-ব্যাস প্রথমে বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কাশী দর্শনে আসিয়া শিবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সেই অপরাধে শিব-দূতেরা তাঁহাকে যথোচিত শাস্তি দিল। শিবদূত কর্ত্তৃক অপ-মানিত হইয়া বেদব্যাস বিষ্ণুর নিকট আপন মনোবেদনা প্রকাশ করায়, বিষ্ণু তাঁহাকে 'হরি হর প্রভেদ জ্ঞান করিও না,' এই বলিয়া বিদায় দিলেন। বেদব্যাস বোধ করিলেন যে, বিষ্ণু শিবকে ভয় করিয়া আমাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, অদ্য হইতে আমি শৈব হইয়া শিবের আরা-ধনা করিব। কালে তাহাই করিলেন এবং পথে ঘাটে বিষ্ণুর নিন্দা করিয়া শিবগুণ গান করিতে লাগিলেন; সেই অপরাধে মহাদেব বেদব্যাসের ভুজস্তম্ভ ও কণ্ঠরোধ করিয়া দেন।

আন্তরিক দৃঢ়ভক্তি পুরাণাদিতে অনেক বিবৃত আছে। এক জন কিরাত দ্রোণাচার্য্যের অসামান্য ধনুর্ব্বিদ্যা শুনিয়া তাঁহার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতে গিয়া হতাশ হইয়া আসে। নীচ জাতি বলিয়া দ্রোণ তাহার আচার্য্য হইতে চাহিলেন না। কুরুকুল আচার্য্যের প্রতি কিরাতের পূর্ব্ব হইতেই অকৃত্রিম ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। এই জন্য বন মধ্যে এক মৃণ্ময় দ্রোণমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকেই শিক্ষাগুরু জ্ঞানে আপনা আপনি অস্ত্র প্রয়োগ শিক্ষা করিতে লাগিল। অসাধারণ ভক্তি-প্রভাবে তাহার ধনু-

বিদ্যায় দৈব বিদ্যা জন্মে। দ্রোণাচার্য্য তাহা জ্ঞাত হইয়া এক দিবস তাহার কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কাহার শিষ্য?' কিরাত কহিল, 'আমি কুরুকুল আচার্য্য দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য।' দ্রোণাচার্য্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুরু দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছে?' কিরাত কহিল, 'না, এক্ষণে গুরু যাহা চাহিবেন তাহাই দিব।' দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, 'তুমি দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি কাটিয়া দাও, তাহা হইলেই, যথেষ্ট গুরু দক্ষিণা দেওয়া হইবে।' কিরাত দ্বিরুক্তি না করিয়া শাণিত অস্ত্রে অঙ্গুলিটি কর্ত্তন করিয়া গুরুপদে অর্পণ করিল।

প্রকৃত সাধকগণ বাহ্য সজ্জাকে ভক্তির লক্ষণ কহেন না। যে কার্য্যের দ্বারা আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ পায়, সাধুগণ তাহাকেই যথার্থ ভক্তি বলিয়া থাকেন। প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্তের বিষয় বাসনা থাকে না, তাঁহারা কেবল ঈশ্বরের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে চাহেন ও সর্ব্বদা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করেন এই মাত্র। বিষয় বাসনার নিবৃত্তি না হইলে, লোকের মনে প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় না। যে ঈশ্বরপ্রেমে আসক্ত হইয়া উঠে, সে কি আর আত্মসুখের দিকে দৃষ্টি রাখে? সে কি আর ধন সঞ্চয় করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়? ঈশ্বরোদ্দেশে সে যখন আত্মার্পণ করে, তখন তাঁহার প্রীতি কামনায় যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

চৈতন্য ঈশ্বরের একজন যথার্থ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ কার্য্য দ্বারা পদে পদে প্রকাশ পাইত। তাঁহাকে প্রকৃত ভক্তিমান্ দেখিয়া অনেক মহানুভব ব্যক্তি চৈতন্য ভক্ত হই-

য়াছিলেন। প্রকৃত গুণ না দেখিলে, কেহ কাহারও প্রতি ভক্তি করে না। মহাপ্রভু যখন সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া হরিনাম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সমভিব্যাহারে কেহই ছিল না, একাকী বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। যখন সাধারণে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন অনেকেই তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিল। তিনি যখন সুর তান ও লয় সংযুক্ত করিয়া রাজপথে হরি সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া অনেক মনুষ্যের মনে ভক্তির আবির্ভাব হইত। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমভরে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া যাইত। চৈতন্যের সেই প্রেমাশ্রুপাত দর্শনে শ্রোতাগণও অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সেই সঙ্কীর্ত্তন স্থান তৎকালে যথার্থ ভক্তির স্থান হইয়া দাঁড়াইত। কি শ্রোতা কি বক্তা কাহারও কপটতার লেশ মাত্র থাকিত না।

চৈতন্যের ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায়, শিক্ষিত সমাজ চৈতন্যের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, চৈতন্য শিক্ষিত লোককে হরিনামে দীক্ষিত করিবার ক্ষমতা রাখেন না, এই জন্যই কেবল হট্ট লোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া অনর্থক গোল-যোগ করিয়া বেড়াইতেছেন। এক দিবস চৈতন্যকে বিচারে পরাস্ত করিয়া উহার সমস্ত ভণ্ডামী নষ্ট করিয়া দিব। কয়েক জন শিক্ষিত সমাজের লোক এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া আছেন, এমন সময়ে চৈতন্য এক দিবস হরি সঙ্কীর্ত্তনে যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত হইয়া স্বশিষ্যে তাঁহাদিগেরই এক জন মহামহোপাধ্যায়

অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীর সম্মুখস্থ বটবৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট হই-লেন। ভট্টাচার্য্য চৈতন্যকে স্বশিষ্যে সমাগত দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, আপনি কোন্ ধর্ম্ম যাজন করিয়া বেড়াইতেছেন? তদুত্তরে চৈতন্য কহিলেন, ধর্ম্মতত্ত্ব আমি কিছুই অবগত নহি, এই জন্য সকল ধর্ম্মের বীজ স্বরূপ হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াই-তেছি। কারণ মহাজনের মুখে শুনিয়াছি, "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, তুমি শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত নহ, এই জন্যই কতকগুলা হট্ট লোকের সহিত অনর্থক গোলযোগ করিয়া বেড়াইতেছ, যদি আমার এই শ্লোক-টির অর্থ করিতে পার, তাহা হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনা-য়াসে বুঝিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন। চৈতন্য দেব সেই কবিতাটির পর্য্যায়ক্রমে একষষ্টি প্রকার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চৈতন্য দেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পূর্ব্ব ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, গললগ্নী কৃতবাসে গদ্গদ বচনে নিবেদন করিলেন, দেব! আপনি সামান্য মনুষ্য নহেন, বোধ হয়, জীবের শিবের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর নরদেহ ধারণ করিয়া অবনীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমার পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি কায়মনে আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

পাঠকগণ, পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয় চৈতন্য দেবকে বিদ্রূপ করিবার মানসেই বৈষ্ণব মণ্ডলীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া-

ছিলেন। চৈতন্য দেবের মুখে একটি মাত্র শ্লোকের নানারূপ ব্যাখ্যা শুনিয়াই তাঁহার পূর্ব্ব ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। অসাধারণ গুণ দেখিয়া চৈতন্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তির উদয় হইয়াছিল। এখানে ভক্ত ও ভক্তির পাত্র উভয়েই সমান, এই জন্য চৈতন্য দেবও ভট্টাচার্য্যের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ভট্টাচার্য্যও সংসারের মায়া মোহ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানগুরু মহাপ্রভুর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। একজন ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিতকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণের মনে বিষম সংশয় উপস্থিত হইল। তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—ভট্টাচার্য্য বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। যাহা হউক, চৈতন্যের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় লইতে হইবে, নতুবা এ সংশয় ছেদনের আর উপায়ান্তর নাই। এইরূপ চিন্তার পর, অপরাপর পণ্ডিতেরাও পর্য্যায় ক্রমে মহাপ্রভুর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যে শাস্ত্রের প্রশ্ন উপস্থিত করেন, চৈতন্য দেব বিশিষ্ট বিধানে তাহার উচিত উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করায় পণ্ডিতেরা একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। যাহা হউক, চৈতন্য দেব আপনার শিষ্যগণকে বহু কালাবধি প্রকৃত ভক্তি তত্ত্বের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগের মনের সমুদয় সংশয় ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তেরা কেবল মহাপ্রভুকেই স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং পূর্ব্ব কথিত নবধা ভক্তির লক্ষণ চৈতন্য চরণেই প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদিগের কাহারও মনে কপটতা ছিল না। তাঁহারা দ্বেষ হিংসা একে-

ধারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কাহারও সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা ছিল না। ভিক্ষার তণ্ডুলে উদর পূর্ণ হইলেই যথেষ্ট বোধ করিতেন। দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা ও শান্তি চৈতন্যভক্তদিগের অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান হইয়াছিল। তাঁহারা এক হরি-সেবা ও হরিগুণ সঙ্কীর্ত্তন এবং হরিকথা শ্রবণ ভিন্ন আর কিছুরই অভিলাষ রাখিতেন না। এই জন্যই চৈতন্যের ভক্তবৃন্দ দিনযামিনী আনন্দ সাগরে ভাসিয়া থাকিতেন। তবেই এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে, চৈতন্য দেবের গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎ-কালের বহু সংখ্যক লোক একেবারে অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং গুরুর উপদেশ মতে সর্ব্বদা সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অসংখ্য লোকের কু প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে চৈতন্য দেব বঙ্গভূমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই দীর্ঘকালেও তাঁহার সদুপদেশের প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত প্রায় হয় নাই। এক্ষণেও বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে দুই এক জন প্রকৃত ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, চৈতন্য দেবের তিরোভাবের পর, বৈষ্ণব মণ্ডলীতে তাঁহার সমতুল্য লোক আর আবির্ভূত হইলেন না। এই কারণেই দুর্দ্দশাপন্ন বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আর সাধু লোক দেখিতে পাওয়া যায় না।

চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পর, পঞ্জাব অঞ্চলে গুরু নানকের মত বহুল প্রচার হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইয়া হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে সম-ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। গুরু নানক যথার্থই পরোপকারী, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও স্বার্থত্যাগী লোক ছিলেন। পঞ্জাব অঞ্চলের লোক

তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ভয় ও ভক্তি করিত। পূর্ব্বোক্ত রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সময়ে সময়ে এক এক জন অসাধারণ গুণসম্পন্ন লোক অবনীতে আবির্ভূত হইয়া অসংখ্য লোককে ভক্তি সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য গগনে সমুদিত হইবে, তাবৎ ঐ সকল মহাত্মাগণের নাম লুপ্ত হইবে না। তাঁহাদিগের শিষ্যেরাও অদ্যাপি সেই সকল জ্ঞান গুরুগণের নাম স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিয়া থাকেন এবং ভক্তি ভাবে তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন। যীশুখৃষ্ট প্যালেষ্টাইনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, দ্বাদশ জন ধীবর মাত্র তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। বাইবেলে লিখিত আছে, খৃষ্ট অন্ধের চক্ষুদান, খঞ্জের চলৎশক্তিদান এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, ও ভূতগ্রস্ত বহু সংখ্যক লোকের আরোগ্য বিধান করিয়া জন সমাজের ভক্তিপাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সকল কথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তৎসম্বন্ধে কোন কথার প্রয়োজন নাই। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রায় উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে অশিক্ষিত গালীল্ প্রদেশ নিবাসী ধীবরগণের মধ্যে খৃষ্ট যে ধর্ম্মের বীজবপন করিয়া গিয়াছিলেন, কালে সেই ধর্ম্ম ইয়ুরোপের প্রায় সমস্ত সভ্য জাতির ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ফলদাতা হইয়াছে। পুরাকালে অনেক ভক্তির প্রকৃত পাত্র অবনীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল এক পরোপকারের জন্য সংসারের কোন সুখেই লিপ্ত হন নাই। সেই জন্যই অদ্যাপি তাঁহাদিগের ভক্তেরা হৃদয়ের সহিত ঐ সকল মহাত্মাগণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নাম স্মরণ করিয়া অনেকে আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন।

এক্ষণকার কালে প্রকৃত ভক্তির পাত্র দুর্লভ হইয়া পড়ায় ভক্তেরও সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশের লোক দীক্ষাগুরুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। রাজাধিরাজেরাও গুরু দেবের চরণ ধৌত করিয়া দিতেন, মহারাজ্ঞীরা সামান্য দাসীর ন্যায় গুরু দেবের চরণ সেবা করিতেন। বলিতে কি, পূর্ব্বকালে এদেশের লোক দীক্ষাগুরুর প্রতি যেরূপ আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন ও গুরু দেবকে সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতেন, এরূপ গুরুভক্তি আর কোন দেশেই প্রচলিত ছিল না। কাল প্রভাবে, গুরুদিগের কুচরিত্র ও অর্থশোষণের আধিক্য দেখিয়া এক্ষণকার অধিকাংশ লোকই দীক্ষা গুরুকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন না। দীক্ষাগুরু বাটী আসিলে, শিষ্যগণকে সমূহ সতর্কের সহিত বাস করিতে হয়। কেন না, কিছুকাল পূর্ব্বে পুলিস রিপোর্টে পাঠ করা গিয়াছে যে, একজন দীক্ষাগুরু কোন শিষ্যের সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত একটি শিশু সন্তানকে স্বহস্তে বিনষ্ট করিয়া আপনার তল্পীর ভিতর রাখিয়াছিল। রজনী প্রভাতে শিষ্যের গৃহ হইতে অন্যত্র গমন কালে পথি মধ্যে একজন পুলিস পদাতিক দেখিল যে, গুরুদেবের তল্পার এক পার্শ্ব দিয়া অনর্গল রক্তধারা পড়িতেছে। পুলিস পদাতিক সন্দেহ করিয়া তাহার তল্পা অনুসন্ধানে দেখিতে পাইল যে, একটি সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত মৃত শিশু তাহার মধ্যে বস্ত্রাবৃত রহিয়াছে। তাহার পর, ঐ গুরু দেবের অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, সে সকল বিষয় এ স্থলে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। একজনের এইরূপ আচরণ দৃষ্টে বহু সংখ্যক লোকের গুরু ভক্তির হ্রাস হইয়া যায়। গুরু ব্যবসায়ীরা যদি কোন শিষ্যের ভক্তির

আধিক্য দেখে, তাহা হইলে, নানা কৌশলে তাঁহার অর্থ শোষণের চেষ্টা পায়। অভিলাষ মত প্রণামী না পাইলে, অনেকে শাপ ও গালি দিতেও ক্ষান্ত থাকে না। আজ কাল মন্ত্র শিষ্য ও গুরুর মধ্যে কেবল দান ও আদানের সম্বন্ধ হইয়াছে।

হিন্দু সম্প্রদায়ীরা বিশেষ ভক্তির সহিত তীর্থভ্রমণে গমন করিয়া থাকেন। তীর্থস্থানের দেব দেবীর প্রতি যাত্রিগণের কতদূর ভক্তি, তাহা সবিস্তারে বর্ণনের প্রয়োজন নাই; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তীর্থবাসী অর্থলোলুপ পাণ্ডারা যাত্রিগণের সেই অকৃত্রিম ভক্তির ব্যতিক্রম ঘটায়। পাণ্ডাদিগের দৌরাত্ম্যে যাত্রিগণ মনের মানসে তীর্থস্থানের দেব দেবী দর্শন করিতে পায় না। তাহারা যেরূপ ভক্তির সহিত তীর্থযাত্রা করে, তীর্থস্থানে উপস্থিত হইয়া তথাকার রীতি নীতি ব্যবহার দর্শনে সে ভক্তির এক চতুর্থ ভাগও হৃদয়ে রাখিতে পারে না। কেবল এক স্বার্থপরতাই এদেশের সর্ব্বত্র ভক্তির পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছে। পুরাকালের মহাত্মাগণ বহু সংখ্যক লোকের কষ্ট নিবারণ করিয়া আপনাদিগের অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া এক্ষণকার অনেক প্রতারক—'আমি উৎকট ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারি, স্বস্ত্যয়ন দ্বারা দৈব বিড়ম্বনা দূর করিতে পারি, তাম্র খণ্ডকে স্বর্ণ খণ্ড করিয়া দিতে পারি,' ইত্যাদি প্রতারণা পরিপূরিত মিষ্ট বাক্যে প্রলোভন দেখাইয়া অনেক অজ্ঞান নর নারীর সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। 'সাধু' নামধারী অসাধু লোকের নিকট এই প্রকারে প্রতারিত হওয়াতে আজ কাল যথার্থই হিন্দু সমাজে যদি কোন সাধু লোকের সমাগম হয়, তাহা হইলে, সহজে আর কেহই তাঁহাকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে চাহে না।

যেমন একটি মৃত দেহ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিলে, মনের তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ কপট লোক জানিলে, তাহার প্রতি কখনই ভক্তি হয় না, বরং মনে বিকৃত ভাবই উপস্থিত হয়। কাল প্রভাবে এ সংসারে ভক্ত-বিটেল লোকের বিলক্ষণ আধিক্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাকে লোকে প্রকৃত বিষ্ণু ভক্ত বলুক, এই অভিপ্রায়ে ভাক্ত বৈষ্ণবেরা ডোর কোপীন পরিধান করে, সর্ব্বাঙ্গ হরিনামের দ্বারা সজ্জিত করে, নাসিকাগ্র হইতে কেশ পর্য্যন্ত হরিমন্দিরের তিলক ধারণ করে ও দক্ষিণ হস্তে এক ঝুলী ও জপমালা লইয়া স্বার্থ সাধনের জন্য ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রকৃত ভক্তির আবেশে চক্ষে জল পড়ে, শরীর কম্পিত হয় এবং কখন কখন মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এক্ষণের কপট ভক্তেরা সঙ্কীর্ত্তন স্থলে প্রেমাবেশে রোদন করে, সর্ব্ব শরীর কাঁপাইতে থাকে, এবং মধ্যে মধ্যে কপট মূর্চ্ছা গিয়া ভক্তির লক্ষণ দেখাইয়া থাকে।

এক্ষণকার কালে স্বার্থশূন্য হইয়া লোকের মঙ্গল ইচ্ছা প্রায় কেহই করে না। আমি মহা পাতকী ও নরাধম হইয়াও সাধারণ সমীপে বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা ভক্তি ভাজন হইব, এই ইচ্ছা সকলের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যিনি দীক্ষাগুরু তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা এই ভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে যে, কি কৌশলে শিষ্যগণের অর্থ শোষণ করিব। মূর্খতা বশতই হউক বা অন্য কারণ বশতঃ হউক, যদি কোন শিষ্য গুরুর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে, কিম্বা দেব দেবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকে, তাহা হইলে, দীক্ষাগুরু মহাশয়গণ ও প্রতারক যাজকগণ ঐ সকল ভক্তিমান্ লোককে

যেরূপ জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করে যে, তদ্দ্বারা অনেক ভক্তের ভক্তিভাব দূরে পলায়ন করে। যাজকের দোষে তাহাদিগের দেব দেবীর প্রতিও ক্রমে ক্রমে অশ্রদ্ধা জন্মে।

এক্ষণকার কালে প্রকৃত ভক্তি প্রায় কোন খানেই, দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ কাল ধনই সকল ভক্তির আধার হইয়াছে। পিতা মাতার অধিক ধন থাকিলে, সন্তান সন্ততিগণ পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি প্রকাশ করে। স্বামী উচ্চবেতন পাইলে, স্ত্রী স্বামীর প্রতি যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। গুরু উত্তম পরিচ্ছদে যানারোহণে শিষ্যবাটী আসিলে, নিতান্ত নিঃস্ব শিষ্যও দুই টাকার ন্যূন প্রণামী দিতে পারে না। সেই গুরুই যদি আবার জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া পদব্রজে অপর একজন শিষ্যের আলয়ে যান, তাহা হইলে, তাঁহার সেই শ্রীপাদপদ্মে অর্দ্ধমুদ্রার অধিক প্রণামী পড়ে না। অধিক আর কি লিখিব, তীর্থস্থানের যে সকল দেব দেবী প্রস্তর নির্ম্মিত উন্নত মন্দিরে আছেন এবং বহু মূল্যের বসন ভূষণ পরিয়া যাত্রিগণকে দর্শন দেন, তাঁহার সম্মুখে কেহ দশ টাকার ন্যূন ভেট ধরিতে পারেন না। সেই দেব দেবীই আবার ভাঙ্গা মন্দিরে মলিন বস্ত্র পরিয়া থাকিলে, তাঁহাদের সম্মুখে এক পয়সার অধিক প্রণামী পড়ে না। এই সকল কারণে বোধ হইতেছে যে, এক্ষণকার অধিকাংশ লোক কেবল অবস্থাকে ভক্তি করে, প্রকৃত ভক্তির নিকট দিয়াও গমন করে না। এক্ষণকার কালে স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে লোকে লোকের প্রতি ভক্তি দেখাইয়া থাকে; কিন্তু ভয়যুক্ত ভক্তি অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা

দেব দেবীকে অধিক ভক্তি করিয়া থাকেন; কিন্তু সে ভক্তিও সর্ব্বতোভাবে ভয় মিশ্রিত। দেব দেবীর প্রতি ভক্তি না করিলে পাছে দুরদৃষ্ট ঘটে, এই ভয়ে তাঁহারা দেব দেবীর অর্চ্চনা ও বন্দনা করিয়া থাকেন এবং ভয় প্রযুক্তই তাঁহাদের অন্যান্য ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভক্তির স্থান মনুষ্য হৃদয়ের অভ্যন্তর। মনোমধ্যে মহৎ ও উত্তম গুণের ধারণা না হইলে, ভক্তির উদয় হইতে পারে না। কোন কোন সময়ে সাধু বেশধারী লোক দেখিয়া তাহার প্রতি আমাদিগের ভক্তির উদয় হয় বটে; কিন্তু যখন তাহার কপটতা জানিতে পারি, তখন মন্দ লোক জানিয়া আর তাহার প্রতি ভক্তি থাকে না। পুরাকালের মহানুভব ব্যক্তিদিগের চরিত্র পাঠ করণ কালে যখন তাঁহাদিগের মহৎ গুণসমূহের পরিচয় প্রাপ্ত হই, তখন তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের ভক্তিরস স্বতই সঞ্চারিত হইতে থাকে; কিন্তু যদি তন্মধ্যে কোন স্থলে তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ মাত্র অন্যায় কার্য্যের বা স্বার্থপরতার আভাস প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে, সেই স্থলেই ভক্তির ব্যতিক্রম হইয়া পড়ে। পাঠকগণ, স্থির ভক্তি ঘটা অত্যন্ত কঠিন। যিনি সৎ স্বভাবাপন্ন ও স্বার্থ বিহীন হইয়া সর্ব্বদা লোকের মঙ্গল ইচ্ছা করেন ও নিজ গুণে সকলকে মুগ্ধ করিতে পারেন, তাঁহার প্রতিই আন্তরিক ভক্তি হইয়া থাকে।

এক ঈশ্বরই আমাদিগের আন্তরিক ভক্তির পাত্র; কেন না, তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশলে আমাদিগের মঙ্গলাভিপ্রায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কেবল মনুষ্যের কেন—এই সংসারের যাবতীয় কার্য্য যাহাতে সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈশ্বর

জনকজননীর হৃদয়ে অকৃত্রিম অপত্যস্নেহ সঞ্চার করিয়া না রাখিলে কে এতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদিগকে বর্দ্ধিত করিত? তবেই ঈশ্বর জনক জননীর হৃদয়ে অপত্যস্নেহরূপে বিরাজমান থাকিয়া আমাদিগের অসহায় অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা যে পিতামাতাকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করি, তদ্দ্বারা সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকেই ভক্তি শ্রদ্ধা করা হয়; কেন না, জনক জননী ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়াই ঈশ্বা-রাভিপ্রেত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। সেইরূপ সদ্‌গুরু ও হিতৈষী বন্ধুরাও অনেকাংশে ঈশ্বরের সদৃশ। কারণ, তাঁহারাও আমাদিগের যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সর্ব্বক্ষণ সদুপদেশ দেন, পাপপথে বিচরণ করিতে নিবারণ করেন, আমাদিগের উন্নতি দেখিলে, আনন্দিত হন এবং অবনতি দেখিলে, কায়মনোযত্নে প্রতিবিধানের চেষ্টা দেখেন। এরূপ সদ্‌গুরু ও সাধু সুহৃদের প্রতি ভক্তিমান্ হইলে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করার সমতুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে ঈশ্বরই বিরাজমান থাকিয়া আমাদিগের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এমন কি, যদি সামান্য কিঙ্কর কিঙ্করীরাও অন্তরের সহিত আমাদিগের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী হয়, তাহাদিগেরও সাধু ইচ্ছার সম্মান করা উচিত।

ঈশ্বর যে অভিপ্রায়ে মনুষ্যের মনে এই ভক্তি বৃত্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি। যাঁহার প্রতি আমাদিগের আন্তরিক ভক্তি জন্মে, তাঁহাকে পরিতুষ্ট রাখিবার জন্য আমরা তাঁহার আদেশ অবহেলা করিতে সাহস করি না এবং তাঁহার আজ্ঞানু-বর্ত্তী হইয়া চলি। এই জন্য ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক ভক্তি

জন্মিলে, তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিতে কখনই ত্রুটি করি না এবং তাঁহার সৃষ্টিকৌশল পর্য্যালোচনা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করি। সদ্‌গুরুকে অকৃত্রিম ভক্তি দ্বারা আপ্যায়িত করিতে পারিলে,আমরা তাঁহার নিকট সর্ব্বদা সুশিক্ষা লাভ করিতে পারি ও তাঁহারই অনুমোদিত সৎ পথে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকি। পিতা মাতার প্রতি ভক্তি থাকিলে, আমরা সৎ পথে থাকিতে পারি এবং সর্ব্ব বিধায় আমাদিগের মঙ্গল ঘটে ; কারণ, তাঁহারা বয়সাধিক্য বশতঃ সাংসারিক দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এরূপ পিতামাতা সন্তানের হিত কামনা ভিন্ন অহিত কামনা কখনই করেন না। এই সংসারে জ্ঞানবান্ সাধু ব্যক্তির শাসনাধীনে থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ আজ্ঞাধীন হওয়া এক ভক্তি ব্যতিরেকে কখনই সম্ভবে না। এই জন্য কাহারও সৎ লোকের প্রতি ভক্তি জন্মিলে, সে কোন কালেই বিনষ্ট হয় না এবং তাহার পদে পদে মঙ্গল হইতে থাকে।

ভক্তি আমাদিগকে নানা সৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করায়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যদি যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সৎপাত্র পাও, তাহা হইলে, তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিও। অসৎ ও কপটীদিগের কপটতায় ভুলিয়া কদাচ তাহাদিগকে ভক্তি করিও না। তাহাতে পদে পদে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবে না। যদি বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া যথার্থ শুভানুধ্যায়ী সজ্জন পাও, তাহা হইলে, তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিও। ইহাতে সংসারে পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবে ; অন্যথা কেবল সকল মঙ্গলালয় এক ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক ভক্তি করিয়া ক্ষান্ত থাকিও।

ভক্তিতত্ত্বসারে লিখিত আছে—

"বিদ্যা হৈতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে হয় ভক্তি,
ভক্তি হৈতে মুক্তি হয়, এই শাস্ত্র উক্তি।"

যে চিন্তা করিতে না শিখিয়াছে, মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে না শিখিয়াছে, যাহার ভাল মন্দ বিবেচনা না জন্মিয়াছে, তাহার ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি কি প্রকারে হইবে? যখন গগনে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া স্বকীয় শুভ্র ভাতিতে জগতের এক অনির্ব্বচনীয় শোভা বিকাশ করে, তখন তস্করেরা কি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া উঠে? যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানবান্, তাঁহারাই সেই পূর্ণ সুধাকরকে দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের অপার মহিমা ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। পর্ব্বতাদিতে অনেক বন্যজাতি বাস করে, তাহারা কি অত্যুচ্চ ভূধর দর্শনে সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম শক্তির বিষয় ভাবনা করিতে পারে? যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁহারাই দূর হইতে সেই পর্ব্বতশ্রেণী দর্শনে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে থাকেন। এক ব্যক্তি নায়েগেরার জলপ্রপাত দর্শনে বলিয়াছিলেন, 'কে বলে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় না? এই যে আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি।'

ভক্তির প্রভাবে আমরা স্বভাবের মধ্যে ঈশ্বরকে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাই। যখন দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয্যে স্বেদজলে সর্ব্ব শরীর সিক্ত হইতে থাকে, শরীরের দাহ জলে পড়িয়া থাকিলেও নিবৃত্তি পায় না, যে সময়ে সংসারের সমস্ত প্রাণীই শীতল স্থান অন্বেষণ করে, শীতল জল পান করিয়া গাত্রদাহ দূর করিতে যায়, কিন্তু কিছুতেই অন্তর্দাহ নিবৃত্ত হয় না; সেই সময় স্বভাব নিয়ন্তা ঈশ্বরের

আজ্ঞায় নীরদেরা নিরবচ্ছিন্ন নীর বর্ষণ করিতে থাকে। বারি-বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শীতল বায়ু সঞ্চালিত হয়। তখন আমরা কি বুঝিতে পারি না যে, এক পরাৎপর পরম বিভু পরমেশ্বরই করুণা বর্ষণে আমাদের সমস্ত কষ্ট দূর করিয়া দিলেন, তাঁহারই মঙ্গল নিয়মে এককালে ধরাতল শীতল হইয়া গেল? ভক্তিমান্ লোক ব্যতিরেকে তৎকালে ঈশ্বরের মহিমা কে অনুভব করিতে পারে? আমরা ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন করিবার কি শক্তি রাখি যে, তাহার সহস্রাংশের এক অংশও সুন্দর রূপে বর্ণন করিব? তিনি আমা-দিগকে যে প্রণালীতে সৃজন করিয়াছেন, যে নিয়মে প্রতিপালন করিতেছেন, যে ভাবে সুশিক্ষা দিতেছেন ও পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করাইতেছেন, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিতে গেলে, একে-বারে ভক্তিরসে হৃদয় গলিয়া যায়, সংসারে আর কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল সর্ব্বক্ষণ সেই পরাৎপর পরম বিভুকে ভক্তি প্রীতি উপহার দিতে মন সহজেই ধাবিত হয়। এই জন্যই প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তিরা লোকালয় অপেক্ষা বন উপবন ও গিরিগুহার অভ্যন্তরেই বাস করিতে ভাল বাসেন; কারণ, ঐ সকল শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন স্থানই ঈশ্বরের অপার মহিমা প্রতি-ক্ষণ ঈক্ষণ করিয়া ভক্তির সাগরে ভাসিয়া বেড়াইবার বিশেষ উপযোগী।

যাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারাই প্রতিক্ষণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া থাকেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি নিবিড় বন মধ্যস্থিত একটি সরো-বরে সহস্র সহস্র শতদল বিকশিত রহিয়াছে দেখিয়া সেই স্থানেই হৃদয় মুক্ত করিয়া বসিলেন। দেখিতে লাগিলেন, শতদলগুলি

ধীর সমীরে আন্দোলিত হইতেছে, সেই জন্য ভ্রমরকুল সহজে তাহাদিগের উপর উপবিষ্ট হইতে পারিতেছে না। কোন স্থলে বা রক্ত শতদলের উপর দুই একটি কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর উপবিষ্ট হওয়ায় প্রস্ফুটিত পদ্মে অতি রমণীয় শোভা হইয়াছে। কোন্ স্থলে বা জলচর পক্ষিকুল পদ্মের মৃণাল ভক্ষণ মানসে ঊর্দ্ধপদে অধোবদনে সলিল মধ্যে মগ্ন হইতেছে ও মৃণালের কিয়দংশ চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া অন্য এক স্থানে ভাসিয়া উঠিতেছে। স্বভাবের এই সকল রমণীয় শোভা দর্শনে সেই ভক্তের মন একেবারে ভক্তিরসে গলিয়া গেল। পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভাবে কহিতে লাগিলেন—হে স্বভাব নিয়ন্তা পরমেশ্বর! তুমি যে আমাকে ধন দিয়া নগর ও উপনগর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ নাই, ইহাতে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইয়াছি। ধনীরা কি সুরম্য হর্ম্ম্যে বসিয়া তোমার এতদূর মহিমা দর্শন করিতে পায়? কখনই না। তাহারা ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তোমাকে একবার ধ্যান করিবার অবসর পায় না। প্রকৃত ভক্তি কাহাকে বলে, তাহা একবার ভাবিতেও পারে না। যথার্থ ভক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে, ভক্তেরা যে কতদূর সুখানুভব করেন, তাহা কেবল ভক্তিমান্ ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারেন।

প্রকৃত ভক্ত যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই তাঁহার ভক্তিপাত্রকে দেখিতে পান। কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে লিখিত আছে—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে যার মূর্ত্তি,
চারিদিকে হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।"

ভক্তিতত্ত্বের কোন গ্রন্থে লিখিত আছে, কোন ঈশ্বর পরায়ণ

ব্যক্তি এক দিবস সন্ধ্যার সময় একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, সম্মুখস্থ বন মধ্যে অসংখ্য খদ্যোৎকুল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে তাহারা এক একটি বৃক্ষের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে উপবিষ্ট হইয়া সেই মহীরুহগণের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি সেই স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে ঈশ্বরের মনোহর সৃষ্টি কৌশল পর্য্যালোচনা করিয়া বিমোহিত হইয়া পড়িলেন ; ভক্তিরসে হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'জগদীশ! তোমাকে আমি চাক্ষুষ দর্শন করিতেছি, তুমি এই ক্ষুদ্র অটবীতেও বিরাজমান রহিয়াছ। এই খদ্যোৎমালায় পরিবেষ্টিত বৃক্ষ অপেক্ষা আর ভক্তির উদ্দীপন কোথায় পাইব? অতএব এই খানেই তোমাকে প্রণিপাত করি।' এই কথা বলিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক পাগলের ন্যায় সেই বৃক্ষকে পরিক্রম করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পাঠকগণ, যখন আমাদিগের মনে ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির উদয় হয়, তখন আমরা পাগলের ন্যায় কখন কাঁদিতে থাকি, কখন বা দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে থাকি। খদ্যোৎ মণ্ডিত বৃক্ষ দর্শন করিয়া উক্ত ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তির মনে অকৃত্রিম ভক্তির উদয় হইয়াছিল, এই জন্যই তিনি ঐ মহীরুহ দেখিয়া তৎস্রষ্টা ঈশ্বরকে অর্চ্চনা ও বন্দনা করিয়াছিলেন এবং করযোড়ে আত্ম নিবেদন করিয়া মনের সমস্ত ক্ষোভ দূর করিয়াছিলেন।

পুরাণাদিতে ঈশ্বরের যে বিরাট মূর্ত্তির বর্ণনা আছে, তাহাও নিতান্ত অযুক্তির কথা নহে। ভগবানের যথার্থ ভক্তেরা সংসা-

[stamp, illegible]

রের সমস্ত পদার্থ লইয়া ঈশ্বরের একটি আকার কল্পনা করিয়াছেন, যথা—চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার নয়ন, ঊনপঞ্চাশ বায়ু তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহগণ তাঁহার অঙ্গের লোম ইত্যাদি। এইরূপ কল্পনা প্রকৃত ভক্তের দ্বারাই হইতে পারে। এই রূপ অদ্ভুত কল্পনার ভাবার্থ ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন।

এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্ত একাল পর্য্যন্ত কেহই সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই ; কিন্তু যে স্থনিয়মে স্বভাবের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, আমারা যদি কিয়ৎক্ষণ তাহার দুই একটি বিষয় স্থির চিত্তে চিন্তা করি, তাহা হইলে, স্বভাব নিয়ন্তা সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল উপলব্ধি করিয়া ভক্তিরসে হৃদয় আর্দ্র হইয়া যায়, বোধ হয়, যেন তিনি সর্ব্ব ভূতে বিদ্যমান আছেন ; তখন আপনা হইতেই যেন তাঁহার প্রতি ভক্তি আসিয়া পড়ে। আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ঈশ্বরের চমৎকার সৃষ্টি কৌশল দেখিতে পাই। প্রতি দিন প্রত্যূষে পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদয়ের উপক্রমেই বোধ হয়, যেন জীব মাত্রেই এককালে চৈতন্য প্রাপ্ত হইল। হে ঈশ্বর! তুমিই যেন চৈতন্যরূপে তাহাদিগের শরীরে আবির্ভূত হও। বিহঙ্গমকুল রজনীতে আপন আপন কুলায় মধ্যে এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থিত থাকে, পরে ঊষার কিঞ্চিৎ আলোক দর্শন মাত্রেই স্বীয় স্বীয় রবে ডাকিতে আরম্ভ করে। মনুজকুল রজনী প্রভাত হইল জানিয়া অমনি দিবসীয় কার্য্য স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করে। হিংস্র জন্তুগণ আপন আপন নিভৃত স্থানে গিয়া লুক্কাইত হয়। সূর্য্যোদয়ের দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ধরাতল

যেন শ্মশানভূমি হইয়াছিল; কিন্তু প্রভাকর পূর্ব্বদিকে সমুদিত হইবা মাত্রই জীবগণ একেবারে যেন নব জীবন প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগের কলরবে সংসার পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এক প্রভাকরই যেন কর্ত্তার স্বরূপ হইয়া প্রত্যহ জীবমাত্রকেই বলিতে থাকেন—জন্তুগণ, তোমরা আর অলসে অবস্থান করিও না, আহারান্বেষণে তৎপর হও। মনুজকুল, তোমরা আপন আপন কার্য্যে মনোনিবেশ কর, আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না। কি আশ্চর্য্য কৌশল! এক সূর্য্যোদয় হইবা মাত্রই জগতের সমস্ত প্রাণী আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, তৎসম্বন্ধে আর কাহাকেও উত্তেজনা করিতে হয় না। যদি আমরা স্থির চিত্তে বিবেচনা করি, তাহা হইলে, ঈশ্বরের সৃষ্ট এক সূর্য্য হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের কত কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারি। সূর্য্যরশ্মিতেই ধরাতলের সলিল আকর্ষিত হইয়া নভোমণ্ডলে মেঘের সৃষ্টি হইতেছে। সেই নীরদেরা নিয়মিত সময়ে নীরবর্ষণ করায় পৃথিবী শস্যশালিনী হয়। জীবগণ সেই বিবিধ প্রকার শস্য কেহ আমান্নে, কেহ বা পক্কান্নে আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। সেই মঙ্গলের নিদানভূত সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর। এইরূপে করুণাময় ঈশ্বরই সূর্য্যমধ্যে বিরাজমান থাকিয়া পৃথিবীকে অন্নপূর্ণা করিতেছেন।

পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল! যখন আমার ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যা নিয়মিত সময়ে একটি সন্তান প্রসব করিল, তখন আমি তাহার আদ্যন্ত সমস্ত চিন্তা করিয়া ঈশ্বরপ্রেমে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। মনে মনে চিন্তা করিলাম, কন্যাটি যখন প্রসববেদনায় অস্থির

হইয়া এক প্রকার অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল, তখন আমি চারিদিকে কেবল বিভীষিকা দেখিতেছিলাম, প্রতিক্ষণ আমার মনে হইতেছিল যে, বুঝি আমার কন্যাটি এ যাত্রা রক্ষা পাইল না। ভাবিতেছিলাম, যদি কেহ আমাকে অমঙ্গল সংবাদ দেয়, তাহা হইলে, আমি কি প্রকারে সেই বজ্রাঘাত তুল্য বাক্য সহ্য করিব ? সেই সময়ে আমি করযোড়ে সেই পরাৎপর পরম বিভুর নিকট প্রার্থনা করিলাম, হে বিভো! এ বিপদে তুমিই কেবল রক্ষাকর্ত্তা। এ সময়ে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে না। এইরূপে ভাবিতেছি ও অনর্গল দুই চক্ষে জল ফেলিতেছি, এমন সময়ে ধাত্রী আসিয়া সংবাদ দিল, "মহাশয়! আপনার একটি দৌহিত্র হইয়াছে, আপনার দুহিতা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়াছিলেন, 'পুত্র সন্তান হইয়াছে' ইহা তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র পূর্ব্বের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছেন, এখন কেবল সতৃষ্ণ নয়নে পুত্রের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন।"

পাঠক, পূর্ব্বে আমি ভয় মিশ্রিত ভক্তির সহিত করুণাময় ঈশ্বরকে কায়মনে ডাকিতেছিলাম। ধাত্রীর মুখে সুসংবাদ পাইয়া সে ভয় দূর হইয়া গেল। ভাবিলাম, আহা! করুণাময় ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে কন্যাটি আমার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিত ও অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কথা কহিয়া আমার চিত্ত বিনোদন করিত, সেই অদ্য পুত্রের জননী হইয়াছে। অপত্যস্নেহ তাহার হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে! এই যে সে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া মৃতকল্প হইয়াছিল। কে তাহার ম্লান বদনে হাসি আনিয়া দিল ?

পূর্ব্বের সমুদয় কষ্ট বিস্মৃত করাইয়া কে তাহাকে সন্তানের প্রতি যত্ন করিতে শিখাইল? হে ঈশ্বর! তোমারই নিয়মে তাহার হৃদয়ে অপত্যস্নেহ সঞ্চার হইয়াছে; অপত্যস্নেহ বশতই সে কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিতেছে না। হে স্বভাব নিয়ন্তা ঈশ্বর! তোমারই নিয়মে ঐ কন্যার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছে। আবার তুমিই অপত্যস্নেহ রূপে তাহার হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া ঐ অসহায় শিশুকে লালন পালন করিবে। হে করুণাময়! তোমার নিয়মানুসারেই আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিষাদ সমুদ্র হইতে আহ্লাদসাগরে ভাসমান হইলাম। আমার সহিত আত্মীয় বন্ধুরাও আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন; তুমি তাঁহাদিগের হৃদয়েও সহানুভূতি বৃত্তি রূপে থাকিয়া সকলকে আনন্দ সাগরে ভাসাইতেছ। ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তোমার সৃষ্টি কৌশল! তুমি আমাদিগকে যে সকল মনোবৃত্তি দিয়াছ, তাহাতেও তোমার অসীম কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমার মনে কত প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইতেছিল; কিন্তু এক্ষণে তৎসমুদয় একেবারে এক ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। তোমার প্রতি এখন যে প্রকার ভক্তির উদয় হইয়াছে, এরূপ ভক্তি যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলে, যথার্থ ঈশ্বরভক্ত হইতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক ভক্তি জন্মিলে, ভক্তেরা যেরূপ মনে প্রীতি লাভ করেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়; কিন্তু আমাদিগের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, কিয়ৎ পরিমাণে সুখের কাল সমাগত হইলে, সর্ব্বাগ্রে তোমাকে ভুলিয়া যাই, তৎপরে পার্থিব সুখে উন্মত্ত হইয়া অজ্ঞান অন্ধকারে কবন্ধের ন্যায় ঘুরিতে আরম্ভ করি। কেবল বিপদের সময় স্বার্থের জন্য 'রক্ষা কর—রক্ষা কর' বলিয়া তোমাকে ডাকিতে থাকি।

G. D. KARPA & ...
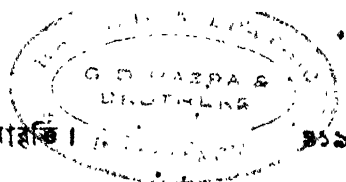
পাণ্ডুকুললক্ষ্মী কুন্তীদেবী এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন—হে যদুকুল তিলক! অদ্য আমার জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন। তোমার কৃপায় অদ্য আমি সসাগরা ধরাপতির জননী হইয়াছি; কিন্তু দেখিও বৎস, যেন সম্পদে মত্ত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া না যাই। যখন একচক্রা দেশে ভিক্ষার তণ্ডুলে জীবন ধারণ করিতাম, তখন প্রতিক্ষণ তোমাকে মনে হইত; সময়ে সময়ে ভক্তিরসে হৃদয় আর্দ্র হইয়া যাইত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজসূয় যজ্ঞের সূত্রপাত অবধি আর তোমাকে সর্ব্বক্ষণ মনে হয় না। এই জন্য বলিতেছি, হে ভক্তবৎসল! তুমি সর্ব্বদা আমাকে বিপদ্ সাগরে ডুবাইয়া রাখিও, তাহা হইলে, তোমার প্রতি সর্ব্বক্ষণ সমান ভক্তি থাকিবে। যাঁহারা বিপদে ও সম্পদে সমান ভক্তি রাখিতে পারেন, তাঁহারাই তোমার যথার্থ ভক্ত। ভক্তিবলে তাঁহারা বিপদকে বিপদ্ জ্ঞান করেন না ও সম্পদকে সম্পদ বলিয়া ধরেন না। যাঁহারা সুখ ভোগের সময় কিম্বা দুঃখ ভোগের সময় তোমার প্রতি সমান অনুরাগী থাকেন, হে ঈশ্বর! তাঁহারাই তোমার যথার্থ ভক্ত।

ন্যায়পরতা—বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু দেশ পর্য্যটন ও বহু লোকের চরিত্র পাঠ করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞান লাভ হয়। সেই জ্ঞান-জ্যোতি দ্বারা দেখিতে পাই, ঈশ্বর সদাত্মা রূপে আমাদিগের হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন। যখন আমরা কোন অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করি, তখন সদাত্মাই আমাদিগের সেই কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে যথোচিত চেষ্টা পান। বোধ হয়, সেই সদাত্মাকেই ইংরাজী ভাষায় Conscience কহিয়া

থাকে। বোধ কর, পরস্ব হরণে হঠাৎ আমার প্রবৃত্তি জন্মিল। সেই প্রবৃত্তি কার্য্যে পরিণত করিবার সময় কে যেন হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে বলিয়া উঠিল—এরূপ কার্য্য করিও না, করিও না; অন্যায় কার্য্য করিলে, তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। এরূপ কার্য্য করা উচিত নহে। পরস্ব হরণে কি কি প্রত্যবায় আছে, সদাত্মার উত্তেজনায় আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা চিন্তা করিয়া লইতে পারি। অসৎ কার্য্যের উপক্রমে আমাদের মনে হঠাৎ যে হিতাহিত জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, সেই জ্ঞানকেই আমরা Conscience বলিয়া ধরিলাম ও ন্যায়পরতা বৃত্তি বলিয়াই তাহা বর্ণন করা হইবে।

যেমন বহু পরিবারের কর্ত্তাকে অনেক সৎ ও অসৎ পরিজন লইয়া বসবাস করিতে হয়, তেমনি আমাদিগের সদাত্মা অনেক সৎ ও অসৎ বৃত্তির সহিত হৃদয় মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। যখন পরিজনেরা ক্রমে অসৎ হইয়া সর্ব্বদা অন্যায় কার্য্য করিতে থাকে, কর্ত্তাকে কিছু মাত্র গ্রাহ্য করে না, তখন মহাত্মা গৃহস্বামী যেমন বাটীর কোন নির্জ্জন স্থানে স্থির ভাবে কাল যাপন করেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, সেইরূপ মনুষ্যের অসৎ প্রবৃত্তি ঘোরতর প্রবল হইয়া সর্ব্বদা অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সদাত্মা আর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না; ক্রমে ক্রমে সদাত্মা তিরোহিত হইয়া যান। ন্যায়পরতা বৃত্তি মনোবৃত্তির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহার দ্বারা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষা হইতেছে। সংসারে সামঞ্জস্য থাকিবার এক মাত্র কারণ ন্যায়পরতা। যদি এই জগতের সমস্ত লোক ন্যায়পরায়ণ হইয়া চলিত, তাহা হইলে, সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য বিচারপতিগণের কিছু মাত্র

কষ্ট বোধ করিতে হইত না। তাহাই বা কেন বলিতেছি, ন্যায়-পরায়ণ সংসারে বিচারালয় ও বিচারপতিরই বা কি প্রয়োজন থাকিত? ঈশ্বর মনোবৃত্তি রূপেই সকল নর নারীর মনে আবির্ভূত হইয়া আছেন, তাঁহার অন্য রূপ কল্পনা করা কেবল আমাদিগের মূর্খতা মাত্র। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যখন দেবগণ আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্তব করিতেছেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে হস্তপদ-বিশিষ্ট কোন মূর্ত্তি কল্পনা না করিয়া নিম্ন লিখিত কথায় স্তুতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।"

'তুষ্টি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ভক্তি রূপেণ সংস্থিতা' ইত্যাদি এই স্তব পাঠে আমাদিগের বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, যাঁহার দ্বারা এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি নর বা নারী নহেন, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই; কিন্তু এই সংসারের যাবতীয় শক্তিতে তিনি সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই বায়ু, তিনিই অগ্নি, তিনিই জল, তিনিই আকাশ ও তিনিই শান্তি। তিনিই ন্যায়পরতা বৃত্তি রূপে আমাদিগের হৃদয়ে বিরাজমান হইয়া আছেন। যেমন গোস্বামী মহাশয়েরা দুই কৃষ্ণের উল্লেখ করিয়া আপনাদিগের মতের পোষকতা করিয়া থাকেন, সেই রূপ কোন বিদেশীয় পণ্ডিত ভাল মন্দের মীমাংসা করিবার জন্য এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের দুই জন কর্ত্তা স্থির করিয়াছেন। এক জন সকল মঙ্গলের আলয়, অপর জন সমস্ত অনিষ্টের মূল। সর্ব্ব মঙ্গলময়ের নাম ঈশ্বর, আর অসৎ বৃত্তির অধিষ্ঠাতার নাম শয়তান। যেমন উপরোক্ত ঐ দুই জন কর্ত্তা এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সমভাবে একাধি-

সত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, সেইরূপ মনুষ্যের মনেও তাঁহারা সৎ ও অসৎ বৃত্তি রূপে বিরাজিত আছেন।

আমরা যাহাতে অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া দণ্ডের ভাজন না হই, এই জন্য দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয় মন্দিরে ন্যায়-পরতা বৃত্তি দিয়াছেন। এই ন্যায়পরতা বৃত্তিকে যুক্তি ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা উত্তেজিত করিতেছে; অন্য দিকে শয়তান কুপ্রবৃত্তি রূপে আমাদিগের দেহক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছে। কোন একটি কার্য্য উপস্থিত হইলে, মনোমধ্যে যে কুপ্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তির ঘোর বাগ্বিতণ্ডা হইয়া থাকে, ইহা আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি। বোধ কর, কোন পল্লীর এক জন ধনাঢ্য লোক তাঁহার এক জন আত্মীয়ের উপর একটি মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। সেই মোকদ্দমার পোষকতার জন্য দুই চারি জন মাননীয় অথচ প্রাচান সাক্ষীর প্রয়োজন। পল্লীর মধ্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত মাননীয় ব্যক্তি, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; তাঁহার বয়ঃক্রমও যষ্টি বর্ষের অধিক হইয়াছে। এই জন্য ঐ ধনী ব্যক্তি মনে মনে অনুমান করিলেন যে, যদি মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার সাপক্ষে মিথ্যা-সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে, আমি অবশ্যই এ মোকদ্দমায় জয় লাভ করিব; তবে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার করিবেন কি না বলিতে পারি না। লোক মুখে শুনিয়াছি, আজ কাল তাঁহার ভয়ানক অর্থ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, অর্থের প্রলোভন দেখাইবার এই উপযুক্ত সময়, এই কষ্টের সময় অধিক অর্থের লালসা বোধ হয় তিনি কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই পরামর্শই সঙ্গত বোধ করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক দিবস তাঁহার

বাটীতে কৌশলে ডাকাইয়া আনিলেন ও নিভৃত স্থানে উপবেশন করাইয়া কহিলেন—মুখোপাধ্যায় মহাশয়, একটি কার্য্য উপস্থিত আছে, তাহাতে আপনার বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইতে পারে। আপনি যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে, সে প্রস্তাব উপস্থিত করি। মুখোপাধ্যায় কহিলেন যে, সে কার্য্যের আদ্যন্ত না শুনিয়া কি প্রকারে তাহাতে স্বীকৃত হইতে পারি। ধনী কহিলেন,—আর কিছুই নহে, আমার উপস্থিত মোকদ্দমায় আপনি যদি গোটা কতক অসত্য কথা কহেন, তাহা হইলে, আমি আপনাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিতে প্রস্তুত আছি। অগ্রে হস্তে টাকা লইয়া কার্য্য করুন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।

এই কয়েকটি কথা ব্রাহ্মণের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ব্রাহ্মণের অসৎ প্রবৃত্তি অমনি নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি মুহূর্ত্ত কালের জন্য মনে মনে ভাবিলেন—বড় কষ্ট পাইতেছি, টাকাগুলি লইলে আপাততঃ সমুদয় কষ্ট দূর হইয়া যায়। সেই মুহূর্ত্ত কালের মধ্যেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য যতদূর ভাবিতে পারে, উক্ত ব্রাহ্মণ তৎ সমুদয় চিন্তা করিয়া লইলেন। যখন ধনীর প্রস্তাবে সম্মতি দানের উপক্রম করিতেছেন, সেই সময় ন্যায়পরতা বৃত্তি ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। ন্যায়পরতা যেন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—অসৎ প্রবৃত্তির বশীভূত হইও না, ধনের প্রতি লোভ করিও না। যদিও দারিদ্র্য দশায় পড়িয়াছ, তথাচ ন্যায় যুক্তি ও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিও না। তুমি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলিয়াই ঐ নরাধম ধনী তোমাকে বিপুল অর্থ প্রদান করিতে চাহিতেছে। বিচারপতিগণও তোমাকে ন্যায়পরায়ণ বলিয়া জানেন, এই

জন্য তোমার অসত্য কথাও একবার সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবেন; কিন্তু তুমি সাক্ষ্য দিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিবা মাত্রই প্রতিবেশি-গণ তোমাকে ঘোর প্রবঞ্চক জ্ঞান করিবে। তুমি ষষ্টি বৎসরে যে সম্ভ্রম টুকু সঞ্চয় করিয়া ছিলে, তাহা এক দিবসের অন্যায় কার্য্যে লোপ পাইয়া যাইবে সংশয় নাই। যে অর্থের লোভে তুমি অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছ, সে অর্থে চির কালের জন্য তোমার দুঃখ ঘুচিবে না : কিন্তু সেই কয়েকটা মুদ্রার জন্য চির কালের নিমিত্ত মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলিয়া কুযশ থাকিবে। ন্যায়পরতা বৃত্তি এইরূপ চিন্তা হৃদয়ে উদ্দীপন করিয়া দেওয়ায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অমনি চমক হইল। ভাবিলেন, কি, আমি অর্থ লোভে অন্যায় চরণে প্রবৃত্ত হইব? কখনই না। যদি অন্নাভাবে সপরিবারের মৃত্যু হয়, তথাচ অর্থের জন্য ন্যায়পরতা পরিত্যাগ করিব না। ধনবান্ ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে কহিলেন, মহাশয়, আমি নিঃস্ব বলিয়া কি আমায় বাটীতে ডাকিয়া অপমান করিলেন? অবশেষে সপরিবারে ভিক্ষা করিয়া খাইব, কেন না, ভিক্ষাজীবীর জন্য সকলেরই দ্বার উদ্ঘাটিত আছে; তথাচ ন্যায়পরতা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। সংসার আবর্ত্তনে পড়িয়া মনুষ্য মাত্রেই পর্য্যায় ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। দুঃখের সময় যে আপনার মান মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অসৎ বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহার ন্যায় নরাধম আর নাই। নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন—ধর্ম্মপথে থাকিলে অর্দ্ধ রজনীতেও অন্ন মিলিতে পারে। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অর্থ পরিপূরিত কথাগুলি শুনিয়া ঘোর স্বার্থপর ধনীরও ক্ষণপ্রভার ন্যায় মনে

একটু চৈতন্য উদয় হইয়াছিল ; কিন্তু দীর্ঘ কাল ধরিয়া কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়াছে বলিয়া তাহার সে চৈতন্য স্থায়ী হইল না।

কেহ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন যে, অর্থ কষ্টে পড়িলেই লোকের ন্যায়পরতা বৃত্তি লোপ পাইয়া যায়। অর্থের আঘ্রাণ পাইলে, সে ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে চাহে। দরিদ্রতাই সমস্ত অসৎ প্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ, এ কথা সাধারণের উপর প্রয়োগ করিতে পারা যায় না ; কারণ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুরপনেয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিরাও ন্যায়পরতা বৃত্তি বিস্মৃত হয় না। তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

সিসিলি দ্বীপের এক বহু জনাকীর্ণ নগর এটনা পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। এই অগ্ন্যুৎপাতের সময় বহু দূরস্থ নগর ও উপনগরের লোকেরাও প্রাণভয়ে নানা স্থানে পলায়ন করিয়াছিল। সেই উপদ্রবের দীর্ঘ কাল পরে একটি প্রায় অশীতি বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা কোন গ্রামের নিকটবর্ত্তী বন মধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণের জন্য ইতঃস্তত বিচরণ করিতে করিতে একটি হস্তিদন্ত নির্ম্মিত সুন্দর বাক্স প্রাপ্ত হইল। সেইটি হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবার সময় সে বুঝিতে পারিল যে, বাক্সটি স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রায় পরিপূর্ণ আছে। বৃদ্ধা ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে বাক্সটি আত্মসাৎ করিতে পারিত ; কিন্তু এই দুরবস্থাতেও বৃদ্ধার মন হইতে ন্যায়পরতা তিরোহিত হয় নাই। সে মনে মনে ভাবিল, বাক্সটি এই অবস্থাতেই আমি রাজ প্রতিনিধির হস্তে অর্পণ করিব। তিনি অনুসন্ধান করিয়া যদি ইহার প্রকৃত অধিকারীকে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে,

এই সম্পত্তি তাঁহাকে অর্পণ করিবেন, নতুবা রাজনিয়মানুসারে রাজপ্রতিনিধির মনে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই ন্যায়পরায়ণা বৃদ্ধা বহু কষ্টে রাজ প্রতিনিধির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সবিনয়ে নিবেদন করিল—ধর্ম্ম অবতার! আমি নিবিড় বন মধ্যে কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়া এই বাক্সটি প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু এটি কাহার সম্পত্তি তাহা জানি না। আপনি দেখুন, এই বাক্সের ডালার উপর স্বর্ণাক্ষরে কি লেখা রহিয়াছে। নাম পাঠ করিয়া যদি ইহার প্রকৃত অধিকারীকে চিনিতে পারেন, তাহা হইলে, এ বাক্স তাঁহাকেই অর্পণ করিবেন। তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দেন: কারণ আমার ন্যায় দরিদ্র স্ত্রীলোক বোধ হয় এতদ্দেশে আর নাই। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা রাজপ্রতিনিধির সম্মুখে বাক্সটি রাখিল।

রাজপ্রতিনিধি শিল্পী দ্বারা বাক্সটি উদ্‌ঘাটন করাইয়া দেখিলেন যে, তাহার মধ্যে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। তিনি বৃদ্ধার এই অসম্ভাবিত ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কহিলেন—জননি! আমার বোধ হয়, তুমি কোন উচ্চকুলোদ্ভবা রমণী হইবে, এতগুলি স্বর্ণমুদ্রার লোভ সহজে সম্বরণ করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তুমি এই দৈন্যদশাগ্রস্ত হইয়াও তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছ, এই জন্য ঈশ্বর অবশ্যই তোমার এই ন্যায়পরায়ণতার উচিত পুরস্কার দিবেন।

মহাভারতে ন্যায়পরতা বৃত্তির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ধর্ম্ম, যুধিষ্ঠিরের ন্যায়পরায়ণতা পরীক্ষা করি-

G D HAZRA & BROTHERS

বার মানসে পাণ্ডবাশ্রমের অনতি দূরে একটি মায়া সরোবর সৃজন করিয়া আপনি তাহার তীরস্থ কোন বৃক্ষে বিরূপাক্ষ পর্ব্বতোপম যক্ষ রূপে বসিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে সেই সময় নকুল মৃগয়া-পরিশ্রমে কাতর হইয়া সেই মায়া সরোবরে জল পান করিতে অগ্রসর হন। নকুলকে দেখিয়া যক্ষ রূপী ধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"ওহে, তুমি ক্ষান্ত হও, এ সরোবর আমার পূর্ব্ব পরিগ্রহ, ইহার জল স্পর্শ করিও না। তবে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে, তদুত্তর করিলে পর জল পান করিতে ও আহরণ করিতে সমর্থ হইবে।" পিপাসা পীড়িত নকুল সেই কথায় কর্ণপাত না করিয়া যেমন সরোবরে জল পান করিতে নামিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল; তদীয় মৃত শরীর সেই মায়া সরোবরে ভাসমান হইয়া রহিল। নকুলের ন্যায় সহদেব, ধনঞ্জয় ও ভীম যক্ষরূপী ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া মায়া সরোবরের সলিল স্পর্শ মাত্রেই মৃত হইলেন এবং তাঁহাদিগের মৃত শরীরও সেই সরোবর জলে ভাসিতে লাগিল। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিলম্ব দেখিয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের তত্ত্ব জানিতে স্বয়ং সেই মায়া সরোবরের তীরে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মৃত দেহ সরোবর সলিলে ভাসিতেছে। এই হৃদয় বিদারক ঘটনা দেখিয়া যুধিষ্ঠির একেবারে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে, ছদ্মবেশী ধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"মহারাজ! আমিই তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছি এবং আমার যে প্রশ্ন আছে, তৎ সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে তোমাকেও অনুজগণের অনুসরণ করিতে হইবে।" যুধিষ্ঠির

যক্ষের মুখে অর্থ পরিপূরিত কথা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইলেন এবং সবিনয়ে কহিলেন—"আপনার প্রশ্নগুলি বলুন, আমি সাধ্যমত তাহার উত্তর দানে চেষ্টা করিব।" ছদ্মবেশী ধর্ম্ম পর্য্যায় ক্রমে প্রশ্নগুলি আবৃত্তি করায় যুধিষ্ঠির তাহার উচিত উত্তর দানে ধর্ম্মরাজকে পরিতুষ্ট করিলেন।

পরে ছদ্মবেশী ধর্ম্মরাজ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! তুমি আমার সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দ্বারা আমাকে পরম আপ্যায়িত করিলে। এক্ষণে আমি তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে এক জনকে পুনর্জ্জীবিত করিব; তুমি কাহার পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা কর?" যুধিষ্ঠির নকুলের পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করাতে যক্ষরূপী ধর্ম্ম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "সে কি! ভীমসেন ও মহারথী অর্জ্জুন তোমার সহোদর এবং পাণ্ডবকুলের পরিরক্ষক, তাঁহাদের উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হীনবল নকুলের জীবন প্রার্থনা করিতেছ কেন?" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে যক্ষ! ধর্ম্মই সর্ব্বরক্ষক ও ধর্ম্মাঘাতেই সর্ব্বনাশ হয়। ধর্ম্ম হত হইলেই সকলকে হত করেন এবং রক্ষিত হইলে সকলকে রক্ষা করেন; অতএব আমি ধর্ম্মকে কখন পরিত্যাগ করিব না। আমাকে সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া জানেন; আমি সেই জনশ্রুতি মিথ্যা করিয়া ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিব না। আমার গর্ভধারিণী কুন্তী দেবী দুই পুত্র হারা হইয়াও আমার জীবন সত্ত্বে নিতান্ত অপুত্রা হন নাই এবং আমিই আমার মাতামহ কুলে জলপিণ্ড দান করিতে পারিব; কিন্তু মাদ্রীসুত নকুলকে জীবিত করিয়া না দিলে তাহার মাতামহ কুলে কে জলপিণ্ড দান করিবে? তন্নিমিত্ত সহোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকু-

লের পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। ছদ্মবেশী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের এই সকল কথা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, "তোমার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সংসারে আর নাই। আমিই মায়া প্রভাবে তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে এই মায়াবারিতে ভাসাইয়া রাখিয়াছি। ঐ দেখ! তাহারা সকলেই জীবিত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া ধর্ম্মরাজ অন্তর্হিত হইলেন।

মহাভারতের স্থানে স্থানে এই প্রকারে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ন্যায়পরায়ণতার চমৎকার চমৎকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন দুর্য্যোধন মাৎসর্য্য বশতঃ বনবাসী যুধিষ্ঠিরকে আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য সপরিবারে প্রভাস তীর্থে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। গন্ধর্ব্বপতি ভুজবলে কুরুবলকে দুর্ব্বল করিয়া সপরিবারে দুর্য্যোধনকে পাশ অস্ত্রে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। রাজা বন্দী শুনিয়া কুরু সৈন্য চারি দিকে ভঙ্গ দিল। গন্ধর্ব্বরাজ অক্লেশে দুর্য্যোধন ও তাঁহার পরিবারবর্গকে নিজ রথে তুলিয়া স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। দুর্য্যোধনের মহিষী ভানুমতী এই আসন্ন বিপদ্ উদ্ধারের উপায়ান্তর না দেখিয়া এক জন সৈনিক পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাতঃ! তুমি দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ, এই সংবাদ সত্বর ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত কর। যদিও আমার স্বামী আজন্ম কাল তাঁহার পদে অপরাধী আছেন, তথাচ আমরা সকলে কায়মনে তাঁহার চরণে শরণ লইলাম। তুমি আমার নাম করিয়া কহিও যে, আপনার ভ্রাতৃবধূগণকে গন্ধর্ব্বপতি হরণ করিয়া লইয়া গেল। তিনি আমাদিগের এই কাতরোক্তি শুনিয়া কখনই স্থির

থাকিতে পারিবেন না, কেন না, তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সংসারে আর নাই।” সৈনিক যে আজ্ঞা বলিয়া ত্বরিত গমনে কাম্যবনে প্রবেশ করিল এবং রাজব্যবহারে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে শির অবনত করিয়া করযোড়ে কহিতে লাগিল, “হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি আমাদিগের সর্ব্বোপরি প্রভু, মহারাজ দুর্য্যোধন প্রভাস তীর্থে স্নান দান করিতে আসিয়া সপরিবারে চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছেন। এই মহা বিপদ্ কালে আপনি ব্যতীত তাঁহার আর দ্বিতীয় বান্ধব নাই। আত্ম পক্ষীয়েরা যে কে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান হইল না। এই জন্য আপনার ভ্রাতৃবধূ মহারাজ্ঞী ভানুমতী আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বিশেষ করিয়া এই কয়েকটি কথা আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতে বলিয়াছেন যে, যদি আমার স্বামীকে তাঁহার চরণে অপরাধী জ্ঞানে তিনি আমাদিগের উদ্ধারে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে, তাঁহার নির্ম্মল যশে কলঙ্ক হইবে। আমরা চিত্ররথের হস্তে কোন ক্রমেই কুলনাশ করিব না। আপনি আমাদের উদ্ধারে উপেক্ষা করিলেন, এই কথা শ্রুত মাত্রেই আমরা আত্মঘাতিনী হইব।” কুলবধূগণ বিপদে পড়িয়াছেন, এই কথা শ্রবণ মাত্রেই যুধিষ্ঠিরের দুই চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, তিনি দুর্য্যোধনের পূর্ব্বকৃত অপরাধ একেবারে ভুলিয়া গেলেন এবং ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভাই, শুনিলে ত? দুরাত্মা চিত্ররথ ভানুমতী প্রভৃতি আমাদিগের ভ্রাতৃবধূগণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আর কাল বিলম্ব করিও না, সত্বরে তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন কর। শত্রুপক্ষ জ্ঞানে এ সময়ে দুর্য্যোধনকে উপেক্ষা করিলে, পাণ্ডবগণকে সংসারে আর কেহই ন্যায়পরায়ণ কহিবে

G. D. HAZRA & BROTHERS

না। দুর্য্যোধনের উপর ভীম ও ধনঞ্জয়ের বিজাতীয় ক্রোধ ছিল, এই জন্য তাঁহার উদ্ধার সাধনের প্রস্তাব লইয়া, ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বাগ্বিতণ্ডা হইয়াছিল। অবশেষে মহারাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে রাজনীতির কৌশলে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধনের উদ্ধার সাধনে পাঠাইলেন। অর্জ্জুন অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই চিত্ররথ গন্ধর্ব্বকে পরাস্ত করিয়া সপরিবারে দুর্য্যোধনকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

মুসলমান বাদশাহগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ন্যায়পরায়ণতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। গিজ্‌নিপতি সুলতান মামুদ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সহিত রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতেন। তিনি দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতবাসীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। একদা এক জন ওমরাহ আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গোপনে কহিলেন—জাঁহাপনা! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতেছেন। আমার সহধর্ম্মিণীর ন্যায় সুন্দরী স্ত্রী গিজ্‌নিতে আর নাই। যুবরাজ সেই সুন্দরীকে দর্শনাবধি একেবারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, অদ্য রজনীতে তাহাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিবেন। আপনি আদেশ করুন, আমি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে অন্যত্র গমন করি। মামুদ কহিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আপন বাটীতে অবস্থান কর, আমি স্বয়ং শস্ত্রপাণি হইয়া অদ্য রজনীতে তোমার অন্তঃপুর রক্ষা করিব। আমার একটি মাত্র আদেশ প্রতিপালন করিবে, অদ্য রজনীতে তোমার অন্তঃপুর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখিও। ওমরাহ যে আজ্ঞা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সুলতান মামুদ সন্ধ্যার পর অস্ত্রধারী হইয়া ওমরাহের বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং একটি নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া পরস্ত্রী লোলুপ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রজনী প্রহরাতীত হইলে, বাদশাহ দেখিতে পাই-লেন যে, এক জন অস্ত্রধারী বীরপুরুষ দ্রুতপদে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া এক আঘাতেই তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 'লম্পটের শিরশ্ছেদন করিয়াছি!' বাদশাহ এইরূপ চীৎকার করিয়া উঠায় ওমরাহ একটি প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ে আলো ধরিয়া দেখিলেন, যে ব্যক্তি হত হইয়াছে, সে বাদশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র নহে, এক জন প্রধান সেনাপতি। তদ্দৃষ্টে সুলতান মামুদ পরম আহ্লাদের সহিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র যে এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয় নাই, তজ্জন্য আমি পরম সুখী হইলাম। আমার বংশে কেহ যেন লম্পটতা-চরণে প্রবৃত্ত না হয়। তাহা হইলে, ভ্রাতুষ্পুত্র কি, ঔরসজাত পুত্র হইলেও আমি স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদন করিব। বাদ-শাহের এই ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় পাইয়া গিজনি রাজধানীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত যুবকেরা সাবধান হইয়া উঠিল। পুরাণ ও ইতিহাসে এইরূপ ন্যায়পরতার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অধিক সঙ্কলন করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করা নিষ্প্রয়োজন।

কিরূপ প্রকৃতির লোক হইলে, প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যায়পরায়ণ হইতে পারে, তাহাই বিবৃত করা যাইতেছে। যে ব্যক্তি বিচারা-সনে বসিয়া স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন না, পরিশ্রমে কাতর

হন না, আত্মীয় কিম্বা গুরুজনের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পক্ষপাত শূন্য হইয়া সত্যাসত্য ও ন্যায় অন্যায়ের অনুসন্ধান করেন এবং সুবিচারের অনুরোধে দয়াকে একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেন, তিনিই যথার্থ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। যাঁহার শরীরে অধিক দয়া তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া ডাক, কিন্তু ন্যায়-পরায়ণ বলিতে পার না। যিনি বিচারাসনে বসিয়া অনুরোধ রক্ষা করিবার চেষ্টা দেখেন, তাঁহাকে এক পক্ষ পক্ষপাত করিতে হইবেই হইবে। যিনি বিচার কালে ক্রোধ করিয়া থাকেন, তাঁহার দ্বারা ন্যায্য বিচার হইতে পারে না। যিনি পরিশ্রমে কাতর, তিনি বিচার কালে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন। যে স্থলে ধৈর্য্য নাই, সুতরাং সে স্থলে সুবিচারও নাই, ইহা সক-লেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহাকে আমরা ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি বলিয়া সম্বোধন করি, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অব-তারের তুল্য।

ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ এবং পুণ্যবান্ পাপীকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কেন না, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, রাজাধিরাজ মহারাজের এক মাত্র পুত্রও উৎকট পীড়ায় প্রপী-ড়িত হইয়া মৃত্যু মুখে নিপতিত হইল। রাজা ধনবলে কি ভুজবলে কিছুতেই আপনার প্রিয় পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি শান্ত ভাবে ঈশ্বরের সেই অভিপ্রেত কার্য্য অনায়াসে সহ্য করিয়া রহিলেন। এমত স্থলে যদি পরের প্রাণ দিয়া আপন পুত্রের প্রাণ রক্ষার উপায় থাকিত, তাহা হইলে, আপন পুত্রের বিনিময়ে রাজা দশটি

বালকের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিতেন, ন্যায় অন্যায়ের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিতেন না। যদি এরূপ একটি নিয়ম থাকিত যে, লক্ষ টাকা মূল্যের ঔষধ সেবন করাইলে, আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে মনুষ্য মাত্রকেই রক্ষা করা যায়। তাহা হইলে, ধনী সন্তান-দিগের কোন কালেই মৃত্যু ঘটিত না। এ দিকে ধনহীনেরা চীৎকার শব্দে ঈশ্বরকে 'পক্ষপাতী' বলিত; কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম তাহা নহে, ছোট বড় সকলকেই সমভাবে মরিতে হইতেছে। শারী-রিক নিয়ম প্রতিপালনের ত্রুটি ঘটিলে, সমভাবে সকলের অদৃষ্টে সমান ফল ফলে। অগ্নিতে হস্ত দিলে, কি ধনী কি নির্ধন সক-লেরই হস্ত দগ্ধ হইবে। জলে মগ্ন হইলে, কি সবল কি হীনবল সকলেরই নিশ্বাস রোধ হইবে। মহৌষধ সেবন করিলে, ক্ষুদ্র ভদ্র সকলের পক্ষেই সমান ফল হইবে। পরিশ্রম সহকারে জ্ঞানানু-শীলন করিলে, কি দরিদ্র কি ধনী, কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী সকলেরই জ্ঞান জন্মিবে। বিপদ্ কালে ঈশ্বরকে ডাকিতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। এই সকল সুনিয়ম দেখিয়া কেবল এক ঈশ্বরকেই যথার্থ ন্যায়পরায়ণ বলিতে ইচ্ছা করে।

ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, তাঁহার নিকট অবিচার নাই। তিনি আমা-দিগের দোষের উচিত দণ্ড বিধান অবশ্যই করিয়া থাকেন। এ দিকে আবার তিনি দয়াময়, তিনি জীবের প্রতি সর্ব্বদাই দয়া-বারি সেচন করিতেছেন। এই দুই বিষয়ের সামঞ্জস্য কিপ্রকারে থাকিবে, তাহা দেখাইবার জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা একটি নূতন কথা উদ্ভাবন করিয়াছেন। পাপের উচিত দণ্ড ভোগ করিতে গেলে, সংসারের প্রায় সমস্ত লোককেই নরকগামী হইতে হয়।

D. HAZRA & BROTHERS

অন্য দিকে দয়াময় ঈশ্বর যদি পাপিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, পাপের দণ্ড এক কালে রহিত হইয়া যায়। এই উভয় সঙ্কটে পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে অবনীতে জন্ম গ্রহণ করিতে বলেন। সেই খ্রীষ্ট জগতের লোক সমূহের পাপ আপন মস্তকে লইয়া মহাপাতকীর ন্যায় উৎকট দণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। এক্ষণেও যিনি মহা প্রায়শ্চিত্তকারী খ্রীষ্টকে ত্রাতা বলিয়া মান্য করিবেন, তাঁহাকে আর অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। যাঁহারা মানবের মুক্তির পক্ষে এই নূতন যুক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। একের পাপের জন্য অন্যে দণ্ড ভোগ করিবে কেন? কোন ব্যক্তির পিতা চুরি করিয়াছে, বিচারে কঠোর পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাবাস তাহার প্রতি আদেশ হইল। ঐ ব্যক্তির এক জন বলবান্ পুত্র পিতার কারাবাসের আদেশ শুনিয়া বিচার-পতির নিকট গিয়া আবেদন করিল—মহাশয়, পিতার বিনিময়ে আমার প্রতি ঐ রূপ দণ্ড ভোগের আদেশ হউক। আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি গুরুদণ্ড ভোগ করিতে পারিবেন না। এরূপ আবেদন কি ধর্ম্মাধিকরণে গ্রাহ্য হইতে পারে? কখনই না। আমার পঞ্চম বর্ষীয় একটি শিশু সন্তান অনভিজ্ঞতা বশতঃ প্রজ্জ্বলিত দীপ শিখায় একটি অঙ্গুলী দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তজ্জন্য জ্বালায় অস্থির হইয়া রোদন করিতেছে। এরূপ অবস্থায় আমি কি বলিতে পারি যে, 'তুই অনভিজ্ঞতা বশতঃ অন্যায় কার্য্য করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিস্। এখন সেই যন্ত্রণা আমাকে দে, আমি পিতা হইয়া আর তোর কষ্ট দেখিতে

পারি না।' কোন ধনবান্ ক্রোধ রিপুর পরতন্ত্র হইয়া আপন কিঙ্করকে হত্যা করিয়াছে। বিচারে তাহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইল। অপরাধী বিচারপতির নিকট আবেদন করিল যে, আমার বিনিময়ে দুই জন ক্রীতদাস ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে, অতএব আমার এই আবেদন গ্রাহ্য হউক। যদি সত্য সত্যই এরূপ আবেদন করে, তাহা হইলে, বিচারপতি তাহাকে উন্মাদ জ্ঞানে হাস্য করিবেন। যদি এরূপ আবেদন রাজ নিয়মে গ্রাহ্য না হয়, তবে মহাপাতকী নরাধমেরা খ্রীষ্টের দোহাই দিয়া কি প্রকারে নরক হইতে নিস্তার লাভ করিবে? বিশেষতঃ, এক ব্যক্তির উৎকট দণ্ড ভোগে জগৎ শুদ্ধ লোকের নিস্তারের পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা আর কি আছে? যাহা হউক, খ্রীষ্টমতাবলম্বীরা ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা ও দয়ার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া যুক্তি সঙ্গত মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

দশরথাত্মজ রামচন্দ্রকে অনেকেই সর্ব্বগুণান্বিত রাজা বলিয়া থাকেন; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহাকে ন্যায়পরায়ণ রাজা কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না। রঘুবংশীয়েরা প্রজা-রঞ্জন করাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া অবধারিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পুরুষের সেই গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া তিনি যখন প্রজারঞ্জনের অনুরোধে পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রীকে নিবিড় অরণ্য মধ্যে সিংহ শার্দ্দূলের মুখে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে ন্যায়পরায়ণ রাজার পরিবর্ত্তে স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজসিংহাসনে বসিয়া কেবল এক প্রজারঞ্জন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য

ছিল। পাঠকগণ, সর্ব্ব কাল ও সর্ব্ব বিষয়ে ন্যায়পরায়ণ হইয়া চলা অতি দুরূহ ব্যাপার। এক একটি সদ্বৃত্তির সম্যক্ চালনা করিতে গেলে, অন্যান্য সদ্বৃত্তির প্রতি অবহেলা করিতে হয়। যাঁহার শরীরে অধিক দয়া, তিনি সর্ব্বতোভাবে ন্যায়পরায়ণ হইতে পারেন না। তবে এই প্রস্তাবের স্থানে স্থানে যে সকল মহানুভবগণের ন্যায়-পরায়ণতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সাময়িক বলিতে হয়। তাঁহারাও আজন্ম কাল সকল কার্য্যে ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

পাঠকগণ, সদাত্মার উত্তেজনায় সদসৎ বিবেচনা দ্বারা যতদূর ন্যায়পরায়ণ হইয়া চলিতে পারেন, তাহার সমূহ চেষ্টা দেখিবেন। সদাত্মার উত্তেজনা-তেই আমরা কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে পারি। যদি এই বৃত্তি আমাদিগের হৃদয়ে না থাকিত, তাহা হইলে, আমাদিগের যে সকল বৃত্তি কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর, তাহারা প্রবল হইয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে অন্যায় পথে বিচরণ করাইত এবং আমরাও পদে পদে অন্যায় আচরণ করিয়া তাহার ফল ভোগ করিতাম। যিনি সদাত্মার উত্তেজনায় কার্য্য করেন, তিনি কখনও কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অবহেলা করেন না, যাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা অবশ্যই করিয়া থাকেন। হে পাঠকগণ! আপনারা কখনও ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যায় পথে বিচরণ করিবেন না, তাহা হইলে, মনের সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবেন।
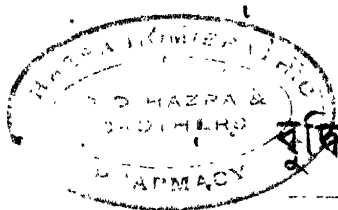
বুদ্ধি বৃত্তি।

যে বৃত্তি দ্বারা আমাদিগের বোধ জন্মে, যে বৃত্তি দ্বারা আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারি, যৌবনে নানা উপায়ে আমরা ধন উপার্জ্জন করিতে পারি, বহু সংখ্যক লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম হই, বিপদ্ কালে বিপদুদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি, সম্পদ কালে পরিমিতাচারে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারি, স্বার্থপর লোকদিগের প্রতারণা জাল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি, কোন দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারি এবং যে বৃত্তি দ্বারা আমরা সংসারের সমুদয় কার্য্য যথা নিয়মে সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি, সেই বৃত্তিকেই বুদ্ধি বৃত্তি কহে।

পণ্ডিতেরা কহেন যে, প্রত্যেক মনুষ্যের মস্তিষ্কে একটি বুদ্ধির স্থান নির্ণীত আছে। নিতান্ত শৈশবাবস্থায় সেই স্থানে বুদ্ধি জড়ের ন্যায় অবস্থান করে, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য জগতের সহিত মনুজকুলের যত পরিচয় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে বুদ্ধি বৃত্তিরও স্ফূর্ত্তি পায়। বালকেরা শৈশবাবস্থা হইতেই বুদ্ধির চালনা করিতে থাকে। দেখা গিয়াছে যে, কোন দুই তিন বর্ষ বয়স্ক বালক জননীর স্তন্য পান করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিত। দুই বৎসরের মধ্যেই তাহার জননীর আর একটি সন্তান জন্মিয়াছিল; সুতরাং জননী বাধ্য হইয়া সেই নব প্রসূত শিশুকেই অধিক ক্ষণ স্তন্য পান করাইতেন। তদ্দৃষ্টে প্রথম জাত বালক মনে মনে ভাবিল যে, আমার ভ্রাতা সত্ত্বে আমি আর ভাল করিয়া স্তন্য পান করিতে পাইব না, অতএব বস্ত্র দ্বারা ইহার বদন

[library stamp, illegible]

আচ্ছাদন করিয়া রাখি, তাহা হইলে, আর ও স্তন্য পান করিতে পাইবে না। এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়া একখানি বস্ত্র দ্বারা আপন সহোদরের মুখ চাপিয়া রাখিল। তাহার মাতা যখন শিশুটিকে স্তন্য পান করাইতে আসিলেন, তখন ঐ প্রথম জাত বালক কহিল—'মা, খোকা আর দুধ খাবে না, ও রাগ কোরে ঘুমুচ্চে, তুমি আমাকে দুধ দাও। তুমি যদি আমাকে ভাল কোরে দুধ খেতে না দাও, তা হলে, আমাকে কাণ কাটায় ধোরে নিয়ে যাবে।' এই রূপ বুদ্ধিকে বালকের সামান্য বুদ্ধি কহিয়া থাকে। যদিও বালক বুদ্ধি দ্বারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিল না, তথাচ আপনার ক্ষমতা মত বুদ্ধির চালনা করিয়া জননীকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা দেখিয়া ছিল। এক্ষণে দেখা উচিত যে, উপরোক্ত বালকের প্রতারণা যুক্ত বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল? কে তাহাকে এরূপ প্রতারণা করিতে শিখাইল? অনুমানে বোধ হয় যে, প্রয়োজনানুসারে লোকের বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। বালকের স্তন্য পানের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই জন্য চিন্তা করিতে করিতে আপনার যত দূর বোধ জন্মিয়াছে, সেই মত একাকী দুগ্ধ পান করণের একটি উপায় উদ্ভাবন করিল; কিন্তু তৎকালে তাহার সম্ভব ও অসম্ভব বোধের স্ফূর্ত্তি হয় নাই বলিয়া সে বুদ্ধি ফলবতী হইল না।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষীয় কোন কোন বালক স্কুলে যাইতে অত্যন্ত ভয় করে। সেই জন্য যাহাতে স্কুলে যাইতে না হয়, তাহার অনেক উপায় অনুমান দ্বারা উদ্ভাবন করিয়া থাকে। কোন দিন একটি বালকের নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, অদ্য স্কুলে যাইব না। সেই জন্য মনে মনে অনুমান করিল যে, যদি

আমি কোন পীড়ার ভাণ করি, তাহা হইলে, মা আমাকে স্কুলে যাইতে নিষেধ করিতে পারেন। এই ভাবিয়া বালক বদন কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া তাহার জননীকে কহিল—মা, আমার বড় মাথা ধরিয়াছে, মাথা তুলিতে পারিতেছি না। তৎ শ্রবণে জননী কহিলেন—তবে আর অদ্য স্কুলে যাইও না, স্থির হইয়া একটু নিদ্রা যাও। বালক সে সময় তাহাই করিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে বালক শয্যা হইতে উঠিয়া জননীকে কহিল—মা, মাথা ধরা ভাল হইয়াছে, আর কিছুই নাই। জননীও তাহাই বিশ্বাস করিলেন। বালক নিশ্চিন্ত হইয়া সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক আরম্ভ করিল।

বুদ্ধি নানা প্রকার। কতকগুলি লোকের অসাধারণ স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে। কাহারও কাহারও উপার্জ্জিত বুদ্ধির প্রভাব অধিক। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে জাতি গত ও পরিবার গত বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এক এক জনের বহুদর্শিতা জনিত চমৎকার বুদ্ধির উদয় হয়। কেহ কেহ বা আত্মপীড়ক ও পরপীড়ক বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিবেচনা সম্ভূত বুদ্ধি, ভিন্ন ভিন্ন অধিকার গত বুদ্ধি, স্বার্থপর ও প্রতারণাযুক্ত বুদ্ধি, বিরোধ মিটাইবার বুদ্ধি এবং বশীকরণের বুদ্ধি অনেক লোকের আছে। সকল অধিকারে সকলে সমান বুদ্ধি প্রকাশ করিতে পারে না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ নীচ কুলোদ্ভব ও নিরক্ষর গোপাল ভাঁড় আপন অসাধারণ বুদ্ধির কৌশলে দিগ্বিজয়ী ভট্টাচার্য্যকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এক বার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর বিষ নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। হয় ত

ক্রোধ বশতঃ নবাব তাঁহার প্রাণান্ত না করিয়া ক্ষান্ত হই-তেন না। কি উপায় দ্বারা নবাবের ক্রোধানল শীতল হইবে, রাজা বাহাদুরের মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই, কেবল গোপাল ভাঁড়ই আপন স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রভাবে প্রতিপালক রাজা বাহাদুরের ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়াছিল। এইরূপে গোপাল ভাঁড় তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিচয় রাজসভায় অনেক বার দিয়াছিল; সে সকল গল্প বহুল প্রচার বলিয়া এ স্থলে তাহা গৃহীত হইল না। এক্ষণে উপস্থিত বুদ্ধির একটি সামান্য উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে;—

কোন গৃহস্থের গৃহে ঘোর অন্ধকার রজনীতে এক চোর প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহস্বামী অত্যন্ত বলবান্; গৃহে চোর প্রবেশ করিয়াছে অনুমানে বুঝিতে পারিয়া একটি নিভৃত স্থানে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চোর ইতস্ততঃ সুযোগ অনুসন্ধান করিতে করিতে গৃহস্বামীকে দেখিতে পাইয়া তাহার সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পলাইবার উপক্রমে দৈবাৎ পড়িয়া গেল। গৃহ স্বামী সেই সুযোগে দুই হস্তে তাহার দক্ষিণ চরণ বল পূর্ব্বক ধরায় চোর 'ঘা—ঘা—ঘা!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চোরের এই উপস্থিত বুদ্ধি কৌশলে গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ তাহার চরণ ছাড়িয়া দিলেন। কেন ছাড়িয়া দিলেন? অনুমানে বোধ হয় যে, যদি কোন ক্ষত যুক্ত স্থান কেহ না জানিতে, পারিয়া হঠাৎ বল পূর্ব্বক চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে, 'ঘা—ঘা!' বা 'লাগে—লাগে!' এইরূপ চীৎ-কার করিলে স্বভাব বশতঃ লোকে ছাড়িয়া দিয়া থাকে। চোরের সেই কৌশল টুকু মনে উদয় হইয়াছিল। যিনি ধরিয়াছিলেন,

তিনিও স্বভাব বশতঃ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই কথাটি যদিও সামান্য কথা, কিন্তু সেই আসন্ন বিপদ্ কালে চোরের এই অসামান্য উপস্থিত বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল কি না, পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিবার সময় নাই, এরূপ বিপদ্ কালে যাহারা আত্মোদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, তাহাদিগের সেই বুদ্ধিকেই উপস্থিত বুদ্ধি কহা যায়।

এই পৃথিবীর খণ্ড চতুষ্টয়ে নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতির বাস আছে। তাহারা সকলেই হস্তপদ বিশিষ্ট মনুষ্য। ঘর দ্বার বাঁধিয়া বসতি করে, পরিবার পোষণের জন্য পরিশ্রম করে ; কিন্তু সকল জাতির বুদ্ধি সমান নহে। আফ্রিকায় কাফ্রি-জাতিরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত নির্ব্বোধ, তাহারা কৌশল যুক্ত কোন কার্য্যই করিতে জানে না। পক্ষান্তরে ফরাসি ইংরাজ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয়েরা পদে পদে আপনাদিগের অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। জাতি গত বুদ্ধির ন্যায় অনেক স্থলে পরিবার গত বুদ্ধিরও চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক একটি পরিবারের মধ্যে কেহই নির্ব্বোধ হয় না। কোন কোন পরিবার ক্রমান্বয়ে পুরুষানুক্রমে রাজ-মন্ত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কলিকাতা মহা নগরীর মধ্যে দুই একটি পরিবার পুরুষানুক্রমে মুৎসুদ্দির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। পল্লীগ্রামের এক একটি পরিবার জমিদারীর কার্য্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। অনেক প্রধান প্রধান জমিদারেরা সেই বংশীয়দিগকেই আপন আপন জমিদারী কার্য্যে নিয়োগ করিতে সাধ্য মত প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এইরূপ এক এক বিষয়ে
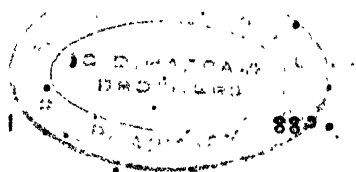
অসাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট লোক এক পরিবারে ক্রমান্বয়ে উদ্ভব হইলেই তাহাকে পরিবারগত বুদ্ধি কহে।

আত্মপীড়ক ও পরপীড়ক বুদ্ধি কাহাকে বলে, নিম্নে তাহারই একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। গ্রীস দেশে আর্টি জরক্‌সেস্ নামে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি জোসিফস্ নামক এক ব্যক্তিকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। জোসিফস্‌ও সময়ে সময়ে তাঁহার উপকার করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিতেন না। দৈব প্রতিকূল বশতঃ আর্টি জরক্‌সেস্ অন্য এক জন রাজা কর্ত্তৃক সম্মুখ যুদ্ধে তিন বার পর্য্যায় ক্রমে পরাভূত হন। আর্টি জরক্‌সেসের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা পুনঃ পুনঃ জয় লাভ করিয়া আর্টি জরক্‌সেস্‌কে একেবারে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তিনি সসৈন্যে রাজধানী আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছেন শুনিয়া আর্টি জরক্‌সেস্ অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং সবিনয়ে আপন প্রিয় সুহৃদ্ জোসিফস্‌কে কহিলেন—সখে, বোধ হয়, এবার আর আত্মরক্ষা করিতে পারিলাম না, শত্রুপক্ষ বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; এরূপ প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। জোসিফস্ কহিলেন—আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমার বুদ্ধি কৌশলেই এবার আপনি শত্রুজয়ী হইবেন। আপনার এক জন নির্দ্দয় কিঙ্কর দ্বারা আমার এই দক্ষিণ কর্ণটি কর্ত্তন করিয়া দিউন এবং কশাঘাতে আমার পৃষ্ঠ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিতে আদেশ করুন, তাহা হইলেই, আমি শত্রু দলন করিতে পারিব। স্বার্থপর রাজা তাহাই করাইলেন। জোসিফস্ যে এক জন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ লোক, পূর্ব্ব হইতেই

অপর পক্ষীয় রাজা লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছিলেন। সেই জোসিফস্ যখন রক্তাক্ত কলেবরে—'মহারাজ! আর্টি জরক্সেসের অত্যাচার হইতে আমার প্রাণ রক্ষা করুন,' বলিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন, তখন তিনি একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া দুই হস্ত ধরিয়া জোসিফস্‌কে উত্তোলন করিয়া কহিলেন—আর্টি জরক্সেস্ কি জন্য তোমার এরূপ গুরু দণ্ড করিয়াছে? জোসিফস্ কহিলেন—মহারাজ! সে কথা ইহার পর বিস্তারে বর্ণন করিব, এক্ষণে ঔষধ পথ্য দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। যদি এ যাত্রা আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলে, আমার দ্বারা ভবিষ্যতে আপনার বিস্তর উপকার সাধিত হইবে। সরল হৃদয় রাজা সেই ধূর্ত্তের কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা তাঁহাকে আরোগ্য করাইয়া আপন প্রধান মন্ত্রীর পদে বসাইলেন; কিন্তু সেই ধূর্ত্ত জোসিফস্ অবশেষে রাজাকে কুমন্ত্রণা দিয়া তাঁহার জীবনান্ত করিলেন এবং সুযোগ করিয়া আর্টি জরক্সেসের নিকট পলাইয়া আসিলেন। জোসিফস্ যে বুদ্ধি দ্বারা এক জন সহৃদয় রাজার সর্ব্বনাশ করিলেন, সেই বুদ্ধিকেই আত্মপীড়ক ও পরপীড়ক বুদ্ধি কহে।

নিম্নে যে বিষয়টি বিবৃত করা যাইতেছে, ইহার এক দিকে বিশ্বাস ঘাতকতা ও অপর দিকে ঘোর চতুরতা দৃষ্ট হয়। যখন কুতবদ্দিন আপন অধিকার বিস্তীর্ণ করিবার মানসে তাঁহার প্রধান সেনাপতি বখ্‌তিয়র খিলিজিকে বঙ্গ দেশ জয় করিতে প্রেরণ করেন, সে সময়ে বঙ্গের রাজসিংহাসনে বৈদ্যকুলোদ্ভব বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন রাজা ছিলেন। যবনেরা বঙ্গ দেশ জয় করিতে

আসিতেছে, এই সংবাদ লক্ষ্মণ সেনের প্রধান সচিব দূত মুখে শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন— রাজা অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে রাজকার্য্যে একবারও মনোনিবেশ করেন না, আমার উপর সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে ইষ্টদেব আরাধনায় কাল হরণ করিতেছেন। এ দিকে প্রবল শত্রু রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। সুশিক্ষিত যবন সৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, আমাদিগের এরূপ সৈন্য সামন্ত নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, বখ্‌তিয়র খিলিজির সহিত সন্ধি করাই যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। রাজ্যেশ্বর অকর্ম্মণ্য, প্রকারান্তরে আমিই এক্ষণে বঙ্গ দেশের রাজা হইয়াছি। সন্ধিই করি, আর যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হই, সে সকলই আমার ইচ্ছাধীন। যবনদিগের সহিত মিলিত হইয়া বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনকে অনায়াসেই দূরীভূত করিতে পারি, তবে এমন সুযোগ কেন পরিত্যাগ করিব? প্রতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতা ব্যতিরেকে কে কোথায় রাজা হইয়াছে?

সচিবের মনে এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির আবির্ভাব হওয়ায়, তিনি স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। রাজ্যেশ্বরের অজ্ঞাতসারে বখ্‌তিয়র খিলিজির নিকট দূত দ্বারা এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমি বঙ্গরাজ্য আপনার হস্তে বিনা যুদ্ধে ন্যস্ত করিয়া দিব; কিন্তু আমাকে এই রাজ্যের করদ রাজা করিয়া রাখিতে হইবে। যদি আপনি আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে, কি প্রণালীতে বঙ্গরাজ্য হরণ করিতে হইবে, তাহার সমুদয় সন্ধি উপদেশ আমি দ্বিতীয় পত্রে লিখিয়া পাঠাইতেছি। ধূর্ত্ত বখ্‌তিয়র খিলিজি সচিবের পত্র পাঠে

বুঝিতে পারিলেন যে, এই নরাধম দুর্ব্বুদ্ধির দাস হইয়া সমূলে নিপাত হইবার উপক্রম করিতেছে। যাহা হউক, যদি সুলভ উপায়ে বঙ্গ দেশ অধিকার করিতে পারি, তাহা হইলে, অনর্থক সৈন্য অপচয়ের প্রয়োজন কি? এক্ষণে লক্ষ্মণ সেনের সচিবের প্রস্তাবেই আমার সম্মতি দেওয়া কর্ত্তব্য।

সচিবের পত্রের প্রত্যুত্তরে বখ্‌তিয়র লিখিলেন—আমি আপনার প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অনুমোদন করিলাম। লক্ষ্মণ সেনের সচিব দ্বিতীয় পত্রে লিখিয়া পাঠাইলেন—আমি প্রলোভন দিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও সৈন্য সামন্ত গণকে আপন অধীনে আনিয়াছি, আপনি অমুক দিবস অমুক সময়ে কয়েক জন শরীর রক্ষক অশ্বারোহীর সহিত অকুতোভয়ে রাজপুরে প্রবেশ করিবেন, কেহই আপনার গতিরোধ করিবে না। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বখ্‌তিয়র খিলিজি আপন সৈন্য সামন্ত-গণকে সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ সজ্জায় প্রস্তুত রাখিয়া স্বয়ং সপ্তদশ জন অশ্বারোহীর সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। যখন রাজা শুনিলেন যে, যবনেরা তাঁহার রাজপুরের নিকটবর্ত্তী হই-য়াছে, তখন তিনি রাজ্য রক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন, তৎপরে অন্য উপায় না দেখিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত কিঙ্করের সাহায্যে অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন এবং একখানি ক্ষুদ্র তরণী-যোগে উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করিলেন। এ দিকে খিলিজি অবিবাদে রাজপুরে প্রবেশ করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। খিলিজির পূর্ব্ব আদেশ মতে যবন সৈন্যেরা নবদ্বীপের চতুষ্পার্শ্ব অবরোধ করিয়া ফেলিল। বখ্‌তিয়র রাজ-

পুরে যখন রীতিমত দরবার করিয়া বসিলেন, সেই সময় লক্ষ্মণ সেনের সচিব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যবন সেনাপতি যথাবিহিত সমাদরের সহিত তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ শিষ্টালাপের পর যবন সেনাপতি কহিলেন—পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে আমি আপনাকে বঙ্গের রাজসিংহাসনে রাজা করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আপনাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। মুসলমান না হইলে, মুসলমানেরা বিধর্ম্মীর করে রাজ্য ভার অর্পণ করিতে কোন কালেই সাহস করেন না। খিলিজির মুখে এই নূতন প্রস্তাব শুনিয়া সচিব একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিঞ্চিৎ রুষ্ট ভাবে খিলিজিকে কহিলেন—এরূপ কথা ত পূর্ব্বে কিছুই হয় নাই, যে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে আমি বঙ্গের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইব না। খিলিজি হাস্য করিয়া বলিলেন—আপনার অপেক্ষা যবন সেনাপতি শতগুণে বুদ্ধিমান্, ইহা কি আপনি পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই? আজন্ম যাহার অন্নে বর্দ্ধিত হইলেন, যে বিশ্বাস করিয়া আপনার উপর সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিল, তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে যখন কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না এবং একবার পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিলেন না, হিন্দু হইয়া অনায়াসে হিন্দু রাজার সর্ব্বনাশ করিলেন, তখন এইরূপ লোকের উপর মুসলমান সেনাপতি কখনই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। আপনি কি বুদ্ধি প্রভাবে রাজার প্রিয় পাত্র হইয়া এত কাল প্রধান অমাত্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তাহা আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আপনি যে বুদ্ধি প্রভাবে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য হরণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন,

সে বুদ্ধি কেবল দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র, তাহাতে কিছু মাত্র ধার নাই। আপনি বিধর্ম্মী মুসলমানের কথায় রাজ্য লাভ সম্বন্ধে এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিলেন; কিন্তু আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করিয়া অতি অল্প সৈন্যের সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিতে সাহস করি নাই। যদিও সপ্তদশ জন অশ্বারোহীতে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ পুরীতে প্রবেশ করিয়াছি; কিন্তু বহু সংখ্যক সৈন্য সজ্জিত হইয়া আমার পশ্চাতে ছিল, একবার মাত্র বংশীধ্বনিতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে রাজ প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমি পূর্ব্ব হইতেই আত্মরক্ষার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু বলুন দেখি, আপনি আত্মরক্ষার কি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন? আমি বিদেশে বান্ধব বিহীন রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়াছি; কিন্তু আত্মবলে খর্ব্ব হইয়া আসি নাই। আপনি যে রাজপ্রাসাদে একাধিপত্য করিয়াছেন, যে রাজ্যের প্রজাগণ রাজা হইতেও আপনার অধিক আদর করিত, তাহারা সকলেই অক্ষত শরীরে আছে; কিন্তু এক্ষণে কেহই সাহস করিয়া আপনার রক্ষার্থে মুসলমান সেনাপতির সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিবেক না। আপনি স্বহস্ত খোদিত কূপে নিপতিত হইয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে মুসলমান সেনাপতির আয়ত্তে আসিয়াছেন। আমি এক্ষণে আপনার প্রতি যে আদেশ করিব, তাহাই হইবে। আপনার বুদ্ধিকে ধিক্! যে পূর্ব্ব হইতে আত্মরক্ষার পথ না রাখিয়া অসীম সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের ন্যায় নির্ব্বোধ আর নাই।

এস্থলে বখ্তিয়র খিলিজিই বুদ্ধিমান্ বলিয়া গণ্য হইলেন। লক্ষ্মণ সেনের সচিব নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়া সমূলে

নির্ম্মূল হইলেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। যে বুদ্ধির প্রভাবে পূর্ব্বকালের লোকেরা পররাজ্য হরণ করিয়া আপনি রাজ্যেশ্বর হইতেন, লক্ষ্মণ সেনের সচিবের সে বুদ্ধির লেশ মাত্র ছিল না। তিনি যবনের চতুরতার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া কেবল বিশ্বাসঘাতকতারূপ মহা পাতকে নিপাতিত হইলেন, এই মাত্র।

নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন সম্বন্ধে চাণক্যের অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি নন্দবংশের সচিব রাক্ষসকে দাসী পুত্র চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করাইতে যেরূপ বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, এক্ষণকার মহা মহোপাধ্যায় রাজনীতিজ্ঞেরা তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না। নন্দবংশের সচিব রাক্ষসও অসাধারণ বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন; কিন্তু যিনি যত কেন বুদ্ধিমান্ লোক হউন না, দৈব অনুকূল না হইলে, কোন বুদ্ধিই ফলপ্রদ হয় না।

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, এক সততাই সকল বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ। সততার সহিত সুবুদ্ধি সংযোগে কার্য্য করিলে, অসাধ্য সাধনও করিতে পারা যায়। যাহারা কেবল দুর্ব্বুদ্ধির দাস হইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে যায়, তাহাদিগের মনোরথ পূর্ণ না হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ সহোদরকে বিনষ্ট করিবার জন্য দুর্য্যোধন কুমন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার একটিও ফলপ্রদ হয় নাই। কুবুদ্ধি দিবার লোক এ সংসারে অনেক পাওয়া যায়; কিন্তু সুবুদ্ধি দাতার সংখ্যা অতি অল্পই দেখা যাইতেছে। অসাধারণ বুদ্ধি চালনা করিবার সময় অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে

জন্য, নতুবা সে বুদ্ধি চরমে ঘোর অনিষ্টকর হইয়া উঠে। যে সকল জ্ঞানী পণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন যে, যে অধিকারে অধিক কাল অবস্থান করে, তাহার সেই অধিকারের প্রয়োজন মত বুদ্ধি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠে। এই কথা অবশ্যই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে; কারণ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যাঁহারা দীর্ঘ কাল ধর্ম্মাধিকরণে ব্যবস্থা শাস্ত্রের ব্যবসায় করেন, তাঁহারা অভি-যোগ উপস্থিত হইলেই তাহার ভিত্তিতে কোথায় সত্যাসত্য আছে, তাহা অতি অল্প আয়াসেই বুঝিয়া লইতে পারেন। ঐ সকল কার্য্যে যাঁহারা নূতন ব্রতী হন, তাঁহাদিগের দ্বারা তত দূর হইতে পারে না; কিন্তু এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে, যাঁহারা এক বিষয় লইয়া ক্রমাগত আলোচনা করেন, তাঁহাদিগের অন্যান্য বিষয়ের বুদ্ধি ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা দর্শন শাস্ত্রের বিচার কালে আপনাদিগের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন; কিন্তু বিষয় বুদ্ধি তাঁহাদিগের "একেবারে নাই" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহারা চৌর্য্য বৃত্তি করিয়া বেড়ায়, সময়ে সময়ে তাহাদিগের বুদ্ধির কথা শুনিলে একেবারে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই কলিকাতা মহা-নগরীতে সর্ব্বদাই তস্করেরা এক একটি নূতন বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া লোকের ধন হরণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের সেই বুদ্ধি কৌশলের গল্প শুনিয়া আমরা নানা বিষয়ে সাবধান হইয়া থাকি, তথাচ তাহাদিগের ব্যবসায়ের পথ এক কালে কেহই বন্ধ করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণেও তাহারা এক এক সময়ে এমনি এক একটি নূতন বুদ্ধির চালনা করে যে, অসাধারণ বুদ্ধি-মান্ লোকেরাও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

অসাধারণ বুদ্ধির প্রভাবে সংসারের দুরবস্থা সকল দূর হইয়া দিন দিন এই জগৎ স্বর্গ তুল্য হইয়া উঠিতেছে। যাঁহার বুদ্ধি আছে, তাঁহার সকলই আছে; যাহার বুদ্ধি নাই, তাহার কিছুই নাই। যদি আমরা বুদ্ধিহীন হইয়া অতুল সম্পত্তি পাই, তথাচ এক বুদ্ধির অভাবে সমূহ অর্থ সত্ত্বেও সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারি না। বুদ্ধি নাই বলিয়া পদে পদে শঠের নিকট প্রতারিত হইয়া মনঃপীড়া পাইতে থাকি, তৎপরে কেবল এক বুদ্ধির অভাবে অসৎ লোকের পরামর্শে অসৎ পথের পথিক হইয়া একেবারে হৃতসর্ব্বস্ব হইলেও হইতে পারি।

কোন সময়ে এক রাজপুত্রের সহিত এক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ কুমারের বন্ধুত্ব সংঘটিত হইয়াছিল। উভয়ে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করেন। ব্রাহ্মণ-কুমার রাজপুত্রকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, অন্য কি কথা, তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। রাজতনয়ও অর্থের দ্বারা অকৃত্রিম বন্ধুর যথোচিত সাহায্য করিতেন; কিন্তু তাঁহার মনে এইরূপ একটি স্পর্দ্ধা ছিল যে, বন্ধু সদুপদেশ দ্বারা আমার যেরূপ উপকার সাধন করেন, আমি অর্থের দ্বারা তাঁহার তদপেক্ষা অধিক উপকার করিয়া থাকি; যে হেতু অর্থই পৃথিবীর সর্ব্ব সুখের আকর। সেই অর্থ দানে আমি বন্ধুর সমস্ত অভাব মোচন করি। রাজনন্দনের মনে মনে যে এইরূপ স্পর্দ্ধা ছিল, ব্রাহ্মণতনয় তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবলে তাহা বিশিষ্ট বিধানে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক দিন তিনি পরিহাস ছলে রাজনন্দনকে কহিলেন, সুহৃদ্, ধনবল ও বুদ্ধিবল এই দুই বলের মধ্যে তুমি কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধর? রাজনন্দন তৎ-

ক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিলেন, এক্ষণকার কালে ধনবলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধন না থাকিলে, সামান্য এক বুদ্ধিবলে কি হইতে পারে? দেখ বন্ধু, কিছু মনে করিও না, তোমার অসাধারণ বুদ্ধির প্রভাব আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি; কিন্তু একপ প্রখর বুদ্ধি সত্ত্বেও আমার সহিত সৌহার্দ্য সঞ্চারের পূর্ব্বে অন্য কি কথা, সামান্য সংসার কষ্টও দূর করিতে পার নাই। এক্ষণে তোমার বুদ্ধিবল ও আমার ধনবল একত্রীভূত হওয়ায় আমরা পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছি। তবেই বিবেচনা করিয়া দেখ, ধনহীনের বুদ্ধি সকল সময়ে কার্য্যকরী হয় না; কিন্তু ধনের বল সকল অবস্থাতেই অমোঘ অস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। ব্রাহ্মণ-তনয় কহিলেন, তোমার এ সকল কথার আমি প্রতিবাদ করিতে চাহি না, তবে নীতিজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন ;—

"বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

যে চাণক্য পণ্ডিতের অলৌকিক বুদ্ধির প্রভাবে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন হইয়াছিল, তাঁহার এই যুক্তি সঙ্গত শ্লোকটি আমি কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারি না। চাণক্য যখন তপোবন পরিত্যাগ করিয়া অতুল ধনশালী নন্দকুলের সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার হস্তে এক অলাবু পাত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কেবল এক বুদ্ধির প্রভাবেই তিনি মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত প্রদত্ত রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে চন্দ্রগুপ্তের বীরদর্পে সে সময় মগধ দেশ কম্পিত হইয়াছিল, সেই চন্দ্রগুপ্তকে চাণক্য নিজ বুদ্ধির প্রভাবে ক্রীত দাস করিয়া

তুলিয়াছিলেন। বন্ধুবর, এই সকল কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, ধনবল অপেক্ষা বুদ্ধিবলকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরিব।

রাজপুত্র কহিলেন—এ বিষয়ের এখানে মীমাংসা হইবে না, চল উভয়ে অন্যত্র গমন করা যাউক। আমি ধন লইয়া যাইব, তুমি কেবল বুদ্ধি লইয়া যাইবে। ধন দ্বারা আমি সকলকে বশ করিয়া ফেলিব; কিন্তু তুমি বুদ্ধিবলে হয়ত আপনার উদরান্নেরও সংস্থান করিয়া লইতে পারিবে না। ব্রাহ্মণপুত্র কহিলেন—আচ্ছা, তাহাই হউক, চল উভয়ে বিদেশে গমন করি।

কিছু দিন পরে রাজপুত্র ব্রাহ্মণপুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিদেশ গমন করিলেন। রাজকুমার লক্ষ মুদ্রা পাথেয় লইলেন। ব্রাহ্মণকুমারের পরিধেয় ধুতি ও উত্তরীয় ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এইরূপে নানা দেশ অতিক্রম করিয়া একটি জনাকীর্ণ নগরে উভয়ে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র মনোমত বাসা স্থির করিয়া তিন রাত্রি বন্ধুর সহিত তথায় বাস করিলেন। চতুর্থ দিবসে বলিলেন—বন্ধু, অদ্য তোমাকে আমি বিদায় দিলাম, এই বান্ধব বিহীন দেশে নিজ বুদ্ধিবলে যদি উদরান্নের সংস্থান করিয়া লইতে পার, তবেই তোমার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিব। ব্রাহ্মণপুত্র কহিলেন—অদ্যই আমি বিদায় হইলাম, তুমি সাবধানে থাকিও। এই বলিয়া তিনি সে নগর পরিত্যাগ করিলেন এবং বহু দূরস্থ একটি গ্রামে গিয়া কোন বিশিষ্ট বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণের গৃহে সে দিবস অতিথি হইলেন। গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের ইষ্ট নিষ্ঠা দেখিয়া সমাদরের সহিত তাঁহাকে আপন গৃহে রাখিলেন। আহারান্তে গৃহস্বামীর সহিত ব্রাহ্মণপুত্র একাসনে বসিয়া নানা কথার পর সবিনয়ে কহিলেন—মহাশয়, আমি এই গ্রামে একটি পাঠশালা

সংস্থাপনের মনন করিয়াছি, যদি এ বিষয়ে মহাশয় কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন, তাহা হইলে, চিরকাল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব। গৃহস্বামী কহিলেন —উত্তম প্রস্তাব উপস্থিত করিলে। আমি কয়েক মাসাবধি নিজ ভবনে একটি পাঠশালা সংস্থাপনের মনন করিয়াছি; কিন্তু উপযুক্ত গুরুমহাশয় না পাওয়ায় সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারি নাই। যদি তোমার শিক্ষকতা কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা থাকে, তাহা হইলে, পাঠশালা সংস্থাপন বিষয়ে আমি তোমার যথোচিত সাহায্য করিব। এইরূপ কথোপকথনে সে দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। পর দিবস প্রাতে গৃহস্বামী আপনার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনটি পৌত্র ও দুইটি ভগ্নী পুত্রকে ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন— তুমি আপাততঃ আমারই এই পূজার দালানে এই কয়েকটি ছাত্র লইয়া পাঠশালা সংস্থাপন কর। আমার বাটীতেই দুই সন্ধ্যা আহারাদি করিবে, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট আর অন্য বেতন প্রাপ্ত হইবে না।

এই স্থলে রাজকুমার ও ব্রাহ্মণপুত্রের পৃথক্ হওয়াবধি নির্বুদ্ধিতা ও সুবুদ্ধিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যখন রাজতনয় কহিলেন—বন্ধু, অদ্য হইতে তুমি নিজ বুদ্ধি প্রভাবে এই বান্ধব বিহীন দেশে আপন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া লও। ব্রাহ্মণকুমার তাহাই করিতেছি, বলিয়া রাজপথে বাহির্গত হইলেন। তাঁহার হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিল না, তথাচ দুই এক দিনের পাথেয় জন্য দুই একটি মুদ্রাও চাহিয়া লইলেন না, কেবল এক উত্তরীয় স্কন্ধে করিয়া বাসাবাটীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যদি কোন নির্ব্বোধ

ব্যক্তি হঠাৎ এরূপ অবস্থায় নিপতিত হইত, তাহা হইলে, সে এক বৃক্ষতলা সার করিয়া হতভম্বের ন্যায় কিয়ৎ ক্ষণ বসিয়া থাকিত; কিন্তু ব্রাহ্মণকুমার যখন বন্ধুর বাসাবাটী পরিত্যাগ করিয়া রাজপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন, যদিও কোন্ দিকে যাইতেছেন এবং কাহার নিকটই বা যাইবেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা ছিল না, তথাচ তিনি এরূপ প্রফুল্ল মনে চলিতে লাগিলেন যে, হঠাৎ দেখিলে, বোধ হয় যেন তিনি দ্রুতপদে স্বীয় ভবনে গমন করিতেছেন। ব্রাহ্মণকুমার গমন করিতে করিতে উপমিতি ও অনুমিতি এই দুইটি মনোবৃত্তিকে মনোমধ্যে আবির্ভূত করিলেন। উপমিতি হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াই বলিয়া দিল—অদ্য তুমি যে অবস্থায় পড়িয়াছ, ইহা নূতন নহে, এরূপ ঘটনা অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, কাব্য নাটকাদিতে ইহার অনেক উপমা স্থল পাইবে। আমি তোমাকে সে সকল বিষয় কত স্মরণ করাইয়া দিব? তুমি মূর্খ নহ, অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছ, এক্ষণে তোমাকেই তোমার হৃদয়ে আপন অবস্থার উপমার স্থল বলিয়া স্মরণ করিয়া লও। তাহার পর অনুমিতি তোমার সহায় হইবে। উপমিতি দ্বারা এইরূপ প্রত্যাদেশিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তার পর, তিনি একটি সুন্দর উপমা স্থল প্রাপ্ত হইলেন। দেবদত্ত এবং আমি যখন একত্র গুরুগৃহে অধ্যয়ন করি, তখন দেবদত্ত এক দিন স্বদেশে গমন করিবার সময় দস্যুহস্তে নিপতিত হইয়াছিলেন। তাহারা বল পূর্ব্বক তাঁহার পাথেয় ও গাত্রের বস্ত্রাদি হরণ করিয়া লইয়াছিল। তিনি এইরূপ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াও কিছুমাত্র ভীত হন নাই। একখানি কদলীপত্রে লজ্জা নিবারণ করিয়া নিকটস্থ এক গ্রামে প্রবেশ করেন। গ্রামে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই একটি

সদাশয় লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি দেবদত্তকে কদলীপত্র পরিধান করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ওহে ব্রাহ্মণ কুমার! তুমি এরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া কোথায় যাইতেছ? তুমি কি কোন বিপদে পড়িয়াছ, না ভিক্ষা করিবার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ? ব্রাহ্মণকুমার মনে মনে ভাবিলেন, যদি এই ব্যক্তি আমাকে গুণবান্ বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইলে, আমার প্রতি ইহার অধিক শ্রদ্ধা হইবে। এই ভাবিয়া হাস্য করত একটি সুন্দর অর্থ পরিপূরিত কবিতার আবৃত্তি করিলেন। তাহার ভাবর্থ এই—"আমি যে দিবস ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, সে দিবস আমাকে দেখিয়া সকলে হাস্য করিয়াছিল। আনন্দে কেহ শঙ্খধ্বনি করিয়াছিল, কেহ বা উলু দিয়াছিল। সেই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে সকলেই হাসিয়াছিল, কেবল আমিই কাঁদিয়াছিলাম।" অদ্য আমার সেই দিন পুনরায় উপস্থিত হইয়াছে। আমার কদলীপত্র পরিধান দেখিয়া কেহ হাসিতেছে, কেহ করতালি দিতেছে এবং কেহ বা বিদ্রূপ করিতেছে; কিন্তু আমার চক্ষু দিয়া অনর্গল জলধারা বহিতেছে। আমার ভূমিষ্ঠ হইবার দিনে ও অদ্যকার দিনে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। তবে সে দিবস উলঙ্গ হইয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলাম, লজ্জা নিবারণের জন্য কদলীপত্র অনুসন্ধান করিতে হয় নাই এবং আহারের জন্যও ভাবিতে হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে পড়িয়া শুনিয়া বুদ্ধিমান্ হইয়াছি বলিয়া যে কোন প্রকারে কদলীপত্র সংগ্রহ করিয়া রজ্জু-দ্বারা সেখানি কটিতে বন্ধন পূর্ব্বক লজ্জা নিবারণ করিয়াছি।

দেবদত্তের এই সকল কথা শুনিয়া পূর্ব্ব কথিত সদাশয় ব্যক্তি কিয়ৎক্ষণ দেবদত্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে
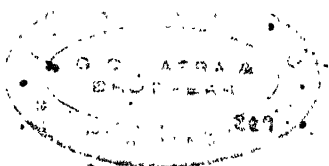
কবিতার ভাব শুনিয়া ঐ অজ্ঞাত কুল শীল ব্যক্তির প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা হইয়াছিল। এক্ষণে আবার মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অনুমানে বুঝিতে পারিলেন যে, এই লোকটি যথার্থই বিশিষ্ট সন্তান; কোন দৈব বিপাকে পড়িয়া এরূপ ভাবে লোকালয়ে প্রবেশ করিয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই রূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে প্রকাশ্যে কহিলেন—তুমি যে হও, তাহার পরিচয় লইবার প্রয়োজন নাই। আমার হৃদয় যখন বলিতেছে যে, তুমি বিপদে পড়িয়াছ, তখন আমার সমভিব্যাহারে আইস, আমি সাধ্যানুসারে তোমাকে সাহায্য করিব।

দেবদত্ত যখন এইরূপে ঐ সদাশয় ব্যক্তির আশ্রয় পাইয়াছিলেন এবং পরিধেয় বস্ত্র উত্তরীয় ও কিঞ্চিৎ পাথেয় পাইয়া পর দিন অনায়াসে স্বধামে গমন করিয়াছিলেন, তখন আমিও সেইরূপ কোন সদাশয় ব্যক্তির আশ্রয় পাইলেও পাইতে পারি। যদি তাহাও না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে, কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে অতিথি হইয়া অদ্যকার উদারান্নের সংস্থান করিয়া লইব।

ব্রাহ্মণতনয় এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্ব কথিত ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। গৃহস্বামী তাঁহার বচন চাতুর্য্য ও ভদ্রের ন্যায় আচার ব্যবহার দেখিয়া নিজ গৃহে তাঁহাকে গুরুমহাশয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র আপন সাত্ত্বিকী বুদ্ধির প্রভাবে দুই চারি দিবসের মধ্যেই গৃহস্বামীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। গৃহস্থের পরিবারগণও তাঁহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি যে প্রণালীতে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া শুনিয়া গ্রামস্থ প্রায়

সকলেই আপনাদিগের বালকগণকে ঐ নব প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় বিদ্যাধ্যয়নের জন্য পাঠাইয়া দিল। এইরূপে এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণকুমার শতাধিক ছাত্রের আচার্য্য হইয়া উঠিলেন।

এক্ষণে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কাহাকে বলে, সংক্ষেপে তাহাই বর্ণন করা যাইতেছে। মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্ব্বে কৃষ্ণার্জ্জুন যোগ কথনে বাসুদেব প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন—হে সখে! মনুজকুলের অবস্থা ভেদে ত্রিবিধ বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, যথা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যিনি প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করিতে পারেন, সৎকার্য্যে যাঁহার সাহস আছে, অসৎ কার্য্যে যিনি ভয় করেন, কিরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সংসার বন্ধনে পড়িতে হয় ও কিরূপ প্রণালীতে চলিলে, মুক্ত পুরুষের ন্যায় কাল যাপন করিতে পারা যায়, যাঁহার এই সকল বিবেচনা আছে, হে পার্থ! সেইরূপ লোককেই সাত্ত্বিকী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। *

ব্রাহ্মণকুমার সেই সাত্ত্বিকী বুদ্ধির প্রভাবেই বিদেশে পর-গৃহে পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া শতাধিক ছাত্রের শিক্ষা-গুরু হইয়া মাসে মাসে প্রায় শত মুদ্রা অর্জ্জন করিতে লাগি-লেন। অর্থের মুখ দেখিলেই লোকের প্রকৃতি রূপান্তর ধারণ করে। ব্রাহ্মণকুমারের মনে যদিও অর্থের সচ্ছলতা বশতঃ কখন কখন অসৎ প্রবৃত্তির আবির্ভাব হইত; কিন্তু সাত্ত্বিকী বুদ্ধির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার নিবৃত্তি করিয়া ফেলিতেন। সৎকার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ সাহস ছিল, পূর্ব্ব কথিত সদাশয় ব্যক্তির গৃহে

* "প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥"
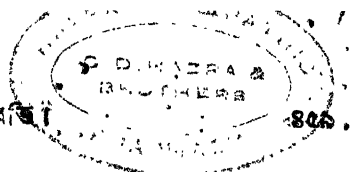
তিনি যথন বাস করেন, তৎকালে তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। কোন সময়ে ঘোর অন্ধকারাবৃত দ্বিপ্রহর রজনীতে ব্রাহ্মণকুমারের আশ্রয়দাতার একটি শিশু সন্তানের মৃত্যু হইল। মৃতদেহকে শ্মশানে রাখিয়া আসিবে, এই ভাবনায় গৃহস্বামী অতিশয় অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। দুই এক জন প্রতিবেশীর নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু কেহই সেই ভয়ানক রজনীতে বাহির হইতে চাহিল না। অবশেষে, ব্রাহ্মণকুমার তাঁহাকে কহিলেন, মহাশয়, আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন। যে কার্য্যের জন্য পুত্রশোক অপেক্ষা অধিক অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন, আমি একাই তৎকার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেছি। যদি একপ স্থলে উপকারে না আসিব, তাহা হইলে, আপনার নিকট যে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি, তাহা হইতে মুক্তি লাভের আর উপায়ান্তর নাই। এই কথা বলিয়া মৃত শিশুকে স্কন্ধে তুলিলেন এবং সেই তিমিরাবৃত অন্ধকার রজনীতে অকুতোভয়ে শ্মশানাভিমুখে চলিয়া গেলেন। যথা সময়ে শ্মশানের কার্য্য শেষ করিয়া যখন ব্রাহ্মণতনয় গৃহস্বামীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার মুখ দেখিয়া গদগদ বচনে কহিলেন—অদ্য হইতে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিব। তুমি আমাকে অদ্য যে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলে, উপযুক্ত পুত্র থাকিলেও এরূপ করিত কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মণকুমার এ সকল কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া নিস্তব্ধ ভাবে অবনত মস্তকে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন; অবশেষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া শয়ন করিলেন।

ব্রাহ্মণতনয় এইরূপে নিজ আশ্রয়দাতার এবং তাঁহার প্রতিবেশিগণের সময়ে সময়ে সমূহ বিপদে সাহায্য করিতেন।

ক্রমে গ্রাম শুদ্ধ লোক তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতে লাগিল। পাঠশালার কার্য্য সমাধা করিয়া যে সময় থাকিত, তিনি আপন নির্জ্জন আবাসে বসিয়া পাঠশালার প্রচলিত দুই এক খানি, ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিতেন এবং হস্তে লিখিয়া সেই সকল গ্রন্থ সুশিক্ষিত ছাত্রদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিতেন। পাঁচ ছয় মাস কার্য্য করিয়া তাঁহার হস্তে চারি পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ হইল। এক দিন বৈকালে তিনি কোন ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন, সেই বাটীর কয়েক জন একত্রিত হইয়া তাস খেলিতে আরম্ভ করিল; সে খেলার নাম নকুস। দেখিতে দেখিতে এক জন এক টাকার পয়সা হারিয়া গেল। যে জয়ী হইল, সে গুরুমহাশয়কে খেলিবার জন্য অনুরোধ করিল। তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণপুত্র কর-যোড়ে কহিলেন, মহাশয়, এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ক্রীড়া কৌতুকে অনভিজ্ঞ, কেবল ছাত্র অধ্যয়ন করাইতে পারি। সে সময়ে এক জন কিঙ্কর সিদ্ধি প্রস্তুত করিয়া তাহাদের সম্মুখে আনিয়া দিল, সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সিদ্ধি পান করিল এবং গুরুমহাশয়কেও এক পাত্র পান করিতে অনুরোধ করিল। সেই সময়ে ব্রাহ্মণপুত্র মনে মনে ভাবিলেন—আর এ স্থানে কখনই আসিব না, শাস্ত্রকারেরা এইরূপ সমাজকেই অসৎ-সমাজ কহিয়া থাকেন। এইরূপ চিন্তার পর একটি ছলনা করিয়া ব্রাহ্মণকুমার সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণপুত্র বাসায় আসিয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে এক জন ভদ্র লোক দুই খানি স্বর্ণাভরণ হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন—গুরুমহাশয়, অদ্য আমার একটি

উপকার করিতে হইবে। এই দুই খানি আভরণ বন্ধক রাখিয়া আমাকে এক শত টাকা কর্জ্জ দিতে হইবে, এক টাকা নয় আনার হিসাবে মাসিক সুদ পাইবেন। এই কথা শ্রবণ মাত্রেই ব্রাহ্মণপুত্র মনে মনে ভাবিলেন, টাকাই সর্ব্ব অনিষ্টের মূল। কিঞ্চিৎ অর্থ হইলে, লোকের ক্রমে ক্রমে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়। আমার তাহাই ঘটিবার উপক্রম হইতেছে। এ ব্যক্তি সুদের লালসা দেখাইয়া আমাকে ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত করিবার চেষ্টায় আসিয়াছে। যদি আমি ইহার অভিমত কার্য্য করি, তাহা হইলে, হঠাৎ এই স্থান পরিত্যাগ করিবার উপায় থাকিবে না। বিশেষতঃ, নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে, ঋণ দিবার সময় দাতা ও গৃহীতার মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব সঞ্চার হয়; কিন্তু পরিশোধের সময় উভয় পক্ষের আর সে ভাব থাকে না। কখন কখন উত্তমর্ণের সহিত অধমর্ণের ঘোর কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই সূত্রে রাজদ্বারে অভিযোগ পর্য্যন্ত করিতে হয়। যে আমাকে এই রূপ কার্য্যে লিপ্ত করিতে আসিয়াছে, তাহাকে আমার পরম শত্রু বলিয়া জ্ঞান করা যুক্তি। আমি কি ইচ্ছা করিয়া এইরূপ বন্ধনে নিপতিত হইতে পারি? যাহার পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে হয় না, সেই মুক্ত পুরুষ; যে বিষয় কার্য্যে জড়ীভূত থাকে, তাহারই ভববন্ধন ঘটে। তিনি এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া প্রকাশ্যে আগন্তুককে কহিলেন—মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি স্বর্ণাভরণ বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে পারিব না; আমি বিষয়ী লোক নহি। যাহা কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি, এ কেবল আমার এক হৃদয়ের বন্ধুর সাহায্যার্থে। তিনি কখন আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ঈশ্বরের

কৃপায় পুনর্ব্বার সেই প্রাণ তুল্য বান্ধবের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলে, আমি আর মুহূর্ত্ত কাল এস্থানে অবস্থান করিব না; তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইব। তিনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবেন, সেই খানেই যাইব। এই সকল বিশেষ কারণ থাকায়, আমি কোন বিষয়ে জড়ীভূত হইতে চাহি না। যে কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি, সজ্জনের পক্ষে ইহার ন্যায় উত্তম বিষয়-কার্য্য আর নাই। আমি আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকি, মনে করিলে, এক্ষণেই এ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি; আমার নিয়োগ কর্ত্তা তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন না, কারণ শিক্ষকতা কার্য্যের নিকাশ দিয়া যাইতে হয় না। আমি যখন সর্ব্বক্ষণ স্থানান্তর গমনে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি, তখন কি প্রকারে ব্যবসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব? এই সকল কথা শুনিয়া আগন্তুক দ্বিরুক্তি না করিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্ট ভাবে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার দুই এক দিবস পরে এক জন ঘটক ব্রাহ্মণ-পুত্রের নিকট উপস্থিত হইল। সেই ব্যক্তি প্রথমতঃ তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া হাস্য বদনে কহিল, আমার যে একটা ভাবনা ছিল, তাহা অদ্য দূর হইল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, আপনি বংশজ; কিন্তু অদ্য পরিচয় লইয়া সে ভ্রম দূর হইয়া গেল। এক্ষণে আমি যে জন্য আগমন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন—বিষ্ণুপুর গ্রামের বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া সুরূপা কন্যা আছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় খড়দহ মেলের এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আপনি বিবাহে সম্মত হইলে, এই মাসের মধ্যেই সেই কন্যার সহিত পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দি। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমার হাস্য করিয়া কহিলেন—মহাশয়, আমি সংসার বন্ধনে

পড়িতে কোন কালেই স্বীকৃত নহি। এক্ষণে বহু কষ্টে উদরান্নের সংস্থান হইয়াছে এই মাত্র। দার পরিগ্রহ করিয়া ভার্য্যার ভরণ পোষণ করি, আমার এরূপ সঙ্গতি নাই। এইরূপ অক্ষমের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি সাহসে কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত আছেন, বলিতে পারি না। আপনি বিশেষ অবগত নহেন, আমি আপাততঃ কোন মহদ্বংশোদ্ভব যুবা পুরুষের বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ হইয়া এই বিদেশে অবস্থান করিতেছি। তিনি ভিন্ন এই সংসারে আপাততঃ আমার আর কাহারও প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইবে না। মহাশয়, নিতান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরাই আমার মত অবস্থায় অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা বিহীন হইয়া দার পরিগ্রহ করে। কালে দুই চারিটি সন্তান সন্ততি হইলেই তাহাদিগের দুর্দ্দশার আর অবধি থাকে না। সে তাহার পুত্র কলত্রের প্রতিপালনের জন্য একেবারে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়। যে ব্যক্তি দার পরিগ্রহ করিয়াছে, ভববন্ধনের যে কি কষ্ট কেবল সেই ব্যক্তিই বুঝিতে পারে। আপনি পণ্ডিত, আপনাকে অধিক বলিতে গেলে আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ হইবে, এই জন্যই এক কথায় বলিতেছি, উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়া সংসার আবর্ত্তনে ঘূর্ণায়মান্ হইতে আমার আপাততঃ ইচ্ছা নাই।

এইরূপে ব্রাহ্মণপুত্র শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিকী বুদ্ধির প্রভাবে এক প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন। এ দিকে রাজনন্দন প্রিয়বন্ধুকে বিদায় দিয়া, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা সাগরে নিমগ্ন থাকিলেন। তিনি চির কাল রাজপ্রাসাদে থাকিয়া কেবল রাজসী বুদ্ধিরই চালনা দেখিতেন। মৃগয়া, দ্যূত-ক্রীড়া, পররাজ্য ও পরধন হরণের কৌশল এবং গৃহাদি সুসজ্জিত করিবার সুপ্রণালী প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার বুদ্ধি বিল-

ক্ষণ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। সাত্ত্বিকী বুদ্ধির অভাবে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার কিছু মাত্র ক্ষমতা ছিল না। এক্ষণে রাজসী বুদ্ধি কাহাকে বলে, নিম্নে তাহাই বিবৃত করা যাইতেছে—

"যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।"

যাহার স্বার্থ-সাধন সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না, যাহার অধর্ম্মই ধর্ম্ম হইয়া উঠে, যে বিলাস চরিতার্থ করিবার কালে কার্য্যকে অকার্য্য ও অকার্য্যকে কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করে এবং যাহার মন্দ বুদ্ধি সর্ব্বদাই অযথাবৎ চালিত হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যক্তির বুদ্ধিকেই রাজসী বুদ্ধি কহা যায়। রজোবুদ্ধিশালী লোক মুহূর্ত্ত কাল সুস্থির থাকিতে পারে না। যদি কোন বিশিষ্ট কার্য্য না থাকে, তাহা হইলেও মনঃকল্পিত নিষ্প্রয়োজন অকার্য্যকে কার্য্য জ্ঞান করিয়া সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। রাজনন্দন প্রথমতঃ আপন বাসাবাটী অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিলাস গৃহের শোভা দেখিয়া সকলেই প্রসংশা করিতে লাগিল। ক্রমে সেই নগরের কতকগুলি সমবয়স্ক লোকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হইল। তিনি প্রায় সর্ব্বদা তাহাদিগকে লইয়া হাস্য পরিহাস ও পাশাক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করিতেন। এতদ্ভিন্ন কোন কোন দিন তাহাদিগকে লইয়া মহা আড়ম্বরের সহিত মৃগয়ায় যাত্রা করিতেন এবং রাশি কৃত মৃগ শিকার করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করিতেন। একটি ধনাঢ্য যুবক আসিয়াছে—এই কথা নগর মধ্যে প্রচার হওয়ায়, নানা প্রকার অর্থ শোষক লোক রাজনন্দনের নিকট আসিতে লাগিল। কেহ বা দুই চারিটি অকালের ফল আনিয়া

রাজনন্দকে উপঢৌকন দিত এবং আশার অতীত পুরষ্কার লাভ করিয়া তাঁহার প্রসংশাবাদ করিতে করিতে গৃহে প্রস্থান করিত। কেহ বা দুই চারি খানি উচ্চ মুল্যের বস্ত্র, কেহ বা উত্তম আতর, কেহ বা দুই চারি খানি উত্তম চিত্রপট আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিত—মহারাজ ব্যতীত এ সকল দ্রব্য আর কে লইবে? আমরা মহারাজের নাম শুনিয়া আসিয়াছি। এইরূপে স্তুতিবাদ করায় রাজনন্দন প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া তোষামোদে মত্ত হইয়া সেই সকল সামগ্রী উচ্চ মুল্যে ক্রয় করিতেন। এ দিকে কেহ বা তাঁহাকে অধিক লাভের সম্ভাবনা দেখাইয়া কোন কোন বিষয় কার্য্যে লিপ্ত করিতে লাগিল; রাজনন্দনও ঐ সকল কার্য্যে জড়ীভূত হইয়া প্রথমতঃ দিন কতক কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ধনীর নাম শুনিয়া দোকানদারগণ যুবরাজের হস্তাক্ষর যুক্ত চিঠি পাইলেই দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহ করিত। এই রূপে রাজনন্দন আপন বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার পশ্চাদ্দৃষ্টি কিছু মাত্র রহিল না। ক্রমে পাওনাদারেরা তাগাদা আরম্ভ করিল। যে দিন শুনিলেন যে, দুগ্ধবিক্রেতা পঁচিশ টাকা পাইবে, মোদক তাহা অপেক্ষাও অধিক পাইবে, সেই দিন হইতেই তাঁহার মনের শান্তি ভঙ্গ হইল। এত দিন যে রাজনন্দনের মনে কুটিল বুদ্ধির লেশ মাত্র ছিল না। এক্ষণে সেই রাজনন্দন কি উপায়ে অপর লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন, সেই চিন্তাই সর্ব্বদা মনোমধ্যে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এক দিন এক জন ধূর্ত্ত যুবা রাজনন্দকে কহিল, মহাশয়,

আপনাকে এক্ষণে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন দেখিতেছি কেন? বোধ হয়, অর্থের অনটন ঘটিয়া থাকিবে, কর্ক্ষণ লোকের হস্তে নগদ টাকা থাকে না। যদি টাকার জন্য ভাবিত হইয়া থাকেন, আমাকে বলুন, আমি তাহার উপায় করিয়া দিতেছি। উক্ত যুবকের মুখ হইতে এইরূপ সুধা মাখা কয়েকটি কথা বহির্গত হইবা মাত্রই রাজনন্দনের মৃত শরীর যেন পুনর্জ্জীবিত হইল, তাহকে বলিলেন, বন্ধু, আমি যে অর্থ সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলাম, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। টাকার জন্য স্বদেশে পত্র লিখিয়াছি, অর্থের সহিত পত্রের প্রত্যুত্তর এক মাসের মধ্যেই আসিবে। এই কয়েক দিনের জন্য তুমি যদি কিঞ্চিৎ অর্থের সুবিধা করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, বড় উপকার হয়। ধূর্ত্ত যুবক বলিল, এ কি আশ্চর্য্য কথা! আমি অদ্যই টাকার সুবিধা করিয়া দিব। এই কথা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল এবং এক জন সুদ খোর মহাজনের নিকট গিয়া কহিল—অমুক স্থানের মহা-রাজের পুত্র আমাদিগের দেশে বায়ু সেবনার্থ আসিয়াছেন। যদি তুমি তাঁহাকে কিছু টাকার সরবরাহ করিতে পার, তাহা হইলে, বিলক্ষণ দশ টাকা লাভের সম্ভাবনা আছে ও আমিও কিছু দালালী পাইতে পারি। মহাজন বলিল, রাজপুত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দাও। যদি তিনি যথার্থ রাজনন্দন হন, তাহা হইলে, আমি অবশ্যই টাকার সরবরাহ করিব। ধূর্ত্ত যুবা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইল।

বৈকালে মহাজনের সহিত রাজনন্দনের সাক্ষাৎ হইল। সুদ-খোর মহাজন প্রথমে রাজপুত্রের মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে চমৎকৃত হইল। তৎপরে তাঁহার গৃহসজ্জা ও পরিচ্ছদ দেখিয়া ভাবিল,

এই ব্যক্তি সামান্য লোক নহেন। এইরূপ বড় লোককে টাকা ধার না দিয়া আর কাহাকে দিব? প্রকাশ্যে কহিল, মহাশয়, আপনার টাকার প্রয়োজন হইলেই তৎক্ষণাৎ আমাকে বলিয়া পাঠাইবেন। রাজনন্দন বলিলেন, আপাততঃ আমাকে দুই সহস্র মুদ্রা ঋণ দিতে হইবে, মাসেকের মধ্যে আমি এই টাকা পরিশোধ করিব। উক্ত সুদখোর মহাজনীয় রীত্যনুসারে এক মাসের অগ্রিম সুদ বাদে তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রকে দুই সহস্র টাকা ঋণ দান করিয়া চলিয়া গেল। টাকা পাইয়া রাজনন্দনের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। সেই দিন হইতে তিনি উক্ত ধূর্ত্ত যুবককে প্রাণের বন্ধু বলিয়া গণ্য করিলেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ তৎক্ষণাৎ তাহাকে পঞ্চাশ টাকা গণিয়া দিলেন।

দুই সহস্র মুদ্রা ঋণ লইয়া কিয়ৎ পরিমাণে রাজপুত্র দেনা পরিশোধ করিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আবার পূর্ব্বের ন্যায় আহারাদির আড়ম্বর ও তাস পাশা চলিল। অপব্যয়ীর হস্তে দুই সহস্র মুদ্রা সপ্তাহের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল। আবার ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইলেন। ধূর্ত্ত বন্ধুর সাহায্যে অন্য এক মহাজনের নিকট চারি সহস্র মুদ্রা ঋণ করিয়া প্রথম মহাজনের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিলেন এবং অবশিষ্ট টাকায় আরও কয়েক দিবস আমোদ আহ্লাদ চলিল। ক্রমে ক্রমে রাজর্ষী বুদ্ধি দ্বারা উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইতে শিখিলেন। কি প্রকারে উত্তমর্ণগণের ঋণ উড়াইয়া দিব, কি প্রকারে প্রতারণা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিব, এই সকল বুদ্ধি তাঁহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তাঁহার দুই একটা

শঠতা ও প্রবঞ্চনার কার্য্য দেখিয়া অনেকেই তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। ক্রমে তিনি লোকের অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া পড়িলেন। মহাজনেরা আর অধিক ঋণ দিতে সাহস করিল না এবং সুদ সমেত পূর্ব্বের টাকা আদায় করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

পাঠকগণ, রাজনন্দনের রাজসী বুদ্ধির প্রভাব এই পর্য্যন্ত বিবৃত হইল। এক্ষণে তামসী বুদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা লিখিব। রাজা দুর্য্যোধনের রাজসী বুদ্ধির ইয়ত্তা ছিল না; কিন্তু যখন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সেনাপতি নিহত হইলেও দম্ভের সহিত সমরাঙ্গনে বলিতে লাগিলেন—আমি অদ্য এই গদাঘাতেই পৃথিবীকে নিষ্পাণ্ডবা করিব। তখন তাঁহার এই দম্ভোক্তি শুনিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, সখে, একি আশ্চর্য্য! কুরুকুলাধম এখনও কি সমরজয়ী হইবার আশা পরিত্যাগ করে নাই? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধনের রাজসী বুদ্ধি এক্ষণে তিরোহিত হইয়াছে। আসন্ন মৃত্যু কালে তমোগুণ সম্ভূত তামসী বুদ্ধির আবির্ভাবে উহার সমস্তই বিপরীত বোধ হওয়াতে সে একেবারে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কার্য্য করিতেছে। অর্জ্জুন কহিলেন, সখে, তামসী বুদ্ধি কাহাকে বলে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥"

এক্ষণে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে যদি কেহ হিত কথা কহে, তাহা হইলেও সে তাহার বিপরীত ভাব গ্রহণ করিবে। অজ্ঞান অন্ধকারে পড়িয়া অধর্ম্মকে উহার ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান হইতেছে।

সে যে সর্ব্বতোভাবে হীনবল হইয়াছে, তাহা কিছু মাত্র বুঝিতে পারিতেছে না। তামসী বুদ্ধির প্রভাবে পাগলে যাহা বলিয়া থাকে, দুর্য্যোধন অম্লান বদনে তাহাই বলিতেছে।

পাঠকগণ, রাজা যুধিষ্ঠির যে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্র পাঠে অবগত হইতে পারা যায়; কিন্তু যখন শকুনির কুচক্রে পড়িয়া পাশা খেলিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বুদ্ধি কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি শান্ত প্রকৃতির লোক হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় ভাণ্ডারের সমস্ত ধন পণ করিয়া বসিলেন। সর্ব্বস্ব পণে হারিয়াও অবশেষে কলুষিত বুদ্ধি বশতঃ আপন সহধর্ম্মিণী পাঞ্চালীকেও পণ করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। কথিত আছে, দ্যূত সভায় প্রবেশ করিবার পর ধূর্ত্ত শকুনির বাক্য কৌশলে রাজা যুধিষ্ঠিরের সাত্ত্বিকী বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বনাশের সময় তাঁহার তামসী বুদ্ধির সঞ্চার হইল। তিনি আপন মুখে ভ্রাতৃগণকে বলিয়াছিলেন—

"যখন কুগ্রহ আসি হয় উপস্থিত,
পাপরূপ বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন করে নীত।
কুকর্ম্ম সকল বোঝে সুকর্ম্মের প্রায়,
নহে কেন প্রবর্ত্তিব কপট পাশায়।"

পূর্ব্ব কথিত রাজনন্দনের হস্তে যত দিন অর্থ ছিল, তিনি অসৎ ও নিষ্প্রয়োজন ব্যয়কে সৎ এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় বোধে সর্ব্বক্ষণ শশব্যস্ত হইয়া থাকিতেন, সময়ে স্নান ভোজন করিবারও অবসর প্রাপ্ত হইতেন না। এক্ষণে ধনহীন হইয়া কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইলেন। যাহারা পূর্ব্বে ঋণ দিয়া পদে পদে তাঁহার

সম্মান রক্ষা করিয়াছিল, এক্ষণে কিসে তাহাদিগকে প্রতারিত করিব, সর্ব্বক্ষণ এই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মন বিপরীত চিন্তায় রত থাকিত। পূর্ব্বে যে কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম ভয় ছিল, ধনহীন হইয়া অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রোধ রিপু পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণে প্রবল হইয়া উঠিল। বন্ধু বান্ধবের প্রতি স্নেহ মমতা কমিয়া আসিল। কেবল এক আত্ম স্বার্থের জন্য সকল সময় গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজনন্দনকে এইরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া উত্তমর্ণ সকলে এক ঐক্য হইয়া উঠিল। রাজনন্দন দেখিলেন, আর নিস্তারের উপায় নাই, এক্ষণে পলায়ন করাই যুক্তি। পলায়নের উপক্রমে এক দিন ভাবিলেন যে, কতকগুলি দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ পার্থেয় সংগ্রহ করিয়া লই; কিন্তু আমার কিঙ্কর কিঙ্করীরা বহু কাল অবধি এক কপর্দ্দকও বেতন প্রাপ্ত হয় নাই, গৃহের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে গেলে যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অন্যান্য উত্তমর্ণকে সংবাদ দেয়, এই আশঙ্কায় এক বস্ত্র পরিধান করিয়া রজনীর শেষ ভাগে পলায়ন করিলেন। পাছে উত্তমর্ণগণ শান্তিরক্ষক কর্ত্তৃক ধৃত করাইয়া দেয়, এই ভয়ে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, তথাচ তাঁহার গমনের বিরাম নাই। ক্রমান্বয়ে বেলা দ্বি প্রহর পর্য্যন্ত পথ পর্য্যটন করিয়া কোন এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামের সম্মুখস্থ বটবৃক্ষ তলে ক্লান্ত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় যার পর নাই কাতর হইয়াছিলেন; কিন্তু হস্তে একটি কপর্দ্দকও ছিল না যে, তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ আহার সামগ্রী ক্রয় করিয়া ক্ষুধা শান্তি করেন। অবশেষে পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া উঠায় সম্মুখস্থ

একটি পুষ্করিণী হইতে অনিয়ম জলপান করিয়া পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষ তলে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ কার্য্যগতিকে সেই বৃক্ষ তলে গিয়া উপস্থিত হইল। সে বিদেশী পথিককে দেখিয়া কহিল, তুমি ম্লান বদনে কি জন্য এই বৃক্ষ তলে বসিয়া আছ? রাজনন্দন সজল নয়নে কহিলেন, আমি জীবিকা নির্ব্বাহার্থে বিদেশে আসিয়াছি; কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কাজ কর্ম্মের সুবিধা করিতে পারি নাই। হস্তে যাহা ছিল, তৎসমুদয় ব্যয় হইয়া গিয়াছে। অদ্য আমার হস্তে আর এক কপর্দ্দকও নাই। এক্ষণে নিরুপায় হইয়া বৃক্ষ তলে বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিল—আমার এক জন কিঙ্করের প্রয়োজন আছে, যদি তোমার কাজ কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে, আমি তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাই। রাজনন্দন অগত্যা তাহার সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার সময় সেই হতভাগা রাজনন্দনকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপন বাটীতে উপস্থিত হইল। বিদেশীকে ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর দেখিয়া ব্রাহ্মণী কিঙ্করের উপযুক্ত ভোজন পান দিয়া রাজপুত্রকে পরিতৃপ্ত করিলেন। এইরূপে সে রজনী অতিবাহিত হইল। পর দিন প্রাতে ব্রাহ্মণ সেই বিদেশীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড়ে কহিল—ধর্ম্মাবতার! আমি এই বিদেশীকে কিঙ্কর নিযুক্ত করিতেছি, আপাততঃ ছয় মাসের জন্য ইহার সহিত লিখন পঠন হইতেছে। বর্ণনা পত্রে এরূপ লিখিত থাকিবে যে, এই ব্যক্তি যেন আমার সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ থাকে। আমি যাহা আজ্ঞা করিব, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে।

কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিলে, আমার ইহাকে প্রহার করিবার ক্ষমতা থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি এই ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহে; তাহা হইলে, আমার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ পঞ্চাশ টাকা দিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। টাকা দিতে অপারক হইলে, উহাকে বিক্রয় করিয়া ক্ষতি পূরণের টাকা আদায় করিব। আবার যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমি এই বিদেশীকে কর্ম্মচ্যুত করি, তাহা হইলে, আমার প্রতি উপরোক্ত নিয়মও সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তিবেক। ইহা শুনিয়া কাজী কহিলেন—ও গো বিদেশী, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছ? রাজনন্দন মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কাজী সেই মর্ম্মে চুক্তিপত্র লিখিয়া লইয়া উভয়কে বিদায় দিলেন।

ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ ইহার পূর্ব্বে বিংশতি জন বিদেশীয় লোককে এই রূপ প্রতারণাজালে ফেলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। রাজনন্দন একবিংশতি সংখ্যায় নিপতিত হইলেন। কাজীর নিকট গোড়া-বাঁধিয়া ব্রাহ্মণ হাস্য বদনে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজনন্দনকে কহিল, তুমি শীঘ্র শীঘ্র স্নানাহার সমাপন করিয়া লও, তাহা না হইলে, কাজ কর্ম্মের সুবিধা হইবে না। রাজপুত্র যে আজ্ঞা বলিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণী পতির আদেশানুসারে নূতন কিঙ্করকে একটি ঝালের লাড়ু দিয়া কহিলেন, জলযোগ কর। রাজপুত্র তাহার কিয়দংশ গলাধঃকরণ করিয়া একেবারে অবসাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। ঝালের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রমে ক্রমে এক গাড়ু জল পান করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণী দেখিলেন যে, জলে উদর পূর্ণ হইয়াছে। সেই সময়ে সস্নেহ বচনে রাজপুত্রকে কহিলেন, এস বাপু, অন্নাহার কর।

[library stamp]
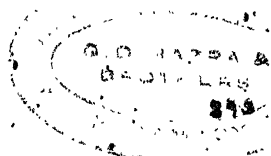
আমি কিঙ্কর কিঙ্করীকে পুত্র কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়া থাকি। পাঁচ দিন থাকিলেই আমার ব্যবহার জানিতে পারিবে। রাজপুত্র সেই মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হইয়া আহার করিতে বসিলেন। পূর্ব্বের জল পানে উদর পূর্ণ রহিয়াছে, এইজন্য এক মুষ্টিও অন্নাহারে সক্ষম হইলেন না। আহারান্তে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পশুর ন্যায় খাটাইতে লাগিল। প্রাতে ঝালের লাড়ুর দ্বারা যে কার্য্য হইয়াছিল, সন্ধ্যার সময় কিঙ্কর আহার করিতে বসিলে, ঝালের ব্যঞ্জন দ্বারা সেই কার্য্য হইতে লাগিল। রাজনন্দন সেই ব্যঞ্জনের সংযোগে রজনীতেও এক মুষ্টি অন্নাহার করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার পর আহার করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, অদ্য আমার অদৃষ্টের দোষে আহারে ব্যাঘাত ঘটিল। বোধ হয়, কল্য অবধি এরূপ হইবে না, এক্ষণে শয়ন করিতে পারিলেই প্রাণ রক্ষা হয়। এই মনে মনে করিয়া কম্বল শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ কহিল, ওহে, কোথায় যাইতেছ? এখনও তোমার কার্য্য শেষ হয় নাই, রজনী দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমার চরণ মর্দ্দন করিয়া দিতে হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজপুত্রের দুই চক্ষু দিয়া অনর্গল জলধারা বহিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিলেন, আমি আপন বুদ্ধিতেই বিপদ্ সাগরে নিপতিত হইলাম। পূর্ব্বে বন্ধু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ। এক্ষণে যে প্রাণরক্ষা করিয়া স্বদেশে যাইব, তাহার ত কিছুই উপায় দেখিতেছি না। তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইয়াছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ সক্রোধে চীৎকার করিয়া কহিল—ওরে, তোর যে বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, আমি এত ডাকাডাকি করিতেছি,

অথাচ চৈতন্য হইতেছে না? বোধ হয়, বেত্রাঘাত না করিলে, চৈতন্যোদয় হইবে না। এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র আস্তে ব্যস্তে চরণ মর্দ্দনে নিযুক্ত হইলেন।

এইরূপে নানা কষ্টে রাজনন্দন সে রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রথম দিবসের কার্য্যাড়ম্বর দেখিয়া রাজপুত্র একেবারে অবসাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। পর দিন প্রাণপণে দুই প্রহর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার পর বল পূর্ব্বক একটা কাষ্ঠের বোঝা মস্তকে তুলিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছাপন্ন রাজনন্দনকে জলসেচন দ্বারা চৈতন্য করিল। পরে রাজনন্দন আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া বসিলেন এবং বিনীত ভাবে কহিলেন—আপনার আমার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন, আমি এরূপ গুরু পরিশ্রম করিতে আর পারিব না। ব্রাহ্মণ হাস্য বদনে কহিল, তবে আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়া বিদায় গ্রহণ কর; যদি টাকা দিতে না পার, তাহা হইলে, পশুর ন্যায় তোমাকে বাজারে বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিব। রাজপুত্র কহিলেন, তবে তাহাই করুন, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ বস্ত্র দ্বারা রাজপুত্রের হস্ত বন্ধন করিয়া যে স্থানে দাস দাসী বিক্রয় হয়, সেই দিকে চলিল। দুরাত্মা ব্রাহ্মণ যখন রাজপুত্রকে বন্ধন অবস্থায় বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছে, ভাগ্যক্রমে সেই সময় দূর হইতে আমাদের পূর্ব্ব কথিত গুরুমহাশয় দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার বন্ধুর ন্যায় এক ব্যক্তি বন্ধন অবস্থায় ক্রন্দন করিতে করিতে চলিয়াছেন, অন্য এক জন তাঁহাকে বল পূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি তদ্দৃষ্টে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বন্ধুই এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া

চলিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এক জন শিক্ষিত ছাত্রকে বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সুবোধ যুবক ছাত্র দ্রুতপদে ঐ দুর্দ্দশাপন্ন রাজপুত্রের নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এই রূপবান্ যুবাকে বন্ধন করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছ? ইনি তোমার কি অপরাধ করিয়াছেন? ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ কহিল, ইনি আমার নিকট পঞ্চাশ টাকা ঋণগ্রস্ত আছেন, টাকা দিতে পারিলেন না বলিয়া ইহাঁকে বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছি। ছাত্র কহিল, যদি আমার আচার্য্য মহাশয় ইহাঁর ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন, তাহা হইলে, তুমি এই যুবাকে পরিত্যাগ কর কি না? ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ কহিল, আমি টাকা পাইলেই ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। গুরুমহাশয়ের শিক্ষিত ছাত্র কহিল, তুমি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি আচার্য্যের নিকট হইতে শীঘ্র আসিতেছি। এই কথা বলিয়া আচার্য্যের নিকট গমন করতঃ আদ্যোপান্ত ঘটনা নিবেদন করিল। গুরুমহাশয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ ছাত্রের হস্তে পঞ্চাশটি টাকা দিয়া কহিলেন, তুমি শীঘ্র গিয়া সেই যুবককে মুক্ত করিয়া লইয়া আইস, ছাত্র তাহাই করিল।

রাজনন্দন সেই কৃতান্তের অনুচর ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম বিবেচনা করিলেন। তিনি সজল নয়নে তাঁহার উদ্ধার কর্ত্তা ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনি কে? ছাত্র কহিল, মহাশয়, অনতি বিলম্বেই আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন, আমার গুরু আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। এই বলিয়া রাজপুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া সত্বর গমনে আচার্য্যের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণকুমার বহু দিবসের পর প্রিয়বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া গদ্গদ বচনে কহিলেন, সখে, তোমাকে যে প্রাণে প্রাণে পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম, এই আমার পরম লাভ। রাজনন্দন কহিলেন, আমি আপনার ক্রীতদাস, বন্ধুর যোগ্য নহি। আপনি যখন দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া আমাকে সেই নরপিশাচের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার দাস, ইহাতে আর সংশয় কি। ব্রাহ্মণকুমার কহিলেন, বন্ধুবর, আর না, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি এই কয়েক মাসের মধ্যে আমাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ? আমি তোমার সেই ভোজ্যান্ন ভোগী ব্রাহ্মণ। এস তোমাকে এক বার হৃদয়ে ধারণ করি, তাহা হইলে, উভয়েরই সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। এই কথাগুলি শ্রুতমাত্রেই রাজনন্দনের চৈতন্য হইল। তিনি প্রিয় বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া ভুজপাশে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ব্রাহ্মণপুত্রও দুই হস্তে রাজনন্দনের কণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলে পর, ব্রাহ্মণপুত্র রাজনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন বন্ধু, এই অল্প কালের মধ্যে লক্ষ মুদ্রা অপ-ব্যয় করিয়া কিরূপে সেই দুরাচার ব্রাহ্মণের হস্তে নিপতিত হইয়া-ছিলে? রাজনন্দন আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বন্ধুর নিকট বর্ণন করায়, দ্বিজপুত্র কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎপরে সবিনয়ে বন্ধুকে কহিলেন, সখে, তোমাকে পূর্ব্বে আমি এতদূর নির্ব্বোধ বলিয়া জানিতাম না। তুমি যখন হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, তখন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বা-হের চেষ্টা দেখিলে না কেন? কোন্ সাহসে কিঙ্করের কার্য্য
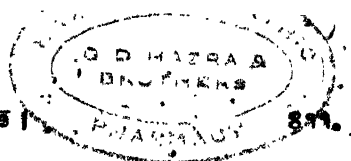
করিতে অগ্রসর হইয়াছিলে? রাজপুত্র কহিলেন, বন্ধু, আর আমাকে লজ্জা দিও না। পূর্ব্বে আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, ধনবলে বুদ্ধিবলকে পরাস্ত করিতে পারা যায়, সেই বিষয় পরীক্ষা করিতে আসিয়া আমার অনেক বিষয় শিক্ষা করা হইল ; এক্ষণে আমরা কি প্রকারে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর। ব্রাহ্মণপুত্র কহিলেন, সময়ানুসারে তাহার যুক্তি করা যাইবে ; এখন স্নানাহার ও মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ নিদ্রা যাও। অনুমানে বোধ হইতেছে, তোমার দুই তিন দিবস উত্তমরূপ আহার নিদ্রা হয় নাই। রাজনন্দন কহিলেন, যথার্থ অনুভব করিয়াছ, আমি তিন দিবস জল ব্যতিরেকে আর কিছুই উদরস্থ করি নাই।

এই সকল কথোপকথনের পর, ব্রাহ্মণপুত্র ছাত্রগণকে বিদায় দিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন এবং সময়ে স্নানাহার করিয়া উভয়ে কিয়ৎক্ষণের জন্য নিদ্রিত হইলেন। অপরাহ্নে রাজনন্দন গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণতনয়কে কহিলেন, সখে, এক্ষণে আমি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছি ; কিন্তু বাটী গমনের জন্য মন অত্যন্ত উতলা হইয়া উঠিয়াছে, শীঘ্র শীঘ্র স্বদেশ গমনের উদ্যোগ করা যাউক। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণপুত্র হাস্য বদনে কহিলেন, প্রিয়তম, যে ব্রাহ্মণ তোমাকে বর্ণনাতীত কষ্ট দিয়াছে, তাহার উচিত দণ্ড না দিয়া আমি কখনই স্বদেশে যাইব না। তোমার ন্যায় আমি সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া কিঙ্করের কার্য্যে নিযুক্ত হইব। বোধ হয়, এক পক্ষের মধ্যেই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া চলিয়া আসিব, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। তুমি শান্তভাবে আমার এই পাঠশালায় অবস্থান কর এবং আমার ন্যায় ছাত্রগণকে বিদ্যা

শিক্ষা করাও। তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া যাইতেছি যে, এ দেশের কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিও না। কেহ উপপ্রযাচিকা হইয়া আসিলে, মাতৃ সম্বোধনে তাহাকে বিদায় করিয়া দিও। আর আমার আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণকে পিতার ন্যায় মান্য করিও। ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার সময়ে ক্রোধে অধীর হইয়া কাহাকেও প্রহার করিও না। আহারোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী নগদ মূল্যে ক্রয় করিও। এ দেশের যুবকদলের সহিত মিশিও না। যদি এই সকল উপদেশের অন্যথা কর, তাহা হইলে, আর আমরা স্বদেশে যাইতে পারিব না। রাজনন্দন কহিলেন, তোমার উপদেশ আমি শিরোধার্য্য করিলাম; কিন্তু বিনয় করিয়া বলিতেছি, তুমি সেই কৃতান্তের অনুচর ব্রাহ্মণের সমীপবর্ত্তী হইও না, তাহার ন্যায় ধূর্ত্ত এ সংসারে আর নাই। তুমি সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন লোক, ছলনা চাতুরী কিছুই জান না। সেই দুরাত্মার হস্তে পড়িলে, আত্মোদ্ধার করা তোমার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মণপুত্র কহিলেন, সে জন্য তোমাকে কিছুই ভয় করিতে হইবে না। তোমার ন্যায় আমার শরীর সুখী নহে, বাল্যকালাবধি আমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা সেই দুরাত্মা আর আমাকে অধিক কি কষ্ট দিবে? এক্ষণে সরল হৃদয়ে আমাকে বিদাও দাও, উপস্থিত প্রস্তাবে আর কোন আপত্তি করিও না। রাজনন্দন অগত্যা ব্রাহ্মণকুমারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

পর দিন প্রাতে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণকুমার উক্ত দুষ্ট ব্রাহ্মণের ভবনাভিমুখে চলিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, সেই দুরাত্মা আপন বহির্দ্বারে বসিয়া তাম্রকূটের ধুম পান

[library stamp, illegible]

করিতেছে। ব্রাহ্মণপুত্র ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে কহিলেন, ঠাকুর মহাশয়, আমি বিদেশী; জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য দূর দেশে যাইতেছিলাম, পথি মধ্যে দস্যুহস্তে নিপতিত হওয়ায়, আমার যাহা কিছু সম্বল ছিল, তাহা সমুদয় নষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছি। মহাশয় যদি কৃপা করিয়া কোন ধনাঢ্য লোকের ভবন দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে, আপনার কাজ কর্ম্মের সুবিধা করিয়া লই। আমার দ্বারা সংসারধর্ম্মের সমস্ত কার্য্যই সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। ব্রাহ্মণ কহিল, ওহে, তোমার আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই; আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি। আপাততঃ আমার বাটীতেই এক জন উপযুক্ত কিঙ্করের প্রয়োজন আছে। যদি ভালরূপ কাজ কর্ম্ম করিতে পার, তাহা হইলে, আমিই তোমাকে আশ্রয় দিতে পারি; কিন্তু এদেশের নিয়মানুসারে কাজীর দরবারে তোমাকে এক খানি করার পত্র লিখিয়া দিতে হইবে। ব্রাহ্মণপুত্র কহিলেন, ঠাকুর মহাশয়, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন; লেখা পড়া করিয়া লওয়া বাহুল্য মাত্র, কেন না আমার ইহ জগতে কেহই নাই, যত কাল জীবিত থাকিব, তত কাল মহাশয়ের বাটী পরিত্যাগ করিব না। শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিল, ভাল, ভাল; আমি আপনার কিঙ্কর কিঙ্করীকে পুত্র কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়া থাকি। তবে কি জান, একটা লেখা পড়া করিয়া রাখা তোমার পক্ষেও ভাল, আর আমার পক্ষেও ভাল। ব্রাহ্মণপুত্র বলিলেন, যে আজ্ঞা, তবে তাহাই করুন।

পরে ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণতনয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া কাজীর আদালতে উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্বে রাজপুত্রের সহিত যেরূপ

করের পত্র লিখিত হইয়াছিল, এবারেও অবিকল তাহাই করিয়া লইল। আদালতের কার্য্য শেষ করিয়া ব্রাহ্মণ ঐ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকুমারকে লইয়া বাটী আসিল। ব্রাহ্মণতনয় বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, মা, বড় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছি, যৎকিঞ্চিৎ মিষ্ট সামগ্রী ও এক ঘটী জল দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ একটি ঝালের লাড়ু ও এক পাত্র জল আনিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র সেই ঝালের লাড়ু চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চারি বারে গলাধঃকরণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবশেষে ইচ্ছামত একটু জল পান করিয়া সুস্থ হইয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ নূতন কিঙ্করকে আহার করিতে ডাকিলেন। ব্রাহ্মণী ভাবিলেন যে, কিঙ্কর ঝাল নিবারণের জন্য অনেক জল খাইয়া ফেলিয়াছে, এক্ষণে এক মুষ্টি অন্ন দিলেই যথেষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণপুত্র আহার করিতে বসিয়া অন্ন দাও! অন্ন দাও! এই শব্দে যত দূর পারিলেন, আহার করিলেন, ফলতঃ ব্রাহ্মণী প্রথমে যে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণপুত্র তাহার চতুর্গুণ আহার করিয়াও উঠিতে চাহেন না; অবশেষে ব্রাহ্মণী আর অন্ন নাই বলিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া দিলেন। আহারান্তে ব্রাহ্মণ নূতন কিঙ্করকে সমভিব্যাহারে লইয়া আম্র কাননে প্রবিষ্ট হইয়া ছদ্মবেশী কিঙ্করকে কহিল, তুমি এই শুষ্ক আম্র বৃক্ষটার অগ্রে গোড়া কর্ত্তন কর, তাহার পর রন্ধনের উপযুক্ত করিয়া চেলা করিতে হইবে। ব্রাহ্মণপুত্র যে আজ্ঞা বলিয়া অবলীলা ক্রমে শুষ্ক বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে রাশীকৃত চেলা করিয়া বৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট হইলেন। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণ কহিল, ও কি হে!

বসিলে চলিবে কেন? এই কাষ্ঠগুলি আটি বাঁধিয়া ক্রমে ক্রমে বাটীতে রাখিয়া আসিতে হইবে। ব্রাহ্মণপুত্র যে আজ্ঞা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং বন্য লতা দ্বারা ন্যূনাধিক দুই মণ পরিমিত একটি কাষ্ঠের বোঝা বাঁধিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ঠাকুর মহাশয়, আমার মস্তকে তুলিয়া দিউন; এই বোঝাটি বাটীতে রাখিয়া আসিয়া আবার নূতন বোঝা বাঁধিতেছি। ব্রাহ্মণ প্রাণপণে সেই গুরুভার কিঙ্করের মস্তকে তুলিতেছে, এমন সময়ে প্রকাণ্ড কাষ্ঠের বোঝা ব্রাহ্মণকুমার কৌশল করিয়া তাহার পায়ে ফেলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বাপ রে! শব্দে ধরাতলে পতিত হইল। এ দিকে কিঙ্কর, কি করিলাম! সর্ব্বনাশ করিলাম! ব্রহ্মহত্যা করিলাম! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। কিঙ্করের আর্ত্তনাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণী ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘটনা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। কিঙ্কর ব্রাহ্মণীকে সমাগত দেখিয়া এক ছুটে বাটী হইতে জলের গাড়ু আনিয়া উপস্থিত করিল এবং কহিল, মা, তুমি ঠাকুর মহাশয়ের মুখে জল দাও, আমি পা টা টানিয়া ধরি। ব্রাহ্মণ কহিল, আমাকে বাড়ীতে লইয়া চল্, তাহার পর রামকৃষ্ণ নাপিতকে ডাকিয়া আনিস্, সে আসিয়া যাহা বলিবে, তাহাই করিব। কিঙ্কর কহিল, যে আজ্ঞা মহাশয়, তাহাই করিবেন, এই বলিয়া গল দেশে হাত দিয়া ব্রাহ্মণেকে সোজা করিয়া বসাইল। ব্রাহ্মণ কহিল, আমাকে কি করিয়া বাড়ী লইয়া যাইবি? আমি ত চলিয়া যাইতে পারিব না। কিঙ্কর কহিল, সে জন্য আপনার ভাবনা নাই, আমি কোলে করিয়া লইয়া যাইতেছি। কিঙ্কর ব্রাহ্মণকে

কোলে করিয়া অক্লেশে বাটীতে আনিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণী ছুটিয়া গিয়া রামকৃষ্ণ নাপিতকে ডাকিয়া আনিলেন। উক্ত নাপিতকে সে দেশের লোক ধন্বন্তরির পুত্র জ্ঞানে মান্য করিত। সে আহত স্থান পরীক্ষা করিয়া কহিল, এক খানা হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভয় নাই, আমিই আরাম করিয়া দিব। তৎপরে রামকৃষ্ণ নাপিত এক খানি বস্ত্রের দ্বারা ভগ্ন স্থানটি কসিয়া বাঁধিয়া দিল এবং কহিল, অদ্য ইহার উপর গাডু করিয়া জল ঢালিতে থাক, কল্য প্রাতে আসিয়া ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করা যাইবে। এই ভাবে সে রজনী অতিবাহিত হইল।

প্রাতে রামকৃষ্ণ আসিয়া ব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। ব্রাহ্মণী কিঙ্করকে কহিলেন, ছেলেটা বড় কাঁদিতেছে, তুই রাস্তা হইতে একটু ভুলাইয়া আন। তাহার পর বাজার করিয়া আনিতে হইবে। কর্ত্তা কাল রাত্রে উপবাস করিয়া আছেন, আজ সকাল সকাল আমাকে রাঁধিতে হইবে। গৃহিণীর আদেশানুসারে কিঙ্কর ছেলে লইয়া বাটীর বাহির হইল। শিশুকে পথে আনিয়া এইরূপে বিকটকার মুখ ভঙ্গী করিতে লাগিল এবং তাহার পৃষ্ঠে এমনি একটি বজ্রচিমটি কাটিল যে, শিশু ভয়ে ও যন্ত্রণায় প্রাণ-পণে চীৎকার করিয়া রাজপথ কাঁপাইয়া দিল। পুত্রের রোদন জননীর পক্ষে অসহ্য হওয়ায়, ব্রাহ্মণী দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খোকা অত কাঁদিতেছে কেন রে? কিঙ্কর কহিল, কি জানি মা! ব্রাহ্মণী আপনা হইতে বলিলেন, তবে তোকে, এখনও চেনে না বলিয়া কাঁদিতেছে। আচ্ছা খোকাকে আমার কোলে দিয়া তুই বাজারে যা। কিঙ্কর ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে গুটি কতক পয়সা লইয়া বাজারে চলিল। বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক খানি

মোদকের দোকানে বসিল। সেই খানে কথা বার্ত্তায় এক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়া দিবা দুই প্রহরের সময় বাজারের কতক-গুলা অপকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাটী আসিয়া পঁহুছিল। বাজার দেখিয়া ব্রাহ্মণীর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। আরক্ত নয়নে ভৃত্যকে বলিতে লাগিলেন, তোর মনো-গত ভাব কি বল্ দেখি? প্রাতঃকালে বাজার করিতে গিয়া কতক গুলা ছাই ভস্ম কিনিয়া দুই প্রহরের সময় বাটী আসিলি কেন? কিঙ্কর সবিনয়ে কহিল, মা, আগে আমার কথা শুন, তার পর রাগ করিও। আমি নূতন লোক, বাজারের রাস্তা চিনিতে না পারিয়া একেবারে মাঠে গিয়া পড়িয়াছিলাম। তার পর জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কত কষ্টে বাজারে আসিয়া দেখি যে, এক জন বড় মানুষের সরকার বাজারের সব ভাল ভাল জিনিষ পত্র কিনিয়া ফেলিয়াছে। তাই আমি যাহা পাইলাম, লইয়া আসিলাম, শুধু হাতে ত আর ফিরিয়া আসিতে পারি না। এই কথা গুলি শুনিয়া ব্রাহ্মণীর ক্রোধের কিঞ্চিৎ শমতা হইল। সেই মৎস্য ও তরকারির অনেক বাদ দিয়া মৎস্যের যূষ ও অন্ন ব্রাহ্মণকে প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং পতির পাত্রাবশিষ্ট আপনি আহার করিবেন ভাবিয়া রাখিলেন। কেবল কিঙ্করকে কীটাকুলিত বার্ত্তাকু দগ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ শুষ্ক অন্ন দিয়া সে দিবসের কার্য্য শেষ করিলেন। কিঙ্কর স্নান করিয়া সেই অন্ন ব্যঞ্জনই অম্লান বদনে আহার করিল।

আহারাদি শেষ হইলে পর, ব্রাহ্মণী কিঙ্করকে কহিলেন, ওরে, গোরু দুইটি এখনও খাইতে পায় নাই। খড় কাটিয়া এক একটা জাব মাখিয়া দে। কিঙ্কর যে আজ্ঞা বলিয়া মুহূর্ত্তের

মধ্যে কতক গুলা খড় কাটিয়া ফেলিল। জাব মাখিবার সময় জলের সহিত কিছু গোময় মিশ্রিত করিয়া দেওয়ায়, দুইটি গোরু-তেই এক গাছি খড়ও মুখে করিল না। কিঙ্কর এইরূপে গোশালার কার্য্য সারিয়া যেমন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি ব্রাহ্মণ কহিল, ওরে, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তামাকু খাওয়া হয় নাই, এক ছিলিম তামাকু সাজিয়া আন। কিঙ্কর তামাকু সাজিয়া কলিকা হস্তে রন্ধন শালায় আগুণ আনিতে গেল। দেখিল, উনুনের উপর এক কড়া দুধ বসান রহিয়াছে, উপরে চটের মত এক খানি সর পড়িয়াছে। ভৃত্য সর খানি তুলিয়া দুই গ্রাসে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। তাহার পর বাটনার পাত্র হইতে একটু তেঁতুল লইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। অবশেষে কলিকার তামাকুর উপর আঙ্গুলের বিলক্ষণ টিপা দিল এবং তাহার উপর কিঞ্চিৎ অগ্নি দিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে হুঁকা দিয়া আসিল। ব্রাহ্মণের হুঁকা টানিয়া মস্তক ধরিয়া গেল, তথাচ ধূম নির্গত করিতে পারিল না; অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল, ওরে, আগুণ নিবিয়া গেল, হুঁকা রাখিয়া দে। কিঙ্কর কহিল, মহাশয়, আপনার শরীর ভাল নয়, আজ তামাকুটা বড় খাইবেন না।

এইরূপে কিঙ্কর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে নিষ্কর্ম্মা দেখিয়া ব্রাহ্মণের বিরক্তির পরিসীমা রহিল না। কহিল, ওরে, কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাল কাটাইবি? দেখিয়া শুনিয়া কাজ কর্ না। ঐ পাট-গুলা টাঙ্গান আছে, বসিয়া বসিয়া দড়ি তৈয়ার কর। আমি দুই চারি দিন বিছানায় পড়িয়া থাকিলে দেখিতেছি সমুদয় নষ্ট হইয়া যাইবে। কিঙ্কর কহিল, মহাশয়, আমি থাকিতে সাংসারিক কাজের

কোন হানি হইবে না। আপনি একে একে বলিয়া দিউন, আমি ক্রমে ক্রমে সব করিয়া ফেলিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিল, আচ্ছা, ততক্ষণ দড়িগুলা তৈয়ার কর্। কিঙ্কর যে আজ্ঞা বলিয়া দড়ি প্রস্তুত করিতে বসিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে দুই সের পাটের মোটা মোটা চারি গাছা দড়া পাকাইয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না, শক্তি থাকিলে, সে কিঙ্করকে বিলক্ষণ প্রহার করিত; কিন্তু উত্থান শক্তি বর্জ্জিত হওয়ায়, পড়িয়া পড়িয়া খানিক দন্ত কড় মড় করিল। কিঙ্কর অকুতোভয়ে কহিল, কেন মহাশয়, কি হইয়াছে? এত কাজ কর্ম্ম করি, তবু আপনার মন পাই না কেন? ব্রাহ্মণ কহিল, দুই সের পাট নষ্ট করিয়া আনিলি, আবার জোর করিয়া কথা কহিতেছিস্? বেটা কোন কাজ কর্ম্মই জানে না। যা, দড়িগুলা এল পাক দিয়া খুলিয়া ফেল্। কিঙ্কর কিয়ৎকাল বসিয়া তাহাই করিল।

পর দিন প্রাতে ব্রাহ্মণ কিঙ্করকে ডাকিয়া কহিল, গোরু দুইটা জাব খাইতেছে না কেন রে? কিঙ্কর কহিল, বোধ হয়, গোরুর কোন বিয়ারাম হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মণ কহিল, তুই গো-শালার ভিতর কতকগুলা ভিজা খড় ও আধ ভিজা ঘুঁটেতে একটা ধোঁয়া করিয়া দে। কয়েক দিবস গো শালায় সাঁজাল দেওয়া হয় নাই বলিয়া গোরু দুইটি শীতে আড়ষ্ট হইয়াছে, তাহার উপর ডাঁশ, মশায় কামড়াইয়া অস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। কিঙ্কর তৎক্ষণাৎ গোশালার মধ্য স্থলে চারি পাঁচ ঝুড়ি ঘুঁটে ও ন্যূনাধিক এক পণ বিচালিতে আগুন ধরাইয়া দিল কিন্তু পাছে গোরু দুইটি পুড়িয়া মরে, এই জন্যে অগ্রেই তাহাদিগের গলার দড়া খুলিয়া

রাখিয়াছিল। ক্রমে আগুণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠায় গাভী দ্বয় বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণী কহিলেন, ওরে, গোরু পলাইল কেন? ধর! ধর! কিঙ্কর গোরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। তাহাতে গাভীদ্বয় আরও ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধ পুচ্ছে একে বারে রাজপথে ছুটিয়া গেল। বাঁধা গোরু এক বার ছুটিয়া বাহির হইলে, তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। কিঙ্কর গোরুর পশ্চাং পশ্চাং ছুটিল। এ দিকে গোশালার চালে আগুণ লাগিয়া ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণী কি হইল! সর্ব্বনাশ হইল! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে ঘরে ব্রাহ্মণ শয়ন করিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সে ঘর খানিও ধরিয়া গেল। ব্রাহ্মণী অনল নির্ব্বাণের চেষ্টা না করিয়া ব্রাহ্মণ যাহাতে রক্ষা পায়, সেই চেষ্টায় চেষ্টিত হইলেন। তিনি পতিকে শয্যা শুদ্ধ টানিয়া ঘরের বাহির করিয়া ফেলিলেন সেই সময় দুই এক জন প্রতিবেশী বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হওয়ায়, তাঁহাদিগের সাহায্যে বহু কষ্টে ব্রাহ্মণকে রাজপথে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে বাটীর চারি-দিকে বেড়া আগুন ধরিয়া উঠিল। সেই অগ্নিকাণ্ডের ভিতর প্রবেশ করিয়া কোন একটা দ্রব্য সামগ্রী বাহির করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। ব্রাহ্মণী আপনার শিশু সন্তানটি ক্রোড়ে লইয়া ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্থির নেত্রে আপনার গৃহ দাহ দেখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের ঘর দ্বার প্রায় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে কিঙ্কর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এক দড়ায় দুইটি গোরু বান্ধিয়া আনিয়া ব্রাহ্মণীকে দর্শন দিল। ব্রাহ্মণী কিঙ্করকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ওরে

[library stamp]
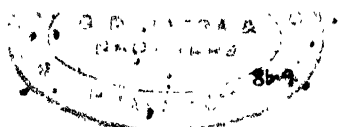
বেটা; এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিলি ? দেখ্ আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! তাই ত মা, এ কি হইল! বলিয়া কিঙ্কর চীৎকার শব্দে কপট রোদন আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতিবেশিগণের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে অনল নির্ব্বাণ হইল। এই অগ্নিকাণ্ডে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী একেবারে হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া গেলেন। এক জন সদাশয় প্রতিবেশী কৃপা করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে আপনার বাটীতে আনিয়া আশ্রয় দিলেন। সে দিন সেই প্রতিবেশী পতি পত্নীর আহারাদির সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া অতিথির ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করিলেন। পর দিন প্রাতে ব্রাহ্মণী আপনার হস্তের এক গাছি রূপার পৈঁছা বাঁধা দিয়া পাঁচটি টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিলেন। সেই টাকায় আপনাদিগের এক এক খানি পরিধেয় বস্ত্র ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চাউল ডাউল ক্রয় করিয়া আনিয়া দুই চারি দিবসের আহারের সংস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণের গৃহ দাহে যদিও সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহা অপেক্ষাও কিঙ্করের ভাবনা সমধিক প্রবল হইয়া উঠিল। কি করিয়া এই দুষ্ট ভৃত্যকে বিদায় করিয়া দিব, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিঙ্কর দিবসে দুই বার সেই কর্জ্জ করা টাকার চাউল ডাউল উত্তম রূপে আহার করিল এবং কোন কাজ কর্ম্ম না থাকায় নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া রহিল। সেই দিবস রজনীতে সকলের আহারাদি হইলে পর, ব্রাহ্মণ নূতন কিঙ্করকে আপনার শয্যার নিকট ডাকিয়া সবিনয়ে কহিল, দেখ বাবা, আমার ত একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে; এ সময়ে আবার তোমাকে রাখিয়া আমি কষ্ট দিতে চাহি না, তুমি স্থানান্তরে কাজ কর্ম্মের অনুসন্ধান কর। তুমি যে

ক্ষণ পরিশ্রমী, লোকে তোমাকে আদর করিয়া রাখিবে। আমি তোমাকে বিপদের সময় আশ্রয় দিয়াছিলাম, বোধ হয়, তুমি সে দিন ভুলিয়া যাও নাই—এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ হইল। ভৃত্য বলিল, আজ্ঞা হাঁ, আপনার এক্ষণে যে অবস্থা ইহাতে কিঙ্কর রাখা আর কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে; এই জন্য আমিও বলিতেছি, পাওনা কয়েকটা টাকা দিয়া আমাকে বিদায় করা ভাল। ব্রাহ্মণ কহিল, বাবা এ অসময়ে আমি পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাইব? তুমি আমাকে একটু দয়া কর, দয়ার অপেক্ষা ধর্ম্ম আর নাই, তা ত জান। কিঙ্কর কহিল, আজ্ঞা হাঁ, দয়ার অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই, ইহা আপনিও যেমন জানেন, আমিও তেমনি জানি। মহাশয়, আমি বিদেশে ধর্ম্ম করিতে আসি নাই, দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছি। আমি যদি অক্ষম হইয়া চাকুরি ছাড়িয়া দিতাম, তাহা হইলে, আপনি আমার প্রতি কিরূপ দয়া করিতেন? আপনার প্রতিবেশীদিগের নিকট শুনিলাম যে, আমার আসিবার দুই দিবস পূর্ব্বে একটি ভদ্র লোক বিপদে পড়িয়া আপনার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি আপনি পশুবৎ ব্যবহার আরম্ভ করায়, তিনি আপন ইচ্ছায় চাকুরি ছাড়িয়া দিবার প্রার্থনা করেন; কিন্তু আপনি করার পত্রের বিধানানুসারে তাঁহাকে বাজারে বিক্রয় করিয়া পঞ্চাশটি টাকা আদায় করিয়াছিলেন। কল্য প্রাতে আপনার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিবে। মহাশয়, অতি বুদ্ধির শেষ রক্ষা হয় না। আপনি আপনাকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানিতেন; কিন্তু আপনার অপেক্ষাও এই পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিমান্ লোক আছে। ঈশ্বর আপনার দুর্বুদ্ধির দণ্ড দিয়াছেন, ইহাতে আক্ষেপ করিলে চলিবে কেন?

পাপের ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তিত হই-বেন, তখন আর দুর্ব্বুদ্ধির দাস হইয়া পর পীড়নে রত হইবেন না। এই কথা বলিয়া কিঙ্কর এক নিভৃত স্থানে গিয়া উপ-স্থিত হইল। পাছে ব্রাহ্মণের কুমন্ত্রণায় ব্রাহ্মণী তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় সে রজনীতে নিদ্রা গেল না।

পর দিন প্রাতে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া কিঙ্কর ব্রাহ্মণের সম্মুখে সদর্পে কহিল, ওগো ঠাকুর, এখন টাকা দিবে, না গো মহিষের মত বাজারে বিক্রীত হইবে? সহজে আসিবে, না আমাকে কাজির দরবার পর্য্যন্ত যাইতে হইবে? ব্রাহ্মণ সরোদনে কহিল, বাবা, আমি এক্ষণে তোমারই হইয়াছি, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। কিঙ্কর বেশী ব্রাহ্মণ তনয় কহিলেন, আমি তোমার মত নর পিশাচ নহি, নর মাংস বিক্রয় দ্বারা আমি অর্থ সংগ্রহ করিব না; তবে ইতি পূর্ব্বে তুমি যে ভদ্র লোকটিকে বর্ণনাতীত কষ্ট দিয়াছিলে, তাঁহার নিকটে আমি এক বার তোমাকে বন্ধন অবস্থায় লইয়া যাইব। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণতনয় এক খানি ডুলি আনাইলেন এবং সেই ডুলিতে ব্রাহ্মণকে তুলিয়া রাজপথে বহির্গত হইলেন। বাহক দ্বয় ডুলি স্কন্ধে অগ্রে অগ্রে চলিল, ব্রাহ্মণপুত্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া আপন পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র বন্ধুকে চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই সমাগত ও তাঁহার সমভিব্যাহারে এক ডুলি দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন। তিনি আস্তে ব্যস্তে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, প্রিয়সখে, এ কি! এই ডুলি করিয়া কাহাকে লইয়া আসিয়াছ? ব্রাহ্মণ তনয় হাস্য বদনে রাজপুত্রকে কহিলেন, তোমার মুনিব ঠাকুর একবার তোমার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। রাজনন্দন সেই অনাবৃত্ত ডুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে ক্রোধে স্ফীত হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম! আজি তোরে আমি স্বহস্তে প্রহার করিয়া অর্দ্ধ মৃত করিয়া ফেলিব। তোর ন্যায় নরাধম এ সংসারে আমি আর দেখি নাই ও দেখিব না। ব্রাহ্মণ রাজনন্দনকে চিনিতে পারিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের বাহ্য ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণকুমার তাহাকে কহিলেন, আমি যখন তোমাকে অভয় দিয়া আনিয়াছি, তখন আর তোমাকে ভয়ে ভীত হইতে হইবে না। পরে বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে, তুমি কাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছ? যাহাকে প্রহার করিয়া অর্দ্ধ মৃত করিবার সঙ্কল্প করিলে, সে অর্দ্ধ মৃত অবস্থাতেই তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই পিশাচ এত কাল নর মাংস বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল, পরশ্ব প্রাতে তৎসমুদয় অনলে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আমি দৈবাৎ ইহার পদে একটি কাষ্ঠের বোঝা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই আঘাতে একটি পদ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই দুরাত্মা একেবারে রাজপথের ভিখারী হইয়াছে। যদি তোমার শরীরে কিছু মাত্র দয়া থাকে, তাহা হইলে, এক্ষণে এই ব্যক্তিই সেই দয়ার পাত্র। যে তোমার হস্ত বন্ধন করিয়া পশুর ন্যায় বাজারে বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল, অদ্য সেই ব্যক্তিই আপনার দুর্বুদ্ধি বশতঃ চলৎশক্তি রহিত হইয়া ভাঙ্গা ডুলি চড়িয়া তোমার নিকট মুক্তি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। তুমি উহাকে মুক্ত কর, তাহা হইলে, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। বন্ধুর এই অর্থ পরিপূরিত কথা-

G. D. MITRA & BROTHERS

গুলি শুনিয়া রাজনন্দন শান্ত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণকুমার উক্ত অর্দ্ধ মৃত ব্রাহ্মণের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া কহিলেন, রে যজ্ঞোপবিতধারী চণ্ডাল! তুই আর অসৎ কার্য্য দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিস্ না; এক্ষণে তোকে মুক্তি দিলাম, স্বস্থানে প্রস্থান কর্। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া দিলেন।

আমাদিগের ব্রাহ্মণকুমার সর্ব্ব বিধায় জয় যুক্ত হইয়া প্রিয়-বন্ধু রাজনন্দনের সহিত বাসায় আসিয়া স্নানহার করিলেন। তৎ পরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম সুখ সম্ভোগের জন্য ব্রাহ্মণতনয় শয্যা-শায়ী হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে রাজকুমার কহি-লেন, প্রিয়সখে, এখন নিদ্রা যাওয়া হইবে না। তুমি কি প্রকারে সেই দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণকে চারি পাঁচ দিবসের মধ্যে সর্ব্ব বিধায় হীনবল করিয়া অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় আমার সম্মুখে আনিয়াছিলে, ইহার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে হইবে। আমি তোমার বুদ্ধি চাতুর্য্যের কার্য্য দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া পড়িয়াছি। এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে, অধিক ধন হস্তে থাকিলে, মনুষ্যের বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায়; আবার ধনের চেষ্টাতেই বুদ্ধি তেজস্বিনী হইয়া উঠে। আমি যে দিন তোমাকে এক বস্ত্র পরাইয়া বাসা হইতে বিদায় করিয়া দিলাম, সেই দিবস রজনী তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রতিক্ষণ ভাবিয়া ছিলাম যে, তুমি উদরা-ন্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া আপনার ভ্রম স্বীকার করিবে। যখন দেখিতে দেখিতে দুই তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন ভাবিলাম, বন্ধুর গ্রহ বৈগুণ্য হইয়াছে, তাহা না হইলে, আমার সহিত অনর্থক

তর্ক করিয়া কি জন্য স্বেচ্ছায় দুর্দ্দশা ভোগ করিতে গেলেন? তাঁহার হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই, হয় ত, উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কত কষ্ট পাইতেছেন। অবশেষে দেখিলাম যে, তুমি রিক্ত হস্তে বাহির হইয়া আসিয়া নিজ বুদ্ধি প্রভাবে পরম সুখে ছিলে। আমি যদিও লক্ষ মুদ্রা লইয়া বসিয়াছিলাম, তথাচ বুদ্ধি বিহীন হইয়া অতি অল্প কালের মধ্যে দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করি। অবশেষে এক জন ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ গবাদির ন্যায় আমাকে বাজারে বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল। যদি ঈশ্বরানুকম্পায় তোমার সম্মুখে না পড়িতাম, তাহা হইলে, আমার অদৃষ্টে যে কি ঘটিত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। ব্রাহ্মণপুত্র কহিলেন, প্রিয়তম, তুমি নিজ মুখে যে কথা ব্যক্ত করিলে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। অধিক ধনে জ্ঞানবান্ লোককেও বুদ্ধিহারা করিয়া ফেলে। কারণ, যেখানে ধন, সেই খানেই অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া দাঁড়ায়। এক অহঙ্কারই সর্ব্ব অনিষ্টের মূল; তাহার সহিত আবার মাৎসর্য্যের যোগ হইলে, না হইতে পারে এমত কার্য্যই নাই। তুমি যদিও আমাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাস, তথাচ আমাকে নির্ধন বলিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ অহঙ্কার করিতে; কিন্তু আমার এরূপ বোধ ছিল না ও এক্ষণেও নাই যে, আমি তোমার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্। বিবেচনা করিয়া দেখ, পূর্ব্বে তুমি কেবল এক অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই ধন বড় কি বুদ্ধি বড়, এই অনর্থক তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। আমি তোমাকে ক্ষান্ত করিবার জন্য অনেক প্রমাণ দর্শাইয়াছিলাম; কিন্তু তুমি কিছুতেই প্রবোধ মানিলে না। অবশেষে তুমিই জেদ করিয়া আমাকে বিদেশে আনিয়া ফেলিলে এবং আপনি

ধনক্ষয় করিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিলে। এক্ষণে তোমার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর করি শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ তোমাকে বর্ণনাতীত কষ্ট দিয়াছিল, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে আয়ত্ত করিতে শিখিয়াছে; কিন্তু বুদ্ধিমানের কিছুই করিতে পারে না। আমি তাহার বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, এই ব্যক্তির কিয়ৎ পরিমাণে দুষ্ট বুদ্ধি আছে, স্থির বুদ্ধির লেশ মাত্র নাই। যদি সে যথার্থ বুদ্ধিমান্ লোক হইত, তাহা হইলে, নানা প্রণালী অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিত। যখন দেখিলাম যে, সে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া কৃত কার্য্য হইয়াছিল, আমার প্রতিও অবিকল সেইরূপ আচরণ আরম্ভ করিল, তখন বুঝিতে পারিলাম, এই নরাধমের ব্যক্তি-গ্রাহিতা গুণ নাই। তোমার আকার প্রকার দেখিয়া সে বুঝিতে পারে নাই যে, তুমি অধিক কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না। যখন কদর্য্য অন্ন আহারই তোমার পক্ষে ঘোর কষ্ট কর বলিয়া বোধ হয়, সে স্থলে ঝালের লাড়ু প্রয়োগ করিবার আর কি প্রয়োজন ছিল? তোমার কমনীয় কান্তি দেখিয়া যখন সে বুঝিতে পারে নাই যে, তুমি উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমায় অধিক পীড়ন করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে; তাহা হইলে, তাহার পঞ্চাশ টাকার প্রত্যাশা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত, তখন তাহাকে কি বলিয়া বুদ্ধিমান্ বলিয়া গণ্য করিব। আবার দেখ, আমি যখন তাহার নিকট চাকুরি স্বীকার করিতে উপস্থিত হইলাম, তখন আমার মুখ দেখিয়া ও বাক্য বিন্যাশ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অনুমান করা উচিত ছিল যে, এই ব্যক্তি অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও বলিষ্ঠ; কিন্তু সে তাহা কিছুই বুঝিতে

না পারিয়া তোমার ন্যায় আমার প্রতিও ঝালের লাড়ু প্রয়োগ করিতে গেল। যে ঝালের লাড়ু খাইয়া তোমার প্রাণ বিয়োগের উপক্রম হইয়াছিল, আমি তাহা অনায়াসে খাইয়া ফেলিলাম; আবার দিবা দুই প্রহরের সময় আমাকে কাষ্ঠ কাটাইতে লইয়া গেল। আমি ভাবিলাম যে, এই দুর্ব্বৃত্ত যত ক্ষণ সুস্থ শরীরে থাকিবে, ততক্ষণ আমার নিস্তার নাই; ইহাকে শয্যাশায়ী করিতে পারিলে, সকল আপদ্ মিটিয়া যাইবে। এই অভিপ্রায়েই ন্যূনাধিক দুই মণ পরিমিত একটি কাষ্ঠের বোঝা বাঁধিয়া মস্তকে তুলিবার সময় ব্রাহ্মণের সাহায্য চাহিলাম এবং তুলিবার সময় কৌশল করিয়া সেই গুরু ভার তাহার পায়ের উপর ফেলিয়া দিলাম। দুরাত্মা সেই আঘাতেই এই কয়েক দিবস শয্যাশায়ী হইয়াছিল। বন্ধু, ভয়ানক হিংস্র পশু শার্দ্দূলকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে পারিলে, একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুও পিঞ্জরের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহাকে উত্যক্ত করিতে পারে। আমার দ্বারা সেই নরাধম ব্রাহ্মণেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। আমি তাহাকে শয্যাশায়ী করিয়া সর্ব্ব বিষয়েই উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। অবশেষে কদাচার ব্রাহ্মণের ঘর দ্বার কৌশলে ভস্মীভূত করিয়া দেওয়ায়, সে আমার উদরান্ন যোগাইতে অক্ষম হইয়া পড়িল, তখন মিষ্ট বাক্যে আমাকে বিদায় করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। সেই সময়ে আমি সময় বুঝিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিলাম; করার পত্র অনুযায়ী আমাকে পঞ্চশত টাকা দাও, আমি বিদায় হইতেছি, [তাহা] না হইলে, পশুর ন্যায় তোমাকে বাজারে বিক্রয় করিব। ব্রাহ্মণ এই দেশের প্রচলিত [ব্যবস্থানুসারে] আপন বুদ্ধিতে আপনি পূরণ হইতেই আমার

নিকট বদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং আমার প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিতে না পারিয়া বিনয় পূর্ব্বক আমারই হস্তে আত্ম সমর্পণ করিল। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয়ই তুমি সচক্ষে দেখিয়াছ।

অকৃত্রিম সুহৃদের মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া রাজনন্দন কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তাহার পর সবিনয়ে কহিলেন, প্রিয় সখে, আমি যখন লক্ষ মুদ্রা হস্তে পাইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারি নাই, তখন পিতার অবর্ত্তমানে রাজ্য রক্ষা করিতে কখনই পারিব না, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি বাল্যকাল হইতে আমাকে নানা আপদ্ বিপদে রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে বিনয় পূর্ব্বক বলিতেছি, পিতার অবর্ত্তমানে আমি যাহাতে রাজ্য ভার বহন করিতে পারি, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দাও। ব্রাহ্মণ পুত্র কহিলেন, প্রিয়তম, তুমি যদি আমার গুটি কতক সদুপদেশ ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় কিছু কাল জপ কর, তাহা হইলে, তোমার পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য কি, একটি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের ভার বহনেও সক্ষম হইবে। প্রথমতঃ, এইটি জানিয়া রাখ যে, এক বুদ্ধি বৃত্তি আমাদিগের সৎ ও অসৎ সকল কার্য্যের উত্তর সাধক হয়। সদ্বুদ্ধি আমাদিগের অভাব মোচন করিয়া দেয়, অসদ্বুদ্ধি সর্ব্বক্ষণ আমাদিগের অভাব বাড়াইয়া থাকে। বন্ধু, বিবেচনা করিয়া দেখ, নিঃস্ব ব্যক্তিরাই আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া লইবার জন্য এই সংসারে সর্ব্ব অধিকারের উন্নতি সাধন করিয়াছে। কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি কৃষিকার্য্য, কি সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রাদি সমস্তই নিঃস্ব লোকের দ্বারা আবিষ্কৃত ও উন্নত হইয়াছে এবং এক্ষণেও পরিমার্জ্জিত ও পরি-

বর্দ্ধিত হইতেছে। যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিলাম, ইহার একটি বিষয়ও ধনবান্ লোকের দ্বারা হইয়াছে, এমত প্রায় দেখিতে পাইবে না। ধনিগণ পদে পদে এই সংসারের অনিষ্ট করিতে থাকে, যে হেতু, তাহারা এক ধনবলে সংসারকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করে এবং সর্ব্ব বিধায় আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে গিয়া দুর্ব্বুদ্ধির দাস হইয়া পড়ে। আমার ধন আছে, আমি সকল বিষয়েই সক্ষম, এই এক আত্ম অহঙ্কারে তাহাদিগের বুদ্ধির জড়তা জন্মে। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারে না, এই জন্য তাহাদিগের বুদ্ধি সত্ত্বেও কোন বিষয়ে সংসারের উপকারে আইসে না; কেবল আপনার অভাব দূর করিতে গিয়া প্রতিক্ষণ বুদ্ধিকে বিপরীত পথে চালনা করে। চল, এক্ষণেই যদি আমরা দিল্লীর রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করি, তাহা হইলে, তুমি দেখিতে পাইবে যে, যে প্রণালীতে বাদশাহ আপন প্রাসাদ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ সাজাইতে এক জন নির্ব্বোধ ব্যক্তি কখনই পারে না। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে, বাদশাহ আপনার রাজ প্রাসাদ এবং উদ্যানাদির শোভা সম্পাদনে কতদূর বুদ্ধির চালনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সেই বুদ্ধি এক বিলাস মন্দির সাজাইতেই বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহার ন্যায় গৃহ সজ্জা করিতে আমি হঠাৎ পারিব না বটে; কিন্তু দুই চারি দিবস শিক্ষা করিলে অনায়াসে পারিব; তবে বিপদে পড়িয়া আত্মোদ্ধার করিতে তিনি আমার ন্যায় কখনই পারিবেন না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা যাহারা এই দিল্লীর সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম ভাবে সর্ব্ব বিষয়েই বুদ্ধির চালনা করিতে পারিতেন বলিয়া বিপদেও বিচলিত হই-

তেন না এবং সম্পদেও একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না; যখন যে অবস্থায় পতিত হইতেন, তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকিতেন। যদি অবস্থার পরিবর্ত্তনে বুদ্ধিমানদিগের মনের চাঞ্চল্য ঘটিত, তাহা হইলে, মহাবীর শিবজী আপনার অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে আরঙ্গেবের কারাগার হইতে কখনই আত্মোদ্ধার করিতে পারিতেন না। যে সকল মহাত্মাগণ আপনাদিগের অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে সামান্য অবস্থা হইতে জগদ্বিখ্যাত নাম লাভ করিয়া এবং উত্তরাধিকারিগণের জন্য বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে অবস্থা ভেদে বুদ্ধির চালনা করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণ বিনা আয়াসে বিপুল বিভবের অধীশ্বর হইয়া যাহাতে মার্জ্জিত বুদ্ধি নাশ হয়, প্রতিক্ষণ তাহাই করিয়া থাকেন। রামায়ণে রঘুকুলপতি দশরথ প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে উপদেশ দিবার সময় কহিয়াছিলেন, বৎস, তুমি যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া আমার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবে, তখন এই কয়েকটি উপদেশ মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইও না—

"মন্ত্রী জনে অনুরাগ না করিবে হীন,
অমাত্য করিবে শুদ্ধ সুবুদ্ধি কুলীন।
দুষ্ট মন্ত্রী হৈতে উপস্থিত হয় ত্রাস,
বুদ্ধিহীন মন্ত্রী হৈলে হয় সর্ব্বনাশ।
কদর্য্য মন্ত্রীর সঙ্গে হয় নানা দোষ,
উত্তম অমাত্য হৈলে সকলের তোষ।
মন্ত্রী বুদ্ধি ভেদ করে শত্রুপক্ষ জনে,
সে বিষয়ে সদা রবে সাবধান মনে।

[library stamp]

শত্রু মিত্র উদাসীন চরিত্র জানিবে,
যথাকালে সন্ধি আর বিগ্রহ করিবে।
স্ববল লাঘবে সন্ধি করিতে উচিত,
শত্রুবল হানি কালে যুদ্ধ প্রশংসিত।
অধিক নিদ্রার বশ কভু না হইবে,
শেষ রাত্রে জাগি কার্য্য ভাবনা করিবে।
একা নাহি কদাচিত করিবে মন্ত্রণা,
নিশ্চয় না হয় তাহে কেবল ভাবনা।
বহুজন মন্ত্রণা কালেতে ভাল নয়,
সে মন্ত্রণা কোন মতে গুপ্ত নাহি রয়।
সিদ্ধ না হইলে কর্ম্ম স্পষ্ট না করিবে,
লক্ষ মূর্খ দিয়া এক পণ্ডিত কিনিবে।”

সখে, রাজা দশরথ যে কয়েকটি উপদেশ রামচন্দ্রকে প্রতিক্ষণ স্মরণ করিয়া রাখিতে কহিয়াছিলেন, আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি যে, এই কয়েকটি উপদেশ তুমিও রাজ্য শাসন সময়ে সর্ব্বক্ষণ স্মরণে রাখিবে। তাহা হইলে, কোন কালে কেহই তোমার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। প্রিয়তম, তাহা বলিয়া ধনবলকে আমি সামান্য বলিয়া বোধ করি না; কিন্তু এক মাত্র বুদ্ধিবলই সকল বলের পৃষ্ঠবল। বুদ্ধি না থাকিলে, ধনরক্ষা পূর্ব্বক তাহার যথাবৎ ব্যবহার করিতে পারা যায় না।

পাঠকগণ, বুদ্ধিবলেই সকল বিষয়ের আবিষ্কার হয় ও ধন বলে তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে। এক জন বুদ্ধিমান্ লোক মনে মনে কল্পনা করিলেন যে, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এক খানি ঘুড়ির সহিত অর্দ্ধ তোলা পরিমিত সামগ্রী বাঁধিয়া দিলে

অনায়াসে শূন্য পথে উঠিতে পারে, তখন অন্য একখানি প্রকাণ্ড ঘুড়িতে অধিক ভার বাঁধিয়া দিলে আকাশ পথে না উঠিবে কেন? বায়ু অপেক্ষা যে বস্তু লঘু তাহাই ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে; এরূপ স্থলে একটি প্রকাণ্ড ব্যোমযান প্রস্তুত করিয়া যদি বাষ্প সহকারে বায়ু অপেক্ষা লঘু করিতে পারি, তাহা হইলে, সেইটি ত গগনমার্গে অবশ্য উঠিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিমান্ লোকের কল্পনাতেই প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যোমযান প্রস্তুত করিয়া কৌতুকের জন্য লোকে তাহা গগনমার্গে উড্ডীন করিত। তাহার পর বহু বুদ্ধিতে মনুষ্যের ভারসহ ব্যোমযানের সৃষ্টি হইয়াছে। যিনি প্রথমে ব্যোমযানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্য স্বল্প ব্যয়সাধ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেলুন প্রস্তুত করিয়া আকাশ পথে ছাড়িয়া দিতেন; কিন্তু এক্ষণে ক্রমশঃ তাঁহার সেই বুদ্ধিবল অবলম্বন করিয়া ধনবলের সংযোগে বুদ্ধিমান্ লোকে ব্যোমযানে চড়িয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাওয়া যাইতে পারে কি না, চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপে বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া ধনের দ্বারা সংসারের নিতান্ত কল্যাণকর কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। পাঠকগণ, মনুষ্যের বুদ্ধির প্রভাব কতদূর, নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি।

এক জন বুদ্ধিমান্ লোক পৃথিবীর গুরুত্ব পরিমাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সঙ্কল্প শুনিয়া কতকগুলি লোক পরিহাস করিয়া বলিল, তবে পৃথিবীকে ওজন করিবার জন্য একটি বৃহৎ তুলাদণ্ড আগে প্রস্তুত কর। প্রত্যুত্তরে তিনি সেই সকল মূর্খ লোককে কহিলেন, পৃথিবী ওজন করিবার তুলাযন্ত্র স্বয়ং ঈশ্বর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা যখন

G D HAZRA &
BROTHERS

অনেক বস্তুর গুরুত্ব অনুভূত হইতেছে, তখন পৃথিবীর গুরুত্ব স্থির করা বুদ্ধিমান্ লোকের পক্ষে বড় কষ্টকর বোধ হইবে না। তাহার পর সেই ব্যক্তি এক জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের সহায়তায় পৃথিবীর গুরুত্ব স্থির করিয়াছিলেন। পাঠক, এই সকল অসম্ভাবিত কার্য্য যখন এক বুদ্ধির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে, তখন আমাদিগের এক মাত্র বুদ্ধি থাকিলেই অনায়াসে মহৎ-কার্য্য সাধনে সক্ষম হইতে পারি। পাঠকগণ, ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মরূপ চক্রব্যূহের মধ্যে বুদ্ধি দেবীকে স্থাপন করিয়া তাহার পর সংসার চক্রের সদসৎ সমস্ত কার্য্যে হস্তার্পণ করিবেন। আবশ্যক মত সমস্ত মনোবৃত্তির চালনা করিয়া সংসারের সর্ব্ব প্রকার লোকের সহিত লিপ্ত হইয়া আপন কার্য্যোদ্ধার করিবেন। জগৎ শুদ্ধ লোক আপনাদের অমঙ্গল চেষ্টা করিলেও কেবল এক দৃঢ় বুদ্ধির প্রভাবে সর্ব্ব বিধায় ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়া সাংসারিক সকল কার্য্যই সমাধা করিতে পারিবেন। যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধির দোষ গুণই কেবল মাত্র আমাদিগের অবনতি ও উন্নতির কারণ, তখন সেই বুদ্ধি যাহাতে কলুষিত না হয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন—

"দয়া সম ধর্ম্ম নাই, ব্যাধি সম খল,
বিদ্যা সম বন্ধু নাই, বুদ্ধি সম বল।"

পাঠকগণ, এই জন্য পুনর্ব্বার বলিতেছি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য জগতের যে কিছু সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়াই স্থির বুদ্ধির কার্য্য। বোধের নামই বুদ্ধি; সেই বুদ্ধি যাহাতে বিকৃত ভাব ধারণ না করে;

তদ্বিষয়ে সমূহ সাবধান থাকা উচিত; কদাচ যেন কোন বিষয়ে অনুমানের বৈলক্ষণ্য না ঘটে; কোন্ কোন্ অবস্থায় কি কি কার্য্যের প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন, তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়া সর্ব্বদা দেখা কর্ত্তব্য। ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মের মধ্যে সুবুদ্ধি দেবীকে স্থাপন করিয়া সমস্ত মনোবৃত্তির চালনা করিলে, কোন কালেই কাহারও অমঙ্গল ঘটিবে না।

বিজ্ঞান-কল্প-লতিকা

সমাপ্ত।

Vidya Ratna Press. 285, Upper Chitpore Road, Calcutta.